হযরত মাওলানা তারিক জামীল

আলোকিত নারী

তরজমা

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

মুহাদ্দিস. জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, ঢাকা
খতীব. সিএন্ডবি স্টাফ কোয়ার্টার জামে মসজিদ
৩০৮ পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

এদারায়ে কুরআন
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

বয়ান : ১

দীন প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদান

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ- أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا
لَا تُرْجَعُوْنَ○ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ-

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

এই বিশাল আকাশ ও বিস্তীর্ণ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এক মহান লক্ষ্যে। সুতরাং এই পৃথিবীতে আমাদের আগমন লক্ষ্যহীন নয়। ইরশাদ হয়েছে—

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ-

তোমরা কি ভেবেছো আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না? [মুমিনূন : ১১৫]

আমরা আল্লাহ তাআলার এক সুদৃঢ় ও সুশৃংখল শাসন ব্যবস্থার অধীন। আমাদের মুখের প্রতিটি উচ্চারণ চোখের প্রতিটি পলক কানের প্রতিটি শ্রবণ এমনকি হৃদয়ে উদিত আবেগ অনুভূতিও আল্লাহ তাআলার নিশ্ছিদ্র তত্ত্বাবধানের অধীন। ইরশাদ হয়েছে–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

মানুষ মুখে যাই উচ্চারণ করে তার জন্যে তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। [কাফ : ১৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ

অবশ্যই তোমাদের জন্যে রয়েছেন তত্ত্বাবধায়কগণ, সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ। [ইনফিতার : ১০-১১]

সুতরাং আমরা জেগে থাকি আর ঘুমিয়ে থাকি ব্যবসায় থাকি আর নির্জনে একাকীত্বে থাকি দু'জন তত্ত্বাবধায়ক সম্মানিত ফিরিশতা রয়েছে আমাদের পাহারায়। আমাদের ডান ও বাম কাঁধে নিয়োজিত এই ফিরিশতাগণ সদা তৎপর। তাদের ঘুমুতে হয় না, খানাপিনা করতে হয় না। এমনকি বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয় না। তাদের কাজ হলো আমাদের প্রতিটি কথা কর্ম ও আচরণের প্রতি সযত্ন লক্ষ্য রাখা।

প্রতিটি অঙ্গই জিজ্ঞাসিত হবে

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন–

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

কান চোখ হৃদয় প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হবে। [বনী ইসরাইল : ৩৬]

এর মর্ম হলো- হে মানব জাতি! তোমাদের দৃষ্টি, তোমাদের শ্রবণ এবং তোমাদের হৃদয়ের ভাবনাগুলো সম্পর্কে পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তাই আমার কাছে খুব সাবধানেই উপস্থিত হয়ো। যেদিন আমি প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবো সেদিন তোমার অঙ্গের উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব চলবে না। তোমার অঙ্গ আমার সামনে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিবে। সেদিন হয়তো বিস্মিত হয়ে বলবে, এ কী হলো! আমার শরীর আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে! তখন তারা তার উত্তরে বলবে-

أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

আল্লাহ যিনি আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। [হা-মীম সিজদা : ২১]

তখন তোমরা হয়তো আশ্চর্য হয়ে বলবে-

তোমাদের ধ্বংস হোক! তোমাদের প্রেরণায়ই তো আমি আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়েছিলাম। আর আজ তোমরা আমারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ-

আমি আজ এদের মুখ মোহর করে দেবো, এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের চরণ সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। [ইয়াসিন : ৬৫]

এক কথায়, এই পৃথিবীতে নারী-পুরুষ যত মানুষ এখন বসবাস করছে তাদের প্রত্যেকের সাথেই রয়েছে সতর্ক প্রহরী। প্রহরী তাদেরকে

দেখছে, তাদের প্রতিটি কৃতকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। একদিন তাদের কৃতকর্মের সকল আমলনামা তাদের সামনে পেশ করবে। সুতরাং আমাদের জীবনের কোন কিছুই আল্লাহ তাআলার দৃষ্টির বাইরে নয়। ইরশাদ হয়েছে–

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

তারা পার্থিব জীবনের বাইরের দিক সম্পর্কে অবগত। আর পরকাল সম্পর্কে তারা গাফেল। [রূম : ৭]

অর্থাৎ আমরা এই নারী-পুরুষরা যারা এখন এই পৃথিবীতে বসবাস করছি, আমরা ভুলে গেছি আমাদের একটি পরকালীন জীবন রয়েছে। আমরা ভুলে গেছি আমাদের সঙ্গে সতর্ক প্রহরী রয়েছে। আমরা আমাদের পরকাল সম্পর্কে গাফেল। পরকালের আযাব সম্পর্কে গাফেল। গাফেল আল্লাহর রহমত সম্পর্কেও।

হে বান্দা! এই পৃথিবীর সবই তোমার

আল্লাহ তাআলা এই বিশাল পৃথিবী, পৃথিবীর বাইরে চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্র আলো-বাতাস সব কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণে। বলেছেন–

يَابْنَ اٰدَمَ خَلَقْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

يَابْنَ اٰدَمَ خَلَقْتُ الْاَشْيَاءَ لِاَجْلِكَ

অতঃপর বলেছেন–

فَلَا تَشْتَغِلْ بِمَا هُوَ لَكَ عَمَّنْ اَنْتَ لَهُ

তোমার জন্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছি সেগুলোর ফাঁদে পড়ে তোমাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছি সে কথা ভুলে যেয়ো না।

এই পৃথিবী আমাদের জন্যে। আর আমরা আল্লাহর জন্যে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, এই পৃথিবী তোমার সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু তুমি এই কারণে আমাকে ভুলে যেয়ো না। আমার অবাধ্য হয়ে পড়ো না। পৃথিবীর সকল সৃষ্টি তোমার সেবায় সদা নিয়োজিত। তুমি যদি এই পৃথিবীতে আমার অবাধ্য হও তবুও তুমি এই সেবা পাবে। সূর্য উঠবে, পৃথিবীব্যাপী আলো ছড়াবে। সূর্যের আলো জালেমের ঘরও আলোকিত করে, আলোকিত করে নীতিবানের ঘরও। ছোট ঘরেও সূর্যের আলো পৌঁছায়, আলো পৌঁছায় বড় ঘরেও। আকাশে চাঁদ ওঠে। চাঁদ জ্যোৎস্না বিলায়। আল্লাহর অনুগত জনপদেও এবং অবাধ্য জনপদেও। এক কথায়, জগতের সকল সৃষ্টি এক সুশৃঙ্খল নিয়মে অবিরাম বয়ে চলছে। সকলেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রেখেছেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই পৃথিবীতে তিনি আমাদেরকে পাকড়াও করেন না। এটাই আল্লাহ তাআলার নিয়ম। কিন্তু এর অর্থ এই না, আল্লাহ তাআলা জালেমদের জুলুম সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ۔

তুমি কখনো মনে করো না জালেম সম্প্রদায় যা করে তা আল্লাহ জানেন না। [ইবরাহীম : ৪২]

আল্লাহ সব কিছুই জানেন

এই পৃথিবীর সব কিছু সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা সম্যক অবগত। ইরশাদ হয়েছে–

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِاجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বলো আর প্রকাশ্যেই বলো– তিনি তো অন্তর্যামী। [মুলক : ১৩]

এক কথায়, আল্লাহর তাআলার জানার সীমা থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই। তিনি ইরশাদ করেছেন–

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ

তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে। [সাবা : ২]

অর্থাৎ মাটির ভেতর লুকায়িত সত্যকেও তিনি জানেন। আরও ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

এবং যা মাটি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় তাও জানেন। [সাবা : ২]

এক কথায়, এই পৃথিবীতে কতগুলো গাছ আছে এবং সেই গাছে কতগুলো পাতা আছে তাও তিনি জানেন। শুধু কি তাই, গাছের ক'টি পাতা ঝরে পড়লো তাও তাঁর জানার বাইরে নয়। ইরশাদ হয়েছে–

مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا

তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে পড়ে না। [আনআম : ৫৯]

অথচ আমরা আমাদের ঘরের পাশের গাছটিতে কতটি পাতা আছে, রোজানা এখান থেকে কতটি পাতা ঝরে পড়ছে তাও জানি না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীব্যাপী বিস্তীর্ণ বিশাল সান্দ্র-বনানীর বিপুল বৃক্ষের পাতা-পল্লবের পরিপূর্ণ হিসেব রাখেন। উঁচু টিলাতে কতটি গাছ রয়েছে, মরুভূমির সমতল পিঠে রয়েছে কতগুলো গাছ– সেই গাছগুলোতে কতগুলো পাতা সবুজ আর কতগুলোই বা লাল হয়ে ঝরে পড়লো এর কোনটিই তাঁর অজানা নয়। গাছে কতটি কলি ফুটলো, কতটি ফল খোসা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলো এবং সেই ফলগুলো কবে পাকবে, কবে কাটা হবে, সেখান থেকে কতটি পাখি খাবে আর কতটি বাজারে বিক্রি হবে সবই তিনি জানেন। তিনি এও জানেন, এই ফল বাজার থেকে কে কিনবে এবং ফলের বিচিগুলো কোথায় নিক্ষিপ্ত হবে। নিক্ষিপ্ত বিচি থেকে কতগুলো গাছ সৃষ্টি হবে এর কোনটিই তাঁর অজ্ঞাত নয়। অনন্তর এই বিচির ভেতর কতটি গাছ লুকিয়ে আছে, সেই বৃক্ষের মাঝে লুকিয়ে আছে কত ফল সেই হিসেবও তাঁর কাছে স্পষ্ট। স্পষ্ট

এবং- সেই লুকায়িত ফল কারা ভোগ করবে। শুধু বৃক্ষ আর ফল-মূলই নয়- এই পৃথিবীতে কতটি পাহাড় আছে এবং সেই পাহাড়ের ওজন পর্যন্ত তিনি জানেন। তিনি জানেন এই পাহাড়ের গর্ভে লুকিয়ে থাকা মূল্যবান খনিজ পদার্থের কথাও। সমুদ্রে কতটুকু পানি রয়েছে, কি পরিমাণ মাছ রয়েছে, বড় মাছ ক'টি আর ছোট মাছ ক'টি, আজ কতটি মাছ সৃষ্টি হলো, কতটি মাছ খাওয়া হলো। তাছাড়া আজকে কতজন শিকারির জালে বরং কার জালে কতটি মাছ ধরা পড়বে সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি জানেন, এই মাছ কোন দেশের শিকারি শিকার করবে আর বিক্রি হবে গিয়ে কোন দেশে। তিনি এও জানেন, পরিশেষে বাজার থেকে কিনে এই মাছ কে খাবে। এজন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

তুমি কখনো মনে করো না জালেমদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল। [ইবরাহীম : ৪২]

সুতরাং আল্লাহ তাআলা জালেমদেরকে পাকড়াও করছেন না বলে এমনটি ধারণা করার সুযোগ নেই যে তিনি জানেন না। ইরশাদ হয়েছে-

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْاَرْضَ

যারা অপকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়ে পড়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন না? [নাহল : ৪৫]

এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ

এমনভাবে তাদেরকে আযাব গ্রাস করে নিবে তারা টেরও পাবে না। [নাহল : ৪৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে-

اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِىْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

অথবা চলাফেরারত অবস্থায় তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না। [নাহল : ৪৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ

অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না? [নাহল : ৪৭]

আল্লাহ তাআলা একথা বারবার বলেছেন– তোমরা কি আকাশের অধিপতি সম্পর্কে নির্ভয় হয়ে পড়েছো? এ তোমাদের কী হলো! ইরশাদ করেছেন–

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

তোমরা কি নির্ভয় হয়ে পড়েছো যে, আকাশের অধিপতি তোমাদেরসহ এই পৃথিবীকে ধসিয়ে দিবেন না। অতঃপর তা থরথর করে কাঁপতে থাকবে? [মুলক : ১৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

তোমরা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়ে পড়েছো যে, আকাশের অধিপতি তোমাদের প্রতি কংকর বর্ষণ এবং ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সতর্কবাণী কেমন ছিল। [মুলক : ১৭]

আদ সম্প্রদায়ের পরিণতি

তোমরা কি আদ সম্প্রদায়ের ইতিহাস ভুলে গেছো? আদ সম্প্রদায়কে মহাঝড় গ্রাস করে নিয়েছিল।

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى

তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখবে তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে।

كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

সারশূন্য খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়। [হাক্কাহ : ৭]

যখন আল্লাহ তাআলার ইশারা হয়েছে প্রবলবেগে বাতাস এসে সমকালীন পৃথিবীর শক্তিশালী একটি জাতিকে চুরমার করে রেখে গেছে। আল্লাহ তাআলা দেখিয়েছেন– এই আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টি তাঁর মুঠোর ভেতর। ইরশাদ হয়েছে–

يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا

তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। [ফাতির : ৪১]

আরও ইরশাদ করেছেন–

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝
الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ

তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক কী করেছিলেন? আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি– যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের। যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি। [ফাজর : ৬–৮]

আমরা ইতিহাস থেকে যতটুকু জানতে পারি, আদ সম্প্রদায়ের একেকজন মানুষ চল্লিশ পঞ্চাশ হাত লম্বা হতো। এতটুকু উঁচু দৈহিক শক্তির অধিকারী করে আল্লাহ তাআলা আর কোন জাতিকে সৃষ্টি করেননি। তারা তিনশ' বছর বয়সে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সাবালক হতো। তাদের গড় আয়ু ছিল ছয়শ' থেকে নয়শ' বছর। তাদের কোন অসুখ-বিসুখ হতো না। তাদেরকে বার্ধক্য আক্রান্ত করতো না। তাদের চুল সাদা হতো না, দাঁত দুর্বল হতো না। বয়সের ভারে তারা কখনও কুঁজো

হতো না। অথচ যখন আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন তখন শক্তিশালী বিশাল এ জাতিকে বাতাসের ছোঁয়ায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

সামুদ সম্প্রদায়ের পরিণতি

সামুদ সম্প্রদায়ের পরিণতি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে—

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

এবং সামুদের প্রতি? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। [ফাজর : ৯]

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ

এবং বহু সৈন্য-শিবিরের অধিপতি ফিরাউনের প্রতি। [ফাজর : ১০]

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

এবং সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল; অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। [ফাজর : ১২-১৩]

وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ

তাদের কাউকে কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ। [আনকাবুত : ৪০]

مِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا

এবং কাউকে কাউকে করেছিলাম পানিতে নিমজ্জিত। [আনকাবুত : ৪০]

আল্লাহ তাআলা তাঁর পাক কিতাবে অতীতকালে অবাধ্যদের ঘটনা শুনিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখ— যারাই আমার অবাধ্য হয়েছে তাদেরকে আমি কিভাবে পাকড়াও করেছি। তোমাদের সাইন্স ও টেকনোলজি অতীতেও আমাকে দুর্বল করতে

পারেনি, আমার হাত থেকে রক্ষা পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না। কারণ, এই বিশাল পৃথিবী আমারই মুঠোয়। .

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। [যিলযাল : ১]

অর্থাৎ এখনও যদি কোথাও ভূমিকম্পন শুরু হয় তাহলে সে কম্পন থেকে এই পৃথিবীর কেউ নিজেকে, নিজের আবাসকে রক্ষা করতে পারবে না। এটাই হলো আল্লাহর কুদরত।

নূহ্ সম্প্রদায়ের পরিণাম

হযরত নূহ্ (আ.)-এর সম্প্রদায়কে গ্রাস করেছিল উত্তাল পানি। ইরশাদ হয়েছে–

فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে এবং মৃত্তিকা থেকে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সকল পানি মিলিত হলো এক পরিকল্পনা অনুসারে। [কামার : ১১-১২]

একটি হাদীসে আছে– আল্লাহ তাআলা যদি সেদিন কারো প্রতি অনুগ্রহ করতেন তাহলে সেই নারীর প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করতেন– যে নারী প্রবল সয়লাবের পানি দেখে বাঁচার আকুতি নিয়ে দুগ্ধপায়ী নিষ্পাপ শিশুকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। পেছনে ধেয়ে আসছে পানি। সে ছুটছে সামনের দিকে। ছুটতে ছুটতে একটি টিলায় গিয়ে উঠলো। যখন টিলাটি পানি গ্রাস করে নিল তখন সে এর চাইতে উঁচু আরেকটি টিলায় আশ্রয় নিলো। যখন সেখানেও পানি পৌঁছে গেল তখন সে অঞ্চলের সর্বোচ্চ টিলায় গিয়ে আশ্রয় নিলো। ধীরে ধীরে পানি সেখানেও পৌঁছে গেল। তারপর পানি তার পা এবং ক্রমাগত তার বুক পর্যন্ত

পৌছে গেল। সে তার সন্তানটিকে উপরে তুলতে তুলতে কাঁধে তুলে নিল। পানি যখন কাঁধ পর্যন্ত পৌছে গেল তখন সে তার সন্তানকে উপরে তুলে ধরলো। আমি মরে যাবো তবুও যেন আমার সন্তান বেঁচে যায়। আর ঠিক সেই সময়ই একটি ক্ষিপ্র ঢেউ এসে তার সন্তানকে ছিনিয়ে নিলো। অতঃপর সন্তানটিকে এবং তার মাকেও ডুবিয়ে মারলো।

যুগে যুগে যারা অবাধ্য হয়েছে এভাবেই তারা করুণ পরিণতির শিকার হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই গল্প শোনাচ্ছেন যেন আমরা তাঁর শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারি।

তাঁর শক্তি অসীম। তিনি চাইলে কাউকে আজই ধরতে পারেন। রকেট দৌড়েও বিজ্ঞানীরা চাইলেই তাঁকে পরাজিত করতে পারবে না। তাঁর শক্তি সীমার বাইরে যেতে পারবে না। আল্লাহ তাআলার একটি ঝাড়ু সৃষ্টি জগতের সকল কৌশলকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমাদেরকে দেখছেন, আমাদের সবগুলো কথা তিনি শুনছেন। তিনি আমাদের সবকিছু সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত। তিনি সবকিছু সর্বদাই করতে পারেন। সকল সৃষ্টি জগত তাঁর কব্জায়। তিনি নিরঙ্কুশ শাসন ও ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর কোন সহযোগী কিংবা পরামর্শক নেই। তিনি একক বাদশাহ। তাঁর কোন শরীক নেই। নেই কোন সমকক্ষ। তাঁর কোন উপমা নেই– যাকে আমরা ভয় করবো। তাঁকে ব্যতীত কোন প্রভুও নেই যার কাছে আমরা আশা করবো। আল্লাহ ও আমাদের মাঝে এমন কোন মাধ্যও নেই যাকে ঘুষ দিয়ে তাঁর পর্যন্ত পৌছতে হবে। তাছাড়া এমন কোন উজিরও নেই যিনি সুপারিশ করে আমাদের কাজ করিয়ে দিবেন। বরং তিনি সদা সর্বত্র বিরাজমান। ইরশাদ হয়েছে–

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষা নিকটতর। [কাফ : ১৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ وَرَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল। [কাসাস : ৮৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি মহিমাময় মহানুভব। [রাহমান : ২৬–২৭]

যখন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে

যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্দেশ হবে হযরত ইসরাফিল (আ.) সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। মুহূর্তে এই বিশাল পৃথিবী ভেঙ্গে চুরমার হবে। সিঙ্গার ধ্বনি নিখিল সৃষ্টি জগতকে ভেঙ্গে খানখান করে দেবে। আকাশ থেকে শুরু করে সমুদ্রের অতল তল পর্যন্ত সবকিছু মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। ইরশাদ হয়েছে–

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

এবং শপথ জমিনের– যা বিদীর্ণ হয়। [তারিক : ১২]

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। [ইনফিতার : ১]

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ

সেদিন আকাশমণ্ডলী হবে গলিত ধাতুর মতো। [মাআরিজ : ৮]

আজ যে বিশাল আকাশকে শক্তিশালী ফিরিশতাগণ ধরে রেখেছেন সেদিন এই বিশাল আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। একজন ফিরিশতার চিৎকারে আকাশ ছিন্ন তুলোর মতো চারদিকে বাতাসে উড়তে থাকবে। ফিরিশতাগণ তখন বলবেন, হে জালেম

সম্প্রদায়! আজ তোমাদের সময় শেষ। ফিরিশতাগণ বলবেন, আজ তোমাদের আশ্রয় হলো জাহান্নামে।

ফিরিশতাদের মৃত্যু

যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংসের নির্দেশ আসবে তখন ফিরিশতাগণও মৃত্যুবরণ করবেন। আকাশ বহনকারী সম্মানিত আটজন ফিরিশত জীবন ত্যাগ করবেন। অবশেষে যখন হযরত জিবরাইল ও হযরত মিকাইল (আ.)-এর উপর মৃত্যুর নির্দেশ বাস্তবায়িত করা হবে তখন আরশ তাদের জন্য এই মর্মে সুপারিশ করবে– হে আল্লাহ! এদেরকেও মরণ দিচ্ছো! অন্তত এই দুইজনকে বাঁচতে দাও। তখন আল্লাহ তাআলা ধমক দিয়ে বলবেন, খামুশ!

اَلْمَوْتُ عَلٰى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِىْ

আমার আরশের নিচে যারা আছে আজ তাদের সকলকেই মরতে হবে।

মৃত্যুবরণ করবে জিবরাইল, মৃত্যুবরণ করবে মিকাইল। মৃত্যুবরণ করবে ইসরাফিল ও আজরাইল। অতঃপর জীবিত থাকবেন একমাত্র আল্লাহ। একমাত্র বাদশাহ। একমাত্র চিরন্তন সত্তা। তিনি একা, আছেনও একা।

اَلْاَوَّلُ لَيْسَ قَبْلَهٗ شَيْءٌ، اَلْاٰخِرُ لَيْسَ بَعْدَهٗ شَيْءٌ، اَلظَّاهِرُ لَيْسَ فَوْقَهٗ شَيْءٌ، اَلْبَاطِنُ لَيْسَ دُوْنَهٗ شَيْئٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

তাঁর পূর্বেও কিছু ছিল না এবং তাঁর পরও কিছু নেই। তাঁর উপরও কিছু নেই, তাঁর নিচেও কিছু নেই। তিনি অনাদি তিনি অনন্ত। তিনি অসীম।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ

দৃষ্টি তাঁকে অবধারণ করতে অক্ষম। [আনআম : ১০৩]

وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارُ

কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি।

[আনআম : ১০৩]

এক কথায়, তাঁর সত্তা সকল বিবেচনায়ই তুলনাহীন। তিনি কখনও ক্লান্ত হন না। তাঁকে কখনও ঘুম কিংবা তন্দ্রা পায় না। তিনি খানাপিনা থেকে পাক। তিনি অন্যকে ঘুম পাড়ান কিন্তু নিজে ঘুমান না। তিনি দেন কিন্তু গ্রহণ করেন না। তিনি কাঁদান কিন্তু নিজে ক্রন্দন থেকে পবিত্র। তাঁর নির্দেশেই মৃত্যু ঘটে। অথচ তিনি মৃত্যু থেকে অনেক উর্ধ্বে। এই পৃথিবীর সকল বস্তু তিনি সৃষ্টি করেছেন। অথচ এই বস্তুর প্রতি তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে তিনি অনুগত করেছেন। অথচ এই আনুগত্যের প্রতি তাঁর কোন ঠেকা নেই। তিনিই বেহেশত সৃষ্টি করেছেন। অথচ এই বেহেশতের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি দোযখ বানিয়েছেন। কিন্তু দোযখের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষ বানিয়েছেন। এই মানুষের প্রতি তাঁর কোন ঠেকা নেই। ইরশাদ করেছেন–

يَا ابْنَ اٰدَمَ! يَا عِبَادِىْ اِنِّىْ لَمْ اَخْلُقْهُمْ لِاَكَاثُرَ بِكُمْ-

হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের সংখ্যাধিক্য দিয়ে আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করবো বলে সৃষ্টি করেছি?

وَلَا سَتَاَنِسُ بِكُمْ وَحْشَةً

আমি আমার মনের একাকীত্ব ঘুচাবার জন্যে কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি? কিংবা

وَلَا لِاَ سْتَعِيْنَكُمْ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ عَجِزْتُ عَنْهُ

আমার কোন আটকে পড়া কাজে সহযোগিতা নেবো বলে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি? না। আমি তো বরং তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি–

اِنَّمَا خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُوْنِىْ فَضِيْلًا وَتَذْكُرُوْنِىْ كَثِيْرًا
وَتَسْجُدُ نِىْ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

আমি তো তোমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করেছি– তোমরা সকাল-সন্ধ্যা শুধু আমারই ইবাদত করবে, কেবল আমাকেই স্মরণ করবে এবং আমারই আনুগত্য করবে।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে, অক্ষত থেকে যাবে কেবলই আল্লাহর সত্তা। তিনি জমিনকে পাকড়াও করবেন, আকাশকে পাকড়াও করবেন। সাতটি আকাশকে একত্রিত করে এমনভাবে আঘাত করবেন যেভাবে ধোপা অনেকগুলো কাপড় একত্রিত করে সজোরে আঘাত করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করবেন– 'আনাল মালিক'! 'আমিই বাদশাহ।'

অতঃপর পুনরায় আঘাত করবেন এবং ঘোষণা করবেন–

أَنَا الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

পুনরায় আঘাত করবেন এবং ঘোষণা করবেন–

أَنَا الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

অতঃপর আল্লাহ তাআলা সক্ষোভে জিজ্ঞেস করবেন–

أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ

অহংকারীরা আজ কোথায়?

أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ

জালেমরা আজ কোথায়?

أَيْنَ الْمُلُوْكُ

রাজা-বাদশাহরা আজ কোথায়?

ঘোষণা করবেন–

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

বলো, আজ বাদশাহ কে?

কেউ কি আছে যে তাঁর কথার জবাব দিবে? তিনি তো একা। শুধুই একা। তিনিই প্রশ্ন করছেন, আবার তিনিই জবাব দিচ্ছেন। এই তো সেই এক ও অদ্বিতীয় মহান সত্তা। এই তো সেই মহান পরাক্রমশীল

সত্তা। যাঁর বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারে না। পৃথিবীর কেউ যাঁর ফয়সালাকে লঙ্ঘন করতে পারে না। পৃথিবীর কেউ যাঁর পাকড়াও থেকে পালাতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে–

لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না। [হাক্কাহ : ১৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ

তোমরা সনদ ব্যতিরেকে অতিক্রম করতে পারবে না। [রাহমান : ৩৩]

সুতরাং এই যাঁর শক্তি, যদি পার তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে লড় তো দেখি!

মনে রাখতে হবে, এই মহান ও পরাক্রমশীল বাদশাহর সামনেই একদিন আমাদেরকে উপস্থিত হতে হবে। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সৃষ্টি হিসেবে আমরা স্বাধীন নই। এক মহান ও অসীম শক্তিশালী সত্তার অধীন আমরা। যে মহান সত্তার সামনে আমাদেরকে কালই উপস্থিত হতে হবে। ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

তোমরা তো আমার কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছো যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। [আনআম : ৯৪]

সেদিন আমরা এই পৃথিবী থেকে যাব একাই যাবো। আল্লাহর দরবারে সেদিন আমরা উপস্থিত হবো সেদিন মা অপরিচিত হয়ে যাবে, স্ত্রী আমাদেরকে চিনবে না, সন্তান সঙ্গ ছেড়ে দিবে, বন্ধুরা চোখ ফিরিয়ে নিবে, শত্রু মিত্র সকলেই সেদিন হবে একই চরিত্রের। শুধু শত্রুই নয়, নিজের অস্তিত্বও নিজের বিপক্ষে দাঁড়াবে। হাত সাক্ষী দিবে, পা সাক্ষী দিবে। বলবে, আমরা তোমার অবাধ্য হয়েছি। আমরা অন্যের প্রতি অবিচার করেছি। পেট বলবে, আমি হারাম খাবার গ্রহণ করেছি। এক কথায়, আমার অস্তিত্বই সেদিন আমার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। সেদিন

আমার স্বজন সজনীরা আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। সেদিন আমি থাকবো কেবলই আমি। আর সঙ্গে থাকবে নিষ্ফলা চিৎকার।

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُئْوِيْهِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا۔

অপরাধী সেদিন শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভাইকে, তার জাতি গোষ্ঠীকে– যারা তাকে আশ্রয় দিতো এবং পৃথিবীর সকলকে। [মাআরিজ : ১১–১৪]

অর্থাৎ প্রাণের সন্তান, প্রিয় সঙ্গিনী ভাই-বন্ধু সকলকে দোযখে ফেলে দিয়ে হলেও নিজেকে বাঁচাতে চাইবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট ফয়সালা– 'কাল্লা'! না! তা আদৌ হওয়ার নয়।

আল্লাহ তাআলার অমোঘ বিধান হলো–

لَاتَزِرُوَازِرَةٌ وِّزْرَاُخْرٰى

কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।
[ফাতির : ১৮]

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طَائِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ

প্রতিটি মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি। [বনি ইসরাইল : ১৩]

অর্থাৎ সেদিন কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না এবং প্রত্যেকের আমলনামা তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। নারীর আমল নারীর কণ্ঠে, পুরুষের আমলনামা পুরুষের কণ্ঠে। এ থেকে কেউই পরিত্রাণ পাবে না। এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

يَافَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لَا اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا۔

হে নবীকন্যা ফাতেমা! তুমি তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হও। কারণ, আমি তোমাকে আল্লাহর ফয়সালা থেকে রক্ষা করতে পারবো না।

যাঁকে তিনি বেহেশতের সকল নারীর সম্রাজ্ঞী হবেন বলে সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁকেই আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর শান ও ক্ষমতার কথা। বলে দিয়েছেন– তুমি একথা ভেবো না, আল্লাহ তাআলা যদি তোমাকে পাকড়াও করে বসেন তাহলে তুমি নবীর কন্যা বলে ছাড়া পেয়ে যাবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদীয় ফুফু সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবকে বলেছেন– তুমি তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হও। আমি তোমাকে আল্লাহর ফয়সালা থেকে রক্ষা করতে পারবো না।

ফয়সালার দিন অবধারিত

একদিন আমাদের সকলকেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তিনি গাফেল নন। তিনি অক্ষম নন। তিনি পাকড়াও করতে পারেন, মারতে পারেন, মিশিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তারপরও তিনি কেনো মারেন না? তিনি কেনো আমাদেরকে ধরেন না? এরও দুটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো, তিনি ফয়সালার সময় স্থির করেছেন পরকাল। ফয়সালা করবেন আখেরাতে। এই পৃথিবীতে তিনি ফয়সালা করবেন না, এটা তাঁর সিদ্ধান্ত।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ أَجْمَعِيْنَ

নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে বিচার দিবস। নিশ্চয়ই সকলের জন্যে নির্ধারিত আছে তাদের বিচার দিবস। [নাবা : ১৭–দুখান : ৪০]

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ

আর হে অপরাধী সম্প্রদায়! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। [ইয়াসিন : ৫৯]

অর্থাৎ ফয়সালার দিন হলো পরকাল। পরকালে আল্লাহ তাআলা ফয়সালার ঘোষণা দিবেন। সেদিন সৎ ও কল্যাণীরা এক সারিতে থাকবে। আর অপরাধীরা থাকবে ভিন্ন সারিতে।

মানুষের ভেতরের অবস্থা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। সেদিন তিনি ভেতরের বিচারে যারা সৎ তাদেরকে অপরাধীদের থেকে আলাদা করে নিবেন। সেই দিন অবধারিত, সেই দিন আমাদের সামনে।

তাওবার সুযোগ

আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে এখনই ধরছেন না তার আরেকটি কারণ হলো বান্দার প্রতি তিনি অপার দয়াশীল। ইরশাদ হয়েছে—

مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও ঈমান আন তাহলে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহর কী কাজ? আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। [নিসা : ১৪৭]

আল্লাহ তাআলা স্বীয় আযাবকে পিছিলে রাখেন আর বান্দাকে তাওবা করার সুযোগ দেন। তিনি অপেক্ষায় থাকেন বান্দা যেন তাঁর দরবারে তাওবা করে। আমরা যখন পাপ করি, আমাদেরকে যখন পাপ করতে দেখে তখন আকাশের ফিরিশতাগণ জোশে ক্ষোভে আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন জানায়— হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরা এদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারবো। জমিন আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা জানায়— হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি একটু পাশ ফিরে শুই। যেন এরা আমার নিচে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তখন তাদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দেন— যাদেরকে আমি স্বইচ্ছায় সৃষ্টি করেছি তারা আর তোমরা বরাবর নও।

فَاِنْ كَانَ عَبْدُكُمْ فَشَأنُكُمْ بِهٖ

তারা যদি তোমাদের বান্দা হতো তাহলে তোমরা তাদেরকে মেরে ফেলতে পারতে। কিন্তু তারা যখন আমার বান্দা তখন তোমরা তাদেরকে আমার হাতেই ছেড়ে দাও। আমার ও আমার বান্দার মাঝখানে তোমাদের দাঁড়াবার প্রয়োজন নেই। আমি অপেক্ষায় আছি, আমার বান্দা জুলুম করার পর তাওবা করবে।

اِنْ اَتَانِىْ لَيْلاً قَبِلْتُهٗ

যদি রাতে তাওবা করে তাহলে তাও আমি কবুল করবো। যদি দিনে তাওবা করে তাহলে দিনের তাওবাকেও আমি কবুল করবো। তিনি সদা অপেক্ষায় থাকেন, বান্দা অনুতপ্ত হৃদয়ে তাওবার প্রার্থনা নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হবে। পৃথিবীর সকলেও যদি এক সাথে তাওবা করে বসে তাহলে তাতেও তাঁর কোন পরোয়া নেই। আবার সকলে যদি এক সাথে অবাধ্য হয়ে পড়ে তাতেও তাঁর কিছু যায় আসে না। তবুও তিনি অসীম দয়ালু। তাঁর দয়া ও অনুকম্পা সীমাহীন। তাই কোন নারী কিংবা পুরুষ যখন অতীত জীবনের পাপের কথা স্মরণ করে, আল্লাহ তাআলার দরবারে এসে নত হয়, চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ক্ষমা চায় তখন আকাশ জুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আকাশে আকাশে মহান মালিকের খুশির ঝিলিক খেলতে থাকে। সেই ঝিলিক দেখে ফিরিশতাগণ সচকিত হয়। তারা বলাবলি করতে থাকে, এ কিসের ঝিলিক! তখন উপর থেকে একজন ফিরিশতা ঘোষণা করে—

اَصْلَحَ الْعَبْدُ عَلٰى مَوْلَاهُ

> আজ এক পথভোলা বান্দা তার মনিবের কাছে পৌঁছে গেছে এবং তার মনিবের সাথে ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ককে পুনঃস্থাপন করেছে।

আমরা কি চাই না, আকাশে খুশির বন্যা বয়ে যাক? আমাদের কি তাওবা করার প্রয়োজন নেই? আসলে যদি ভেবে দেখি তাহলে দেখবো, জীবনের পদে পদেই আমরা তাওবার মুহতাজ। আমরা যখন আল্লাহর

দরবারে তাওবা করবো তখন তিনি আনন্দিত হবেন, তিনি খুশি হয়ে ফিরিশতাকে ঘোষণা করতে বলবেন, আমার হারানো বান্দা আমার কাছে ফিরে এসেছে। যাও, গিয়ে ঘোষণা দাও!

সত্যিই আমাদের জীবনে তাওবা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

মা-বাবার চাইতেও আপন

তাঁর দয়া এত বেশি, মানুষ যতই তাওবা করতে থাকে তিনি ততই মাফ করতে থাকেন। এই পৃথিবীতে কেউ যদি মা-বাবার সাথে কোন রকমের খারাপ আচরণ করে, তারপর ক্ষমা চায় মা-বাবা ক্ষমা করে দিবেন। দ্বিতীয়বার করলে দ্বিতীয়বার করবেন। তৃতীয়বার করলে তৃতীয়বার করবেন। কিন্তু চতুর্থবার গিয়ে বলবেন, এটা তোর চরিত্র। তুই আমাদের সাথে উপহাস করছিস। তুই এটা নিয়ম করে নিয়েছিস, আমাদের কথা অমান্য করবি আর মুখে বলবি, মাফ করে দাও। কিন্তু আল্লাহ তাআলার শান দেখুন! জীবনভর বান্দা তাওবা করছে আর ভাঙ্গছে এবং জীবনভরই বলছে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি সত্য মনে তাওবা করছি। আর আল্লাহও বলে রেখেছেন–

إِنْ تَسْتَغْفِرْنِي غَفَرْتُ لَكَ

> বান্দা! তুমি যদি বলো ক্ষমা করে দাও। তাহলে আমি ক্ষমা করে দেবো।

তারপর বান্দা এই তাওবাও ভেঙ্গে বসে। পুনরায় এসে বলে, হে আল্লাহ! আমি তো আমার অতীত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছি। আবার নতুন করে তাওবা করছি। তুমি আমার পেছনের অপরাধ ছেড়ে দাও। তখন আমি বলি, আচ্ছা! তোমার পেছনেরটা ছেড়ে দিলাম। তারপর বান্দা যখন বলে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আশ্রয় দাও। তখন আমি তাকে আশ্রয় দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাই।

তিনি আরও বলেন, তোমার পাপ যদি এই পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলে, তোমার পাপের পরিমাণ যদি আকাশের নক্ষত্রসমও হয়, তোমার পাপ

যদি এই মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত ওঠে যায় তারপরও যদি তোমার মনে ক্ষমার প্রেরণা জাগ্রত হয় আর তুমি বলতে পারো- হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও! তাহলে আমি কোন কিছুর পরোয়া করবো না। তোমাকে মাফ করে দিবো।

لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَآءِ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِىْ

তিনি স্পষ্ট ঘোষণা দেন, বান্দা! আমি তোমাকে মাফ করে দিবো। আমি তোমাকে মাফ করে দিচ্ছি। তাছাড়া আমাকে তো জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। বান্দা যখন 'ইয়া আল্লাহ' বলে ডাকে তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'লাব্বাইক ইয়া আবদি'- বান্দা আমি উপস্থিত বলে সাড়া দেন। অথচ কলজের টুকরা সন্তানও যখন অপরাধ করে এসে মায়ের সামনে দাঁড়ায় মা তখন তাকে ধমক দেয়। ধমক দিয়ে বলে, আমার মাথা খাসনে! সন্তান বাবার কাছে গিয়ে আব্বা বলে। বাবা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, কী! সন্তান আবারও ডাকে, আব্বা! বাবা মাথা নিচু করে বলে, হু! সন্তান যখন আবার আব্বা বলে, বাবা তখন রেগে গিয়ে বলেন, বকবক বন্ধ কর। কিন্তু সেই করুণাময় অসীম মেহেরবান মালিককে দেখুন! মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাঁর অবাধ্যতায় ডুবন্ত বান্দা। পাপে পাপে জীবন যার আচ্ছাদিত, সেই বান্দাই যখন পাপবিজড়িত কণ্ঠে পাপ আচ্ছাদিত হাত দু'টো উত্তোলন করে বলে- ইয়া আল্লাহ! তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেন। বলেন, লাব্বাইক ইয়া আবদি! বান্দা আমি উপস্থিত। বান্দা বলো, তোমার কী চাই? আমরা আল্লাহ আল্লাহ বলতে থাকি। তিনি লাব্বাইক লাব্বাইক বলতে থাকেন। আমরা ডাকতে ডাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু তিনি জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত হন না।

হযরত উমর (রা.)-এর কালের ঘটনা। সেকালে এক গায়ক ছিল। সে লুকিয়ে লুকিয়ে গান গাইতো। গান-বাজনা হারাম বলে মানুষের সামনে খোলামেলা গাইতো না। লুকিয়ে লুকিয়ে যারা তার গান শুনতো তারাও তাকে কিছু পয়সা ধরিয়ে দিতো। যখন সে বুড়ো হয়ে পড়লো তখন তার কণ্ঠস্বর শ্রুতিকটু হয়ে পড়লো। এখন আর গাইতে পারে না। তখন শুরু হয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ক্রমাগত আক্রমণ। অবশেষে জান্নাতুল বাকির গোরস্থানে গিয়ে নিরিবিলি বসে পড়লো এবং বলতে লাগলো- হে আল্লাহ!

যখন আমার সুমিষ্ট আওয়াজ ছিল, সুমধুর কণ্ঠ ছিল তখন মানুষ আমার গান শুনতো। আমার কণ্ঠ হারিয়ে গেছে। আমার শ্রোতারাও হারিয়ে গেছে। এখন আমার কণ্ঠ শোনার কেউ নেই। অথচ তুমি তো সকলের কণ্ঠই শোন। তুমি জান, আমি দুর্বল। তুমি জান আমি তোমার অবাধ্য। তারপরও আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমার অভাবকে দূর করে দাও। এ কথা বলে সে এমন জোরে চিৎকার করলো, তার কণ্ঠ গিয়ে পৌঁছলো আল্লাহর দরবারে। মসজিদে শায়িত ছিলেন হযরত উমর (রা.)। তাঁর কাছে নির্দেশ এলো– আমার বান্দা আমাকে ডাকছে। তুমি তাকে সাহায্য কর। হযরত উমর (রা.) নাঙ্গা পায়ে ছুটে গেলেন জান্নাতুল বাকিতে। সেখানে গিয়ে দেখলেন একজন দুর্বল, বয়সের ভারে ন্যুব্জ বৃদ্ধ বিড়বিড় করে আল্লাহ তাআলাকে তার জীবন কাহিনী শোনাচ্ছে। কিন্তু সে হযরত উমর (রা.)কে দেখেই ওঠে ছুটে পালাতে চেষ্টা করলো। হযরত উমর (রা.) তাকে ডেকে বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি তোমাকে ধরতে আসিনি। আমাকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। বৃদ্ধ ফিরে তাকালো। বললো, কে পাঠিয়েছে? উমর (রা.) বললেন, তুমি যাঁকে ডাকছো তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। একথা শোনতেই বৃদ্ধ আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে বললো, হে আল্লাহ! সত্তরটি বছর তোমার অবাধ্যতায় কাটিয়েছি, তোমাকে কখনও স্মরণ করিনি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্মরণ করলাম, তাও পেটের তাগাদায়। তারপরও তুমি আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো! হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। এ কথা বলে সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো এবং এ কান্নার ভেতর দিয়েই সে মহান মালিকের সাথে গিয়ে মিলিত হলো। হযরত উমর (রা.) নিজে তার জানাযা পড়ান।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

আল্লাহ তাআলা যেহেতু অতীব দয়ালু, পরম করুণাময় তাই তিনি মানুষের প্রতি সদাই অনুগ্রহ করতে চান। তিনি মানুষকে জাহান্নামে পাঠাতে চান না। আর এ কারণেই তিনি পাপ করার সঙ্গে সঙ্গে বান্দাকে পাকড়াও করেন না। অধিকন্তু তিনি মানুষের জন্যে, পাপীদের জন্যে তাওবার দরজা রেখেছেন সদা উন্মুক্ত।

بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مَالَمْ يُغَرْغِرْ

জীবন ওষ্ঠাগত হওয়া পর্যন্ত তাওবার দরজা সকলের জন্যে খোলা।

তাওবার দরজা খোলা ছেলেদের জন্যেও, মেয়েদের জন্যেও।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

আমি পূর্বেই এ কথা উল্লেখ করেছি, আমরা এই পৃথিবীতে পরিপূর্ণ স্বাধীন নই। আমরা যা করছি সবকিছুই সযতনে সংরক্ষিত হচ্ছে। একদা আমাদের সকল কৃতকর্ম গ্রন্থিত আকারে আমাদের সামনে পেশ করা হবে। বলা হবে–

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

> তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্যে যথেষ্ট। [বনি ইসরাইল : ১৪]

নেকী-বদী সবকিছুই সে কিতাবে গ্রন্থিত থাকবে। আল্লাহ সামনে উপস্থিত করে জিজ্ঞেস করবেন–

اَعْطَيْتُكَ خَوَّلْتُكَ اَنْعَمْتُ عَلَيْكَ

> তোমাকে সম্পদ দিয়েছিলাম, রাজত্ব দিয়েছিলাম– তুমি কী নিয়ে এসেছো?

সে বলবে–

جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ اَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِى
آتِكَ بِهِ كُلِّهِ

আমি সঞ্চয় করেছি এবং বৃদ্ধি করেছি, তারপর বহুগুণে বাড়িয়ে রেখে এসেছি। আমাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন। সবকিছু নিয়ে আসবো।

প্রশ্ন করা হবে, তুমি এখানে কি নিয়ে এসেছো?

বলবে, কিছুই আনিনি।

অতঃপর তাকে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে।

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ

তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও। [আ'রাফ : ৪১]

দোযখের বিছানা, দোযখের খাট, দোযখের ঘর।

سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ

অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানি। [ওয়াকিয়াহ : ৪২]

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ

যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না। [গাশিয়া : ৭]

কণ্টকময় বৃক্ষে আচ্ছাদিত হবে সে নিবাস। সেখানে শান্তি সুখের কোন গন্ধও থাকবে না।

سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا

আমি অচিরেই তাকে চড়াবো শাস্তির পাহাড়ে। [মুদ্দাছ্ছির : ১৭]

ফিরিশতাগণ গলায় রশি লাগিয়ে একটি উঁচু পাহাড়ে টেনে উঠাবে, জাহান্নামের তাপে সে পাহাড় এতটা অগ্নিময় হবে, পা রাখতেই পা গলে যাবে। দ্রুত পা সরিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইবে আর অমনি উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। গলে যাবে হাত। হাত বাঁচাতে চাইবে। অতঃপর সে আত্মরক্ষা করতে চাইলে ফিরিশতা রশি ধরে টান দিবে। বলবে, উপরের দিকে ওঠো। সে বলবে, ওঠতে পারছি না। তখন ফিরিশতা রশি ধরে হেঁচড়ে উপরের দিকে তুলে নিবে এবং পাহাড়ের ঘর্ষণে তার পুরো শরীর গলে যাবে। শরীর গলে নিঃশেষিত হওয়ার পূর্বেই তা আবার পূর্ণাঙ্গ দেহে রূপান্তরিত হবে। আবার গলবে, আবার নতুন শরীর লাভ করবে। এভাবে গলা ও নতুন শরীর লাভ করার ভেতর দিয়ে সত্তর বছর কেটে যাবে। সত্তর বছর পর তাকে পাহাড়ের শেষ চূড়ায় তুলে নেয়া হবে। তারপর

তাকে সেখানেই ফেলে রাখা হবে– সে নারী হোক আর পুরুষ। সে এভাবে গলতে গলতে এবং গলিত শরীর নতুন রূপ লাভ করতে করতে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়বে। আবার তাকে হেঁচড়ে উপরে ওঠানো হবে। তাছাড়া চারদিক থেকে সাপ-বিচ্ছু এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেই সাপ ও বিচ্ছুর একেকটি দংশন এতটা বেদনাদায়ক হবে– একবার দংশন করার পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে এর ব্যথায় কঁকাতে থাকবে এবং সেখানে তাকে রক্ষার মতো কেউ থাকবে না।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

আমরা সেই আখিরাতকে সামনে নিয়েই অগ্রসর হচ্ছি। আখিরাতই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমাদের সকল চেষ্টা ও সাধনার কেন্দ্রবিন্দুই আখিরাত। আমরা এখানে চেষ্টা করছি, আর সেখানে ঘোষণা হচ্ছে–

فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ اَثْقَلَتْ مَوَازِيْنُهٗ وَسَعِدَ سَعَادَةً لَا يَشْقٰى بَعْدَهَا اَبَدًا

> অমুকের পুত্র তমুক নেক ও কল্যাণ অর্জনের জন্যে অগ্রসর হয়েছে, সফলকাম হয়েছে এবং আর কখনও ব্যর্থ হবে না।

এই সাধনার দ্বারাই আমরা পরকালে মুক্তির পরোয়ানা লাভ করবো। তারপর আর ব্যর্থতা ও পরাজয় আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। যারা মুক্তির এই পরোয়ানা লাভ করবে তাদের জন্যে আল্লাহ তাআলা নির্মাণ করে রেখেছেন অতিথিশালা। সেই অতিথিশালা তিনি নিজে নির্মাণ করেছেন। নির্মাণ করেছেন নিজ হাতে। যার একটি ইট মোতির অন্যটি ইয়াকুত পাথরের। আবার কোনটি বা জমরদ পাথরের। মশলা মেশকের। সেখানে বিছানো ঘাসগুলো জাফরানের। কর্পূরের সারি সারি টিলা। মণি-মুক্তার ঝাড়-প্রদীপ। আর এই সবকিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে আল্লাহর আরশ। আর তার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত নানা নহর।

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ

যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। [কাহফ : ৩১]

মণি-মুক্তা, ইয়াকুত, জমরদ ও সোনা-রূপায় নির্মিত সেই অট্টালিকার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নানা নহর। দুধের নহর, শরাবের নহর, মধুর নহর। অতঃপর প্রতিদিন আল্লাহ তাআলা অন্তত পাঁচবার বেহেশতকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে বেহেশত! আমার বান্দা ও বান্দীদের জন্যে নিজেকে সজ্জিত কর।

দিনে বেহেশতকে পাঁচবার সজ্জিত করা হবে, পাঁচবার সুগন্ধি ছড়ানো হবে। এই পৃথিবীতে যে নিজের আমল ও ঈমান সাজিয়ে ছিল। এই পৃথিবীতে যে তাকওয়ার পথ ধরেছিল। এই পৃথিবীতে যে আল্লাহর উপর ভরসা করেছিল- সেই অধিকারী হবে সেই জান্নাতের। জান্নাতের অধিকারী হবে ঈমানদার নারী ও পুরুষগণ। ঈমানদার নারীগণ তাদের স্বামীদেরও আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা বেহেশতে গিয়ে তাদের স্বামীদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে সেজেগুজে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকবে। বেহেশতে একজন ফিরিশতা আছে। তাসবীহ-তিলাওয়াত এমন কোন কিছু তার দায়িত্বে নেই। বরং সে স্বর্ণকার। এই পৃথিবীতেও স্বর্ণকার থাকে। যে স্বর্ণের খাদ সরিয়ে অলংকার তৈরি করে। বেহেশতের স্বর্ণকারের কাজ হবে বেহেশতীদের জন্যে অলংকার তৈরি করা। বেহেশতে অলংকার নির্মাণের যে ছাঁচ রয়েছে যদি সেই ছাঁচটি দিবসের সূর্যের মুখোমুখি ধরা হয় তাহলে সূর্যটি অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হবে। এই যদি হয় ছাঁচের রূপ তাহলে অলংকার কেমন হবে? বেহেশতের সেই অলংকার নারীরাও পরিধান করবে, পরিধান করবে পুরুষরাও।

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ কঙ্কনে অলংকৃত করা হবে।

[কাহাফ : ৩১]

সেখানে নারী-পুরুষ উভয়ের হাতেই চুড়ি থাকবে। কারও হাতে স্বর্ণের চুড়ি কারও হাতে রূপার। সকলেই নিজ নিজ মর্যাদা মাফিক অলংকারে সজ্জিত হবে। রেশমের হালকা ফিনফিনে সবুজ পোশাকে সজ্জিত হবে তারা। মাথায় শোভিত হবে রেশমের দবিজ কোমল তাজ। সেই তাজ সজ্জিত হবে এমন মণি-মুক্তা দিয়ে যার আলোয় পূর্ব-পশ্চিম আলোকিত

হয়ে ওঠবে। নারীদের চুলকে এমন অপূর্ব সুবাসে সুবাসিত করে তোলা হবে– তার একগোছা চুল যদি এই পৃথিবীকে স্পর্শ করতো তাহলে সমগ্র পৃথিবী সুবাসে মৌ মৌ করে উঠতো। বেহেশতের নারী ও হুরগণ আল্লাহ তাআলার নূরে নূরময় হবে। যাদের রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা কুরআন-হাদীসে আলোচিত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে শুভ্র ডিমের আবরণের ন্যায় শ্বেত ও ইয়াকুত মোতির ন্যায় স্বচ্ছ হবে যাদের বদন। তারা পূর্ণ যৌবনা হবে। সূর্য তাদের রূপের সামনে মনে হবে ম্রিয়মাণ। আর এই ধরনের সুন্দরী হুরদের তুলনায় বেহেশতের ঈমানদার রমণীদের রূপ-সৌন্দর্য হবে আরও সত্তর হাজারগুণ অধিক। একটি হাদীসে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত উম্মে সালমা (রা.) জিজ্ঞেস করেছিলেন–

يَارَسُوْلَ اللهِ! نِسَاءُ الدُّنْيَا اَفْضَلُ اَمْ نِسَاءُ الْجَنَّةِ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়ার নারী শ্রেষ্ঠ না বেহেশতের নারী?

এই প্রশ্ন কেন হলো? প্রশ্ন এই কারণে হয়েছে, দুনিয়ার নারী-পুরুষরা তো মাটির তৈরি। তাছাড়া তারা সদা প্রস্রাব-পায়খানা বহন করে বেড়ায়। তাদের জীবনযাপনও মাটিকে কেন্দ্র করেই। পক্ষান্তরে হুরদের সৃষ্টি হলো মেশক জাফরান ও কর্পূর থেকে। এক কথায়, সুগন্ধি থেকে সৃষ্ট এক মদির সুরভিত বিস্ময়কর সৃষ্টি। মানুষের সাথে এর কোন তুলনা নেই। তাছাড়া এই যে পৃথিবীতে আমরা মেশক জাফরান আম্বর কর্পূর ইত্যাদি সুগন্ধির কথা বলি– এ তো কেবল নামে মাত্র সুগন্ধি। এর প্রকৃত রূপ তো আমরা অনুভব করবো জান্নাতে। বেহেশতের এক ফোঁটা পানি যদি কেউ আঙুলে মেখে অতঃপর আকাশে ওঠে দুনিয়ার দিকে ধরে তাহলে সেই এক ফোঁটা পানির সুবাসে এই বিশাল সৃষ্টি জগত সুবাসিত হয়ে ওঠবে। এই যদি হয় বেহেশতের পানির সুবাস তাহলে সেখানকার মেশক আম্বর জাফরান ও কর্পূরের সুগন্ধি কেমন হবে? কেমন হবে এই সুবাস থেকে সৃষ্ট রমণীর রূপ? এ কারণেই হযরত উম্মে সালমা (রা.) জিজ্ঞেস করেছেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! পৃথিবীর নারী উত্তম না বেহেশতের? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন–

بَلْ نِسَاءُ الدُّنْيَا

বরং দুনিয়ার নারীরাই শ্রেষ্ঠ।

উম্মে সালমা (রা.) পুনরায় প্রশ্ন করেছিলেন– কেন, হে রাসূল?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন–

لِصِيَامِهِنَّ وَصَلَاتِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাদের নামায রোযা ইবাদত-বন্দেগীর কারণে।

এখানে নামায রোযার পাশে যে ইবাদত শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে এর মর্ম হলো– জীবনব্যাপী বন্দেগী। মুমিন নারী ও পুরুষের পুরো জীবনটাই হবে আল্লাহর বন্দেগীপূর্ণ। এখানে দুনিয়ার নারীর শ্রেষ্ঠত্বকে তিনটি শর্তের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। নামায রোযা ইবাদত-বন্দেগী। সুতরাং যেসব নারী এই পৃথিবীতে এই তিনটি শর্ত অর্জন করতে পারবে–

اَلْبَسَ اللّٰهُ وُجُوْهَهُنَّ النُّوْرَ

আল্লাহ তাআলা তাদের মুখশ্রীকে নূরময় করে দিবেন।

اَجْسَادُهُنَّ الْحَرِيْرُ

তাদেরকে রেশমী পোশাকে সজ্জিত করবেন।

তাদের চেহারা হবে সেদিন নূরে উদ্ভাসিত। শরীরে শোভা পাবে রেশমী পোশাক। হাতে থাকবে স্বর্ণের চুড়ি। আঙ্গুলে শোভা পাবে শিল্পময় আংটি। আমাদের এ দেশে প্রচলন নেই, কিন্তু আরবে আছে। আপনারা হয়তো বাইতুল্লাহ শরীফে দেখে থাকবেন– সেখানে উদ পুড়িয়ে ধুনি দেয়া হয়। একটি বিশেষ পাত্রে সেই সুগন্ধিময় উদ বৃক্ষ পুড়ানো হয়। রাজা-বাদশাহগণ তাদের রাজ-মহলে মেশক আম্বর ইত্যাদি সেই পাত্রে রেখে তাতে উদ-যোগে প্রজ্জ্বলিত করে ধুনি দেয়। ফলে চারপাশ মদির সুরভিতে আমোদিত হয়ে ওঠে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– বেহেশতীদের কক্ষে কক্ষে সাজানো থাকবে

সেই খোশবু পাত্র। সেখান থেকে মৌ মৌ করে অপূর্ব সুরভি বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। আর সেই পাত্রগুলো নির্মিত হবে মণি-মুক্তা দিয়ে।

বেহেশতে হুরদের সাথে নেক নারীদের বিতর্ক

বেহেশতে হুরদের সাথে ঈমানদার নারীদের বিতর্ক হবে। বেহেশতের হুর বলবে, আমরা তো এক শাশ্বত সৃষ্টি। আমাদের কখনও মৃত্যু আসেনি। আমরা অবিনশ্বর সৃষ্টি। জীবনে কখনও বার্ধক্য দেখিনি। জীবনে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অথচ এসব বিষয় দুনিয়াতে রয়েছে। এসব ত্রুটি যেমন পুরুষদের মধ্যে রয়েছে, তেমনি রয়েছে নারীদের মধ্যেও। এই পৃথিবীতে আমরা জন্মগ্রহণ করি আবার মৃত্যুও বরণ করি। আমরা এখানে যৌবন লাভ করি আবার বার্ধক্যে উপনীত হই। আমরা এখানে ঘনিষ্ঠ হই আবার ছেড়ে যাই। বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করি। বেহেশতী হুরদের এ কথার প্রেক্ষিতে বেহেশতী নারীগণ বলে উঠবে–

نَحْنُ مُصَلِّيَاتٌ مَا صَلَّيْتُنَّ

আমরা তো পৃথিবীতে নামায পড়েছি। কিন্তু তোমরা কি নামায পড়েছো?

আমরা পৃথিবীতে রোযা রেখেছি, তোমরা কি রোযা রেখেছো?

আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর নামে সম্পদ বিসর্জন দিয়েছি। তোমরা কি সম্পদ বিসর্জন দিয়েছো?

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, এই বিতর্কে পৃথিবীর নারীগণ বেহেশতী হুরদেরকে পরাজিত করবে। আর আমি বলি, এই নারী শুধু বেহেশতে গিয়ে যে বিতর্কে হুরদেরকে পরাজিত করবে শুধু তাই নয়। সে বেহেশতে যেমন জয়ী হবে, জয়ী এই পৃথিবীতেও। সে জয়ী ঈমানে, তাকওয়ায়, তাওয়াক্কুলে ও চরিত্রের পবিত্রতায়। তাই বেহেশতের হুরগণ পৃথিবীর নারীদের সেবিকা মাত্র। এক হাদীসে আছে– বেহেশতী হুরগণ জান্নাতী নারীদের উদ্দেশ্যে বলবে– তোমরা তো পৃথিবীর সংকীর্ণতা পার করে এসেছো। তোমরা তো কবরের অন্ধকার পেছনে ফেলে এসেছো।

তোমরা মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছো। আবার মাটিতেই হারিয়ে গিয়েছো। কিন্তু আমরা, আমাদের জন্মই হয়েছে জান্নাতুল ফেরদৌসে। আমাদের নিবাস এক চিরন্তন অট্টালিকায়। পক্ষান্তরে তোমাদের জন্ম হয়েছে মাটি থেকে। তারপর আবার কবরে এসে মিশে গেছো সেই মাটিতেই। সেখানে দীর্ঘকাল কাটিয়েছো ভয়ানক অন্ধকারে। উত্তরে জান্নাতী নারীগণ বলবে, এতে সন্দেহ নেই আমরা মৃত্যুবরণ করেছি। তবে সেই মৃত্যু দান করেছেন আল্লাহ। তাই আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি, তাঁরই প্রশংসা করি। কিন্তু তোমরা একটি কথার জবাব দাও–

أَلَيْسَ أَبُوْنَا اٰدَمُ سَجَدَتْ لَهٗ مَلَائِكَةُ الرَّحْمٰنِ
وَاللّٰهُ يَشْهَدُ

আমরা কি সেই আদমের সন্তান নই, যে আদমকে সমগ্র ফিরিশতা সিজদা করেছিলেন? আর সেই দৃশ্য আল্লাহ তাআলাও প্রত্যক্ষ করেছেন।

বেহেশতী নারী আরও বলবে– রাত যখন ছিলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আকাশের তারাগুলো যখন অন্ধকারে মিলিয়ে যেতো তখন আমরা অযু করে মুসল্লায় দাঁড়াতাম। আল্লাহর দরবারে সিজদা করতাম। আমাদের চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু পড়তো। বলো, তোমরা সেই রাতের গভীরে সাধের ঘুম ছেড়ে ওঠার, রাতের গভীরে দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়ার স্বাদ কোথায় পাবে? সন্দেহ নেই, বেহেশতের ফলেও স্বাদ আছে। কিন্তু রাতের গভীরে ওঠে আল্লাহকে ডাকার, আল্লাহর সামনে অশ্রু বিসর্জন দেবার যে স্বাদ সে স্বাদ তুমি বেহেশতের ফলে কোথায় পাবে? সে স্বাদ তো তোমরা পাওনি। পেয়েছি আমরা। তাছাড়া আমরাই তো সেই ভাগ্যবতী কাফেলা– যাদের কোলে সম্মানিত নবীগণ লালিত হয়েছেন। আমরাই সেই ভাগ্যবতী জাতি– যারা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তাছাড়া সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের ঘরেই জন্মলাভ করেছেন। আমরাই তাঁকে কোলে তুলে লালন-পালন করেছি। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাক কালাম বয়ে এনেছেন। আমাদেরকে বেহেশতের পথ দেখিয়েছেন। ...

এভাবে বিতর্ক চলছে উভয়ের মাঝে। কে ফয়সালা দিবে? ফয়সালা ঘোষণা করবেন আল্লাহ। তিনি আরশ থেকে ফয়সালা ঘোষণা করবেন তাঁর বান্দীর পক্ষে। আল্লাহর ফয়সালা পেয়ে সগর্বে ওঠে দাঁড়াবে জান্নাতী নারী। অপূর্ব রূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে সেই নারী। তার সে রূপ দেখে লজ্জায় সূর্যও মাথা নত করতে বাধ্য হবে। মূলত এটাই আমাদের লক্ষ্য। এটাই আমাদের পথ। এ পথেই আমাদেরকে চলতে হবে। আমরা এই পৃথিবীতে থাকতে আসিনি। এই পৃথিবী আমাদেরকে ছাড়তেই হবে। এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এই পৃথিবীর রূপ সৌন্দর্য যেন আমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। আমরা যেন দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে আমাদের মনযিল ভুলে না যাই।

বেহেশতের পথ

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

বেহেশতে পৌছতে হলে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের পথ দিয়েই পৌছতে হবে। আমাদের জীবনে বাইরে থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। আমাদের এই শরীর ও অস্তিত্বকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের কর্তব্য হলো, আমরা নারী হই আর পুরুষ হই আমরা যেন আমাদের অস্তিত্বকে সে পথে ব্যবহার করি। আমাদের শরীর যেন সে পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। সে পথের বাইরে যেন আমাদের মুখ না যায়, চোখ না যায়। আমাদের কান আমাদের হাতের স্পর্শ, আমাদের চালচলন সবকিছুই যেন সে পথে পরিচালিত হয়। আমাদের অন্তরে যেন সদা জাগ্রত থাকে কেবলই আল্লাহ। এটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে হলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে হবে। আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র পথ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরিকা।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এমন অনুগ্রহ ইতোপূর্বে আর কোন নবী তাঁর উম্মতের প্রতি

করেননি। তিনি আমাদের জন্যে যতটা কেঁদেছেন আর কেউ তাঁর উম্মতের জন্যে ততটা কাঁদেনি। তিনি আমাদের জন্যে যতটা বিচলিত হয়েছেন, তিনি আমাদের জন্যে যতটা নির্যাতন সয়েছেন ঠিক ততটা বিচলিত কিংবা ততটা নির্যাতিত আর কেউ হয়নি। তিনি আমাদের জন্যে তায়েফে নির্যাতিত হয়েছেন। নির্যাতিত হয়ে তিনি দৌড়ে পালাচ্ছেন। আর পেছন দিক থেকে পাথর বর্ষিত হচ্ছে। পা তুলছেন, উত্তলিত পায়ে এসে পাথর পড়ছে। মাটিতে পা রাখছেন পাথর এসে মাটিতে আঘাত করছে। পাথরের আঘাতে পায়ের গোছা রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে। আঘাতে আঘাতে পুরো শরীর নীলবর্ণ হয়ে ওঠেছে। অতঃপর শরীর থেকে রক্ত ঝরেছে। অনন্তর সেই রক্তে শরীরের সাথে জুতা মুবারক এমনভাবে লেপ্টে গিয়েছিল যে, পা থেকে জুতা আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হয়েও এ পথে এতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন যে, অবশেষে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেছেন।

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঁধে তুলে নেন এবং দৌড়ে এসে শত্রুদেরই একটি বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর সেদিনকার এই দুর্দশা দেখে শত্রু উতবা জাউজানীর পর্যন্ত চোখে পানি নেমে এসেছে। সেও আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলে ওঠেছিল- দেখ, দেখ! মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কী অবস্থা! হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই দুর্দশা দেখে ভয়ঙ্কর শত্রুদের হৃদয়ও কেঁপে ওঠেছিল। তাদের আত্মীয়তার বন্ধন মুহূর্তে নড়ে ওঠেছিল। তাই তারা বাগান থেকে এক গোছা আঙ্গুর এই বলে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিয়েছিল, শত্রুতা শত্রুতার জায়গায়। কিন্তু তুমি তো আমাদের আত্মীয়। সুতরাং আমাদের এই আতিথেয়তা গ্রহণ কর। ভাববার বিষয় হলো, সেদিন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কী করুণ দশা হয়েছিল যে, তাঁর সে রক্তাক্ত অবস্থা দেখে শত্রুপক্ষ পর্যন্ত বেদনা অনুভব করেছে।

কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুভূতি দেখুন! যখনই তাঁকে সাহায্য করার জন্যে প্রতিপক্ষ আত্মীয়তার ছুঁতো ধরে এগিয়ে এসেছে তখন তিনি তাঁর জখমের কথা ভুলে গেছেন। আঙ্গুর

তাতে উপস্থিত ক্রীতদাসটিকে দেখেই তিনি চকিত হয়ে বসেছেন। জিজ্ঞেস করেছেন– তুমি কে? তোমার বাড়ি কোথায়? সে তার পরিচয় দিতেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেন, তুমি নীনওয়া-এর অধিবাসী? সে তো আমার ভাইয়ের শহর। হযরত ইউনুস (আ.)-এর শহর। ক্রীতদাসটি বললো, আপনাকে ইউনুস (আ.)-এর সংবাদ কে বললো? আপনি কিভাবে জানলেন তিনি সেখানকার অধিবাসী ছিলেন? ইরশাদ করলেন– হযরত ইউনুস (আ.) নবী ছিলেন। আর আমিও তো নবী। এ কথা বলে তিনি সূরা ইউনুস তিলাওয়াত করতে লাগলেন। তিলাওয়াত শুনে সেই গোলাম হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পায়ে চুমু খেতে লাগলো এবং সে কালিমা পড়ে ঈমানদার হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে উতবা বলে উঠলো, হায়রে! অবশেষে আমার গোলামটিও বরবাদ হলো? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবার থেকে যখন গোলামটি ফিরে এলো তখন উতবা বললো, তুমি জীবনে তো কখনও আমার পায়ে চুমু খেলে না। মুহাম্মদের পায়ে চুমু খেলে কেনো? গোলাম বলে উঠলো, খোদার কসম! তিনি আল্লাহর নবী এবং সত্য নবী। তাঁর অনুসরণ ও তাঁর পায়ে চুমু খাওয়ার মধ্যেই জান্নাত নিহিত।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

পৃথিবীর এই জীবন পথে কোনদিকে তাকাবার অবকাশ আমাদের নেই। আমরা দেখবো কেবলই আমাদের নবীকে। আমরা দেখবো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরিকাকে। দেখবো তাঁর জীবনাদর্শকে। আমাদের কাজ হলো, কেবলই তাঁর পথে তাঁর আদর্শে জীবনযাপন করা। অন্যকে দেখার কিংবা অন্য কোন পরিবেশের দিকে তাকাবার সুযোগ আমাদের নেই। আমাদের লক্ষ্য তো একটাই, আমাদের আল্লাহ কী চান?

আল্লাহ তাআলা তাঁর চাওয়ার কথা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাওয়ার কথা আমাদেরকে করে দেখিয়েছেন। আমাদের কাজ হলো তাঁর দেখানো সে পথে পায়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন,

আমরা যদি সে পথে ওঠে আসি তাহলে তিনি আমাদের হয়ে যাবেন। এখানে সাদা-কালো কিংবা নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। এটাই মূলত বেহেশত পর্যন্ত পৌঁছার পথ।

একেকটি সুন্নত হলো বেহেশতের মূল্য। হাত থেকে যদি একটি টাকা পড়ে যায় তাহলে কেউ একথা বলে না, একটা টাকাই তো! পড়ে গেছে, গেছে। ওঠাবার দরকার নেই। একটি ভোটের জন্যে রাজনীতিকরা জীবন বিলিয়ে দেয়। কেউ এ কথা বলে না, একটি ভোটই তো। পেলে পেলাম না পেলে না পেলাম। বরং তারা বলে, একটি ভোটের ওপরই আমার হারজিত নির্ভরশীল। একটি নাম্বারের জন্যে শিক্ষার্থীরা সারা রাত জেগে পড়াশোনা করে। তার পাশ ফেল নির্ভর করে একটি নাম্বারের ওপর। অনুরূপভাবে একটি একটি টাকা করেই ধনকুবেরদের সঞ্চয়ের পাহাড় গড়ে ওঠে। মুমিন বান্দারাও একটি একটি সুন্নত করে আল্লাহ তাআলার প্রতি ক্রমাগত এগিয়ে যায়। এমন নয়, এটা তো সুন্নতই। করলেও ভালো, না করলেও চলে। বরং সুন্নতকে উপেক্ষা করার কারণে কিয়ামতের দিন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবার থেকে বিতাড়িত হতে হবে। নবীর সুন্নতকে উপেক্ষা করে কেউ আল্লাহর দরবারেও ঠাঁই পাবে না।

একবার ভেবে দেখুন, যদি আমাদের দেশের কোন সৈনিক ইন্ডিয়ান সৈনিকের উর্দি পরে তাহলে তার অবস্থা কি হবে? সে যদি হাজার চিৎকার করে বলে, আমি শুধু বিদেশী উর্দিটাই পরেছি, নতুবা আমার ভেতরে কোন কলংক নেই। আমার অন্তর মাতৃভূমির ভালোবাসায় কানায় কানায় পূর্ণ। আমি আমার দেশের একজন বিশ্বস্ত সৈনিক। তার এ কথা কি কেউ শুনবে? বরং বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। তোমার পোশাকই বলে দিচ্ছে, তুমি গাদ্দার। আমরা তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলাবো। এজন্য বলি, শুধু অন্তরে নয়, আমাদের বাইরের রূপটাও বদলাতে হবে। আমাদের বাইরের দিকটাও হতে হবে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরিকা মাফিক। এবং এই বদলের সূচনাটাই হয় বাইরে থেকে। এটা শয়তানের প্রবঞ্চনা। শয়তান মানুষকে এই বলে ধোঁকা দেয়, প্রথমে ভেতরটা ঠিক কর। ভেতর ঠিক হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, আপনারাই বলুন, শরীরের কাপড় ময়লা হয়ে গেলে আমরা কি

সেটা খুলে ফেলে দিই না? কেন খুলে ফেলি? এই কারণেই তো খুলে ফেলি, কাপড়ের ময়লা আমাদের মন-মানসিকতাকে পর্যন্ত আক্রান্ত করে। তাই আমরা ময়লা কাপড় ছেড়ে পরিষ্কার কাপড় পরি। তাছাড়া অপরিচ্ছন্ন পাত্রে তো আমরা পানিও পান করি না। গ্লাসে যদি তরকারীর ঝুল লেগে থাকে তাহলে সেই গ্লাসে কি কেউ পানি পান করতে চাইবে? যদি কেউ বলে তাহলে বলবে, গ্লাসটা ময়লা। তাই এতে পানি পান করতে রুচি হচ্ছে না। বিছানার চাদর যদি ময়লা হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা তুলে ফেলে দেই। এ কথা বলি না, হোক না ময়লা, থাক তো! সুতরাং এর উপর ঘুমুতে সমস্যা কোথায়? বরং বলি, এই ময়লা কাপড়ে শুইতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কাপড়ের ময়লা ক্লেদ আমাদের ভেতরকে পর্যন্ত আক্রান্ত করে। অনুরূপভাবে পরিচ্ছন্ন কাপড় দেখলে, পরিচ্ছন্ন আসবাবপত্র দেখলে আমাদের ভেতরটা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খাবারের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই ভেতরটা আনন্দে চড়চড়ে ওঠে। শুবার ঘরটা যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে মনটা ভরে ওঠে। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, বাইরের অবস্থা ভেতরে প্রভাব ফেলে। তাই কারও বাইরের অবস্থা যদি ভালো হয় তার ভেতরটাও ভালো হবে। এজন্যে ভেতরে রূপান্তরের সূচনা হয় বাইরের রূপান্তর থেকে। আমরা যদি মানুষের সৃষ্টি সূচনার দিকে তাকাই তাহলে সেখানেও দেখবো, মায়ের গর্ভে প্রথম তার শরীর নির্মিত হয়। তারপর সেখানে রূহ আসে। মানুষ প্রথমে ঘর তৈরি করে, তারপর সেখানে আসবাবপত্র দিয়ে সাজায়। তাই মানুষের জাহেরই প্রমাণ করে তার বাতেন ও ভেতরটা কেমন।

আমরা যেভাবে ময়লা কাপড় খুলে রেখে দিই, আমরা যেভাবে বিছানার চাদরটা ময়লা হয়ে গেলে তুলে ফেলে দিই অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলাও ময়লা অন্তরকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আমরা কতটা আত্মপ্রবঞ্চিত! আমরা নিজেদের জন্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পছন্দ করি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পছন্দ করি। প্রতিদিন গোসল করতে পছন্দ করি। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা তো কাপড় দেখেন না, রঙ দেখেন না, বাড়িঘর দেখেন না— তিনি তো দেখেন আমাদের হৃদয়। আল্লাহ তাআলা বলেন— আমি জমিনে সমাসীন হই না,

সমাসীন হই না আকাশেও। আমি সমাসীন হই আমার বান্দার হৃদয়ে। আর যে হৃদয়ে আল্লাহ আসীন হন, যে হৃদয়ে আল্লাহ আগমন করেন সে হৃদয়কে আমরা দুনিয়ার ভালোবাসায় ক্লেদাক্ত করে রাখি। সম্পদের ভালোবাসায়, অলংকারের ভালোবাসায় অন্ধকার বানিয়ে রাখি। ভাববার বিষয়, এমন হৃদয়কে আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করবেন না ছুঁড়ে মারবেন? আল্লাহ তাআলা তো সোনা-রূপা দেখেন না। মূল্যবান পোশাক আর শরীরের সৌন্দর্য দেখেন না। তিনি দেখেন মানুষের হৃদয়। তিনি দেখেন হৃদয়ে কি কেবল আমিই আছি না অন্য কেউ।

আল্লাহর ভালোবাসায় কাউকে শরীক করো না

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর দরবারে এক মহিলা এসে আরয করলো, হযরত! যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পর্দার নির্দেশ না থাকতো তাহলে আমি আপনাকে আমার চেহারা খুলে দেখাতাম। আমি দেখাতাম আমি কতটা রূপসী। অথচ তারপরও আমার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। উপস্থিত সকলেই বিস্ময়ে বিমূঢ়। বিষয়টা কি? একজন মহিলা সে তার অভিযোগ নিয়ে এসেছে। সে তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা বলেছে। এতে বেহুঁশ হয়ে পড়ার কি আছে। কিছুক্ষণ পর যখন হযরত জিলানী (রহ.) হুঁশ ফিরে পেলেন তখন সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শোন! এ একজন সাধারণ সৃষ্টি। একজন রূপসী নারী। অথচ সেও তার ভালোবাসায় কোনরূপ অংশীদারিত্ব মানতে নারাজ। তাহলে তোমরাই বলো, আল্লাহ তাআলা কিভাবে তাঁর ভালোবাসায় কোন অংশীদারকে মেনে নিবেন? তিনি কত যে মহিমাময়! সৃষ্টি হয়ে আমরা অংশীদারকে মানতে পারি না। অথচ তিনি মেনে নিচ্ছেন। আমরা আমাদের হৃদয়ে কত অংশীদার বসিয়ে রেখেছি। তিনি সবই মেনে নিচ্ছেন এবং ক্রমাগত মেনে নিচ্ছেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)কে তাঁর বাবা থেকে চল্লিশ বছর বিচ্ছেদে রেখেছেন। চল্লিশ বছর পর পিতা-পুত্রের মিলন ঘটিয়েছেন। হযরত ইয়াকুব (আ.) পুত্রশোকে কাঁদতে কাঁদতে চোখ সাদা করে ফেলেছিলেন।

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

শোকে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। [ইউসুফ : ৮৪]

যখন মিলন ঘটলো তখন হযরত ইয়াকুব (আ.) আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলেন– হে আল্লাহ! এই দীর্ঘকাল তুমি কেন ইউসুফকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলে? ইরশাদ করলেন– একবার তুমি নামায পড়ছিলে। ইউসুফ ছিল তখন খুবই ছোট। সে তখন বিছানায় শুয়ে কাঁদছিল। আর তখন তোমার মনোযোগ আমাকে ছেড়ে দিয়ে ইউসুফের প্রতি নিবিষ্ট হয়েছিল। তোমার এই আচরণ আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত হেনেছে। এ কারণে আমি ইউসুফকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি।

হযরত ইবরাহীম (আ.)কে বলেছেন, ইসমাইলের কণ্ঠে ছুরি চালাও। এটা এজন্য বলেছেন যেন আমরা এই ঘটনা থেকে শিখতে পারি, আল্লাহকে পাওয়ার এটাই পথ। এটাই আমাদের মিরাজ। যদি আল্লাহকে পেতে গিয়ে জীবন যায় তাতেও আমরা রাজি। যদি জীবন বাঁচে তাতেও রাজি।

প্রকৃত ঈমানের রূপ

ফেরাউনের একজন দাসী ছিল। সে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছিলো। ঈমান লুকিয়ে রাখা যায় না। টাকা-পয়সাও লুকিয়ে রাখা যায় না। তার ঈমান গ্রহণের সংবাদ লুকানো থাকলো না। পৌঁছে গেল ফেরাউনের কান পর্যন্ত। তার দুই কন্যা ছিল। একজন দুগ্ধপায়ী। আরেকজন সবেমাত্র হাঁটতে শিখেছে। ফেরাউন তাকে ডেকে পাঠালো। অতঃপর একজনকে তেল আনতে বললো। একটি বড় কড়াই আনতে বললো। তারপর আগুন জ্বালিয়ে কড়াইয়ে তেল ঢালা হলো। তেল গরম হয়ে যখন তাতে বুদবুদ উঠতে শুরু করলো তখন ফেরাউন তার দরবার ডাকলো। দরবারে সে ঈমানদার দাসীকেও ডাকলো। বললো, তুমি ইচ্ছে করলে এই গরম উত্তপ্ত তেলকে গ্রহণ করতে পারো। আবার ইচ্ছে করলে ধন-সম্পদ ও

অপরিসীম ভোগ-সম্ভোগ গ্রহণ করতে পারো। বলো, তোমার কি মত? তুমি যদি আমাকে মানো তাহলে আমি তোমাকে সোনা-দানায় মুখ ভরে দিবো। আর যদি মুসার খোদাকে মানো তাহলে এই ফুটন্ত তেলে ডুবে মরতে হবে। প্রথমে এতে তোমার বাচ্চাদেরকে ডুবিয়ে মারবো, তারপর তোমাকে। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বাসী সেই নারী সেদিন কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, এ তো আমার দু'জন সন্তান মাত্র। যদি আমার আরও সন্তান থাকতো তাহলে তাদেরকেও আমি জ্বলন্ত তেলে ছুঁড়ে মারতাম। সুতরাং তোমার যা খুশি তা কর।

আমরা মূলত এটাই চাই। আমরা চাই, এ পৃথিবীর প্রতিটি নারী-পুরুষ যেন এই ঈমানদার দাসীর পথেই ওঠে আসে। একদিন আমাদের সকলকেই আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দাঁড়াতে হবে। আমরা বলি, মানুষ কী বলবে? কিন্তু এ কথা ভেবে দেখি না, আল্লাহর রাসূল কি বলবেন। আল্লাহর রাসূলকে তো উম্মতের সামনে আদর্শ তুলে ধরার জন্যে নিজ সন্তানের গলায় ছুরি চালাতে হয়েছে। আমাদের সন্তান কি নবীর সন্তানের চাইতেও বেশি দামী? কখনোই হতে পারে না।

ফেরাউন প্রথমে বড় মেয়েটাকে তুলে তেলে ফেলে দিল। সে সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে ঈমানদার মা কিছুটা ভড়কে গেল। যতকিছুই হোক, মা তো মা-ই। এ কারণেই আমি বলি, আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে মায়ের ভালোবাসার সাথে তুলনা করেছেন। বাপের ভালোবাসার সাথে তুলনা করেননি। এ কথা বলেননি, আমি পিতার চাইতে সত্তরগুণ বেশি ভালোবাসি তোমাদেরকে। বরং বলেছেন, আমি তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের চাইতে সত্তরগুণ বেশি ভালোবাসি। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। তাই সে যখন তার চোখের সামনে নাড়ীর ধন সন্তানকে ফুটন্ত তেলে ঝলসে যেতে দেখলো, তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠলো। আল্লাহ তাআলা তখন অনুগ্রহ করে তার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্যের পর্দা তুলে দিলেন। সে তখন তার সন্তানের আত্মাকে বেরিয়ে যেতে দেখলো। দেখলো সে আত্মা উজ্জ্বল নূরময়। আত্মা উড়ে যেতে যেতে বললো, মা ধৈর্য ধর। বেহেশত প্রস্তুত হয়ে আছে। মাও অস্ফুটস্বরে বললো

বেহেশত! তারপর উপস্থিত করা হলো দুগ্ধপায়ী শিশুটিকে। দুগ্ধপায়ী শিশুর প্রতি মায়ের টান থাকে সকল সন্তানের চাইতে বেশি। তাকে তুলে দিয়ে যখন ফেরাউন ফুটন্ত তেলে ছুঁড়ে মারলো তখন এই ঈমানদার নারী আবারও ভয়ে বেদনায় মমতায় কেঁপে ওঠলো। কিন্তু এবারও আল্লাহ তায়ালা তার চোখ থেকে অদৃশ্যের পর্দা তুলে দিলেন। মা তাকিয়ে দেখলেন, তার সন্তানের প্রাণ উড়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে বলে যাচ্ছে, মা মা! ধৈর্য, ধৈর্য! বেহেশত, বেহেশত! অতঃপর ফেরাউন এই ঈমানদার দাসীকেও তুলে জ্বলন্ত কড়াইয়ে ছেড়ে দিল। পুড়ে শেষ হয়ে গেল তিনটি জীবন্ত প্রাণ। তাদের হাড়গোড়গুলো মাটিতে পুঁতে ফেলা হলো।

এই ঘটনার দুই হাজার বছর পর যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রজনীতে বাইতুল মুকাদ্দাসে দুই রাকাত নামায পড়ে আকাশের দিকে যাত্রা শুরু করেন তখন বেহেশতের সুগন্ধি পেয়ে বললেন–

جِبْرَائِيْلُ! اَشُمُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

জিবরাইল! আমি বেহেশতের সুগন্ধি পাচ্ছি।

উত্তরে হযরত জিবরাইল (আ.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সুগন্ধি ফেরাউনের সেই দাসীর কবর থেকে পাচ্ছেন।

মূলত এই প্রেরণাই অর্জন করতে হবে আমাদের। এই প্রেরণা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে পৃথিবীর প্রতিটি নর-নারীর হৃদয়ে। মনে রাখতে হবে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবীর আগমন হবে না। এ সুবাদে আমরাও সর্বশেষ উম্মত। আমাদের পরও এই পৃথিবীতে আর কোন উম্মতের আগমন ঘটবে না। সুতরাং এখানে আমরা শুধু আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করবো– এটা কখনও কাঙ্ক্ষিত নয়। আমরা এই পৃথিবীতে সুখের নিবাস নির্মাণ করার জন্যে আসিনি। এখানে থাকতে হবে, তাই প্রয়োজনে ঘর বানাবো। সেটা শুধুই প্রয়োজন পরিমাণে। এখানে আমরা পোশাক-আশাক, খানাপিনা যতটুকু গ্রহণ করবো শুধুই প্রয়োজনের খাতিরে। লোক দেখানোর জন্যে নয়। আরাম-

আয়েশ আর চাকচিক্যময় সজ্জিত জীবন সে তো বেহেশতের জন্যে। এই পৃথিবীতে ঈমানদারের জীবন হবে কেবলই প্রয়োজনের ভেতর সীমাবদ্ধ। এই পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তো এতটা সীমায় রেখেছেন। বলে দিয়েছেন, আমরা যেনো ফল খাওয়ার সময় আমাদের প্রতিবেশী অসহায় গরীব-দুঃখীদেরকেও শরীক করি। আর যদি তা না পারি তাহলে যেন ফল খেয়ে ফলের ছিলকা বাইরে না ফেলি। কারণ, আমাদের ফলের খোসা দেখে তাদের সন্তানের মনে আঘাত লাগবে। এক কথায়, মুমিনের পার্থিব জীবন হবে একান্তই সাদাসিধে। আর বেহেশতের জীবন হবে আলীশান, বর্ণাঢ্য।

এই পৃথিবীতে আমাদের মূল কর্তব্য হলো, আল্লাহর দীনের পয়গামকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া। পূব থেকে পশ্চিম সাদা-কালো আরব-আজম নারী-পুরুষ কেউ যেন দীনের আলো থেকে বাইরে না থাকে। আমরা ভেবে দেখেছি কি, আজ পৃথিবী থেকে কত মুসলমান নারী-পুরুষ তাওবা ছাড়া বিদায় নিচ্ছে! অথচ তাওবা ছাড়া তাদের এই বিদায় হবে জাহান্নামের পথে যাত্রা। এই পৃথিবীতে কি পরিমাণে হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান, মুশরিক আপন আপন পথে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে সে কথা কি আমরা ভেবেছি? অথচ এটা ছিল আমাদের অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

আমাদেরকে আমাদের জীবনে পরিপূর্ণ দীন অনুসরণ করতে হবে। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে পরিপূর্ণ দীনের পয়গাম। আমরা যেহেতু সর্বশেষ নবীর সর্বশেষ উম্মত তাই আমাদের কর্তব্য অপরিসীম। পৃথিবীর সকল নারী-পুরুষ বুড়ো-শিশুর সামনে এ কথা তুলে ধরতে হবে, আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রের সফলতা শুধুই আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। একদা মুসলমানগণ এই সাধনায় সদা নিমগ্ন ছিলেন। তখন ইসলামও ছিলো। ছিলো সম্প্রসারমান। যখন আমরা এই দীনের পয়গামকে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি তখন আমাদের থেকেও দীন বিদায় নিতে শুরু করেছে। আল্লাহ তাআলা তো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি পবিত্র ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ

আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ করলাম সম্পূর্ণ। [মায়িদা : ৩]

অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার প্রান্তরে ঘোষণা করলেন–

اَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

তোমরা অনুপস্থিতদের কাছে আমার এ পয়গাম পৌঁছে দাও।

এটা এক চিল্লা, দুই চিল্লা কিংবা চার চিল্লার বিষয় নয়।

ইমাম গাযালী (রহ.) লিখেছেন– যদি এই পৃথিবীতে কোন কাফের ব্যক্তি মারা যায় আর মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাকে ঈমানের কথা না বলা হয়ে থাকে তাহলে এর জন্যে সমগ্র উম্মাহকেই জবাবদিহী করতে হবে। চাই সে আবিদুল হারামাইন হোক, কিংবা হোক মসজিদের কবুতর। সকলকেই এই দায়িত্ব লঙ্ঘনের জন্যে আল্লাহ তাআলার সামনে জবাবদিহী করতে হবে।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

মূলত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই প্রেরণাই দিয়ে গেছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছ থেকে এই প্রেরণাই গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁরা এই পয়গাম নিয়ে পৃথিবীব্যাপী চষে বেড়িয়েছেন। তাঁদের সেই ঈমানী কাফেলায় পুরুষগণ ছিলেন, ছিলেন সঙ্গে নারীগণও।

খাতুনে জান্নাত

হযরত উম্মে হারাম বিনতে মালহান (রা.) ছিলেন বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্তা এক ভাগ্যবতী নারী। তাঁর ঘরেই আরাম করছিলেন সারা

জাহানের বাদশাহ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি শোয়া থেকে হাসতে হাসতে উঠলেন। তাঁকে ঈষৎ হাসিতে উদ্ভাসিত দেখে হযরত উম্মে হারাম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী হয়েছে? ইরশাদ করলেন- আমি এইমাত্র দেখলাম, আমার উম্মতের একটি কাফেলা রাজা-বাদশাহদের মতো সমুদ্রের পথে যাচ্ছে। উম্মে হারাম (রা.) আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুআ করে দিন যেন আমিও এই কাফেলায় শরীক হতে পারি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে দুআ করে দিলেন। হযরত মুআবিয়া (রা.) যখন কুবরুসের উদ্দেশে নৌপথে সফর করেন তখন তাঁর কাফেলায় স্বীয় স্বামীর সাথে এই উম্মে হারাম (রা.)ও ছিলেন। সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। আজও পর্যন্ত সেখানেই তাঁর কবর রয়েছে। তাই আল্লাহর দীনের পয়গাম যেভাবে অতীতকালে পুরুষরা বয়ে বেড়িয়েছে তেমনি বয়ে বেড়িয়েছে নারীরাও। নারীরা পুরুষদের মতো সামগ্রিকভাবে আল্লাহর পথে বের হতে না পারলেও শর্তসাপেক্ষে বেরিয়েছেন এবং আল্লাহর দীনের পয়গাম অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

হযরত আসমা (রা.)-এর ত্যাগ

হযরত যুবায়ের (রা.) হলেন বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বিখ্যাত দশ সাহাবীর অন্যতম একজন। তিনি ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একান্ত প্রিয়ভাজনদের একজন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন- হে তালহা! হে যুবায়ের! বেহেশতে প্রত্যেক নবীরই দু'জন সঙ্গী থাকবে। এটা অনেকটা আমাদের কালের দেহরক্ষীর মতোই। বেহেশতে প্রত্যেক নবীর সাথেই তাঁর ডানে এবং বামে দু'জন সঙ্গী থাকবেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার সঙ্গী হবে তালহা! তুমি এবং যুবায়ের। কিন্তু ভাববার বিষয় হলো, হযরত যুবায়ের (রা.) এই মর্যাদায় কিভাবে উত্তীর্ণ হলেন? মূলত এ পথে চলতে তাঁকে শক্তি যুগিয়েছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী হযরত আসমা (রা.)। তিনি তাঁর স্বামীকে তাঁর পাওনা অধিকারে ছাড় দিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন, এই

পৃথিবীতে তোমার কাছে আমার কোন দাবী নেই। দাবী কিছু থাকলে পরকালে আল্লাহর কাছ থেকে নেবো। পরবর্তীকালে হযরত আসমা (রা.) তাঁর নিজের ঘটনা নিজেই বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, হযরত যুবায়ের (রা.) সর্বদাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে থাকতেন। আমার ঘরে কিছুই ছিল না। কাজের দাস-দাসীও ছিল না। সব কাজ নিজ হাতে করতাম। ঘরের এবং বাইরের। শুধু নিজের খানাপিনাই নয়, ঘোড়া এবং উটের খাবারও আমাকেই সংগ্রহ করতে হতো। কখনও কখনও একদিন দুইদিন তিনদিন পর্যন্ত অনাহারে কাটাতে হতো। বাবা তখনও জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে কখনও অভিযোগ করিনি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন। তাঁর কাছেও অভিযোগ করিনি। স্বামী আছেন। কিন্তু তাঁর সাথে অধিকারের কোন লড়াই নেই। আমাদের মেয়েরা তো এক্ষেত্রে কোনরূপ বিলম্ব বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। তারা তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে একবিন্দু ছাড় কিংবা সুযোগ দিতে প্রস্তুত হয় না। কিন্তু যারা সত্যিকার অর্থেই ভাগ্যবতী তারা এই ভেবে নিজের অধিকার ক্ষমা করে দেয়- পরকালে আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে নিবো।

এ সম্পর্কে আরেকটি হাদীস বলি। এক ব্যক্তি আল্লাহর দরবারের দিকে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে পেছনে আসছে আরেক ব্যক্তি। এসে আরয করছে- হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার হক মেরে খেয়েছে। তুমি আমার হক আদায় করে দাও। মূলত এ ব্যক্তি দুনিয়াতে সামর্থ ছিল না বলেই তার হক দিতে পারেনি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তার কাছ থেকে আমি তোমাকে কী আদায় করে দিবো? তার কাছে তো কিছুই নেই। তখন সে বলবে, তার থেকে কিছু নেকী আদায় করে দাও। আমার কিছু গুনাহ তার কাঁধে চাপিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা বলবেন, উপরের দিকে তাকাও। সে উপরের দিকে তাকাবে। দেখবে, আলীশান জান্নাত। বিশাল বিশাল সোনা-রূপার মহল। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! এটা কোন নবীর বেহেশত? এটা কোন শহীদ কিংবা সিদ্দীকের বেহেশত? আল্লাহ তাআলা বলবেন- যে এর মূল্য আদায় করবে এটা তারই বেহেশত। আরয করবে- হে আল্লাহ! এর মূল্য কি? ইরশাদ করবেন- যে নিজের পাওনা মাফ করে দেয়, এই বেহেশত তার। এ

কথা শোনার পর সে আরয করবে– আচ্ছা, তাহলে আমি আমার পাওনা এর কাছ থেকে নেবো না। তুমি আমাকে বেহেশত দিয়ে দাও। সুতরাং যে সকল নারী স্বামীদেরকে পাওনা অধিকার ছাড় দিয়ে আল্লাহর পথে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দিবেন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে দিবেন, নিজের খাজানা থেকে দিবেন। যেভাবে হযরত আসমা (রা.) নিজের অধিকার ত্যাগ করেছিলেন। জীবনে দুঃখ-যাতনাকে অবিরাম সয়েছেন; কিন্তু স্বামীর কাছে অভিযোগ করেননি, অভিযোগ করেননি আল্লাহর রাসূলের কাছেও।

হযরত আসমা (রা.) বলেন, ক্ষুধা দারিদ্র ছিল আমার পরিবারের সব সময়ের সঙ্গী। আমাদের পাশেই থাকতো এক ইহুদী পরিবার। একবার তাদের ঘরে বকরি জবাই হলো। যখন গোশত রান্না হচ্ছিল তখন তার সুবাসে আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। আমি আগুন আনার বাহানা করে তার কাছে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, আগুন আনার ছুঁতোয় যাই, সে হয়তো আমাকে এক দুই টুকরা গোশতো খাইয়ে দিবে। কিন্তু সে আমাকে কোন কথাই জিজ্ঞেস করলো না। আমার হাতে আগুন ধরিয়ে দিল। আমি আগুন নিয়ে ঘরে ফিরলাম। অথচ আমার ঘরে রান্না করার মতো একবিন্দু কিছু নেই। আগুন দিয়ে আমি কী করি! আগুন ফেলে দিলাম। কিন্তু কোনভাবেই ক্ষুধা আমাকে ধৈর্য ধরতে দিচ্ছিল না। আমি পুনরায় আগুন আনতে গেলাম। এবারও সে আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। আমার হাতে আগুন তুলে দিল। ঘরে এনে আমি আগুন ফেলে দিলাম। কিন্তু ক্ষুধার যাতনায় আমি কোনভাবেই স্থির থাকতে পারছিলাম না। এই দৃশ্য আল্লাহ তাআলা দেখছিলেন। তিনি তো চাইলে তাঁর স্বামীর কাছে নিজের পাওনা দাবী করতে পারতেন। যদি নিজের অধিকারের কথা বলে স্বামীকে ঘরে ধরে রাখতেন তাহলে হয়তো হযরত যুবায়ের (রা.) বেহেশতে নবীর সঙ্গী হওয়ার গৌরবময় সুসংবাদ লাভ করতে পারতেন না। প্রশ্ন হলো, হযরত যুবায়ের (রা.) যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী হয়ে বেহেশতে যাবেন হযরত আসমা (রা.) কি তখন তাঁর সঙ্গে যাবেন না। নিশ্চয়ই তিনিও তো সঙ্গে যাবেন। একেই তো বলে বুদ্ধিমতী নারী। দুনিয়ার সামান্য সুখ বিসর্জন দিয়ে কত বড় সম্পদ গড়ে তুলেছেন! হযরত

আসমা (রা.) বলেন, আমি তৃতীয়বার আগুন আনতে গেলাম। এবারও সে আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। আমার হাতে আগুন তুলে দিল। আমি আগুন নিয়ে ঘরে এসে বসে পড়লাম এবং খুব কাঁদলাম। আল্লাহকে বললাম, হে আল্লাহ! এই দুঃখ-বেদনার কথা কাকে বলবো? আমার সামনে তো একমাত্র তুমিই। তোমাকে ছাড়া আর কার কাছে বেদনার কথা বলবো?

এবার আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তাঁর প্রতি উথলে উঠলো। প্রতিবেশী ইহুদী খানা খাওয়ার জন্যে ঘরে আসলো। গোশতের একটি পেয়ালা তার সামনে রাখা হলো। সে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের ঘরে কি কেউ এসেছিল? স্ত্রী বললো, হ্যাঁ, এই প্রতিবেশী আরব নারী আগুন নেবার জন্যে দুই তিনবার এসেছিল। স্বামী বললো, আমি পরে খাবো। প্রথমে এই আরব নারীর ঘরে এক বাটি গোশত দিয়ে আসো। হযরত আসমা (রা.) বলেন, বাইরে গোশতের বাটি হাতে দাঁড়িয়ে আছে ইহুদী নারী। আর আমি ঘরে বসে কাঁদছি। বলছি, হে আল্লাহ! আমি কি করবো? হে আল্লাহ! আমি কি করবো? অতঃপর সে ইহুদী নারী আমার সামনে গোশতের বাটিটি রাখলো। হযরত আসমা (রা.) বলেন, তখন এই গোশতের বাটিটি আমার কাছে সমগ্র পৃথিবীর চাইতেও বেশি দামী ছিল।

আল্লাহু আকবার! ইসলাম তো এভাবেই প্রসারিত হয়েছে। ইসলাম বাতাসে চড়ে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েনি। এর পেছনে রয়েছে সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানী। সাহাবায়ে কেরামের আম্মাগণ যদি আমাদের মায়েদের মতো সন্তানদেরকে চোখের আড়াল হতে না দিতেন, তাঁদের স্ত্রীগণ যদি স্বামীদেরকে আটকে রাখতেন তাহলে আমরা এই ভারতবর্ষে বসে ইসলাম পেতাম না।

আমাদের এই ইসলামের সকল অংশ মূলত মুহাম্মদ ইবনে কাসিম (রহ.)-এর অনুগ্রহ। প্রাচীন সিন্ধুর বিশাল অঞ্চল দীপালপুর থেকে কাশ্মীরে এসে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সর্বমোট চার মাস অবস্থান করেন। চার মাস অতিক্রম করার পর সোয়া দুই বছর এই সিন্ধুতেই কাটিয়ে দেন এবং এখানেই শাহাদাতবরণ করেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে চার মাসের বেশি দেখেননি। স্ত্রীও স্বামীকে চার মাসের বেশি দেখেনি। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর

এই ত্যাগ সুযোগ করে দিয়েছিল অসংখ্য মানুষকে ইসলাম দেখার। এই মহান দম্পতি কিয়ামতের দিন যে শান ও মর্যাদার সাথে বেহেশতে যাবে তাদের ত্যাগের সেই বিনিময়কে কি কোনভাবেই খাটো করে দেখা যায়?

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

আমাদের কর্তব্য হলো, সারা পৃথিবীতে এই দীনের পয়গাম ছড়িয়ে দেয়া। আমাদের হৃদয়ে মানুষের দরদ এবং মানুষের প্রতি ব্যথা ও যন্ত্রণা থাকতে হবে। পৃথিবীর একটি মানুষও যেন জাহান্নামে না যায়– এই প্রেরণা নিয়ে আমাদেরকে পথ চলতে হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে নবুওয়তের যখন পরিসমাপ্তি ঘটেছে তখন তো আমাদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে দীনের। পুরুষরা পুরুষদেরকে বুঝাবে, নারীরা বুঝাবে নারীদেরকে। মনে রাখতে হবে, সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ্ হিসেবে মুক্তির জন্যে শুধু নামায রোযাই যথেষ্ট নয়। আমরা তো বনি ইসরাইল নই যে, ঘরের কোণে বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ করবো আর মুক্তি পেয়ে যাবো। আমাদেরকে দেখতে হবে, আমাদের নবীর আদর্শ কি। মানুষকে দীনের পয়গাম শোনানোর জন্যে তিনি সদা কতটা অস্থির থাকতেন সে কথা আমাদেরকে ভাবতে হবে।

শ্রেষ্ঠ শহীদের শাহাদাত

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বাধিক প্রিয় চাচা হযরত হামযা (রা.)। তাঁরই হত্যাকারী হযরত ওয়াহশী (রা.)। হত্যাও কোন সাধারণ পদ্ধতিতে নয়। হত্যা করার পর নাক কান কেটে দিয়েছে। বক্ষ বিদীর্ণ করে কলিজা বের করে এনে চিবিয়েছে। হযরত হামযা (রা.)-এর শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও ফুঁপিয়ে কেঁদেছেন বলে প্রমাণ নেই। কিন্তু হযরত হামযা (রা.)-এর লাশ দেখে তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। তাঁর সে কান্নার শব্দ দূর থেকে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) শুনতে পেয়েছিলেন। আর তখনই উপস্থিত হলেন হযরত জিবরাইল (আ.)। এসে আরয করলেন, হে রাসূল! আল্লাহ তাআলা বলছেন, আপনার কান্না আমার ভালো লাগছে

না। আপনি ধৈর্য ধরুন। আমি আপনার চাচার কথা আরশের উপর লিখে দিয়েছি।

اَسَدُ اللهِ وَاَسَدُ رَسُوْلِهٖ

হামযা! আমার ও আমার রাসূলের সিংহ।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তরবার তাঁর জানাযার নামায পড়েন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ থেকে মদীনার উদ্দেশে রওনা দেন। মদীনায় তখন তাঁর বংশের একমাত্র হামযা, আলী ও আকীল (রা.) ছাড়া আর কেউ ছিল না। নারীও ছিল না, পুরুষও ছিল না। যখন তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন তখন ঘরে ঘরে আনসারী নারীগণ তাদের শহীদদের জন্যে কান্নাকাটি করছিল। এই দৃশ্য দেখে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হৃদয়ে বেদনা তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠলো। দু'চোখ বেয়ে নেমে আসলো অশ্রুধারা। হৃদয় চিরে বেরিয়ে আসলো দীর্ঘঃশ্বাস। আহা! আমার চাচার জন্যে কাঁদবার মতো কেউ নেই। সবার জন্যে কাঁদার লোক আছে, কিন্তু আমার চাচার জন্যে কাঁদার কেউ নেই।

তিনি সেদিন কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন! তাঁর হৃদয়ে কতটা কষ্ট জমেছিল? কতটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন হযরত হামযা (রা.)-এর ঘাতকের প্রতি! অথচ এই ওয়াহশীকেও তিনি বলেছিলেন– ওয়াহশী! তুমি যদি মুসলমান হও তাহলে বেহেশতে যাবে। অথচ আমাদেরকে কেউ যদি গালি দেয় তাহলে আমরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হই। আর আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাচার ঘাতককে বলছেন, যদি কালিমা পড় তাহলে বেহেশতে চলে যাবে। ওয়াহশী বলেছিলো, আমি এত বড় পাপী! আমি কালিমা পড়ে কি করবো? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন– তাওবা কর, নেক আমল কর– আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। শিরক ছাড়া অন্য সকল পাপই আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। ওয়াহশী বলছিলো, তিনি যাকে খুশি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। যদি আমাকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমার কি হবে? এ কথা কুরআন শরীফে আছে। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করেন–

لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।
[যুমার : ৫৩]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ওয়াহশী'র এই কথোপকথন মুখোমুখি হয়নি। ওয়াহশী তখন ছিল তায়েফে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন বিশেষ দূত পাঠিয়ে তাকে এই পয়গাম শোনান। এই সান্ত্বনার বাণী শোনার পর সে চেহারা ঢেকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মাথা নিচু করে উপবিষ্ট ছিলেন। মুখের কাপড় সরিয়ে ওয়াহশী ঘোষণা করে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

মুখের কাপড় সরাতেই উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তলোয়ার কোষমুক্ত করে দাঁড়িয়ে যান। তাকে হত্যা করার জন্যে এগিয়ে আসেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবায়ে কেরামকে বলেন– এ তো কালিমা পড়ে ফেলেছে। তোমরা সরে যাও। কারণ, একজন মুসলমান হওয়া আমার কাছে হাজারজন কাফের হত্যা করার চাইতে বেশি প্রিয়। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَنْتَ اَوَحْشِىٌّ

তুমি কি ওয়াহশী?

জি, আমিই ওয়াহশী।

বলেন, তুমি আমার সামনে বসো।

সামনে বসার পর জিজ্ঞেস করেন–

كَيْفَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ؟

তুমি আমার চাচাকে কিভাবে হত্যা করেছিলে?

[illegible] বছর গত হয়ে গেছে, কিন্তু হৃদয়ের ঘা এখনও শুকায়নি। চাচাকে হত্যা করার বেদনা এখনও ভুলতে পারেননি। তাঁর দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ইরশাদ করলেন–

وَيْحَكَ ضَيِّفْ عَنِّى وَجْهَكَ

> ওয়াহশী! তুমি কখনও আমাকে তোমার চেহারা দেখাবে না।

ভাববার বিষয় হলো, যার মুখ দেখতে প্রস্তুত নন তাকেও কি করে [illegible]তে পৌঁছানো যায় সে কথা ভাবতে ভুলেননি।

আমাদেরও তাঁর উম্মত হিসেবে মানুষের প্রতি এই দরদ ও ভাবনা পোষণ করতে হবে। কি করে পৃথিবীর প্রতি পুরুষ ও নারী জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতের পথ পাবে আমাদেরকে সে কথা ভাবতে হবে এবং সে ভাবনা নিয়ে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকলকে সেই তাওফীক দিন। আমীন।

বয়ান : ২

ইত্তেবায়ে রাসূল (সা.) ও নারী জাতি

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ- اَمَّابَعْدُ!

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

প্রতিটি মানুষের শরীরে একটি অন্তর রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গীকার ও নিয়ম এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত হলো– এই একটি অন্তরে কখনও দুটি চিন্তা একত্রিত হতে পারে না। দুটি শোক একত্রিত হতে পারে না। এর মর্ম হলো, যে অন্তরে দুনিয়ার চিন্তা ঠাঁই পেয়েছে আল্লাহ্ তাআলা সে অন্তরে পরকালের চিন্তা ঠাঁই দিবেন না। পক্ষান্তরে যে অন্তরে পরকাল চিন্তা ঠাঁই পাবে, সে অন্তরে দুনিয়ার চিন্তা ঠাঁই পাবে না। আরও সহজ কথায়, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সুখ বিলাসের পেছনে ছুটবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে আখেরাতের সুখ বিলাস থেকে বঞ্চিত করবেন। আর যে ব্যক্তি পরকালীন সুখ-শান্তির আশায় সচেষ্ট হবে সে পার্থিব জগতে আরাম-আয়েশের পথকে এড়িয়েই জীবনযাপন করবে।

দুনিয়ার চিন্তা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ كَانَ هَمُّهُ طَلَبَ الدُّنْيَا، فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ عَنْهُ فِي قَلْبِهِ، أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ-

যে ব্যক্তি দুনিয়ার পেছনে পড়ে যায়, দুনিয়ার শান-সৌন্দর্য যার লক্ষ্যে পরিণত হয় আল্লাহ তাকে দুনিয়ার ক্ষেত্রেও অস্থির করে রাখেন। তার রিযিক ছড়িয়ে দেন। তার অন্তর ভরে দেন দুনিয়ার চিন্তা দিয়ে। তাকে ক্লান্ত করে দেন, আর পরকাল তার থেকে দূরে সরে যায়। অথচ দুনিয়াতে তকদীরের বাইরে সে কিছুই প্রাপ্ত হয় না।

আখেরাতের চিন্তা

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সর্বদাই পরকালের কথা ভাবে, তার কান্না ও অস্থিরতা পরকালকে কেন্দ্র করেই– সে দুনিয়ার সুখ-শান্তির কথা ভুলে যায়। তার হৃদয় জুড়ে সর্বদাই বিরাজ করে পরকাল চিন্তা। তার মন ও ভাবনায় সদা ঘুরেফিরে কবরের অন্ধকার ঘর। সে কখনও দুনিয়ার সুখ-শান্তিকে পরোয়া করে না। গভীর রাতে ওঠে নিরালায় বসে কবরের ধ্যান করে। সে ভাবে, একদা শরীরের এই শক্তিশালী হাড়গুলো আলাদা হয়ে পড়বে। শরীরের ওপর পোকা-মাকড় ঘুরে বেড়াবে। সে ভাবে, হাশরের মাঠে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। এই ভাবনা তাকে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হতে দেয় না। তার অন্তরকে দুনিয়ার কথা মনে করতে দেয় না। অথচ এই চিন্তার কারণে যে সে তার তকদীরের রিযিক থেকে বঞ্চিত হয় তাও নয়। কারণ, আমার নামে যা কিছু বরাদ্দ রয়েছে দুনিয়ার কোন শক্তি তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلَا اَنَّ جِبْرَائِيْلَ نَفَثَ فِىْ رُوْحِىْ اَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا

শোন! হযরত জিবরাইল (আ.) আমাকে বলেছেন– যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তার রিযিককে পূর্ণরূপে ভোগ করে শেষ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করবে না।

বোনেরা আমার!

এটা আমাদের প্রভুর রীতি। যদি কারও অন্তরে পরকালের ভাবনা থাকে তাহলে এই দুনিয়াতে আল্লাহ তাকে স্থিরতা দান করেন। আর যদি কারও অন্তরে দুনিয়ার চিন্তা এসে ভর করে তাহলে সেখান থেকে পরকালের চিন্তা বেরিয়ে যাবে। যদি কেউ আল্লাহকে ভালোবাসে তাহলে তার অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা ঠাঁই পায় না। আর যে অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা জেঁকে বসে সে অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ভালোবাসা ছিনিয়ে নেন।

একবার যার মাথায় বেহেশতের চিন্তা ঢুকেছে, নেকীর প্রতিযোগিতায় আর কেউ তাকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। একবার যার ভেতরে জাহান্নামের ভয় ঢুকেছে, দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে সে কখনও প্রশ্রয় দিতে পারে না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

يَا مُعَاذُ اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَاِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ

হে মুআয! বিলাসিতা থেকে বিরত থেকো। কারণ, আল্লাহর বান্দাগণ কখনও বিলাসী হয় না।

এই দুনিয়াটা হলো একটা পথ মাত্র। এই পথ পাড়ি দিয়ে আমাদেরকে সামনে যেতে হবে। কেউ আজ যাবে, কেউ যাবে কাল। শখে-স্বপ্নে যাই কিছু কুড়াচ্ছি আমরা রেখে যেতে হবে এখানে।

এই পৃথিবীতে আমরা সুখভোগের উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর যখন ভোগ-বিলাসের সময় হয় তখন মৃত্যু

দুয়ারে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ে। জীবন মুহূর্তে সংকোচিত হয়ে ওঠি। বিদায় নিতে হয় নীরবে। ভোগ-বিলাসের সকল উপকরণ পড়ে থাকে পাশে। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, এটা ভোগের জায়গা নয়। মূলত এটা হলো, পরকালের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করার স্থান। এই দুনিয়াটা হলো কবরের কথা ভাববার জায়গা। এ কথা ভাববার জায়গা, আমাকে একবার আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হতে হবে।

হযরত রাবি' ইবনে খুফফাইন (রহ.) একজন মস্ত বড় বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর কালের কিছু লোক তাঁকে ভারি হিংসা করতো। সেকালে এক ব্যভিচারী নারী ছিল। রূপে-গুণে ছিল প্রবাদতুল্য। হিংসুকরা তাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে রাজি করালো সে হযরত রাবি' (রহ.)কে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। মানবতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ফিতনার সূচনা হয়েছিল নারী থেকে। বিশেষ করে নারী ও পুরুষরা যখন স্বাধীনভাবে মেলামেশা করে তখন শয়তান ফিতনা উস্কে দেয়। তাছাড়া ধন-সম্পদও মানুষকে অন্ধ করে ফেলে। যেমনটি আজকের সমাজের প্রতি তাকালেই আমরা দেখতে পাব। অতঃপর সেই ব্যভিচারিণী তার সবচাইতে সুন্দর পোশাকটি পরিধান করলো। খুব ভালোভাবে সাজগোজ করলো। শরীরে সুগন্ধি মাখালো। অতঃপর হযরত রাবি' ইবনে খুফফাইন (রহ.) যখন রাতের বেলা নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হলেন তখন সে রূপসী নারী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। তুলে দিল মুখের পর্দা। তার উপর হযরত রাবি' (রহ.)-এর দৃষ্টি পড়তেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি নামিয়ে দিলেন এবং বললেন, শোন বোন! যে সৌন্দর্য নিয়ে তোমার এত অহংকার, যে রূপের ভরসায় তুমি আমাকে পথহারা করতে এসেছো, তুমি একবার সেই দিনের কথা স্মরণ কর যেদিন আল্লাহ তাআলা তোমাকে কোন অসুস্থতায় আক্রান্ত করবেন। বলো, সেদিন তোমার চেহারার ঔজ্জ্বল্য কোথায় যাবে? তোমার শরীরের হাড়গুলো যখন কংকালের মতো বেরিয়ে আসবে– বলো, সেদিন তোমার রূপ যাবে কোথায়? তুমি বলো, যখন তোমাকে কবরে রাখা হবে, যখন তোমার এই আলোকজ্জ্বল মুখের ওপর মাটি ছড়িয়ে দেয়া হবে, যখন তোমার শরীরের ওপর কবরের পোকা-মাকড় অবাধে ঘুরে বেড়াবে, তোমার চোখগুলো খেয়ে ফেলবে, তোমার চুলগুলো টেনে উপড়ে ফেলবে,

তোমার হাড়গুলো শরীর থেকে আলাদা হয়ে পড়বে– তখন তো তুমি হবে একটি নিথর কংকাল। তুমি একবার সেই দিনের কথা ভেবে দেখ, যেদিন তোমাকে মুনকার-নাকীর তুলে বসাবে। অতঃপর তোমাকে তোমার কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। বলো, কী রূপ নিয়ে আজ তুমি বড়াই করছো? তোমার এই রূপ-সৌন্দর্য তো কালই পোকা-মাকড়ের খোরাক হবে।

হৃদয়ের দরদ ও ব্যথাবিজড়িত একেকটি বাণী ব্যভিচারী নারীর হৃদয়ে থেকে থেকে আঘাত করছিল এবং তাঁর কথা শেষ হবার আগেই পথহারা করতে আসা নারী নিজেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে পথের উপর। তারপর যখন সে হুঁশ ফিরে পায় তখন সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে। পরবর্তীকালে সে তার কালের অনেক বড় ওলী ও তাপসী হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তার কাছে দুআ চাইতে আসতো।

বিচার দিবস

বোনেরা আমার!

আমরা তো দুনিয়ার ফাঁদে এমনভাবে আটকে পড়েছি, আমাদের যে একটা পরকাল আছে সেকথা ভুলেই গেছি। ভুলে গেছি, আমাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। ভুলে গেছি, হাশরের মাঠের সে অবস্থা হবে ভয়াবহ। সেখানে কারও আপন বলতে কেউ থাকবে না।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ
وَبَنِيهِ ۝ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ...

সেদিন মানুষ তার ভাই মা বাবা স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে পালিয়ে বেড়াবে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই এমন গুরুতর অবস্থা হবে যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত করে রাখবে। ['আবাসা : ৩৪–৩৭]

সকলেই নিজের ভাবনায় ব্যাকুল থাকবে। কেউ কারও কাছে যাবে না। সবার একই আর্তনাদ হবে, নাফসী! নাফসী! হে আল্লাহ! আমাকে রক্ষা

করো, আমাকে বাঁচাও! চারদিকে প্রহরারত ফিরিশতাগণ সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকবে। জাহান্নামের ভয়াবহ চিৎকার হৃদয়কে সদা কম্পিত করে রাখবে। জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দীর্ঘ লেলিহান প্রতিটি মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখবে। কম্পিত মনে সদাই ভাবতে থাকবে, আমাকে হিসাবের পাল্লার সামনে দাঁড়াতে হবে।

হিসেবের মুখোমুখি হতে হবে, আমাকে আপনাকে সকলকেই। কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন স্বয়ং আল্লাহ। জবাব দিবে দুর্বল অসহায় বান্দা-বান্দী। মেয়েদের অন্তর তো এমনিতেই দুর্বল হয়। এই দুর্বল নারীকেই তখন আল্লাহ তাআলা সরাসরি নাম নিয়ে ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন–

أَيْنَ مَا أَعْطَيْتُكَ؟ أَيْنَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ...؟

তোমাকে যা দিয়েছিলাম তা কোথায়? তোমাকে যা পরিয়েছিলাম তা কোথায়? যে সম্পদ রিযিক ও আকল তোমাকে দান করেছিলাম তা কোথায়?

তখন প্রতিটি মানুষ গাছের পাতার ন্যায় কাঁপতে থাকবে।

সেদিনের সেই পরিস্থিতি হবে খুবই ভয়াবহ। ডান দিকে তাকালে নিজের আমল নজরে পড়বে। বাম দিকে তাকালে নজরে পড়বে আমল। সামনের দিকে তাকালে ভেসে আসবে জাহান্নামের চিৎকার।

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ○ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ○ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ○ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ○ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي.....

এটা সঙ্গত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশতাগণও। সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে। তখন এই উপলব্ধি তার কী কাজে আসবে?

সে বলবে, হায়! আমার এই জীবনের জন্যে যদি আমি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম! [ফাজর : ২১-২৪]

يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَالَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً يُوَيْلَتٰى لَيْتَنِى لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلاً

জালেম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!
[ফুরকান : ২৭-২৮]

দু'টি ফোঁটা

দুনিয়ার দু'টি অশ্রুফোঁটা আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধকে শীতল করতে পারে। দু'ফোঁটা অশ্রু জাহান্নামের আগুনকে নিভিয়ে দিতে পারে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আমি আমার এক উম্মতকে দেখলাম, সে জাহান্নামে পতিত হচ্ছে আর অমনি দুনিয়াতে আল্লাহর ভয়ে বিগলিত একফোঁটা অশ্রু এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের করে একদিকে দাঁড় করিয়ে দিল।

এ হলো, আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রুর মূল্য। যে অশ্রু নির্গত হয়েছে এই পৃথিবীতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই পৃথিবীতে যারা কাঁদবার সুযোগ পায়নি, আল্লাহর ভয়ে এই পৃথিবীতে যারা অশ্রু বিসর্জন দেয়নি পরকালে তাদের অশ্রুতে নৌকা চলবে। কিন্তু সে অশ্রু তাদের একবিন্দু উপকারে আসবে না। সেদিন আল্লাহ বলবেন-

اَيْنَ الْمَفَرُّ...

পালাবে কোথায়? [কিয়ামা : ১০]

রাতের অন্ধকার নেই। কোন রক্ষিত কক্ষও নেই। পাহাড়ের টিলা কিংবা গর্তও নেই।

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا

অতঃপর তিনি তাকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে। [ত্বহা : ১০৬]

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ.....

সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না। [হাক্কাহ : ১৮]

كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

না! আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকেরই কাছে। [কিয়ামা : ১১-১২]

يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছিল এবং কী পশ্চাতে রেখে গেছে। [কিয়ামা : ১৩]

আল্লাহ তাআলা কত যে দয়ালু! এই পৃথিবীতে তিনি আমাদের উপর তাঁর রহমতের পর্দা ছড়িয়ে রেখেছেন। আমাদের পাপগুলোকে ঢেকে রেখেছেন। আমাদের চোখ অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়, কিন্তু ফিরিশতাগণ আমাদেরকে এসে থাপ্পর মারে না। আমরা নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি কান পেতে বসি, কিন্তু ফিরিশতাগণ আমাদের কান এসে বন্ধ করে দেয় না। আমরা অন্যায় পথে পা বাড়াই, কিন্তু ফিরিশতাগণ লাঠি নিয়ে এসে আমাদের পা ভেঙ্গে দেয় না। এ সবই আল্লাহর অনুগ্রহ।

তাওবার অপেক্ষা

বোনেরা আমার!

আকাশের ফিরিশতাগণ যখন দেখে, আমরা আল্লাহর দেয়া নিয়ামত ভোগ করে আবার তাঁরই হুকুমের বিরোধিতা করি, তাঁর হুকুমকে অবলীলায় উপেক্ষা করে চলি তখন তারা আল্লাহ তাআলার কাছে

অনুমতি চায়। এমনকি আমাদের পায়ের নিচের মাটিও আল্লাহকে বলে, হে আল্লাহ! আমি কি একবার পাশ ফিরে শোব? সমুদ্র পর্যন্ত আল্লাহকে বলে, হে আল্লাহ! যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি এদের উপর চড়ে বসবো এবং এদেরকে ডুবিয়ে মারবো।

পানির বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ জঙ্গলের গাছ-গাছালি পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। পানি মৃত্যুঘন্টা হয়ে মানুষের জনপদ থেকে জনপদ পর্যন্ত ধ্বংস করে দিতে পারে। ফিরিশতাগণ আল্লাহ তাআলাকে বলে– হে আল্লাহ! তুমি অনুমতি দাও, আমরা এদেরকে ধ্বংস করে দিই। আল্লাহ তাআলা বলেন– তোমরা যদি এদেরকে সৃষ্টি করে থাক তাহলে ধ্বংস করে ফেল। সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই। আর যদি আমি তাদেরকে সৃষ্টি করে থাকি তাহলে আমার ও আমার বান্দাদের মাঝে এসে নাক গলাবে না। আমি আমার বান্দার তাওবার অপেক্ষায় আছি।

اِنْ اَتَانِىْ نَهَارًا قَبِلْتُهُ، اِنْ اَتَانِىْ لَيْلاً اَقْبَلْتُهُ

সে যদি দিনের বেলা তাওবা করে, আমি তার তাওবা কবুল করবো। যদি রাতের বেলা তাওবা করে, আমি তাও কবুল করবো।

আল্লাহ তাআলার করুণা বড়ই বিস্ময়কর! সারা জীবন অপরাধ করার পর জীবন সায়াহ্নে এসে যদি কেউ কৃত অপরাধের প্রতি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাওবা করে, আল্লাহ তাআলার রহমত সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোলে তুলে নেয়। সন্দেহ নেই, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্যে আমাদের মা-বাবার চাইতেও বেশি দয়ালু, বেশি মমতাপ্রবণ।

আল্লাহর রহমত : একটি বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত উমর (রা.)-এর কালে মদীনায় এক গ্রাম্য গায়ক বাস করতো। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের তালে গান গেয়ে বেড়াতো। যখন ইসলাম এলো। গান-বাজনা নিষিদ্ধ হলো। গান শোনা বিবেচিত হলো মহাপাপ বলে। তারপরও সে লুকিয়ে লুকিয়ে গান গেয়ে বেড়াতো। এটাই ছিল তার পেশা। বার্ধক্যে এসে যখন তার কণ্ঠের সুর হারিয়ে গেল তখন মানুষ

তাকে উপেক্ষা করে চললো। ফলে তার জীবিকার পথ বন্ধ হয়ে গেলো। জীবন হয়ে উঠলো দুঃসহ। পরে সে একদিন জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে এই বলে কাঁদতে লাগলো– হে আল্লাহ! যতদিন আমার কণ্ঠে মধু ছিল ততদিন মানুষ আমার গান শুনেছে। আমার জীবিকার ব্যবস্থা হয়েছে। আজ আমার কণ্ঠের সুর হারিয়ে গেছে। ফলে মানুষ আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন আর কেউ আমার গান শুনে না। অথচ তুমি তো সবার কথাই শোন, সব অবস্থায় শোন। আজ তুমি আমার ডাক শোন। আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

হযরত উমর (রা.) তখন মসজিদে নববীতে আরাম করছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অন্তরে নির্দেশ এলো– আমার এক বান্দা আমাকে ডাকছে। সে বিপদগ্রস্ত। তুমি তাকে সাহায্য কর। হযরত উমর (রা.) সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন জান্নাতুল বাকীর দিকে। তাঁকে দেখেই তো বুড়ো গায়ক পালাতে উদ্যত। হযরত উমর (রা.) ডাকলেন, দাঁড়াও! আমি আসিনি, আমাকে পাঠানো হয়েছে। আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে যেন তোমাকে সাহায্য করি। বলো তো তোমার বিষয়টা কি?

বৃদ্ধ গায়ক বললো, কে পাঠিয়েছে আপনাকে?

উমর (রা.) বললেন, আল্লাহ পাঠিয়েছেন।

এ কথা শোনেই সে কাঁদতে লাগলো এবং পুনরায় হাত তুলে দুআ মাগতে লাগলো– হে আল্লাহ! সারা জীবন আমি তোমার নাফরমানী করেছি। আমার জীবনের প্রতিটি রাত, প্রতিটি বৈঠক কেটেছে তোমার অবাধ্যতায়। অজ্ঞতা ও গাফলতের ভেতর দিয়ে কেটেছে আমার জীবনের প্রতিটি দিন। আজ যখন আমার পায়ের নীচ থেকে জীবনের সকল ভরসা সরে গেছে তখন আশ্রয় চেয়েছি তোমার দরবারে। তোমাকে ডেকেছি। সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমার ডাকে সারা দিয়েছো। আমি তোমাকে ভুলেছি, তুমি আমাকে ভুলোনি। এ কথা বলে আকাশ কাঁপিয়ে এক চিৎকার তুলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

বিরান হৃদয়

আমাদের জীবনের মূল টার্গেট তো হলো আল্লাহ। যে কোন মূল্যেই হোক তাঁকে খুশি করতেই হবে। আমাদের জীবন-মরণ সবকিছুই হবে তাঁর বিধানের অধীন। তাঁর নবীর পথই হবে আমাদের জীবন চলার একমাত্র পথ। পৃথিবীর রঙ রূপ জৌলুস এতটা বেড়েছে, আজ যেদিকেই তাকাই চোখ ঝলসে ওঠে। কিন্তু বোনেরা আমার! হৃদয়ের দিকে তাকালে মনে হয়, আমাদের হৃদয় পড়ে আছে বিরান। পৃথিবীর কোথাও মানবতার ছিটেফোঁটাও নেই। মানুষ আছে, মানুষের গুণ নেই। বাড়িঘর দৃশ্যত আলোকিত, কিন্তু হৃদয়হীন। প্রকৃত অর্থে অমাবশ্যার রাতের চাইতেও অধিক অন্ধকার। রাতভর চারদিকে বিদ্যুতের বাতি জ্বলে। গভীর রাতেও সড়কে সুঁই পড়ে গেলে বিদ্যুতের আলোতে তুলে নেয়া যায়। এ হলো আমাদের পার্থিব ভুবন। কিন্তু আমাদের হৃদয় জগত এতটা বিরান, সেখানে কোথাও কোন আলোর ছোঁয়া নেই। দৃশ্যত চারদিকে তাকালে সবুজ-শ্যামল মনে হয়। দৃষ্টি যতদূর যায়, লকলকানো ফসল। চারদিকে কেবল সবুজ আর সবুজ। অথচ হৃদয়ের জমিন মরুভূমির মাটির চাইতেও অধিক বন্ধ্যা। সেখানে সবুজের কোন চিহ্ন নেই। যে হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা নেই, যে হৃদয়ে আল্লাহ নামের আকুলতা নেই, যে হৃদয়ে প্রভুপ্রেমের আকর্ষণ নেই, যে হৃদয় রাতের গভীরে ওঠে মুসল্লায় গিয়ে দাঁড়াতে উৎসাহিত করে না, যে হৃদয় কপালকে মাটিতে টেনে নিয়ে যায় না, যে হৃদয় পাপী মনকে অশ্রু বিসর্জনে তাড়িত করে না- সে হৃদয় তো হৃদয় নয়। সে হৃদয় তো পাথরের চাইতেও কঠোর।

বোনেরা আমার!

আজ যারা স্ত্রী তারা তাদের স্বামীদের ভালোবাসার স্বাদ আস্বাদন করেছে। মা-বাবা সন্তানের ভালোবাসার গন্ধ লাভ করেছে। এই পৃথিবীতে আমরা সকলেই অর্থ-কড়ি ও সোনা-রূপার ভালোবাসা চেখে দেখেছি। কিন্তু যা চেখে দেখিনি তাহলো আল্লাহর ভালোবাসা, আল্লাহর প্রেম। আজ আমাদের হৃদয়ে আল্লাহপ্রেমে কাঁদার অস্থির হওয়ার কষ্ট ভোগ করার দৌলত নেই। এই উম্মত আজ বন্ধ্যা হয়ে পড়েছে। হৃদয়

জগত তাদের বিরান। হৃদয় তাদের অন্ধ। চোখ আলোকিত। ঘর উজ্জ্বল। কিন্তু হৃদয় আঁধারে আচ্ছাদিত।

যারা আল্লাহর ভয়ে রাতের গভীরে ওঠে কাঁদতো তাঁরা আজ নেই। এখন আমাদের রাত কাটে মৃতদের মতো। আমাদের দিন কাটে বেকার। আজ নারীরা নির্যাতিত। আজকের নারীদের জন্যে খাবার রান্না করা, ঘর গোছানো আর সন্তান লালন-পালন ব্যতীত অন্য কোন কর্তব্যের কথা বলাই হয় না। আমরা মূলত আমাদের মুসলমান ভাই ও বোনদের সমীপে এইটুকু বলতে চাই– আমাদের জীবনের মূল টার্গেট হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসাই হলো আমাদের জীবনের মূল পুঁজি। এই পুঁজিকে সামনে রেখেই মূলত আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এর বাইরে যা কিছু আছে সবই থাকবে পেছনে। কিন্তু কি করবো? আমাদের নারীগণ সকালে নাস্তা থেকে অবসর হতেই দুপুরের রান্না শুরু হয়ে যায়। দুপুরের খানাপিনা শেষ হতেই শুরু হয় বিকালের চায়ের প্রস্তুতি। বিকালের চা-নাস্তা থেকে অবসর হতেই শুরু হয় রাতের খানাপিনার আয়োজন। অতঃপর ক্লান্ত শরীরে তারা এলিয়ে পড়েন বিছানায়। গভীর অবসন্নতা ও ক্লান্তির ভেতর দিয়ে কেটে যায় রাত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দু হয় পেট। যা মূলত পেশাব-পায়খানারই আয়োজন। অথচ আমরা আমাদের অতীতের দিকে তাকালে দেখবো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে দুই দুই মাস পর্যন্ত চুলায় আগুন জ্বলতো না। কোন খাবার রান্না করার আয়োজন হতো না। ঘরে কোন অলংকার ছিল না। অতিরিক্ত কাপড়-চোপড় ছিল না। ছিল না ঘর গোছানো আর রান্নাবান্নার বিচিত্র আয়োজন। তবে হৃদয় আল্লাহর ভালোবাসায় ছিল কানায় কানায় পূর্ণ।

এক নারীর নবীপ্রেম

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর একবার এক নারী এসে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর ঘরে

উপস্থিত হলো। আরয করলো– আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর মুবারক জিয়ারত করতে চাই। হযরত আয়েশা (রা.) হুজরা মুবারকের দরজা খুলে দিলেন। আর সে ভক্ত নারী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। আর কাঁদতে কাঁদতে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলো।

আমরা মূলত এই তাবলীগী সাধনার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সকল নর-নারীর হৃদয়ে নবীপ্রেমের সেই প্রদীপই পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করতে চাই। আমাদের কর্তব্য হলো পৃথিবীব্যাপী এই পয়গাম ছড়িয়ে দেয়া। আমরা বলতে চাই, আল্লাহর সন্তুষ্টি আল্লাহপ্রেম ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসাই আমাদের জীবনের প্রথম টার্গেট। খানাপিনা স্ত্রী-সন্তান ব্যবসা-বাণিজ্য অন্য সবকিছু থাকবে প্রয়োজনের সারিতে জীবনের দ্বিতীয় স্তরে। এই পৃথিবীতে আমাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যে প্রেরণ করা হয়নি। আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে জীবনযাপন করার জন্যে। এই পৃথিবীর সকল নারীই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যাসম। আমাদের সকলের আকা ও মনিব হলেন তিনি। জীবন চলার পথে আমাদের কোন মর্জি-খুশি নেই। আল্লাহ যা চাইবেন আমাদেরকে তাই করতে হবে। আল্লাহর হাবীব যা আদেশ করবেন সেটাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।

একবার হযরত সাদ (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন গরীব মানুষ। বিয়ে করতে চাই। দেখতে হযরত সাদ (রা.) ছিলেন কুচকুচে কালো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই আবেদন শোনার পর বললেন– আমর ইবনে ওয়াহাবকে গিয়ে বলো সে যেন তার কন্যাকে তোমার কাছে বিয়ে দেয়। আমর ইবনে ওয়াহাব ছিলেন আরবের বিখ্যাত সাকিফ কবিলার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁর কন্যা ছিল রূপে-গুণে অপূর্ব। তাছাড়া আমর ইবনে ওয়াহাব ছিলেন ধনী মানুষ। অথচ হযরত সাদ (রা.) একে তো গরীব তার উপর হাবশী-কালো। তাই তিনি যখন পয়গাম নিয়ে কন্যার

বাপের সাথে আলোচনা করলেন তখন হযরত আমর মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ভাবলেন, আমার ধনী ও সুন্দরী মেয়ে এই গরীব ও কৃষ্ণ লোকটির সাথে কিভাবে জীবন কাটাবে? তাই তিনি এই প্রস্তাবকে সরাসরি অস্বীকার করে দিলেন। কন্যা যখন জানতে পারলো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে আগত পয়গামকে তাঁর বাবা ফিরিয়ে দিয়েছে তখন ঘরে যেতেই কন্যা বাবাকে বললো–

يَاأَبَتَا اَلنَّجَاةَ قَبْلَ اَنْ يَفْضَحَكَ الْوَحْىُ

আব্বাজান! আপনি কার পয়গাম ফিরিয়ে দিয়েছেন? এখনই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে গিয়ে হ্যাঁ বলে আসুন। আমাদের প্রতি আল্লাহর আযাব নেমে আসার আগেই ওঠে যান। এই পয়গামের বাহক যেমনই হোক আমি এই আত্মীয়তায় রাজি। কারণ, একে পাঠিয়েছেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই হলো আমাদের গর্বের নারী জাতি। একদা যাদের হৃদয় ছিল নবীপ্রেমে কানায় কানায় পূর্ণ– তারা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসায় হৃদয়ের সকল আবেগ ও স্বপ্নকে অবলীলায় বিসর্জন দিতেন।

জীবনের লক্ষ্য

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আমি আপনাদের খেদমতে এ কথাই আরয করতে চাই– আমরা হলাম আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত বান্দা। তিনি ইরশাদ করেছেন–

هُوَ اجْتَبٰكُمْ...

তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। [হাজ্জ : ৭৮]

কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কেন নির্বাচিত করেছেন? নির্বাচন এজন্য করেছেন যেন আমরা পৃথিবীর সমুদয় মানবগোষ্ঠীকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবার কথা ভাবি। আমাদেরকে ভাবতে হবে, একজন মানুষ

যখন কাফের অবস্থায় মারা যায় তখন কবরে যেতেই নিরান্নব্বইটি সাপ তাকে চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাকে জড়িয়ে ধরে দংশন করতে থাকে। এটা কত কঠিন বেদনার কথা। পৃথিবীর কোটি কোটি নর-নারী আজ দলে দলে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে। দুর্বিষহ আজাবের দিকে দল বেঁধে ছুটছে। আমাদের জীবনের মূল টার্গেটই হওয়া উচিত এদেরকে ফিরিয়ে আনা। এটা আমাদের কর্তব্য। এই কর্তব্য সাধনে প্রয়োজনে ঘর ছেড়ে আল্লাহর দীনের পয়গাম নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। এ পথে যত বাধাই আসুক সব বাধাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতেই হবে।

এ পথের মর্যাদা

বোনেরা আমার!

আপনাদের ঘরের পুরুষরা যখন আল্লাহর দীনের পয়গাম নিয়ে আল্লাহর পথে বেরিয়ে যাবে, অতঃপর তাদের কথা স্মরণ হতেই আপনাদের হৃদয় চিরে বেদনার যে ঘনশ্বাস বেরিয়ে আসাবে এই শ্বাস আপনাকে বেহেশতে উঁচু মর্যাদায় আসীন করবে। আপনার এই নিঃসঙ্গতার একেকটি দীর্ঘঃশ্বাস আল্লাহ তাআলার কাছে গভীর ধ্যানমগ্নতায় জপিত তাসবীহ'র চাইতেও প্রিয়। প্রিয়জনের নিঃসঙ্গতায় আপনাদের মনের বিয়োগ-যাতনা আপনাদের পাপকে এমনভাবে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিবে সাবান যেভাবে ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করে দেয়। অনুরূপভাবে যারা আল্লাহর পথে আল্লাহর দীনের পয়গাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ যাতনা তাদের জীবনকেও পাপমুক্ত করে তুলে। তাদের হৃদয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে আল্লাহপ্রেমের শিশির। আল্লাহ তাআলা এই বিয়োগ-কাতর আল্লাহর পথের পথিকদের সম্পর্কে ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন– বলো, আমার এই বান্দা তার প্রিয় স্ত্রী-সন্তানদেরকে ঘরে রেখে কেন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে? কেন স্ত্রী-সন্তানদের বিয়োগ-যাতনা বুকে নিয়ে ফিরছে? ফিরিশতাগণ বলে– হে আল্লাহ! তোমাকে পাওয়ার আশায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তাই! তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকো আমি বিয়োগ-কাতর স্ত্রী-পুত্র এবং বিয়োগ-কাতর স্বামী উভয় পক্ষকেই ক্ষমা করে দিলাম।

দুনিয়ার হাকীকত

এই পৃথিবী আগাগোড়া সবটাই নশ্বর। এখানকার কোন কিছুই স্থায়ী নয়।

عِشْ مَاشِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ... ... وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ...

এই পৃথিবীতে যেভাবে খুশি জীবনযাপন কর। তোমাকে অবশ্যই মরতে হবে।

এখানে যাকে খুশি ভালোবাস। অবশ্যই একদিন তাকে ছেড়ে যেতে হবে।

اَفَلَا تَرَوْنَ اِلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ... يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيْدٍ...وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيْدٍ... وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُوْدٍ...

তোমরা কি দেখ না, এই দিন রাত কত দ্রুত প্রতিটি নতুনকে পুরাতন করে দিচ্ছে? প্রতিটি দূরকে কাছে টেনে আনছে। অঙ্গীকৃত সবকিছুকেই টেনে নিয়ে আসছে।

এটাই তো এই দুনিয়ার প্রকৃত রূপ। এই রূপ যারা আবিষ্কার করতে পেরেছে তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা হৃদয়ে মেখে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে আল্লাহর পথে। এ পথে শুধু যে পুরুষরাই নিজেদের স্বপ্ন সাধ ও আবেগকে বিসর্জন দেয় তা নয়। বরং নারীদের ত্যাগ ও কুরবানী আরও বেশি। স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তারা ঘর সামলায়। সন্তানের জ্বালা সয়। তাছাড়া জীবনের নানা প্রয়োজন তাদেরকে অবিরাম যন্ত্রণা দেয়। অধিকন্তু তারা যখন নিরালায় নির্জনে ভাবতে বসে তখন একাকীত্ব তাদেরকে কুরে কুরে খায়।

নারীর শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তাআলা নেক নারীগণকে তাদের নেক স্বামীদের পূর্বে বেহেশতে জায়গা দিবেন এবং বলবেন, যাও! তোমারা তোমাদের স্বামীরে পূর্বেই বেহেশতে প্রবেশ করো। বেহেশতী পোশাকে সজ্জিত হও। সাজগোজ কর এবং বেহেশতের দরজায় দাঁড়িয়ে স্বামীদেরকে অভ্যর্থনা কর।

এর উপমা এমন, এক ব্যক্তি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তার একটি ক্ষুদ্র দোকান আছে। তাই তার মুনাফাও কম। আরেকজন বড় ব্যবসায়ী। তার আছে মিল-ফ্যাক্টরী। তাই তার মুনাফাও প্রচুর। অনুরূপভাবে ঘরে বসে নামায পড়লেও সওয়াব পাওয়া যায়। তবে এই মুনাফা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মুনাফার মতো। পক্ষান্তরে আল্লাহর দীন প্রচারের উদ্দেশে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়া, মানুষের সামনে আল্লাহর দীনের কথা আলোচনা করা, আল্লাহর পথে সাধনা করা বড় ব্যবসায়ীর মতো। ভবিষ্যতে যার মুনাফা প্রচুর।

জান্নাতী নারীদের মর্যাদাই ভিন্ন। বেহেশতের হুরগণ সেবিকা হয়ে তাদের পোশাক পরিধান করাবে। বেহেশতী নারীদের পোশাকের আঁচল হবে এক মাইল দীর্ঘ। এই আঁচল বহন করে জান্নাতী হুরগণ তাদের পেছনে পেছনে হাঁটবে। বেহেশতী নারীদের চুল হবে আজমিন প্রলম্বিত। হুরগণ তাদের পেছনে পেছনে তাদের চুল বহন করে ফিরবে। বেহেশতী নারীদের চুল এত উজ্জ্বল হবে- তাদের একটি চুল যদি এই পৃথিবীতে ছুঁড়ে মারা হয় তাহলে তার আলোয় সারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে সুবাসিত। তাদের মাথার সিঁথি থেকে এমন আলো ঠিকরে পড়বে যে আলোর সামনে সূর্যও লজ্জায় মাথা লুকাবে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا وَمَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَاَزۡوَاجِهِمۡ وَذُرِّيّٰتِهِمۡ وَالۡمَلٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُوۡنَ عَلَيۡهِمۡ مِّنۡ كُلِّ بَابٍ، سَلٰمٌ عَلَيۡكُمۡ بِمَا صَبَرۡتُمۡ فَنِعۡمَ عُقۡبَى الدَّارِ-

স্থায়ী জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফিরিশতাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে সকল দরজা দিয়ে এবং বলবে- তোমরা ধৈর্যধারণ করেছো বলে তোমাদের প্রতি শান্তি। কত যে ভালো এই পরিণাম! [রা'দ : ২৩-২৪]

অতঃপর তাদের উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করবেন- যাও, আজ থেকে তোমাদের মাঝে আর কখনও বিচ্ছেদ ঘটবে না। স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি কেউ কারও থেকে আলাদা হবে না।

এই পৃথিবী তো বিচ্ছেদেরই জায়গা। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ-বিত্তের ধান্ধা সন্তানকে মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই দৃশ্য আমরা প্রায়ই দেখি। সন্তান অর্থ কামানোর জন্যে দূরে কোথাও চলে গেছে। ঘরে মা-বাবা নিঃসঙ্গ। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। সন্তান চলে গেছে অর্থের পেশায় বিদেশে। মা-বাবা পড়ে আছে আপন ঘরে নিঃসঙ্গ। অনেক বছর পর পরের মতো পরস্পরে সাক্ষাত হয়। এটাই দুনিয়ার চরিত্র। আমার বাবা মাঝে মধ্যেই বলতেন- তোমাদেরকে জন্ম দিয়ে কী লাভ হলো? এক মেয়ে থাকে ফয়সালাবাদে, একজন লাহোরে আর তুমি সারা বছর থাকো তাবলীগে। চতুর্থজন ডাক্তারী করে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় আর আমরা দু'জন থাকি একাকী। বাবার কথা শোনে আমারও মাঝে মধ্যে কান্না পেতো। আমি বলতাম, এই তো কয়েক দিনের জীবন! তারপর আল্লাহ তাআলা ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে এমনভাবে একত্রিত করবেন যখন আর আমরা কেউ কারও থেকে আলাদা হবো না।

আমার আব্বা যখন মারা গেলেন তখন আমাদের এক বন্ধু তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। দেখলেন গম্বুজ আকৃতির একটি সুন্দর ঘরে তিনি উপবিষ্ট। জিজ্ঞেস করলেন, মিয়া সাব! আপনি কোথায়? তিনি বললেন-

فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ

সুখদ-কাননে। তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে। [সাফফাত : ৪৩-৪৪]

সে বললো, আমরা তো আপনাকে রেখে চলে গেছি।

তিনি বললেন, না না। আমরা শীঘ্রই একত্রিত হবো।

মূলত আমরা একত্রিত হবো এজন্যেই আল্লাহ তাআলা বেহেশত তৈরি করেছেন। আর দুনিয়া তৈরি করেছেন পৃথক হওয়ার জন্যে। সুতরাং আমাদের এই পৃথক হওয়া যদি আল্লাহর দীনের জন্যে হয় তাহলে সেটাই হবে বড় কথা। যার বিনিময়ে আমরা বেহেশতে অনন্তকাল এক সঙ্গে থাকবো।

প্রিয় বোনেরা আমার!

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জন্যে বেহেশত ছিল নিশ্চিত। তারপরও তাঁরা ঘরবাড়ি ছেড়েছেন। আল্লাহর দীনের পতাকা হাতে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের কবর রচিত হয়েছে পাহাড়ে, মরুভূমির বালুকাময় প্রান্তরে। কিছুদিন পূর্বে আমরা জামাতে গিয়েছিলাম উর্দুনে। সেখানে গিয়ে আমরা সাহাবায়ে কেরামের কবর জিয়ারত করেছি। বিখ্যাত সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল (রা.) ও তাঁর প্রিয় পুত্র আবদুর রহমান ইবনে মুআয (রা.) পাহাড়ের চূড়ায় ঘুমিয়ে আছেন। শুরাহবিল ইবনে হাসানা (রা.) ঘুমিয়ে আছেন এক সমতল প্রান্তরে। যারার ইবনে আযওয়ার (রা.)-এর কবর এক টিলার উপর। বিখ্যাত সাহাবী আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) ঘুমিয়ে আছেন পথের পারে। আমরা মুতা প্রান্তরে গেলাম। যেখানে বিখ্যাত মুতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যে যুদ্ধে বিখ্যাত তিন সাহাবী হযরত যায়েদ, হযরত জাফর ও হযরত আবদুল্লাহ (রা.) শাহাদাতবরণ করেছিলেন।

আমরা যখন হযরত জাফর (রা.)-এর সমাধির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন আমাদের সকলের চোখ দিয়ে বন্যার পানির মতো অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। আমরা শত চেষ্টা করেও অশ্রু রোধ করতে পারছিলাম না। হযরত জাফর (রা.)-এর শাহাদাতের হৃদয়বিদারক কাহিনী আমাদের চোখের সামনে তখন ভেসে বেড়াচ্ছিল।

তখন তাঁর বয়স ছিল তিরিশ বছর। ঘরে যুবতী স্ত্রী। ছোট ছোট চারজন সন্তান। যখন তিনি আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়লেন, হাতে তুলে নিলেন ইসলামের পতাকা তখন শয়তান এসে তাকে এই বলে প্ররোচণা দিল– জাফর! তোমার ঘরে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী। তোমার এই ছোট ছোট সন্তান। তুমি যদি শহীদ হয়ে যাও তাহলে তাদের কি হবে?

হযরত জাফর (রা.) ধমক দিয়ে বললেন, অভিশপ্ত! এখন এসেছো তুমি! এখন তো আল্লাহর নামে জীবন দেয়ার সময়। অতঃপর তিনি আবৃত্তি করলেন–

يَاحَبَّ الْجَنَّةِ وَاقْتِرَابُهَا
طَيِّبَةٌ وَبَارِدٌ شَرَابُهَا
وَالرُّوْمُ رُوْمٌ قَدْنَا عَذَابُهَا
كَافِرَةٌ بَعِيْلَةٌ اَنْسَابُهَا

প্রিয় বেহেশত, বেহেশতের নৈকট্য
শুভ ঠিকানা, সুশীতল পানীয় তার
রোমানদের ধ্বংস সন্নিকটে
অবিশ্বাসী, নীচ তাদের পরিচয়॥

এবং এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে এগিয়ে গেলেন। ঢুকে পড়লেন শত্রুর ভেতর। শত্রুর তলোয়ারের আঘাতে এক হাত কেটে গেল। কেটে গেল দ্বিতীয় হাত। অতঃপর দু'টুকরো হয়ে গড়িয়ে পড়লেন মাটিতে। চলে গেলেন সোজা বেহেশতে। পেছনে যুবতী স্ত্রী আর ছোট ছোট সন্তানদেরকে রেখে ঘুমিয়ে আছেন পাহাড়-দেশে। এখন থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে তাঁর কবর রচিত হয়েছে এমন জায়াগায় যেখানে তাঁর পূর্বে কোন মানুষের পা পড়েনি।

তারপর আমরা উপস্থিত হলাম হযরত যায়েদ (রা.)-এর কবরের পাশে। তাঁর কবরে একটি হাদীস লেখা ছিল। আমি আমার সঙ্গীদেরকে সেই হাদীসটি তরজমা করে শোনালাম। হাদীসটি শোনে তারা সকলে অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

হযরত যায়েদ (রা.) যখন শাহাদাতবরণ করেন তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাতের সংবাদ নিয়ে তাঁর বাড়িতে যান। শাহাদাতের সংবাদ শোনান। সংবাদ শোনে তাঁর ছোট মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসলে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোলে তুলে নেন এবং কাঁদতে থাকেন। হযরতকে কাঁদতে দেখে হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) আরয করেন– হে

রাসূল! আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি তো আল্লাহর রাসূল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

هٰذَا شَوْقُ الْحَبِيْبِ اِلَى الْحَبِيْبِ

সা'দ! এটা হলো বন্ধুর জন্যে বন্ধুর আবেগ।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ (রা.)কে নিজের পুত্র বানিয়েছিলেন।

তারপর আমরা উপস্থিত হলাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর কবরে। হযরত আবদুল্লাহ (রা.)-এর চারজন সুন্দরী তরুণী স্ত্রীকে ঘরে রেখে বেরিয়ে পড়েছিলেন আল্লাহর পথে। পেছনে রেখে গিয়েছিলেন বিশাল বিশাল বাগান। তাঁর কবরে ছিল এক বিস্ময়কর নূর। তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে শত চেষ্টা করেও চোখের পানি সংবরণ করা যায় না। তাঁর সম্পর্কে আমরা ইতিহাসে পড়েছি, তিনি যখন জিহাদের ময়দানে এগিয়ে যেতে থাকেন তখন তাঁর অন্তরে স্ত্রী-সন্তানদের চেহারা ভেসে ওঠে। তখন তিনি নিজেই নিজেকে ধাক্কা দিয়ে ছাড়িয়ে নেন।

অতঃপর ঢুকে পড়েন শত্রুপক্ষের স্রোতের ভেতর। শুরু করেন মরণপণ লড়াই। তাঁর শরীর টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে। বিখ্যাত এই তিন সাহাবী যেখানে শাহাদাতবরণ করেন সেই জায়গাগুলো এখনও সংরক্ষিত আছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সম্পর্কে বলেছিলেন– হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমি দেখতে পাচ্ছি তাঁরা তিনজনই বেহেশতের নহরে সাঁতার কাটছে এবং বেহেশতের ফল খাচ্ছে।

প্রিয় বোনেরা আমার!

মূলত আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য ভুলে গেছি। ভুলে গেছি বলেই পুরুষরা যখন আল্লাহর পথে বেরিয়ে যেতে চায় তখন নারীরা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষরাও তাদের দাবী মেনে নেয়। অথচ পুরুষ আল্লাহর পথে বেরিয়ে যাবে আর নারী তাকে শক্তি যোগাবে, সাহস যোগাবে– এই তো ছিল আমাদের পূর্বসুরীদের ইতিহাস। নারী-পুরুষের সমন্বিত সাধনা ব্যতীত জীবনের সকল ক্ষেত্রে দীনের পয়গাম পৌঁছে দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের অতীত ইতিহাস তো এই– পুরুষগণ জীবন

দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছেন আর নারীগণ তাদের সংগ্রামের পথে চেতনার প্রদীপ জ্বেলে ধরেছেন। সুতরাং তোমরাও যদি তোমাদের জীবনবন্ধুদের মনে এই প্রেরণার প্রদীপ জ্বালাতে পারো তাহলে সন্দেহ নেই পরকালে তোমাদের হাশর হবে হযরত ফাতেমাতুয যাহ্‌রা, হযরত খাদিজাতুল কুবরা ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সাথে। তোমরা যদি সাজসজ্জা ও পোশাক অলংকারের পথ ছেড়ে দিয়ে অল্পে তুষ্টি ও ধৈর্যের পথে ওঠে আসতে পারো তাহলে তোমাদের হাশর হবে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবি-কন্যাদের সাথে। মনে রাখতে হবে, দীনের প্রচার-প্রসার এ শুধু পুরুষেরই কর্তব্য নয়। যুগে যুগে এ কাজে পুরুষের সাথে নারীরাও সহায়তা করেছে। দীনের জন্যে পুরুষ রক্ত দিয়েছে, তো নারী ধৈর্যধারণ করেছে। পুরুষ আল্লাহর পথে সাধনা করেছে, তো নারী ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা সয়েছে। একটি চমৎকার ঘটনা মনে পড়লো। নেপালে একবার মেয়েদের একটি জামাত গেল। অতঃপর সেখান থেকে সত্তরজনের একটি জামাত আমাদের এখানে এলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এত বড় জামাত কিভাবে তৈরি হলো? তারা বললো, প্রথমে শুধু পুরুষদের জামাত যেতো। তখন আমরা নারীরা ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম। এবার যখন পুরুষের সাথে মেয়েদের জামাত গেছে তখন তাদের কাছ থেকে মেয়েরাও দীন শেখার সুযোগ পেয়েছে। সুযোগ পেয়েছে দীন ও দীনি দাওয়াতের মর্যাদা সম্পর্কে জানবার। এর আগে তো তাবলীগে যাচ্ছি বললেই তারা আমাদের কাপড় চেপে ধরতো। ঘরের রান্নাবান্না বন্ধ করে দিতো। ফলে বাধ্য হয়েই আমাদেরকে জামাতে বের হওয়ার ইচ্ছে বর্জন করতে হতো। কিন্তু এবার যখন তারা সরাসরি দীন বুঝতে পেরেছে তখন বাধা দেয়ার বদলে আমাদেরকে বরং উৎসাহিত করেছে। তাই আমরা যারা ইচ্ছে করেছি সকলেই আল্লাহর রাস্তায় বেরোতে পেরেছি। এজন্য বলি, শুধু পুরুষরাই নয়, এ কাজে পুরুষদের মতো নারীদেরকেও নারী মহলে দীনি দাওয়াত তুলে ধরতে হবে। তবেই সম্ভব হবে আমাদের সকল অঙ্গনে আল্লাহর দীনের পয়গাম পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন। ۞

বয়ান : ৩

ইসলাম ও নারী

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ : اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِo مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْاُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ......فَلَنُحْيِيَنَّهٗ طَيِّبَةًo وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يٰاَبَاسُفْيَانَ وَاللّٰهِ لَتَمُوْتُنَّ ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَيَدْخُلَنَّ مُحْسِنُكُمُ الْجَنَّةَ وَمُسِيْئُكُمُ النَّارَ اَوْكَمَاقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... ...

> আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যেই সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো। [নাহল : ৯৭]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আবু সুফিয়ান! নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর পুনরুত্থিত হবে, তারপর তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে আর অসৎকর্ম-পরায়ণরা যাবে জাহান্নামে।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অনুসন্ধানের একটি স্পৃহা রয়েছে। জন্মের পর একটি শিশু যখন থেকে বুঝতে শুরু করে তখন থেকেই তার মধ্যে এই অনুসন্ধানী স্পৃহা কাজ করতে শুরু করে। সে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে থাকে। মাকে প্রশ্ন করে, বাবাকে প্রশ্ন করে। চোখের সামনে যা দেখে তা সম্পর্কেই জানতে চায়। মা-বাবা তার প্রশ্ন শোনে শোনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে একটি বিষয়কে একবার নয় দশবার জিজ্ঞেস করে। আমরা যখন শিশু ছিলাম এমনটি আমরাও করেছি। আজ আমাদের শিশু সন্তানরাও তাই করছে।

এই অনুসন্ধান স্পৃহা মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আমাদের মাঝে এই গুণটি আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন এই জন্যে যেন মুখ্যত আমরা তাঁকে অনুসন্ধান করি। অনুসন্ধান মানুষের এমন একটি শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য– এই অনুসন্ধানের সিঁড়ি বেয়েই এক সময় মানুষ এটম পর্যন্ত আবিষ্কার করেছে। দুর্বল দৃষ্টির মানুষ এক সেন্টিমিটারকে একটি রেখাই অনুমান করে। অথচ মানুষ এর পরিমাপ আবিষ্কার করেছে এবং তাদের এই আবিষ্কার নেশা বিন্দু থেকে পরমাণু পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আবিষ্কার করেছে এটম। মানুষ তার এই অনুসন্ধান শক্তি দিয়েই আবিষ্কার করেছে ইলেক্ট্রন নিউট্রন ও প্রোটন। অথচ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এসব বিষয় চোখে পড়ে না। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মানুষ কি এটম দেখেছে? ইলেক্ট্রন দেখেছে, নিউট্রন দেখেছে, প্রোটন দেখেছে? বরং [illegible] দ্বারা এই শক্তিগুলো তারা

আবিষ্কার করেছে। বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে তারা জেনেছে, এগুলোর পেছনে নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য শক্তি আছে।

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

আল্লাহ তাআলাকে দেখা যায় না। বেহেশত আমাদের সামনে নেই। আমরা দোযখও দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনুসন্ধান শক্তি দিয়েছেন। অতঃপর দাবী করেছেন যেন আমরা তাঁকে অনুসন্ধান করি। আমরা যখন এটম দেখতে পারি তখন তাঁকে দেখতে পাবো না কেন? তাছাড়া তাঁকে উপলব্ধি করার মতো অনেক প্রমাণ রয়েছে। রাত আসতেই সমগ্র জগত অন্ধকারে ছেয়ে যায়। আচ্ছা, সমগ্র জগত কিভাবে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়? অতঃপর যখন পূর্ব থেকে একটি আলোর গোলক মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তখন সমগ্র পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠে। এত বড় সূর্য! পৃথিবীর তুলনায় যা বার লক্ষ গুণ বড়। এই বিশাল সূর্যটি প্রতিদিন ঠিক একই জায়গায় উদিত হয়। চলে একই গতিতে। আবার নির্দিষ্ট একটি জায়গায় অস্তমিত হয়। প্রতি বছরই নির্দিষ্ট মৌসুমে সে তার স্থান পরিবর্তন করে। বছরের একটি নির্দিষ্ট মৌসুমে বৃক্ষ লতা তার পাতাগুলো ঝেড়ে ফেলে দেয়। আবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে আসে বসন্ত। কখনও আবহাওয়ায় উদাসীনতা ছড়িয়ে পড়ে। কখনও বা অনুভব করি আমরা প্রাণচাঞ্চল্য। বছরের নির্দিষ্ট মৌসুমে ঝড়-বৃষ্টি আসে। কখনও বা সূর্য মেঘ আচ্ছাদিত হয়। চাঁদ কখনও বাড়ে, কখনও কমে। আবহাওয়া কখনও ঝড়ো হয়, কখনও বয়ে চলে মৃদুমন্দ বেগে। আবহাওয়া কখনও গরম হয়, কখনও হয় ঠাণ্ডা।

সারি সারি কৃষ্ণকালো পর্বতমালা দাঁড়িয়ে আছে। আর তার ভেতর লুকিয়ে আছে শুভ্র-সফেদ মর্মর পাথর। বাইরে থেকে কয়লার বিশাল স্তূপ। অথচ তার ভেতরই লুকিয়ে আছে বিমল উজ্জ্বল হীরে। বরফ আচ্ছাদিত সারি সারি টিলা। বৃক্ষ আচ্ছাদিত সবুজ-শ্যামল পাহাড়। পাহাড়ের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত ঝরনা। পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসা স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা। বহমান নদী-নালা এবং তরঙ্গায়িত সমুদ্রের পর সমুদ্র। এই পানিরই একটি ফোঁটা যখন ঝিনুকের ভেতর যায় তখন

তাতে সৃষ্টি হয় মোতি। সাপের মুখে গিয়ে যদি পড়ে তাতে সৃষ্টি হয় বিষ। হরিণের মুখে পড়লে হয় মেশক। বকরীর মুখে পড়লে হয় দুধ। আম্র বৃক্ষের শেকড় এই পানির রসে সিঞ্চিত হয়েই জন্ম দেয় আম। এই পানিই মানুষের জীবনে সৃষ্টি করে জীবন।

আমরা তো প্রতিনিয়তই এই বিস্ময়কর সৃষ্টিলীলা প্রত্যক্ষ করছি। আমরা কি একবার ভেবে দেখেছি এগুলোর পেছনেও মহান কোন শক্তি নিহিত রয়েছে? আমরা কি কখনও অনুসন্ধান করে দেখেছি এই সবকিছু পরিচালনা করছেন এক অদৃশ্য সত্তা।

এ সম্পর্কে কুরআনে কারীম বলেছে–

قُلْ اَرَئَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ، اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ...

বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো– আল্লাহ্ যদি রাতকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত স্থায়ী করেন? আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন মাবূদ রয়েছেন যিনি তোমাদেরকে আলোক এনে দিতে পারেন? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না? [কাসাস : ৭১]

আরও ইরশাদ করেছেন–

قُلْ اَرَئَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ، اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ...

বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো– আল্লাহ্ যদি দিনকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন মাবূদ আছেন যিনি তোমাদের জন্যে রাতের আবির্ভাব ঘটাবেন যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো। তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না? [কাসাস : ৭২]

আল্লাহ্‌র কুদরত

আসলেই কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি ও সত্তা আছে? এমন কেউ আছেন কি যাঁর হাতে আমাদের ভাগ্যের চাবিকাঠি। কে আমাদেরকে এক বিন্দু পানি থেকে ক্রমাগত সৃষ্টি করে চলছেন? কে আমাদেরকে বলার শক্তি দিচ্ছেন? কার কাছ থেকে আমরা শোনার শক্তি পাচ্ছি? আমাদেরকে উপলব্ধি ক্ষমতা কে দিচ্ছেন? এক ফোঁটা নাপাক পানিকে কে এত সুন্দর অবয়বে রূপান্তরিত করছেন? এই পানি থেকেই কাউকে বানাচ্ছেন পুরুষ, কাউকে নারী। কাউকে বানাচ্ছেন অনিন্দ্য সুন্দর আবার কাউকে শ্রীহীন।

এই পৃথিবীর দিকেই তাকিয়ে দেখুন–

কোথাও সমতলভূমি যেন পাতানো বিছানা।

কোথাও আদিগন্ত বিস্তৃত মরু সাহারা।

কোথাও বা সারি সারি পাহাড়।

কোথাও প্রবাহিত তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র।

কোথাও বা সারি সারি ফলবান বৃক্ষের মেলা।

আবার কোথাও বা সীমাহীন কন্টকাকীর্ণ গাছ।

দেখতে একই রকমের পাতা অথচ তার সুগন্ধি এমন যে চারপাশ আমোদিত হয়ে ওঠে। একই রকমের গাছের ডালা কিন্তু তাতে এত পরিমাণে কাঁটা বিছানো তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করাই মুশকিল। আচ্ছা, এই গোলাপের মধ্যে কে রঙ দিয়েছে? কে তার ভেতর সুবাস ঢেলেছে? গোলাপ গাছের নীচে বিছানো মাটিতেও ঘ্রাণ নেই। ঘ্রাণ নেই তাতে সিঞ্চিত পানিতেও। ঘ্রাণ বাতাসেও নেই। তাহলে এই ঘ্রাণ আসলো কোত্থেকে? আমরা তো চারপাশে কোথাও কোন রঙের বিচরণ দেখি না। তাহলে চামেলি সাদা হলো কিভাবে? গোলাপ কিভাবে লাল হলো? আর মন-মাতানো সুবাসই বা পেলো কোথায়? আর তার পাপড়িগুলোকেই বা কে সযতনে স্বতন্ত্রভাবে বিছিয়ে দিলো?

গাভী আমাদের চোখের সামনে চারা ভক্ষণ করে। কিন্তু এই চারা থেকে দুধ কিভাবে সৃষ্টি হলো? ঝিনুকে এক ফোঁটা পানি প্রবেশ করলো। কিন্তু তা মোতি হলো কিভাবে? সাপ মুখে তুলে নিয়েছিলো এক ফোঁটা পানি। কিন্তু সে পানি বিষ হলো কিভাবে? এই পানি মানুষও পান করে। কিন্তু মানুষের ভেতরে গিয়ে তা জীবন্ত জীবন হয়ে ওঠে কিভাবে? ফসলের ক্ষেত পানি পান করে। কিন্তু সে পানি পানে ফসল কিভাবে সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে? পানি সিঞ্চিত হয়েছিল আম্র বৃক্ষ। কিন্তু তাতে আম সৃষ্টি হলো কিভাবে? এই রূপান্তর কে করছেন? এ সকল রূপান্তরের পেছনে কোন সত্তার শক্তি কার্যকর? আমরা আদিষ্ট হয়েছি যেন সেই শক্তিকে অনুসন্ধান করি।

আল্লাহ বলেছেন–

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ...
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً...
فَأَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ...
مَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا...
أَءِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ...

বরং তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেন বৃষ্টি। অতঃপর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। তা থেকে বৃক্ষাদি উদ্গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবূদ আছে কি?

আল্লাহ্ তাআলার দাবী

আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে দাবী করেছেন– হে আমার বান্দা ও বান্দীগণ! তোমরা আমাকে অনুসন্ধান কর। তোমরা চামড়ার উপর মেহনত করেছো। অতঃপর তা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছো। তোমরা

তোমাদের সাধনাকে লোহার উপর ঢেলে দিয়েছো। সে লোহা এখন আকাশে উড়ে। তোমরা বীজের উপর সাধনা করেছো। তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে নয়ন জুড়ানো বাগিচা। তোমাদের সাধনা ছোঁয়ায় পাথর থেকে গড়ে ওঠেছে সুদৃশ্য অট্টালিকা। তোমরা সুতার উপর শ্রম দিয়েছো। তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে রঙ-বেরঙের বস্ত্র। মৃত বস্তুকে তোমরা তোমাদের সাধনা দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছো। অথচ আমি তো হলাম এক জীবন্ত বাস্তবতা। তোমরা যদি আমাকে পাও তখন তোমাদের পাওয়ার আর কি থাকবে?

এখন তো তোমরা–

বস্ত্রের গোলাম।

কাঁচির গোলাম।

চামরার দাস।

পাথরের দাস।

তোমরা বস্তুসামগ্রীর গোলাম।

তোমরা যদি আমাকে অনুসন্ধান করতে পারো, তোমরা যদি আমার বন্ধুত্ব লাভ করতে পার তখন তোমরা বুঝতে পারবে আসলে জীবন কাকে বলে। সত্যিকার অর্থে তখনই তোমরা লাভ করবে জীবনের পরিচয়।

জীবন তো রুটির নাম নয়।

কাপড় পরিধানকে জীবন বলে না।

সুখ-ভোগের নাম জীবন নয়।

সুরম্য অট্টালিকাকেও জীবন বলে না।

জীবন বলে না বড় বড় কারখানাকে।

প্রশ্ন হলো, এগুলোই যদি জীবনের লক্ষ্য হতো তাহলে মৃত্যুর সময় এগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কেন?

জীবনের হাকীকত

আমাদের আশাগুলো পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কে ধ্বংস করে মাটির পরতে শুইয়ে দেয়? কে আমাদের সাধনার অর্জনকে অন্যদের হাতে তুলে দেয়? আমি তো উপার্জন করতে করতে উপার্জনের পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। আমার হাড়গুলো শুকিয়ে যায়। আমার জীবনের সবগুলো স্বপ্ন অজানায় হারিয়ে যায়। অথচ পেছনে আমার রেখে যাওয়া কর্ম বেঁচে থাকে উজ্জ্বল হয়ে। পূর্ণ বিভায় উদ্ভাসিত থাকে আমার ব্যবসা-বাণিজ্য। আমার ঘরও থাকে আলোকিত।

এই পৃথিবীতে এমন কত সুউচ্চ অট্টালিকা রয়েছে কিন্তু এগুলো যাদের হাতে তৈরি তারা ঘুমিয়ে আছে মাটির নিচে। মাটির সাথে মিশে গেছে তাদের হাড়গোড়। তাদের শরীরের গোশতগুলো খোরাক হয়েছে পোকা-মাকড়ের। এমনকি সেই পোকা-মাকড়গুলোও খোরাক হয়েছে অন্য পোকা-মাকড়দের। কবরের যাতনা হয়তো বা তাদের হাড়গুলো গলিয়ে ফেলেছে। গোশতগুলো শরীর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে শরীরের চামড়াগুলো। অতঃপর মাটি পার্শ্ব বদল করেছে। পাশ ফিরে শুয়েছে। এই পৃথিবীতে আমরা যেমন ঘুমুতে ঘুমুতে ক্লান্ত হয়ে পার্শ্ব বদল করি তেমনি মাটিও পার্শ্ব বদল করে। তখন পীর সাহেব, মিয়া সাহেব, চৌধুরী সাহেব, সরদার সাহেব, মন্ত্রী সাহেব, আমীর সাহেব, বাদশাহ সাহেব, ফকীর সাহেব, গরীব সাহেব ও রাণী সাহেবসহ সকল সাহেবকেই উলট-পালট করে রেখে দেয়। এই পৃথিবীতে যারা বিপুল সৌন্দর্য নিয়ে অহংকার করতো তাদের সেই সৌন্দর্যকে কবরের মাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। তখন আর তার কোন অস্তিত্ব থাকে না।

এদিকে তার রেখে যাওয়া সম্পদও এক সময় রক্ষা পায় না বাতাসের আঘাত থেকে। বাতাস এসে তার সকল সঞ্চয় সম্পদ ও অট্টালিকাকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলে। কোথাও তার কোন অস্তিত্ব খোঁজে পাওয়া যায় না। অথচ তাকে কবরে বসে সাজা ভোগ করতে হয় তার সেই হারিয়ে যাওয়া সম্পদের।

পৃথিবীর জীবন এ কেমন জীবন! এ জীবনের লক্ষ্যই বা কি? এখানকার সহায়-সম্বল তো চারদিন সঙ্গ না দিতেই ছেড়ে যায়। এখানকার আনন্দ চারদিনও থাকে না। অতঃপর মুখোমুখি হতে হয় ভয়াবহ মৃত্যুর। এখানকার কুরসী ও ক্ষমতা তো গ্রহণ করার আগেই হারিয়ে যায়। এখানকার রূপ-সৌন্দর্য ক'দিনের? অল্প ক'দিন না যেতেই মেকাপ ছাড়া চলে না। মেকাপেরও একটা সময় আছে। সে সময় পার হয়ে যাওয়ার পর আর মেকাপও সঙ্গ দেয় না। এখানকার কত লক্ষ লক্ষ সুন্দরকে হারিয়ে যেতে হয়েছে। কত লক্ষ লক্ষ রূপসী-ঠোঁট তার রূপ হারিয়েছে। এখানকার কত হৃত সৌন্দর্য মুখকে কৃত্রিম রূপে সাজানো হয়েছে। কিন্তু সেই রূপ কি আর ধরে রাখা গেছে? তাহলে এর হাকীকত কি? এখানকার সহায়-সম্বল, রূপ-সৌন্দর্য এর কী মূল্য আছে?

কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীর স্বরূপ

মূলত এই পৃথিবীতে আমাদের আগমন হয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য। এখানে আমাদের আগমন লক্ষ্যহীন নয়। এখানে আমাদের সর্বপ্রথম যে কথা জানতে হবে তাহলো আমাদের আগমনের সেই লক্ষ্যটি কি? কি কাজটির জন্যে আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে? আমাদের সেই কাজটিই হলো মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহকে অনুসন্ধান করা। তাঁকে জানা ও তাঁকে সন্তুষ্ট করা। আমাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করা– একদিন অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। তাঁর সকাশে আমাদেরকে আমাদের এই পার্থিব জীবনের হিসেব দিতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়। আমাদের এই পৃথিবীতে আগমন, এই জীবন-মৃত্যু কোনটিই লক্ষ্যহীন নয়। এ তো কাফের মুশরিকদের ভাবনা।

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ

অসম্ভব! তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব। [মুমিনূন : ৩৬]

অর্থাৎ এই যে বলা হয়, আমাদের এই জীবন কিছুই নয়। মরে গেলাম তো ঘটনা শেষ। মূলত এই জাতীয় প্রতিশ্রুতি ভিত্তিহীন। বরং বাস্তব সত্য হলো–

قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ

বলো, নিশ্চয়ই হবে। আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। [তাগাবুন : ৭]

لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে। [আ'রাফ : ১৮৭]

অর্থাৎ আমাদের এই পার্থিব জীবন মোটেই অনর্থক নয়। আমাদেরকে আমাদের জীবন সম্পর্কে বর্ণে বর্ণে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

একটি মরণ হলো মানুষের মরণ। আমি মরে গেলাম, আপনি মরে গেলেন। পুরুষ মারা গেল, নারী মারা গেল। একদিন এই শহরের সকলেই মারা যাবে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাঙ্গণ মানবশূন্য হয়ে পড়বে। সেদিন মারা যাবে কল-কারখানাগুলোও। সেদিন মৃত্যুবরণ করবে এই পথঘাট, বাগবাগিচা সবই। একদিন এমন একটি প্রভাত উদ্ভাসিত হবে সূর্য তার মুখ তুলে তাকাতেই এক নতুন খেলা শুরু হবে। সন্ধ্যা গড়াবে অন্য দশ দিনের মতোই। বন-বিহঙ্গরা তাদের বাসায় ফিরে আসবে। ব্যবসায়ীরা তাদের কাজ কাম শেষে অবসন্ন চিত্তে ঘরে ফিরবে। স্ত্রীদের কাছে ব্যবসার হিসাব-কিতাব শোনাবে। শোনাবে আমেরিকায় এত টাকা জমা করেছি, ইউরোপে জমা করেছি এত টাকা। বলবে, অমুক শহরে একটা বড় অট্টালিকা বানিয়েছি। অমুক দেশ থেকে একটা বড় অর্ডার পেয়েছি। জার্মানী থেকেও অর্ডার এসেছে, আমেরিকা থেকেও অর্ডার এসেছে। ফ্রান্সে মাল পাঠিয়েছি, সেখান থেকে টাকাও এসে পড়েছে। তাছাড়া অমুক দেশে টাকা পাঠাতে হবে এবং এত টাকা একাউন্টে জমা আছে।

অসম্পূর্ণ গল্প

যেভাবে আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের গল্প শোনাই, গল্প শোনাই এই পরিমাণে প্রডাকশন হয়েছে, গুদামে এই পরিমাণে মাল জমা আছে। জমিদাররাও তাদের জমি-জমার গল্প পাড়ে। যারা শ্রমিক কর্মচারী আয়-উপার্জনের তাদেরও গল্প আছে। তারাও বলে, আজ অফিসার আমাকে শাসিয়েছে। অমুক ফাইলটা এখনও পূর্ণ হয়নি কেন? অমুক ফাইলটা আমি পূর্ণ করেছি। অমুক ব্যক্তি আমাকে অপমান করেছে। আমি অমুকের কাজটা করে দিয়েছি। এভাবেই ধীরে ধীরে আমাদের জীবনের একটা সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এবং এভাবেই ধীরে ধীরে একটা দিন আমাদের থেকে বিদায় নেয়। এভাবে প্রতিদিনই আমাদের জীবনে গল্প আসে। আবার অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই তা শেষ হয়ে যায়। আমরা অপেক্ষায় থাকি এই গল্প শেষ হবে আগামীকাল। এভাবেই দেখা যাবে শেয়ালকোটে এমন একটি সন্ধ্যা আসবে যে সন্ধ্যায় সেখানকার প্রতিটি নর-নারী তাদের অসম্পূর্ণ গল্প নিয়েই শয্যা গ্রহণ করবে। শুয়ে শুয়ে হয়তো পরিকল্পনা আঁটবে– কাল গল্প সমাপ্ত হবে। অতঃপর অন্যান্য দিবসের মতো সকালে সূর্য উঠবে। পাখিরা তাদের বাসা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। বাতাস বইয়ে আপন গতিতে।

সূর্য হয়তো জানে না আজই তার শেষ চমক।

চাঁদও হয়তো জানে না আজই তার শেষ বিদায়।

রাত হয়তো জানে না তার এই অন্ধকার আর ফুরাবে না।

সৃষ্টি জগত জানে না এই দিনটিই তার শেষ দিন।

পাখিরা তাদের বাসা ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছে। জানোয়ারগুলো তাদের ঘর থেকে বেরিয়েছে। গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়েছে সাপগুলো। আপন আস্তানা থেকে বাঘ বেরিয়েছে, সিংহ বেরিয়েছে। সকালে সর্বত্র হৈ চৈ পড়ে গেছে। বাচ্চাদেরকে প্রস্তুত কর। কেউ কাপড় পড়ছে। কারো জন্য খাবার তৈরি করা হচ্ছে। কেউ বা খাবার সবেমাত্র মুখে তুলেছে। সুন্দরীদের কেউ বা মেকাপ নিয়ে বসেছে। কেউ মাথায় বেণী ভাঙছে। আয়নায় মুখ দেখছে। দোকানদাররা দোকান খোলে বসেছে। ক্রেতারা

দোকানে আসা-যাওয়া শুরু করেছে। কেউ কাপড় মাপছে। কেউ পকেট থেকে পয়সা বের করে মূল্য পরিশোধ করছে। কৃষকরা মাঠে গিয়ে জমি কর্ষণ শুরু করেছে। জীবনের সর্বত্র বহতা নদীর মতো বিরাজ করছে পূর্ণ চঞ্চলতা। বিয়ের বরযাত্রা প্রস্তুত। বর সাজানো হচ্ছে। সর্বত্র সাজ সাজ রব। সানাই বাজছে। অফিসে শুরু হয়েছে যথারীতি ব্যস্ততা। টেবিলে ফাইলে সই হচ্ছে। নতুন কোম্পানীর সাথে একটি নতুন বিষয়ে চুক্তি হচ্ছে। কেউ বা নতুন অর্ডার পেয়ে মনে মনে বেশ আনন্দিত বোধ করছে। কেউ বা ঘরে খানাপিনায় ব্যস্ত। বেগমের হাতে খাবারের গ্রাস। সে বাচ্চার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে। রান্না ঘরে কেউ বা রুটি ভাজছে। কর্মচঞ্চল পৃথিবীর প্রতিদিনকার এই চিত্র আপনি আপনার কল্পনায় ভাবুন। আমি হয়তো তার সামান্যই এখানে উল্লেখ করেছি। উল্লেখ করেছি ঠিক এমনি একটা দিন আসবে সেদিন সবাই নিজ নিজ ব্যস্ততায় নিমগ্ন থাকবে। সকলেই বলবে, আমি খুবই ব্যস্ত। আমাকে ডিস্টার্ব করো না।

ছোট কিয়ামত

ঠিক এই অবস্থাতেই যখন পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু তার পূর্ণ যৌবনে উত্তীর্ণ হবে তখন হঠাৎ করেই একটি ধ্বনি কর্ণগোচর হবে।

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى

অতঃপর যখন মহা সংকট উপস্থিত হবে। [নাযিআত : ৩৪]

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ

যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে। [আবাসা : ৩৩]

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ

যখন সিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। একটিমাত্র ফুঁক। [হাক্কা : ১৩]

সে আওয়াজ হবে এক ভয়ানক আওয়াজ। যে মা তার সন্তানের মুখে খাবারের লোকমা তুলে দিচ্ছিল তার হাত নিচে নেমে আসবে। খাবারের

লোকমা মুখে না গিয়ে বুকে পড়ে যাবে। যে নারী আয়নার সামনে বসে মেকাপে ব্যস্ত ছিল তার হাত থেকে চিরুণি পড়ে যাবে। তার মস্তক নিচু হয়ে আসবে। তার সামনের গ্লাস বাঁকা হয়ে আসবে। তার চেহারা হয়ে উঠবে বিকৃত। যে মা এইমাত্র তার সন্তানের জন্যে পাগলপারা ছিল সেই মা-ই তার সন্তানকে ছুঁড়ে মারবে ময়লা-আবর্জনার পাত্রকে ছুঁড়ে মারার মতোই। আর বাদকরা বাদ্যযন্ত্র ফেলে পালাবে।

আর বাঁশিওয়ালা পালাবে বাঁশি ফেলে।

গায়করা গান ছেড়ে পালাবে।

নারীরা পালাবে তাদের সন্তান ছেড়ে।

স্বামীরা স্ত্রীদেরকে রেখে পালাবে।

সন্তানরা পালাবে তাদের মা-বাবাকে রেখে।

দোকানদারের হাত থেকে মাপযন্ত্র পড়ে যাবে। ক্রেতার হাত থেকে পড়ে যাবে পয়সা। কৃষক বীজ ছিটাবার জন্যে যে হাত উত্তোলন করেছিল সে হাত অলস ভঙ্গিতে নিচে নেমে যাবে। মার্কেট উদ্বোধনকারীরা লাল ফিতার সামনে নিথর দাঁড়িয়ে থাকবে। সই করতে প্রস্তুত কলম হাত থেকে পড়ে যাবে। ফ্যাক্টরি নিজ জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু ফ্যাক্টরির মালিক গোষ্ঠী পাগলের ন্যায় ছোটাছুটি শুরু করে দিবে। কোটি কোটি টাকার নোট পদদলিত করে পালিয়ে যাবে ব্যাংকের ম্যানেজার-ক্যাশিয়ার। প্রহরী পালাবে, পালাবে চাপরাশিও। স্ট্যাট ব্যাংক থেকে শুরু করে ছোটখাট সুদী প্রতিষ্ঠানের কোন জালিমই আজ রক্ষা পাবে না। চারদিক থেকে গর্জে ওঠবে সেই ভয়ানক ধ্বনি। বাড়ির দরজা খোলা। বাড়ির মালিক পালিয়ে যাচ্ছে সবার আগে। একটাই আকুতি– আমার ঘর যাক, আমার স্ত্রী মরে মরুক, আমার সন্তান পিষ্ট হোক আমারই পদতলে– আমি শুধু চাই আমার মুক্তি। কেবলই আমি বাঁচতে চাই।

সে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি।

সে ভয় ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে।

সেই ভীতিকর আওয়াজ ক্রমাগত ঘনীভূত হতে থাকবে।

চোখের সামনে নিজের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে পড়তে দেখবে।

সাধনার সকল আয়োজন বিচূর্ণ হতে দেখবে।

নিজের ফ্যাক্টরি বালুর স্তুপের মতোই মাটির সাথে মিশে যেতে দেখবে।

সৃষ্টির হৃদয় চিরে বেরিয়ে আসা চিৎকার কানে এসে প্রবেশ করবে।

বিস্ফারিত চোখে দেখবে সূর্য বিচূর্ণ হচ্ছে।

দেখবে নক্ষত্রগুলো ছিটকে পড়ছে।

দেখবে চাঁদ আলোহারা হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে।

সেই আকাশ যাতে কখনও ভাজ পড়েনি। সেই আকাশ আজ ঝুকে পড়বে। টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে। শক্তিশালী সুউচ্চ পর্বত চূর্ণ হয়ে পড়বে। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে সৃষ্টি হবে আগুনের লেলিহান। উদ্ভ্রান্তের মতো পশু-পাখিগুলো ছোটাছুটি করতে থাকবে। গাছে গাছে আগুন লেগে যাবে। পায়ের নিচের মাটিতে ফাটল ধরবে।

وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

এবং শপথ জমিনের! যা বিদীর্ণ হয়। [তারিক : ১২]

মানুষ দিকভ্রান্তের মতো ছুটে পালাচ্ছে। অথচ কারো সামনেই কোন পথ নেই। কারো সামনেই কোন আশ্রয় নেই। আজ বড় ভয়ানক দিন। এই সোসাইটির যারা কৃতদাস তাদের কারো কপালেই আজ কল্যাণ নেই। যারা সোসাইটির দিকে তাকিয়ে জীবনের পথ নির্ণয় করে তারা আজ তাকিয়ে দেখ, আল্লাহ তাআলা এই সোসাইটিকে কিভাবে ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিয়েছেন। ভয়ানক একটি আওয়াজ। ক্রমাগত বেড়েই চলছে। অতঃপর ভয়ানক একটি কম্পনে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে সমগ্র পৃথিবী। তখন প্রতিটি মানুষই উপুড় হয়ে পড়ে যাবে।

আকাশের ফিরিশতাদের মৃত্যু

অতঃপর আল্লাহ তাআলা আকাশ ভেঙ্গে দিবেন। সপ্তাকাশে অবস্থানরত ফিরিশতাগণও মৃত্যুর দুয়ারে। তারা মৃত্যুর পেয়ালা পান করবে। আরশ

বহনকারী ফিরিশতাগণও বরণ করবে মৃতুর মালা। অতঃপর নির্দেশ হবে-

জিবরাইল! মৃত্যুবরণ কর!

মিকাইল! মৃত্যুবরণ কর!

আল্লাহ তাআলার ইশ্‌ক ও ভালোবাসা সুপারিশ করবে- হে আল্লাহ! জিবরাইল ও মিকাইলকে রক্ষা কর!

তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন-

أُسْكُتْ فَقَدْ كَتَبْتُ الْمَوتَ عَلٰى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِىْ

চুপ কর! আমার আরশের নিচে যারা আছে সকলের জন্যেই আমি মৃত্যুর ফয়সালা করে দিয়েছি।

মৃত্যুবরণ করবে জিবরাইল। মিকাইলও শেষ। সিঙা ফুৎকাররত ইসরাফিলও ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। সিঙার ফুৎকার হাওয়ায় ভেসে উড়ে যাবে আরশে। আরশের উপরে আছেন আল্লাহ। নিচে কেবল আজরাইল। তখন আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করবেন- বলো আর কে বাকি আছে?

বলবে, উপরে তুমি আর নিচে তোমার গোলাম।

নির্দেশ করবেন-

اِنَّكَ مَيِّتٌ

তুমিও মরে যাও।

এতদিন পর্যন্ত যে সকলের রূহ কবজ করে ফিরতো আজ সে নিজেই নিজের প্রাণ কবজ করবে। যদি মানুষ বেঁচে থাকতো তাহলে মৃত্যুমুখে আজরাইলের সেই চিৎকার শোনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে সকল মানুষ মারা যেতো।

আজ কারো জন্যেই কাঁদবার মতো কেউ নেই।

আজ কাউকে দাফন করার মতো কেউ নেই।
আজ কাউকে কাফন পরানোর মতো কেউ নেই।
আজ কারো জন্যে মাতম করার কেউ নেই।
আজ সম্পদ হারিয়ে যাওয়ার ফলে মামলা করারও কেউ নেই।
আজ দরবার আছে। দরবারী কেউ নেই।
কুরসী আছে। কুরসীতে বসার কেউ নেই।
বাদশাহী আছে। বাদশাহ কেউ নেই।
পেয়ালা আছে। পানকারী কেউ নেই।
আজ এক আল্লাহ আছেন। তাঁর কোন শরীক নেই।
আল্লাহ তাআলা যখন সকলকে মৃত্যু দিবেন তখন ঘোষণা করবেন–

مَنْ كَانَ لِىْ شَرِيْكًا فَلْيَأْتِ...

> আমার কোন শরীক আছে কি যে আমার মোকাবিলা করবে?

তিনি তিনবার এই ঘোষণা দিবেন। বলবেন, আমার কোন প্রতিপক্ষ থাকলে সামনে আস। অতঃপর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে নত করে দিয়ে ঘোষণা করবেন–

اَنَا الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

আমিই কুদ্দুস সালাম ও মু'মিন।

পুনরায় ঝাঁকুনি দিয়ে একই বাণী উচ্চারণ করবেন। তৃতীয়বার উচ্চারণ করবেন–

اَنَا الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

অতঃপর বলবেন–

اَيْنَ الْمُلُوْكُ

কোথায় আজ রাজ-রাজারা?

اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ

জালেমরা আজ কোথায়?

أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ

অহংকারীরা আজ কোথায়?

বলবেন−

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

আজ বাদশাহ কে?

কোন জবাব নেই। অতঃপর আল্লাহ নিজেই বলবেন−

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

পরাক্রমশীল এক আল্লাহরই নিরঙ্কুশ রাজত্ব। [মু'মিন : ১৬]

যেখানে হিসাব নিবেন স্বয়ং আল্লাহ। যেখানে ব্যবস্থা আছে শাস্তি ও পুরস্কারের। যেখানে ব্যবস্থা আছে চিরস্থায়ী সম্মান ও চিরস্থায়ী অপমানের। যেখানে চিরন্তন সুশ্রী রূপও আছে, আছে কুশ্রী রূপও। যেখানকার সফলতা চিরন্তন, ব্যর্থতাও চিরন্তন। যেখানকার অপমান যেমন সীমাহীন তেমনি সীমাহীন সম্মানও। আল্লাহ যদি কারও প্রতি সন্তুষ্ট হন তাহলে তাকে বেহেশত দেবেন আর অসন্তুষ্ট হলে দেবেন জাহান্নাম। আমাদের এই মরণই যদি শেষ কথা হতো তাহলে আর কোন চিন্তা ছিল না। নামায পড়তাম কিংবা না পড়তাম। পর্দা করতাম কিংবা না করতাম। সত্য বলতাম কিংবা না বলতাম। অন্যায় করতাম কিংবা কল্যাণ করতাম। সুদ খেতাম কিংবা না খেতাম। মানুষের প্রতি ন্যায় করতাম কিংবা অন্যায় করতাম।

কিয়ামতের নকশা

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

খুব শীঘ্রই আমরা বিশাল একটা জীবনের মুখোমুখি হবো। যে জীবনের সূচনা আছে কিন্তু শেষ নেই। সেদিন আল্লাহ নিজে উপস্থিত হবেন।

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশতাগণও। [ফাজর : ২২]

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। [হূদ : ১০৫]

يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا

(আমরা আশঙ্কা করি আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে) এক ভীতিপ্রদ ভয়ঙ্কর দিনের। [দাহর : ১০]

يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا

যেদিনটি কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে। [মুয্যাম্মিল : ১৭]

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ

সেই দিন জাহান্নামকে আনা হবে। [ফাজর : ২৩]

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

এবং পথভ্রষ্টদের জন্যে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। [শুআরা : ৯১]

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে বেহেশত। [শুআরা : ৯০]

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ

আমি স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। [আম্বিয়া : ৪৭]

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

তোমাদের প্রত্যেকেই পুলসিরাত অতিক্রম করবে। [মারিয়াম : ৭১]

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশতাগণও। [ফাজর : ২২]

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ

সেদিন রূহ ও ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। [নাবা : ৩৮]

সেদিন আল্লাহর সামনে ফিরিশতাগণ নির্বাক অবস্থায় দাঁড়ানো থাকবে। কেউ কোন কথা বলবে না।

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

সেদিন আটজন ফিরিশতা তোমার প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের ঊর্ধ্বে। [হাক্কা : ১৭]

আরশের ছায়া মানুষের মাথার উপর পর্যন্ত বিস্তার করবে। আরশ বহন করবে আটজন ফিরিশতা। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলবেন– আমি তোমাদেরকে দেখেছি, তোমাদের কথাবার্তা শোনেছি। তোমরা আমার কালাম শুনেছো না গান-বাদ্য শুনেছো– আমি সবই দেখেছি। তোমরা হারাম খেয়েছো না হালাল খেয়েছো, নামায পড়েছো না নামায ছেড়েছো, নারীরা পর্দায় থেকেছে না পর্দা ছেড়েছে সবকিছুই ছিল আমার দৃষ্টির সামনে। কার ভেতরে অহংকার, কার ভেতরে বিনয়, কে কি মানসিকতায় যাকাত দিয়েছে; অতঃপর তাদের মাপজোক ঠিক ছিল না বেঠিক– সবই ছিল আমার চোখের সামনে।

আল্লাহ তাআলার গুণাবলী

তিনি তাঁর গুণাবলীর কথা পাক কুরআনের নানা জায়গায় তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

তোমার প্রতিপালক ভুলবার নন। [মারিয়াম : ৬৪]

لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسٰى

আমার প্রতিপালক ভুলেন না এবং বিস্মৃতও হন না। [ত্বহা : ৫২]

لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ

তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। [বাকারা : ২৫৫]

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا

তুমি কখনও মনে করো না, আল্লাহ তাআলা গাফেল। [ইবরাহীম : ৪২]

مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَىْءٍ

আল্লাহ এমন নন যে, কোন কিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে। [ফাতির : ৪৪]

এক কথায় তিনি অক্ষম নন, গাফেল নন, মূর্খ নন, ভুলেন না, বিস্মৃত হন না, তন্দ্রাচ্ছন্ন হন না, তাঁকে ঘুম পায় না, দুর্বলতা পায় না, কোন ত্রুটি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর গুণময় নামাবলী তো এমন–

اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوْسُ...اَلسَّلَامُ اَلْمُؤْمِنُ...

اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيْزُ...اَلْجَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ...

اَلْخَالِقُ اَلْبَارِئُ...اَلْمُصَوِّرُ اَلْغَفَّارُ...

اَلْقَهَّارُ اَلْوَهَّابُ...اَلرَّزَّاقُ اَلْفَتَّاحُ...

اَلْعَلِيْمُ اَلْقَابِضُ...اَلْبَسِيْطُ اَلْخَافِضُ...

اَلرَّفِيْعُ اَلْمُعِزُّ اَلْمُذِلُّ...اَلسَّمِيْعُ اَلْبَصِيْرُ...

اَلْحَكَمُ اَلْعَدْلُ...اَللَّطِيْفُ اَلْخَبِيْرُ...

اَلْحَلِيْمُ اَلْعَظِيْمُ...اَلْغَفُوْرُ اَلشَّكُوْرُ...

اَلْعَلِىُّ اَلْكَبِيْرُ...اَلْحَفِيْظُ اَلْمُقِيْتُ...

اَلْحَسِيْبُ اَلْجَلِيْلُ... اَلْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ...

اَلْمُجِيْبُ اَلْوَاسِعُ...اَلْحَكِيْمُ اَلْوَدُوْدُ...

اَلْمَجِيْدُ اَلْبَاعِثُ...اَلشَّهِيْدُ اَلْحَقُّ...

اَلْوَكِيْلُ اَلْقَوِىُّ...اَلْمَتِيْنُ اَلْوَلِىُّ...

اَلْحَمِيْدُ اَلْمُحْصِىُ...اَلْمُبْدِئُ اَلْمُعِيْدُ...

اَلْمُحْيِى اَلْمُمِيْتُ...اَلْحَىُّ اَلْقَيُّوْمُ...

اَلْوَاجِدُ اَلْمَاجِدُ...اَلْوَاحِدُ اَلْاَحَدُ...

اَلصَّمَدُ اَلْقَادِرُ...اَلْمُقْتَدِرُ اَلْمُقَدِّمُ...

اَلْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ...اَلْاٰخِرُ اَلظَّاهِرُ...

اَلْبَاطِنُ اَلْوَالِىُ...اَلْمُتَعَالُ اَلْبَرُّ...

اَلتَّوَّابُ اَلْمُنْتَقِمُ...اَلْعَفُوُّ الرَّؤُفُ...

مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ

وَالْاِكْرَامِ...اَلْمُقْسِطُ الْجَامِعُ...

اَلْغَنِىُّ اَلْمُغْنِى...اَلْمَانِعُ اَلضَّارُّ...

اَلنَّافِعُ اَلنُّوْرُ...اَلْهَادِيُ اَلْبَدِيْعُ...

اَلْبَاقِيُ اَلْوَارِثُ...اَلرَّشِيْدُ اَلصَّبُوْرُ جَلَّ جَلَالُهُ...

এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যসহই তিনি তাঁর আদালতে চির অধিষ্ঠিত।

জান্নাত-জাহান্নামের ফরিয়াদ

জাহান্নামে রয়েছে অগ্নি ও অগ্নিশিখা। বেহেশতে রয়েছে মদির সুরভি ও কল্পনাতীত সুবাস। জান্নাত বলে– হে আল্লাহ! আমার ফল পেকে গেছে। আমার নহরগুলোর পানি উছলে উঠেছে। আমার জাম, আমার শরাব, আমার দুধ, আমার মধু, আমার পোশাক, আমার অলংকার, আমার স্বর্ণ, আমর রূপা, আমার মহল অপেক্ষায় আছে। তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। পক্ষান্তরে জাহান্নাম বলে– হে আল্লাহ! আমার অঙ্গারগুলো স্ফীত হয়ে উঠেছে। আমার গর্তগুলো ভীষণ গভীর হয়ে পড়েছে। আমার অগ্নি লেলিহান প্রচণ্ড ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে। হে আল্লাহ! আমার জিঞ্জির, আমার শেকল, আমার ফুটন্ত পানি, আমার কন্টকাকীর্ণ বৃক্ষ-লতা সবই অপেক্ষায় আছে। আমার অধিবাসীদেরকে জলদি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। অপরাধী, ব্যভিচারী নারী-পুরুষদের জখম থেকে নির্গত দুর্গন্ধময় পুঁজ প্রথমে তাদেরকে পান করানো হবে, অতঃপর শরাবখোরদেরকে। এই পাপীদের শরীরের পুঁজ রক্ত ঘাম ও শ্লেষ্মা একটি নির্দিষ্ট হাউজে জমা করা হবে। অতঃপর তা পানিতে ফুটিয়ে পেয়ালায় পূর্ণ করে রাখা হবে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে– এই শরাব প্রথমে মদখোরদেরকে পান করাও। অতঃপর অন্যান্য নাফরমানদেরকে। আল্লাহ তাআলা বেহেশত-দোযখ উভয়ের ডাকেই সাড়া দিবেন। বলবেন, এখনই আমি তোমাদের পূর্ণ করার ব্যবস্থা করছি।

ব্যর্থ মানুষের রূহ

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন– সকলেই নিজ নিজ কৃতকর্মের ফলাফল ভোগ করার জন্য প্রস্তুত হও। এই সেই কঠিন সময় যখন একজন শিশুও বৃদ্ধে পরিণত হবে। মরণই যদি শেষ কথা হতো তাহলে তো ভালোই ছিল। কিন্তু এখানে মরেও মরার পথ নেই। এখানে এ সবকিছুই ঘটবে। এখানকার বিচারে যখন কোন ব্যক্তি ব্যর্থ বলে বিবেচিত হবে তার নেকীর পাল্লা হাল্কা হয়ে যাবে। ভারী হয়ে পড়বে পাপের পাল্লা এবং ফিরিশতা তাকে ব্যর্থ বলে ঘোষণা করে দিবে। তখন

আল্লাহ তাআলা বলবেন– একে ধর। ফিরিশতাগণ ছুটে আসবে। ধরবে কিভাবে? মুখের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে জিহ্বা বের আনবে। জিহ্বা টেনে তার থুতনি পর্যন্ত নিয়ে আসবে। অতঃপর নাঙা শরীরে তাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে থাকবে। সে তখন কাতরকণ্ঠে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। ফিরিশতাগণ তার জবাবে বলবে– পরম করুণাময় আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করেননি, আমরা কিভাবে দয়া করবো? একজন নারীর ক্ষেত্রেও যখন তার ব্যর্থতার ফয়সালা হবে তখন ফিরিশতাগণ ছুটে আসবে। তার মাথার চুল চেপে ধরে টেনে নিয়ে যাবে। সেও কাতরকণ্ঠে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। ফিরিশতাগণ বলবে, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করেননি, আমরা কিভাবে করবো? এ তো মাত্র পাকড়াও শুরু। সামনে তো অপেক্ষা করছে পাকড়াও-এর ঘর। সে ঘর কেমন?

نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

আমি জালেমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি অগ্নি। যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। [কাহ্ফ : ২৯]

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ

তাদের শয্যা হবে আগুনের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও। [আ'রাফ : ৪১]

সফল মানুষ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

বিষয়টি খুবই জটিল। আর আমরা ভেবে রেখেছি একেবারেই সহজ। আমরা রুটি-রোজগারকেই জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে রেখেছি। দুনিয়ার সাজ-সজ্জার জন্যে আমরা পাগল। শেষ বিচারে যখন কোন নারী সফল বলে ফয়সালা লাভ করবে কিংবা কোন পুরুষের পক্ষে সফল বলে ফয়সালা দেয়া হবে তখন সে একটি শ্লোগান দিবে।

هَاؤُمُ

মূলত কুরআনে কারীমে উল্লিখিত এই শব্দটি একটি শ্লোগান। আমাদের ভাষায় এর প্রকৃত কোন তরজমা নেই। বাজিতে জিতে গেলে বিজয়ী ব্যক্তি যেমন এই বলে উল্লাস প্রকাশ করে- 'আসো আসো!' এটাও ঠিক তেমনি ধরনের একটি শ্লোগান। কোন মানুষ যখন আনন্দে খেই হারিয়ে ফেলে তখন সে এভাবেই শ্লোগান দেয়। বারবার নির্বাচনে জেতার পর বিজয়ী কত রকমের শ্লোগান দেয়। তার সে শ্লোগান অনেক সময় পাগলামীকেও স্পর্শ করে। সে চিন্তা করে না আমার এই কথা মানুষ শুনলে কি ভাববে? সে দিন যারা বিজয়ী হবে তারা তাদের আমলনামা খুলে এই বলে আহ্বান করবে-

اِقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ

আমার আমলনামা পড়ে দেখ। [হাক্কা : ১৯]

হাঁ, বিজয়ীরা ডেকে বলবে- আমার কাগজ পড়ে দেখো না? আমি তো পরীক্ষায় পাস করে গেছি। অন্যরা চিৎকার করে বলবে- আরে বোন! তুমি কিভাবে পাস করে গেলে! আমি তো বরবাদ হয়ে গেছি। আরে ভাই, তুমি কিভাবে সফলকাম হলে! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। সে তার জবাবে বলবে-

اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ

আমি তো জানতাম, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। [হাক্কা : ২০]

অর্থাৎ আমি পূর্ব থেকেই জানতাম আমাকে আমার প্রভুর সামনে আমার কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। তাছাড়া আমি পাগল ছিলাম না যে, শহরের গলিপথে ছুটাছুটি করে জীবন বরবাদ করে দিব। আমি নির্বোধ ছিলাম না যে, দু'দিনের এই ক্ষুদ্র জীবনের জন্যে আমি আমার পরকালীন অনন্ত অসীম জীবনকে বিক্রি করে দিব। তাই আমি আমার দু'দিনের সংক্ষিপ্ত জীবনকে এই পরকালীন জীবনের প্রস্তুতির মধ্যেই কাটিয়েছি।

জগতবিখ্যাত তাপসী হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) শুধুমাত্র একজন নারী হিসেবেই ইতিহাসে আলোচিত নন। তাছাড়া নারীসুলভ সৌন্দর্যের কারণেও তিনি এই গুরুত্ব পাননি। কারণ কোন নারীকে নারী হিসেবে

আকর্ষণীয় হতে হলে তার থাকতে হয় খান্দানী শ্রেষ্ঠত্ব, রূপের সৌন্দর্য, সম্পদ ও সন্তান দান ক্ষমতা। অথচ এসব গুণের কোনটিই ছিল না হযরত রাবেয়া বসরীর মাঝে। বংশ হিসেবে ছিলেন দাসী। শরীরের রঙ বর্ণে ছিলেন কালো। আর কৃতদাসের তো কোন সম্পদই নেই। অধিকন্তু ছিলেন বন্ধ্যা। কিন্তু তারপরও শত শত বছর পর আমরা আজ তার নাম নিচ্ছি। কেন তাঁকে স্মরণ করছি আমরা? তাঁর কালে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় রূপসী-সুন্দরী রাণী ছিল। তাদের জীবন ছিল সোনা-রূপায় আচ্ছাদিত। কিন্তু আজ তাদের নাম নেয়ার মতো কেউ নেই। কারণ, সেটা ছিল বনু উমাইয়াদের শাসন যুগ। সে যুগে উমাইয়া শাসকদের হেরেমে সুন্দরী রূপসী নারীর কোন অভাব ছিল না। অথচ তাদের কারও কথাই ইতিহাস স্মরণ রাখেনি। ইতিহাস স্মরণ রেখেছে বংশগত কৃতদাস, কৃষ্ণ-কালো সন্তানহীনা এক বন্ধ্যা নারীর কথা। সে বন্ধ্যা ছিল। রাতের বেলা গোসল করে কাপড় পরিধান করে স্বামীকে জিজ্ঞেস করতো, তোমার কি কোন প্রয়োজন আছে? স্বামী বলতো, না। অতঃপর প্রশ্ন করতো, আমাকে তুমি অনুমতি দিচ্ছ? স্বামী বলতো, হ্যাঁ। তারপর রাবেয়া বসরী (রহ.) মুসল্লায় গিয়ে দাঁড়াতেন এবং মুসল্লার উপর রাত কাটিয়ে দিতেন।

হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর প্রার্থনা

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)-এর স্বামী মারা গিয়েছিল যৌবনে। হাসান বসরী (রহ.) ছিলেন সে কালেরই এক মহান ব্যক্তিত্ব। ইসলামী জ্ঞান ও বুযুর্গীর পথিকৃৎ। সে কালের বহু মানুষ তাঁর কাছে কন্যা দেয়ার জন্যে লালায়িত ছিল। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (রহ.) নিজে পায়ে হেঁটে হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)-এর দরবারে উপস্থিত হন। পর্দার আড়াল থেকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। জবাবে হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) বলেন, আমাকে চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও। তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করবো। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বললেন, বলুন আপনার প্রশ্ন। রাবেয়া বসরী (রহ.) বললেন, বলো আমি কি বেহেশতি না দোযখী। হাসান বসরী নিরব। প্রশ্ন করলেন, হাশরের মাঠে যখন আমলনামা বিতরণ করা হবে

কখন কেউ আমলনামা পাবে সামনে থেকে, কেউ পেছন থেকে। বলো, আমি কোন দিক থেকে পাবো? হাসান বসরী নীরব। প্রশ্ন করলেন, কিয়ামতের দিন যখন আমল মাপা হবে তখন কারও নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে, কারও বদ আমলের। বলো, আমার নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে না বদ আমলের। হাসান বসরী নীরব। প্রশ্ন করলেন, যখন পুলসিরাত পার হওয়ার পালা আসবে তখন কেউ তো বিদ্যুৎগতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, কেউ বা পড়ে যাবে। বলো, আমার অবস্থা কি হবে? হযরত হাসান বসরী (রহ.) বললেন, রাবেয়া! আপনার কোন প্রশ্নের জবাবই আমার কাছে নেই। উত্তরে হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) বললেন, হাসান! যাও, আমাকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ দাও। আমার সামনে বড় বিপজ্জনক ঘাঁটি রয়েছে। বিয়ে করার অবসর আমার নেই।

মৃত্যুর স্মরণ

আমাদের সামনে একটি মনজিল রয়েছে। আমরা তো সকলেই মুসাফির। আপনারা হয়তো মনে করে থাকবেন, আমরা তাবলীগের লোক। তিন দিনের জন্যে বেরিয়েছি। তাই আমরা মুসাফির। কথা কিন্তু তা নয়। খোদার কসম করে বলছি, আমরা মুসাফির, আপনারাও মুসাফির। আমাদের এই সফরের সীমানা হলো মৃত্যু। সেখান থেকে শুরু হবে এক নবজীবনের যাত্রা। সে যাত্রার শুরু আছে শেষ নেই। মূলত আমাদের সকল প্রস্তুতি সেই জীবনের জন্যে। এটাই হলো মূলত আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়। কেউ বলতে পারে না, এখানে কে কত দিন থাকবে। অবশেষে বিচ্ছেদ আসবেই। আমাদের চোখের সামনের চলন্ত জানাযা কি এ কথা বলে না, আমাদের এই ঘর ক্ষণস্থায়ী। পতিত লাশগুলো কি আমাদেরকে এ কথা বলে না, এ জগতটা মন দেয়ার জগত নয়। চকিত দৃষ্টিতে তাকালে এই পৃথিবী কত সুন্দর! এখানে মৃত্যু নামক কিছু যে আছে তা মনেও হয় না। কিন্তু আমরা যদি আমাদের চারপাশে একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকাই তাহলে দেখি, এই তো দাদী মারা গেছেন, দাদা মারা গেছেন, নানা মারা গেছেন, নানী মারা গেছেন। তখন এও উপলব্ধি হয়– এখান থেকে মানুষ বিদায়ও নেয়।

এই তো গত বছরের কথা। আমি হজে ছিলাম। এদিকে আমার মা ইন্তে কাল করেছেন। তাঁর লাশ পড়ে আছে। মানুষ কান্নাকাটি করছে। তিন বছর বয়সী আমার ভাতিজি এসে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছে, চাচীজান! এরা কাঁদছে কেন? আমার স্ত্রী তাকে জবাব দিচ্ছে, তোমার দাদী মা মারা গেছেন তাই। এটাই ছিল তার দেখা প্রথম দুর্ঘটনা। তার বয়সও সবেমাত্র তিন-চার বছর। সে তো ইতোপূর্বে কেবল হাসতে দেখেছে। আজই প্রথম দেখলো এতগুলো মানুষকে এক সাথে কাঁদতে। তাই সে অস্থির এরা কাঁদছে কেন। আমার স্ত্রী যখন তাকে বললো, আজ তোমার দাদী মা আল্লাহর কাছে চলে গেছেন তখন সে তাজ্জব হয়ে বললো, আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। দাদু তো দেখি এখানেই শুয়ে আছে। কিন্তু কথা বলছে না কেন, উঠছে না কেন, এরা কাঁদছে কেন? মূলত তার জীবনের এটা প্রথম ধাক্কা। তার নিষ্পাপ হৃদয় দর্পণে এই প্রথম আঁচড়। এই ধাক্কা খেতে খেতে একদিন হয়তো তার আয়নাই ভেঙ্গে যাবে। আমরা কত না পাগল! প্রতিনিয়তই এই দৃশ্য দেখি, কিন্তু কিছুই শিখি না।

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিদায়

হযরত ফাতিমা (রা.) ইন্তেকালের সময় অসুস্থ ছিলেন। বিশেষ কোন প্রয়োজনে হযরত আলী (রা.) ছিলেন ঘরের বাইরে। হযরত ফাতিমা (রা.) ঘরের সেবিকাকে ডেকে বললেন, আমার জন্যে পানির ব্যবস্থা কর। পানির ব্যবস্থা করা হলো। বললেন, আমাকে গোসল করাও। গোসল করানো হলো। তারপর তিনি কাপড় পরিধান করলেন। বললেন, আমার খাটিয়াটি ঘরের মাঝখানে এনে দাও। সেবিকা খাটিয়াটি ঘরের মাঝখানে এনে দিল। হযরত ফাতিমা (রা.) কিবলামুখী হয়ে শুয়ে পড়লেন। সেবিকাকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি গোসল করে নিয়েছি। সাবধান! আমার মৃত্যুর পর কেউ যেন আমার শরীর না দেখে। এ কথা বলেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

হযরত আলী (রা.) ঘরে ফিরে দেখেন কাহিনী শেষ। হযরত ফাতিমা (রা.) চব্বিশ বছর বয়সে ওফাত লাভ করেছেন। সেবিকা এসে যখন পুরো কাহিনী বর্ণনা করলো তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, খোদার কসম! তুমি যা বলেছো তাই হবে। যখন কবরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হলো, চারপাশে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হযরত আলী (রা.) ফাতিমা! ফাতিমা! বলে তিনবার ডাকলেন। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ নেই। তখন তিনি একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন যার সারমর্ম এই–

ফাতিমার কি হলো–
সে তো আমার একটি মাত্র ডাকেই কেঁপে উঠতো
অথচ আজ আমার ডাকে কোন সাড়া নেই।
আজ কেন কোন সাড়া নেই?
প্রিয়তমা! সমাধিতে পা দিতেই ভুলে গেলে ভালোবাসার সব কথা?
হাঁ, কতদিন কে কার সঙ্গে থাকে?
বন্ধুতা একদা সাঙ্গ হবেই।
আমি আমার এই হাতে আমার প্রিয় নবীকে সমাধিস্থ করেছি
আর আজ এই হাতেই মাটির গর্ভে রেখে দিলাম ফাতিমাকে।
শুয়ালাম প্রিয়তমাকে মাটির গর্ভে।
আমি আজ বুঝতে পেরেছি এখানে কারও বন্ধুত্বই টিকে থাকে না
আমি বুঝেছি এই রাত একদা নেমে আসবে আমার জীবনেও
সেদিন উত্তোলিত হবে আমার জানাযা
সেদিন কারও কান্নাই আমাকে উপকৃত করবে না।
আমি তো পড়ে থাকবো মৃত্তিকা জড়িয়ে
অন্যেরা কাঁদলেই বা আমার কি হবে?

পরকালের পুঁজি

এখানে গভীরভাবে জানবার বিষয় হলো, পরকালে আমাদের কাজে লাগবে কোন সে পুঁজি? দুনিয়ার টাকা-পয়সা, রূপ-সৌন্দর্য কিংবা বংশ

গৌরব তো কাজে আসবার বিষয় নয়। বংশ গৌরব যদি কাউকে রক্ষা করতে পারতো তাহলে অন্তত আবু লাহাবকে দোযখে যেতে হতো না। বংশ পরিচয়ের কারণেই যদি কেউ পরাজিত হতো তাহলে হযরত বেলাল (রা.) বেহেশতে যেতে পারতেন না। বংশ পরিচয় যদি কাউকে খাটো করতে পারতো তাহলে তেরশ' বছর পর আমরা রাবেয়া বসরীর কথা আলোচনা করতাম নাম। এখানে বিচারের বিষয় তো হলো, কার মৃত্যু হয়েছে আল্লাহর দীনের উপর। এখানে দেখার বিষয় হলো- কে কতটুকু সম্পদ নিয়ে কবর পথে পাড়ি দিয়েছে? আমাদের এই তাবলীগ জামাত মূলত এই কবরের প্রস্তুতির কথাই বলে। বলে, পরকালের জন্যে কিছু পুঁজি সংগ্রহ করতে। বলে, ভবিষ্যতে এই টাকা-পয়সা কোন পুঁজি হিসেবে বিবেচিত হবে না। আখেরাতের পুঁজি হলো আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টি। সুতরাং আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্জিকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহর মর্জি রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবনের সকল মর্জিকে বিসর্জন দিতে হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের জন্মই এমন পরিবেশে যেখানে মানুষ নিজের মর্জির পূজা করে বেড়ায়। ইরশাদ হয়েছে-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ

> তুমি কি লক্ষ্য করেছো তাকে যে তার খেয়াল খুশিকে নিজের মাবূদ হিসেবে গ্রহণ করেছে? [জাছিয়া : ২৩]

নিজের খেয়াল খুশিকে মাবূদ হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ হলো মনমতো জীবনযাপন করা। মন যা চায় তাই করে বেড়ায়। কুরআনের ডাক কানে তুলে না, শরীয়তের আহ্বানকে পাত্তা দেয় না। শোনে না, নবীর আহ্বানও। বরং মন যা চায় তাই করে বেড়ায়। আমাদের আহ্বান হলো, তোমার এই খেয়াল-খুশির পথকে পরিহার কর।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আল্লাহ তাআলার প্রিয়তম নবী হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শকে গ্রহণ করো। তাঁর চাইতে দয়ালু আর কো

নমুনা নেই। তিনি এই উম্মতের প্রতিটি নারী ও পুরুষের জন্যে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন। এই উম্মতের প্রতিটি নারী ও পুরুষের বেদনায় অস্থিরতার ভেতর দিয়ে তেইশটি বছর অতিক্রান্ত করেছেন। আর আজ আমরা তাঁর জীবনাদর্শের সরাসরি বিদ্রোহী। এই পৃথিবীতে আমাকে এমন একজন মা দেখাও যে তার সন্তানের জন্যে তেইশ বছর কেন, তেইশ মাস কেঁদেছে? তেইশ মাস কেন, তেইশ সপ্তাহ কেঁদেছে– এমন মা-ই বা কোথায়? আমি বলি, অবিরাম তেইশ ঘন্টা কেঁদেছে এমন মা-ও পৃথিবীতে খুঁজে পাবে না। আমি বলি, দেড় হাজার বছর আগের মদীনার দিকে তাকিয়ে দেখ, এমন এক মহান সত্তা যাঁর জন্যে সমগ্র জগত কুরবান। তিনি পৃথিবীর যেখানেই পা রাখেন সেখানেই শান্তির সুবাতাস বইতে থাকে। তিনি যেখানে মাথা রাখেন সেখানে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত ফুল বাগিচায় রূপান্তরিত হয়। তিনি যে দিকেই যান সে দিকেই বসন্তকাল। তিনি যেখানেই উপবেশন করেন সেখানেই পড়ে আরশের তাজাল্লী।

তিনি মাটির পৃথিবীতে বসে জান্নাত জাহান্নাম দেখতে পান। লওহে মাহফুয পড়তে পান। যাঁর পায়ের ধুলো এতটা উঁচু যে, তার পেছনে পড়ে থাকে প্রথম আসমান, দ্বিতীয় আসমান, তৃতীয় আসমান, চতুর্থ আসমান, পঞ্চম আসমান, ষষ্ঠ আসমান, সপ্তম আসমান। সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত তাঁর গতির কাছে পরাজিত। আরশে মুয়াল্লাও তাঁর মনযিল নয়; বরং মনযিল পথ। তিনি পার করে চলে যান আরশও। অতঃপর সত্তর হাজার নূরের পর্দা উন্মোচিত হয় তাঁর অগ্রসরতায় ধীরে ধীরে। অবশেষে মুখোমুখি হন স্বয়ং আল্লাহ তাআলার।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

> ফলে তাঁদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইলো।
> অথবা তারও কম। [নাজম : ৯]

এত মহান যাঁর মর্যাদা তিনিই আপনার আমার জন্যে মদীনায় বসে চোখের পানি বিসর্জন দিচ্ছেন। চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যাচ্ছে। ভিজে যাচ্ছে তাঁর বক্ষ মুবারক। তিনি সিজদায় পড়ে কাঁদছেন। তাঁর চোখের পানিতে সিজদার স্থান কাদা হয়ে যাচ্ছে। তাঁর পেছনে বসে

তাঁর স্ত্রী কাঁদছেন এবং এভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছেন– আপনি এতটা অস্থির কেন? তাঁর সিজদার দীর্ঘতা দেখে কেউ কেউ এই ভেবে ভীত হয়েছেন, আবার তিনি ইন্তেকাল করে গেলেন কি না! এত দীর্ঘ সিজদা কোন জীবিত মানুষ করতে পারে না। কার জন্য করেছেন এত দীর্ঘ সিজদা? শুধু এই বাসনায়– হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও।

সাহাবা ও নবী পরিবারের মর্যাদা

মজার বিষয় হলো, সাহাবায়ে কেরামের সকলেই তো ছিলেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্ত। তাঁদের সম্পর্কে তো আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে থাকতেই অঙ্গীকার করে রেখেছেন–

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

> আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। [বায়্যিনা : ৮]

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

> তবে আল্লাহ তাদের সকলের জন্যে কল্যাণের– বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। [হাদীদ : ১০]

হযরত হাসান (রা.) বেহেশতের সরদার।

হযরত হুসাইন (রা.) বেহেশতের সরদার।

হযরত ফাতিমা (রা.) বেহেশতি নারীদের সরদার।

হযরত আলী (রা.)-এর ঘর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরের সামনে। পাক কুরআনে উম্মাহাতুল মুমিনীনের আলোচনা হয়েছে বিশেষ মর্যাদার সাথে।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সকল নারীকে কুরআনে কারীমে 'ইমরাআতুন' শব্দে স্মরণ করেছেন। কিন্তু আমাদের নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণকে কোথাও এই শব্দে স্মরণ করেননি। বরং স্মরণ করেছেন 'যাওজা' শব্দে। ইরশাদ হয়েছে–

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا

স্মরণ কর, নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। [তাহরীম : ৩]

تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ

তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ। [তাহরীম : ১]

وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ

তাঁর পত্নীগণ তাঁদের মাতা। [আহযাব : ৬]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আমাদের নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণকে আল্লাহ তাআলা 'যাওজা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ অন্যান্য নারীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন 'ইমরাআতুন' শব্দ। সেসব নারীদের মধ্যে হযরত নূহ (আ.), হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীগণ যেমন রয়েছেন তেমনি রয়েছে ফেরাউনের স্ত্রী এবং ইমরানের স্ত্রী। হতে পারে হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী অবাধ্য ছিল; কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী তো ঈমানদার ছিলেন। হযরত সারা-এর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত ইসহাক (আ.)। সুতরাং হযরত সারা (আ.) হযরত ইসহাক (আ.)-এর জননী। হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর দাদী এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পরদাদী। সুতরাং তিনি এক সম্মানিত নারী। কুরআনে কারীমে তাঁকেও 'ইমরাআতুন' বলা হয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? পার্থক্য হলো– বিবাহিত নারীকেই 'ইমরাআতুন' বলে। যে নারীর সূত্রে স্বামীর বংশধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু 'যাওজা' বলা হয় এমন জীবনসঙ্গিনীকে যে শুধু সন্তান প্রসবেরই অংশীদার নয় বরং স্বামীর চিন্তা, গোপন রহস্য, তার ভাবনা সবকিছুরই অংশীদার হয়। অংশীদার হয় জীবনের ও জীবন চলার পথের। সে অংশীদার হয় প্রবাসে, অংশীদার হয় নিবাসে। সুখেও অংশীদার হয়, অংশীদার হয় দুঃখেও। স্বামীর আনন্দই তার আনন্দ বলে বিবেচিত হয়। স্বামীর বেদনাই হয় তার বেদনা। যে নারী স্বামীর প্রতিটি নিঃশ্বাসের ভাগীদার, যে নারী স্বামীর প্রতিটি পদক্ষেপে অংশীদার, যে

নারী স্বামীর বিপদে নিরাপদ আশ্রয় সে নারীই 'যাওজা'। স্বামীর জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হয় না যে নারী আরবী ভাষায় তাকেই 'যাওজা' বলা হয়। আমাদের নবীর বিবিগণকে এই শব্দেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁরা পৃথিবীর সকল মুসলমানের জন্যে মা। কুরআন তাঁদেরকে সম্মানিত করেছে এভাবে–

لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। [আহযাব : ৩২]

অর্থাৎ হে নবীর সঙ্গিনীগণ! এই পৃথিবীতে তোমাদের কোন তুলনা নেই।

উম্মতের জন্যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কান্না

তিনি আরাফায় পড়ে কাঁদছেন কেন? কেন কাঁদছেন মিনায়? হেরেমে কেন কাঁদছেন? মধ্য রাতে তাঁর কান্নায় কেন কেঁপে উঠছে আরশে আজীম। তাঁর সে কান্না ছিল অনাগত উম্মতের জন্যে। তিনি কেঁদেছেন অনাগত উম্মতের ক্ষমা প্রার্থনায়। তিনি কেঁদেছেন যেন তাঁর উম্মতের ছোট বড় প্রতিটি নারী-পুরুষ মুক্তি পেয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে–

وَلَهُ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ

তিনি যখন কাঁদতেন তখন তাঁর বুকের ভেতর থেকে ডেগের ফুটন্ত পানির ধ্বনির মতো ধ্বনি শোনা যেতো। তিনি বিড়বিড় করে কাঁদতেন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। বলতেন– হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আ.) বলেছিলেন, মাফ করে দাও! সে তো তোমার খুশি। যদি মাফ না করো সেও তোমার খুশি। ঈসা (আ.) বলেছিলেন– মাফ করো সে তোমার ইচ্ছা। না করো সেও তোমার ইচ্ছা। কিন্তু হে আল্লাহ! আমি তো এ কথা বলিনি। আমি বলি–

اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ...اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ...

আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও।

আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও।

বলি, হে আল্লাহ! তুমি মাফ করবে না তবুও মাফ করে দাও। এ কথা বলে তিনি এমনভাবে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন হযরত জিবরাইল (আ.)। এসে বলেন, হে রাসূল! আল্লাহ তাআলা আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন, কী হয়েছে? ইরশাদ করেন- আমার উম্মতের ভাবনা আমাকে কাঁদাচ্ছে। জবাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- কাঁদতে হবে না। আপনাকে আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে খুশি করে দেবো।

কত বড় বেদনার বিষয়! আমরা সেই নবীর নির্দেশ লঙ্ঘন করি। আমরা সেই নবীর দেখানো পথকে বিসর্জন দিই।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

একবার একটু ভেবে দেখ, যিনি তোমার জন্যে এতটা কেঁদেছেন, এতটা ভেবেছেন, এতটা অস্থির হয়েছেন তুমি তোমার মনকে জিজ্ঞেস কর, তাঁর সম্পর্কে তোমার মন কি বলে? আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি, একটি মৃত হৃদয়কে জিজ্ঞেস করলেও সে চিৎকার করে বলবে, যা করছি সবই ভুল। আমরা যা করছি এটা আমাদের জীবনের লক্ষ্য নয়।

প্রিয় বোনেরা আমার!

এই যে আমরা আমাদের জীবনব্যাপী নানা রকম সংস্কৃতি লালন করছি, শরীয়তের সাথে এর কী সম্পর্ক রয়েছে? বিয়ে-শাদীতে এই যে মেহেদী উৎসব, মেহেদী উৎসবের নামে উলঙ্গপনা- এটা আমরা কোথেকে পেলাম? এ তো একদা হিন্দুদের সংস্কৃতি ছিল। মুসলমানরা এটা কিভাবে গ্রহণ করলো? বলো, হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়েতে কি মেহেদী উৎসব হয়েছিল? কিংবা হযরত খাদিজা, হযরত রুকাইয়া, হযরত যাইনাব ও হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-এর বিবাহে? হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়েতে বারাত দেখাও। বলো, তাঁদের বিয়েতে কি কোন ব্যান্ড বাজানো হয়েছিল? তাঁদের বিয়েতে কি মেয়েরা নেচেছিল? যে মেয়েদের লজ্জা দেখে একদা ফিরিশতাগণ লজ্জা করতো আজ সে মেয়েদের নির্লজ্জতা দেখে শয়তানও চোখ নামিয়ে নেয়। যে যুবকদের সততা ও পবিত্রতা দেখে ফিরিশতাগণ পর্যন্ত বিস্মিত হতো আজ তাদের উলঙ্গপনা দেখে শয়তানও লজ্জায় মুখ ঢাকে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার!

আমরা কি করছি? কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি? যিনি আমাদের জন্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেঁদেছেন। আমাদের জন্যে কাঁদতে কাঁদতে যিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন আমরাই আজ তাঁর আদর্শের প্রধান বিদ্রোহী।

জীবন সায়াহ্নে জিবরাইল ও আজরাইলের আগমন

দিবসের এক প্রহর কেটে গেছে। আজ বারই রবিউল আউয়াল। সোমবার। খুব শীঘ্রই সেই মহা ঘটনাটি সংঘটিত হবে। যে ধরনের ঘটনা এই পৃথিবীতে আগেও কখনও ঘটেনি, পরেও কখনও ঘটবে না। হযরত জিবরাইল (আ.) কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে আসলেন। তাঁর সঙ্গে আগমন করলেন এমন একজন ফিরিশতা যিনি এর পূর্বেও কখনও পৃথিবীতে আসেননি, পরেও কখনও আসবেন না। তাঁরা উভয়ে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি বিষয়? বিষয় এটাই– ইয়া রাসূলাল্লাহ! বাইরে মালাকুল মওত দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে আসার অনুমতি চাইছে। আপনি অনুমতি দিলেই তারা প্রবেশ করবে।

একবার ভেবে দেখুন, যে নবীর সামনে অনুমতি ছাড়া মালাকুল মওত তো উপস্থিত হতে পারে না, আজ আমরা সেই নবীর সাথে বিদ্রোহ করছি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আসতে বলো। মালাকুল মওত এসে আরয করলো– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রভুর নির্দেশ ছিল আমরা যেন আপনার অনুমতি নিয়েই ভেতরে প্রবেশ করি, অন্যথায় যেন ফিরে যাই। এমন ঘটনা এর পূর্বেও কখনও ঘটেনি, এর পরও কখনও ঘটবে না। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আপনাকে অধিকার দিয়েছেন, আপনি চাইলে থেকে যেতে পারেন, আবার চলেও যেতে পারেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাইল (আ.)-এর প্রতি তাকালেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনার সাক্ষাতের প্রতি আগ্রহ পোষণ করছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও! গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসো আমি চলে যাওয়ার পর আমার উম্মতের

সাথে আল্লাহ্ তাআলা কি আচরণ করবেন? এ হলো আমাদের প্রতি আমাদের নবীর দরদ। আজ আমরা সেই নবীর আদর্শকেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে উপেক্ষা করে চলছি। সুতরাং ভাই ও বোনেরা আমার! সুদী লেনদেন ছাড়। অনেকেই বলে, তাহলে ব্যবসা চলবে কিভাবে? যদি বলি, বোনেরা আমার! পর্দা করো। তখন বলে, পর্দা করে এই সোসাইটিতে থাকবো কি করে? আমি বলি, তোমাদের এই প্রশ্ন বড়ই আজব। যদি বলি, এই মেহেদী উৎসব ছাড়। এটা বড়ই অবিচার। বলে, এটা তো আমাদের সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটা ছেড়ে সমাজের আর দশজনের সঙ্গে চলবো কি করে? বলি, এ তো হলো সমাজের সাথে সোসাইটির চলমান সভ্যতার সাথে তোমাদের আন্ত রিকতা। কিন্তু এর বিপরীতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতাও দেখ। নির্বোধ পশুও তো এতটা বিশ্বাসঘাতক হয় না। দীর্ঘ তেইশ বছরের একটানা সফরে ক্লান্ত পথিক যিনি তাঁর জীবনের সকল সহায়-সম্বল এ পথেই বিলিয়েছেন। অবশেষে বিদায় বেলা যেতে যেতেও মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছেন এই উম্মতের তরেই। বলেছেন- প্রথমে জেনে আস, আমি চলে যাওয়ার পর আমার উম্মতের সাথে কী আচরণ করা হবে।

শেষ মুহূর্তের ইতিবৃত্ত

যখন তিনি জান্নাতুল বাকী থেকে ফিরে আসেন তখন শুরু হয় তাঁর মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। সে ব্যথা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অবশেষে জ্বরে রূপ নেয়। তিনি তখন যার ঘরেই অবস্থান করতেন, জিজ্ঞেস করতেন- আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকবো? সম্মানিত জীবন-সঙ্গিনীগণ অনুমান করতে পারেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত মা আয়েশার ঘরে অবস্থান করতে চাচ্ছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মা যায়নাব কিংবা মা হাফসার ঘরে ছিলেন। তখনই সকলে মিলে পরামর্শ করে জানালেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সকলে আনন্দচিত্তে অনুমতি দিচ্ছি আপনি আপনার জীবনের অবশিষ্ট সময়গুলো আয়েশার ঘরেই থাকবেন। এ কথা শোনার পর সকলের প্রতি শুকরিয়া জানালেন। বললেন, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণ

করুন। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এক চুল পরিমাণও ইনসাফ থেকে সরে দাঁড়াননি। অতঃপর হযরত আয়েশার ঘরে চলে যান।

শেষ ভাষণ শেষ উপদেশ

তারপর হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা.)কে ডাকেন। তাঁদের কাঁধে ভর করে মসজিদে আগমন করেন। মসজিদের মিম্বরে উপবেশন করেন। অতঃপর সমবেত সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের মাঝে দীর্ঘ দিন কাটিয়েছি। হতে পারে এই সময়ে আমি কথায় ও কাজে কারও প্রতি অবিচার করেছি। আমি উপস্থিত আছি। যদি কারও প্রতি অবিচার করে থাকি তাহলে সে যেন তার প্রতিশোধ নেয়। কি যে ভালোবাসা ছিল হৃদয়ে! বিদায় বেলায়ও সেই একই ভাবনা।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মস্তক মুবারক আমার বুকের উপর রাখা ছিল। তিনি সোজা হয়ে শোয়া ছিলেন। হযরত জিবরাইল (আ.)কে বললেন, আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করে এসো, আমি চলে যাওয়ার পর আমার উম্মতের সাথে কি আচরণ করা হবে? তখন উত্তর এলো, আপনি চলে যাওয়ার পর আপনার উম্মতকে আমি একা ছাড়বো না। আমি তাদের সঙ্গে থাকবো। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلْاٰنَ قَرَّتْ عَيْنِىْ...

এখন আমার চোখ ঠাণ্ডা হলো।

আজরাইল! এখন তুমি তোমার কাজ কর। অতঃপর পাঠ করলেন–

اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقُ الْاَعْلٰى

এই আওয়াজ শোনার সাথে সাথেই হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে ছেড়ে গেছেন। ঠিক সেই সময়ও হযরত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেদনা ছিল এই উম্মতকে নিয়েই। তখনও তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল–

اَلصَّلٰوةُ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ...

হে উম্মতী! নামায ছেড়ো না।

অতঃপর আজ আমাদের মাঝে এমন কত নারী আছেন যারা নামায পড়েন না। পুরুষদের মধ্যেও তো এই সংখ্যা কম নয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ উপদেশে অধীনস্থদের প্রতি ভালো আচরণের কথা বলেছেন। অধীনস্থ কর্মচারী চাকর-বাকর কারও প্রতি অবিচার করতে নিষেধ করেছেন। তারা যদি তাদের কাজকর্মে দায়িত্ব পালনে কোনরূপ ত্রুটি করে তো তাদেরকে গালি-গালাজ করতে তাদের প্রতি সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন– তোমাদের প্রতি আমার সর্বশেষ উপদেশ হলো নামাযের প্রতি যত্নবান থাকবে এবং অধীনস্থদের প্রতি অবিচার করবে না। অথচ আজকে আমরা আমাদের সমাজের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখবো, ঘরে বাজারে অফিসে অধীনস্থদের প্রতি কি জুলুমই না করা হয়! তাছাড়া মসজিদে যখন আযান হয় তখন কয়জন পুরুষ মসজিদে যায়, কয়জন নারী ওঠে গিয়ে জায়নামাযে দাঁড়ায়? আমাদের প্রতি আমাদের নবীর মমতাকে দেখুন, আর দেখুন তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা! সেই মহান সত্তা যাঁর রূহ কবজ করার সময় হযরত আজরাইল (আ.) পর্যন্ত কেঁদে ফেলেছিলেন। আমি কয়েক মাস আগে একটি হাদীসে পড়েছি, হযরত জিবরাইল (আ.) যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহ বের করেন তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আজরাইল (আ.) বলেন, হায় মুহাম্মদ! আসমানে যাচ্ছো, আর তখনও ক্রন্দনরত অবস্থায় যাচ্ছো!

আর কতকাল দুশমনের আনুগত্য

এ কত বড় জুলুম! সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠে দেখুন, চার বছরের শিশুরা গলায় টাই ঝুলিয়ে প্যান্ট-শার্ট পরে স্কুলে যাচ্ছে। এদের মা-বাবা কত বড় জালেম! যারা তাদের এই স্বচ্ছ-হৃদয় সন্তানদেরকে শত্রুদের

রূপে গড়ে তুলছে। ওরা তো আল্লাহর দুশমন। আল্লাহর নবীর দুশমন। আপনার দুশমন। আজো তাদের হাতে রয়েছে দু'ধারী খঞ্জর। আপনার বংশধরদের শাহরগ কেটে দিতে তাদের হাত একটুও কাঁপবে না। তারা আমাদের প্রতি শত অবিচার করার পরও তাদের হৃদয়ে একবিন্দু অনুগ্রহ জাগে না। অথচ আমরা অনুসরণ করছি তাদেরই পথের, তাদেরই পোশাকের, তাদেরই জীবন সভ্যতার। একটি কুকুরও তো এতটা বিশ্বাসঘাতকতা করে না। সে এক টুকরো রুটি খেয়ে আজীবন তার মালিকের পাহারাদারী করে যায়। ভাববার বিষয়, আমরা আজ কোন ধরনের সমাজ-সভ্যতাকে কিনে এনেছি। কোন পথকে আমরা ভালোবেসেছি। এই নিষ্পাপ শিশুটির কি দোষ ছিল? কি দোষে আজ এই শিশুটি কাফেরদের পোশাক পরিহিত? সে যখন কাল বড় হবে তখন কি আর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের উপর ওঠে দাঁড়াবে? এ কেমন অন্ধকার নগরী? মা-বাবা ছেলের পেছনে লেগেছে। দাড়ি কামাও। বলুন, এটা কি কোন আকৃতি হলো? এই জালেম যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, যখন আল্লাহর রাসূলের মুখোমুখি হবে তখন কি জবাব দিবে? এই মা-বাবা কি উত্তর দিবে তখন? তুমি কি জান না, এই উম্মতের সকলেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছেলে ও কন্যাসম? তিনি যদি পরকালে জিজ্ঞেস করেন, পুত্র! কেন তুমি আমার সুন্নতকে ভালোবাসতে পারোনি? আমার পথ তোমার কাছে কেন ভালো লাগেনি? আমি তো তোমাদের জন্যে কত যন্ত্রণা সয়েছি। যে দুশমনরা তোমাদের বংশধারাকে নিশ্চিহ্ন করতে সচেষ্ট ছিল তোমরা তাদেরই পথে চলেছো। আমার কথা একবারও স্মরণ হয়নি? তখন কি জবাব দিবে? সেখানে তো পালাবার কোন জায়গায়ও থাকবে না। মরবারও উপায় থাকবে না। বড়ই ভাবনার বিষয়।

পর্দার নির্দেশ ও এক সাহাবিয়্যাহ

রাতের বেলা নির্দেশ এলো পর্দা কর। এই নির্দেশ কেউ পেল, কেউ পেল না। আলিফ লাম থেকে শুরু করে সূরা নাস পর্যন্ত হাজারবার পড়।

হযরত মারিয়াম ব্যতীত আর কোন নারীর নাম নেই। হযরত মারিয়াম (আ.)-এর নামও এই কারণে প্রকাশ করেছেন, আল্লাহ তাআলার প্রতি একটা মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে। মানুষ হযরত ঈসা (আ.)কে আল্লাহর পুত্র বলে বসেছিল। তখনই আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন, হে বেকুবের দল! ঈসা আমার পুত্র নয়, মারিয়ামের পুত্র। মূলত এই অভিযোগ খণ্ডনের জন্যই হযরত মারিয়ামের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি তাঁর মায়ের নামও উল্লেখ করা হয়নি। নেক বদ কোন রকমের নারীর নামই উল্লেখ করা হয়নি। এটা পাক কুরআনের উপস্থাপন ভঙ্গি। কোন নারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। যেখানেই উল্লেখ করা হয়েছে স্বামীকে যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরাউনের স্ত্রী, নূহ (আ.)-এর স্ত্রী, লূত (আ.)-এর স্ত্রী, ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী। কারও নাম নেই। খাদিজা, হাফসা, আয়েশা, সারা, জুলাইখা কারও নামই নেই। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, তার কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা বিনা প্রয়োজনে মেয়েদের নাম নেয়াটাও পছন্দ করেন না। তাই মেয়েদের নামটাও গোপন করার বিষয়। সুতরাং মেয়েদের মুখ দেখাবার অনুমতির কথা কি কল্পনা করা যায়? আল্লাহ তাআলা যেখানে তাদের নামকে পর্যন্ত গোপন রাখতে শিখিয়েছেন সেখানে চেহারা প্রদর্শন করার অনুমতি কিভাবে দিবেন? তবে প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেননি, বলেছেন পর্দা করে যেতে।

আল-কুরআনে লজ্জা প্রসঙ্গ

হযরত মুসা (আ.) যখন মাদায়েন শহরে পৌঁছলেন তখন দেখলেন, একটি কূপের ধারে ছাগলকে পানি পান করানো হচ্ছে।

وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ

তাদের পেছনে ছিল দুইজন নারী। [কাসাস : ২৩]

مَا خَطْبُكُمَا

(মুসা (আ.) বললেন,) তোমাদের কি ব্যাপার!

[কাসাস : ২৩]

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে পানি পান করাচ্ছ না কেন?

তারা বললো–

لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ

> আমরা আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ অন্য রাখালরা তাদের জানোয়ারগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আর আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। [কাসাস : ২৩]

এ কথা শোনার পর হযরত মুসা (আ.) বললেন, আমি তোমাদের ছাগলগুলোকে পানি পান করিয়ে দিচ্ছি। অতঃপর তিনি অগ্রসর হন। মানুষের ভীড় ঠেলে কূপের ধারে চলে যান। যে বালতিটি দশজনে টেনে তুলতো হযরত মুসা (আ.) একাই তা অনায়াসে তুলে আনেন এবং ছাগলগুলোকে পানি পান করিয়ে দেন। তারপর ছায়ায় গিয়ে বিশ্রাম করতে বসেন এবং বলেন–

رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ...

> হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার কাঙাল। [কাসাস : ২৪]

উভয় বোন ঘরে ফিরে যায়। তাদের বৃদ্ধ বাবা জিজ্ঞেস করে, আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কি করে? তারা বলে, আব্বা! আজ এক ব্যক্তি আমাদের ছাগলগুলোকে পানি পান করিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়জন বলে ওঠে– তাকে কিছু প্রতিদান দেয়া উচিত। বাবা বলেন– যাও, তাকে নিয়ে আসো। তাকে গিয়ে বলো, আমাদের বাবা তোমাকে তোমার পরিশ্রমের কিছু বিনিময় দিতে চাচ্ছেন।

এক বোন হযরত মুসা (আ.)কে ডাকতে আসে। এখানে এই গল্প শোনাবার কি প্রয়োজন? প্রয়োজন এটাই, কুরআনে কারীম সবকিছুই সংক্ষেপে বলে। হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক ছাগলকে পানি পান করানো, গাছের নিচে বিশ্রাম নেয়া, এক বোনের তাঁকে ডাকতে আসা, অতঃপর তার সাথে হযরত মুসা (আ.)-এর গমন– এসব গল্প এখানে কেন শোনানো হয়েছে? মূলত এর উদ্দেশ্য হলো– নারী জাতির সামনে একটি

বিধান আলোচনা করা। ইসলামী জীবনের একটি দিক তুলে ধরাই এর লক্ষ্য। ইসলামে এমন কঠোরতা নেই যে, একা নারী তার ঘর থেকে বেরই হতে পারবে না। তবে অবশ্যই সেই বের হওয়ার স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে। ইরশাদ হয়েছে—

فَجَاءَتْهُ اَحَدُ هُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ

তখন নারীদের একজন লজ্জাজড়িত চরণে তাঁর কাছে এসে হাজির হলো। [কাসাস : ২৫]

এই গল্প আল্লাহ তাআলাই শুনিয়েছেন। শুনিয়েছেন একজন কন্যা হযরত মুসা (আ.)কে ডাকতে এসেছে। কিন্তু সেখানে এই ঘটনাটি বলতে গিয়ে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই তিনটি শব্দের দ্বারা তার চলনভঙ্গিটি স্থির করা হয়েছে। স্থির করা হয়েছে তার চলন-চরণ লজ্জাজড়িত। যারা আরবী ভাষাতত্ত্বের খোঁজ-খবর রাখেন তারা বুঝবেন এই আয়াতে সেই নারীর চলনকে বাহনের চলনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বাহন যেমন তার মালিকের অনুগত হয়ে বাধ্যগতের মতো ধীর কদমে অগ্রসর হয় তদ্রূপ এ কন্যাও লজ্জার অনুগত হয়ে পথ চলছিল ধীর কদমে। মূলত আয়াতের এই বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে এ শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন। শিক্ষা দিতে চেয়েছেন লজ্জা কাকে বলে, এই মেয়েকে দেখে শিখ। সে এমনভাবে চলছে যেন লজ্জার কাপড় জড়িয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত লজ্জাবৃত হয়ে ধীর কদমে পথ চলছে।

সেই সাথে হযরত মুসা (আ.)-এর লজ্জার কথাও আলোচনা করেছেন। সেই লজ্জার কথা স্থান পেয়েছে হাদীস ও ইতিহাসে। আর নারীর লজ্জার কথা স্থান পেয়েছে পাক কুরআনে। কারণ, পুরুষের চাইতে নারীর জন্যই লজ্জা অধিক প্রয়োজনীয়। সে মুসা (আ.)-এর কাছে এসে বলেছে—

اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوكَ...لِيَجْزِيَكَ اَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا

আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করছেন আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাবার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য। [কাসাস : ২৫]

এ কথা বলে মেয়েটি যখন বাড়ির দিকে চলতে শুরু করে তখন হযরত মুসা (আ.) তাকে বলেন, তুমি আমার পেছনে আস। পেছন থেকে আমাকে পথ বলে দাও। পবিত্র নবী নিষ্পাপ নবী তাঁর চোখের উপর ভরসা করেননি। অথচ তিনি কালীমুল্লাহ। আমাদের মতো নামাযী মানুষ নন। আমরা হলে হয়তো মনের পর্দার কথা বলতাম। বলতাম, মনের মধ্যে পূর্ব থেকেই পর্দা আছে। বলি, পর্দা তো মনের নয়। পর্দা তো হয় চেহারার।

মূলত আমাদের সফলতার মাপকাঠি হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। নারী যতই নিজেকে আবৃত রাখে আল্লাহ তাআলা ততই তাকে পছন্দ করেন। আমরা তো আমাদের অতীত ভুলে গেছি। আমরা যে সবেমাত্র অপমানের সিঁড়িতে পা রেখেছি তা নয়। আমরা দুইশ' বছর অপমানের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। দুই ঘন্টায় দুইশ' বছরের কাহিনী শোনাবো কিভাবে। কিভাবে আমরা ধীরে ধীরে পথহারা হয়েছি। কিভাবে আমরা দূরে সরে পড়েছি আমাদের মনযিল থেকে। কিভাবে আমরা সুতো ছিন্ন ঘুড়ির মতো শেকড় ছিন্ন হয়ে পড়েছি সে কাহিনী অনেক দীর্ঘ। কিভাবে অপশক্তি আমাদেরকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, কিভাবে আমরা পথহারা মুসাফিরের মতো উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর আমরা পথহারা পথে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় চলতে থাকি। আমরা এক জায়গায় সুখ রেখে সুখ খুঁজতে থাকি অন্য জায়গায়।

আল্লাহ তাআলা নারীদের জন্যে মর্যাদা রেখেছেন কুরআনে। তাদের সম্মান দিয়েছেন, লজ্জা দিয়েছেন। এর পূর্বে তো নারীকে কেউ জিজ্ঞেসও করতো না। ইহুদীদের কাছে নারী ছিলো এক ডাইয়িং জাতি। কাফের সম্প্রদায় নারীকে জানোয়ার জ্ঞান করতো। খৃষ্টানরা মনে করতো, নারী হলো যৌন চাহিদা পূরণের ক্ষেত্র মাত্র। তারপর এলো ইসলাম। ইসলাম এসে নারীদের সম্পর্কে এক বিস্ময়কর ঘোষণা দিল। বললো–

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান।

[নিসা : ১৭৬]

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা নারীকে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রেও কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। ছেলের জন্যে দুই অংশ, আর মেয়ের জন্যে এক অংশ। ছেলের জন্যে দুই টাকা, মেয়ের জন্য এক টাকা। কিন্তু এখানে ছেলের অংশ চিহ্নিত করার জন্যে মেয়ের অংশকে ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অথচ সাধারণ বিচারে পুরুষের মর্যাদা নারীর চাইতে বেশি। সেই হিসেবে কথাটা হওয়া উচিত ছিল এমন–

لِلْأُنْثَى مِثْلُ نِصْفِ حَظِّ الذَّكَرِ

'মেয়ের জন্য পুরুষের অংশের অর্ধেক।'

এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, নারীদের প্রতি আল্লাহ তাআলা কতটা করুণাপরায়ণ। এখানে তিনি প্রথমে নারী অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছেন। কারণ, সমাজে নারীদেরকে তাদের অধিকার দেয়া হয় না। মনে করা হয়, বিয়েতে তোমাকে 'জাহিয' হিসেবে যা দেয়া হয়েছে ওটাই তোমার পাওনা। আমাদের জমিদারীতে মেয়েদের কোন অধিকার নেই। আমাদের সমাজে মেয়েদেরকে তাদের পাওনা অধিকার দেয়ার উপমা খুবই বিরল। আমার বাবা যখন আমার বোনদেরকে তাদের পাওনা অধিকার বণ্টন করে দেন তখন আমাদের অঞ্চলে এই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। আমার বাবাকে কেউ কেউ আক্ষেপের সাথে এ কথাও বলেছেন, আপনি এ কি বিপদের কাণ্ড ঘটালেন। এখন তো আমাদের মেয়েরাও তাদের পাওনা দাবী করে বসবে।

কিন্তু এখানে আল্লাহ তাআলার বাচনভঙ্গি দেখুন। প্রথমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারপর তার সাথে তুলনা করে পুরুষের অধিকার উল্লেখ করেছেন। এটা ঠিক, অনেক অধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষরা নারীদের চাইতে অগ্রণী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ

পুরুষ নারীর কর্তা। [নিসা : ৩৪]

সেই হিসেবে পুরুষের মর্যাদা অবশ্যই নারীর চাইতে বেশি। তাই নারী পুরুষের অধীনস্থ। তবে সেই অধীনস্থতা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবাধ্যতায় নয়।

ইসলামে যেভাবে পুরুষের অধিকার রয়েছে তেমনি অধিকার রয়েছে নারীরও। কিন্তু সম্পদের অধিকার বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা প্রথমে নারীর অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ...

> নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। [বাকারা : ২২৮]

এখানে কথাটা তো এমন হওয়ার কথা ছিল– পুরুষদের নারীদের উপর অধিকার রয়েছে, যেমনটি তোমাদের রয়েছে পুরুষদের উপর। কিন্তু এখানে নারীদের অধিকারের কথা প্রথমে বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে পুরুষের অধিকারের কথা। আল্লাহ তাআলা এভাবেই নারীর অধিকারকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে পাক কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তারপরও কি আমাদের নারীরা আল্লাহর কথা মানবে না? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথে চলবে না? বেপর্দাকে তাদের জীবন থেকে তাড়াবে না? তারা অপচয় মুক্ত জীবন গঠন করবে না?

কথা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। যখন বেহেশতে যাওয়ার পালা আসবে, সেখানেও কিন্তু নারীরাই আগে যাবে। পুরুষরা যাবে তাদের পরে। অবশ্য এই আগে যাওয়াটা মর্যাদার কারণে নয়। নবীদের চাইতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ তো আর কেউ হতে পারে না। অথচ নবীদের জীবন-সঙ্গিনীরাও তাঁদের আগে বেহেশতে যাবেন। আগে যাবেন এই জন্যে যেন বেহেশতের সৌন্দর্য, বেহেশতের রূপ ও অলংকারে সুশোভিত ও সুসজ্জিত হয়ে স্বামীদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে পারে। বেহেশতে প্রবেশের পর বেহেশতের রূপ-সৌন্দর্য মেখে দুনিয়ার নারীগণ বেহেশতি হুরদের চাইতে সত্তরগুণ বেশি সুন্দরী ও রূপসী হয়ে উঠবে।

একজন কালো নারী এবং কালো পুরুষ যখন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ করবে তখন বেহেশতের রূপ-সৌন্দর্য মেখে সেই কৃষ্ণ-কালো নারী ও পুরুষ এতটা বিভামণ্ডিত হয়ে উঠবে যে, হাজার বছরের দূরত্বে দাঁড়িয়েও তাদের চেহারার নূরকে দেখতে পাবে।

وَاَنَّ بِيَاضَ الْاَسْوَدِ يُرٰى مِنْ مَسَافَةِ اَلْفِ عَامٍ...

এ হলো সেই নারীর রূপ ও বিভা। পার্থিব জগতে যার আকারে কোন সৌন্দর্য ছিল না, বর্ণে ছিল না কোন রূপ।

সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর তাঁর সাথে বেহেশতে প্রবেশ করবেন মুসলমানদের মধ্যে অসহায় গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তিগণ। ধনী মুসলমানগণ গরীব মুসলমানদের পরে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। সবার আগে বেহেশতে প্রবেশ করবেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর সঙ্গে থাকবেন হযরত বেলাল (রা.)। পেছনে থাকবেন হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত আবি উবায়দা ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। এই কাফেলার পর বেহেশতে প্রবেশ করবেন গরীব মুসলমানগণ। সকলেই নিজ নিজ বাহনের উপর উপবিষ্ট হবে। সকলেই নিজ নিজ বেহেশতের দিকে এগিয়ে যাবে। বেহেশতের দরোজায় বেহেশতের সেবক দল তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। আরেকটু অগ্রসর হলে অভ্যর্থনা জানাবে বেহেশতের হুরগণ। অতঃপর যখন বেহেশতের দরোজায় গিয়ে পৌছবে তখন অভ্যর্থনা জানাবে ঈমানদার বিবিগণ। তারা তাদের স্বামীদের হাতে হাত রেখে বলবে–

اَنْتَ تُحِبُّنِىْ اَنَا اُحِبُّكَ

আমি তোমার প্রিয়তমা, তুমিও আমার প্রিয়তমা!

اَنَا الْخَالِدَةُ فَلَا اَمُوْتُ...

এখন থেকে আমি আর কখনও মৃত্যুবরণ করবো না।

اَنَا النَّاعِمُ فَلَا اَبْعَثُ...

আমি আর কখনও বুড়ি হবো না।

اَنَا الْمُقِيْمُ فَلَا اَرْحَلُ...

আমি আর কখনও তোমাকে ছেড়ে যাবো না।

أَنَا رَاضِيٌ فَلَا أَسْخَطُ...

আমি আর কখনও তোমার সাথে ঝগড়া করবো না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

এই যে আমরা স্ত্রী-সন্তান রেখে আল্লাহর পথে বেরিয়ে যাই এটা এই কারণে নয় যে, আমরা পাগল। এই কারণে নয় যে, আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি আমাদের কোন আগ্রহ ও ভালোবাসা নেই। বরং আমরা এই কারণে তাদেরকে রেখে আল্লাহর পথে বেরিয়ে যাই যেন আমরা বেহেশতে গিয়ে একত্রিত হতে পারি। যার পর আর কখনও আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটবে না।

একটি মজার ঘটনা

আমরা একবার হজ্বে গেলাম। হেঁটে হেঁটে মুজদালিফায় যাচ্ছি। আমরা পথের পাড়ে এক জায়গায় বসে পড়লাম। মিনায় প্রবেশ করার জন্যে লোকজন আসছে। এক বুড়ো ও এক বুড়ি আমাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। বুড়ি এসেই বসে পড়লো। বুড়ো দাঁড়ানো। তারা ছিল আমাদেরই অঞ্চলের। তাই বুড়ো বুড়িকে বলতে লাগলো– ওঠ! এখনও পুরো পথই বাকি। বুড়ি বলতে লাগলো আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর চলতে পারছি না। বুড়ো বললো, ভীড় বেড়ে যাবে। শয়তানকে কংকর মারতে হবে। তখন পারা যাবে না। কাজটা এখনই সেরে নিই। বুড়ি বললো, আল্লাহর বান্দা! আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি চলতে পারছি না। বুড়ো মিয়া একটু রেগে গেল। খানিকটা শক্তভাষায়ই বললো, ওঠ! বুড়ি বললো, আমি উঠতে পারবো না। তোমার যা খুশি কর। বুড়ো বললো, এটা শ্বশুর বাড়ি নয়। যা খুশি তাই করবে।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এই বুড়ো-বুড়ি হজ করতে এসেছে। আল্লাহর ভালোবাসাই তাদেরকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। তারা ইহরামের কাপড় পরে আছে। ইহরামের কাপড় পরে তো অন্যের সাথেও ঝগড়া

করা যায় না। আর এরা ঝগড়া করছে স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু বেহেশত এমন স্থান যেখানে গিয়ে এই স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াও থাকবে না।

অনন্ত সুখের ঠিকানা

স্বামী-স্ত্রী বেহেশতে গিয়ে এক সাথে উপবেশন করবে। তাদের মাথার উপর ছেয়ে থাকবে নানা রকমের গাছ-গাছালি। তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। গাছে ঝুলে থাকবে বিচিত্র ফল। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবে পাখি। পাশ দিয়ে বয়ে চলবে পানির ঝরনা। মৃদু বেগে ঝির ঝির করে বইবে বাতাস। বিশ্রুত হবে অপূর্ব সঙ্গীত। সেখানে থাকবে সারি সারি ফিরিশতা ও সেবক দল। সেখানে নেয়ামতের কোন সীমা থাকবে না। যখন তারা সুখ-ভোগের নেশায় চূড়ান্ত মাত্রায় উত্তীর্ণ হবে তখন ফিরিশতাগণ এসে বলবে–

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ

সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সম্ভাষণ। [ইয়াসিন : ৫৮]

এই হলো বেহেশতের শান। এই হলো বেহেশতির মর্যাদা। এখানে এসে দেখবে কাল যে ঘরের চাকরাণী ছিল আজ এখানে তার মর্যাদার অন্ত নেই। কাল যে পথে ফেরি করে ফল বিক্রি করতো আজ বেহেশতে তার আলীশান অট্টালিকা। আজ বেহেশতে এসে সে সালাম পাচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। পাচ্ছে সাদর-সম্ভাষণ। অতঃপর আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন– হে আমার বান্দা ও বান্দীগণ! তোমরা কি সন্তুষ্ট আছো? সকলেই আরয করবে, হে আল্লাহ! আমরা তো এখানে সবকিছুই পেয়েছি। তারপরও সন্তুষ্ট হবো না কেন? আমরা যা পেয়েছি তার চাইতে উত্তম তো আর কিছু আছে বলে আমাদের জানা নেই। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন– যাও, আজ থেকে আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। আর কখনও তোমাদের প্রতি নারাজ হবো না।

আমাদের এই তাবলীগ জামাত মূলত মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে পৃথিবীব্যাপী ঘুরে ঘুরে এই বেহেশতের কথাই বলে। মানুষের সামনে

পূর্ণ যত্ন ও দরদের সাথে এই বেহেশতের পথই তুলে ধরে। আমাদের পয়গাম একটাই, মনগড়া পথকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর পথ ধর। আল্লাহ যা করতে বলেছেন তাই কর। আর আল্লাহ যা ছাড়তে বলেছেন তা ছেড়ে দাও। কারণ, যদি আল্লাহর দেয়া পথে তোমরা উঠে আসতে না পার তাহলে কিয়ামতের দিন সকলকেই আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের মুখোমুখি হতে হবে। সেদিন পালাবার কোন পথ থাকবে না।

ফেরাউনের ঘরে ঈমান

আমরা ফেরাউনের নাম সকলেই শুনেছি। সে ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অহংকারী শাসক। সে নিজেকে খোদা দাবী করেছিল। তাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ ছিল না। সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী জালেম শাসকের ঘরেরই দুটি কাহিনী শুনাচ্ছি। তার ঘরেই এক দাসী ছিল। ফেরাউন ঈমান না আনলেও ঈমান এনেছিল সেই দাসী। তার ছিল ছোট ছোট দুটি কন্যা। একজন তো দুগ্ধপায়ী শিশু। ফেরাউন তাকে ডেকে সতর্ক করে দেয়– যদি তুমি মুসার রবের ধর্ম ত্যাগ না কর তাহলে তোমাকে ও তোমার এই দুই কন্যাকে ফুটন্ত তেলে পুড়িয়ে মারবো। বিশ্বাসী দাসী ফেরাউনের কথায় মোটেও শংকিত হয়নি। সে তার ঈমানে অটল। অবশেষে তার চোখের সামনে বিশাল পাত্রে তেল গরম করা হয় এবং ফুটন্ত তেলের মাঝে একজন একজন করে তার নাড়ী ছেঁড়া ধন কন্যাদ্বয়কে ছুঁড়ে মারা হয়। মা তো মা-ই। মা আঁৎকে ওঠে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। কিন্তু শিশু কন্যা মাকে বিস্ময়করভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বলে– মা! ধৈর্য ধর! বেহেশতে সাক্ষাত হবে। এই ঘটনা আমরা ইতোপূর্বে শুনেছি। এও শুনেছি, মিরাজের রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে যখন ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে যাত্রা করেন তখন অপূর্ব এক সুবাসে আমোদিত হয়ে ওঠে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মন-প্রাণ। হযরত জিবরাইলকে জিজ্ঞাসা করেন– জিবরাইল! এ কিসের সুবাস? জিবরাইল বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফেরাউনের সেই ঈমানদার দাসী ও তার দুই কন্যার পুড়া হাড়গুলো এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এই সুগন্ধি সেই হাড় থেকে উৎসারিত।

ফেরাউনের দাসীর এই অবিচলিত বিশ্বাস দেখে ফেরাউনের স্ত্রীও মুসলমান হয়ে যায়। সে বলে,. পৃথিবীর কোন মা এমন জালেম হতে পারে না। নিশ্চয়ই এ কাণ্ড যিনি ঘটিয়েছেন তিনিই সত্য। যে ফেরাউন তাকে অস্বীকার করার কারণে অন্যদেরকে শাস্তি দিচ্ছিল আল্লাহর কি লীলা! অবশেষে তার ঘরেই ঈমান প্রবেশ করলো। তার সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী হলো মুসলমান। পরিষ্কার ঘোষণা করে দিল–

امَنَّا بِرَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسٰى

হারুন ও মুসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম।

ফেরাউন বললো, এর ফল তো এইমাত্র দেখলে! তুমি আবার এ কী করে বসলে? বললো, আমি যা করেছি বুঝেশুনেই করেছি। নিশ্চয়ই এই দীন সত্য। অন্যথায় কোন মা এমন কাণ্ড করতে পারে না। তার প্রতি ফেরাউনের ভালোবাসা ছিল ভীষণ। এই স্ত্রীর অনুরোধেই একদা ফেরাউন হযরত মুসা (আ.)কে ছেড়ে দিয়েছিল। তাই তাকে খুব বুঝালো। কিন্তু সে ফেরাউনের কোন কথাই মানলো না। অবশেষে জেলে পুরে দিলো। জেলখানায় গিয়ে সম্মুখীন হলো অনাহারসহ নানা কষ্টের। তারপর ডেকে আনা হলো দরবারে। এই সেই দরবার যেখানে একদা আছিয়ার রাজত্ব চলতো। সেই আছিয়াই আজ এই দরবারের আসামী। তার হাত-পা বাঁধা। আছিয়া স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলো– যত খুশি মার, বেত্রাঘাত কর আমি আমার বিশ্বাস থেকে এক চুলও নড়ছি না। এক জল্লাদ তাকে বেত্রাঘাত করতে লাগলো এবং তার কোমর থেকে রক্তের নদী প্রবাহিত হতে লাগলো। সেই রক্তে পা ভেসে যাচ্ছিল। আর আছিয়া বলছিল–

فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ

সুতরাং তুমি কর যা তুমি করতে চাও। [ত্বহা : ৭২]

স্পষ্ট ঘোষণা। তুমি যা খুশি কর, কিন্তু আমি আল্লাহর বিধান ছাড়ছি না। আমি যে রঙ ধারণ করেছি জীবন ছাড়বো সে রঙ ছাড়বো না। জীবন দেবো পর্দা দেবো না।

ফেরাউন যখন দেখলো এখানে সব কৌশলই ব্যর্থ তখন বললো, একে শূলিতে চড়িয়ে দাও। সেকালের শূলি কেমন ছিল? হাতে পায়ে পেরেক মেরে কাঠের পাটাতনের সাথে লেপ্টে দেয়া হতো। অতঃপর এভাবেই রেখে দেয়া হতো। যখন হযরত আছিয়ার উভয় হাতে পেরেক মারা হলো- সেই হাতে যে হাতে কখনও কোন তৃণ-লতা পর্যন্ত পড়েনি। তারপর ফেরাউন নির্দেশ দিল, একে মাটিতে বিছিয়ে দাও এবং তার উপর একটি পাথর রেখে দাও। যে পাথরের নিচে চাপা পড়ে সে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করবে। তখন হযরত আছিয়া (রা.) চিৎকার করে উঠলো এবং এমন এক বাণী শোনালো যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার ইতিহাসে সোনার হরফে লিখিত থাকবে। সেই বাণী হাদীসেও সংরক্ষিত হয়েছে, সংরক্ষিত হয়েছে কুরআনেও। হযরত আছিয়া (রা.) বলেছিল-

رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ...

হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করো এবং আমাকে উদ্ধার করো ফেরাউন ও তার দুস্কৃতি থেকে। আর আমাকে উদ্ধার করো জালেম সম্প্রদায় থেকে। [তাহরীম : ১১]

তাঁর হৃদয়ের দরদপূর্ণ সে আবেদন আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন এবং স্বীয় সন্নিধানে তাঁকে ঘরও দান করেছেন। আমাদের নবীর জন্যে বেহেশতে একটি নির্ধারিত স্থান রয়েছে। যার নাম হলো 'মাকামে মাহমুদ'। এই স্থানটি আরশের সাথে একেবারে লাগোয়া। এখানে যে আসবে সে আল্লাহর একেবারে নৈকট্যপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে।

যখন হযরত খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করেন তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- খাদিজা! তুমি যখন বেহেশতে যাবে তখন তোমার সতীনকে আমার সালাম জানাবে। হযরত খাদিজা (রা.) চমকে উঠলেন। বললেন, আমার সতীন! আমিই তো আপনার প্রথম স্ত্রী। ইরশাদ করেন- না! বেহেশতে ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়ার সাথে আল্লাহ তাআলা আমাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া

হযরত ঈসা (আ.)-এর জননী মারিয়ামের সাথেও আল্লাহ তাআলা আমার বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন।

বোনেরা আমার!

এসব সম্মানিত নারীদের সাথে হাশর লাভের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ কর। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা কর যেন এই ভাগ্যবতী নারীদের সাথেই তোমাদের হাশর হয়। বড়ই ব্যথা হয়, আজ আমরা কাদের পেছনে ছুটেছি? আমরা যাদের পেছনে ছুটেছি তাদের জীবন তো হলো গান-বাজনা আর নাচানাচি।

বাংলাদেশ সফরের একটি ঘটনা

আমি বাংলাদেশ থেকে ফিরছিলাম। পথে আমার পাশে সিট পড়লো গৌর বর্ণের এক ব্যক্তির। ঘণ্টা খানিক আমি তার সাথে কোন কথাই বলিনি। ভেবেছি, ইংরেজি হয়তো আমি ভুলে গেছি। প্রায় পঁচিশ বছর হলো আমি ইংরেজি বলি না। তারপর ভাবলাম, একে দাওয়াত দেয়া দরকার। কিন্তু সাহস যুগাতে পারছিলাম না। এরই মধ্যে আমাদের সামনে খাবার পরিবেশি হলো। এবার আর আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। মনে মনে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাইলাম– হে আল্লাহ! জীবনে তো বহু ইংরেজি বলেছি। তুমি আমাকে সাহায্য কর। তারপর তার সাথে কথা বলতে শুরু করলাম। আল্লাহ তাআলা ধীরে ধীরে ইংরেজি বলাটা আমার জন্যে সহজ করে দিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম– আচ্ছা! এই যে তোমরা সারা জীবন নাচছো, গাইছো, ডিসকো ক্লাবে গিয়ে জুয়া খেলছো এবং একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে তোমাদের জীবন। তোমার হৃদয়কে একবার জিজ্ঞেস করে দেখ তো এই বিশাল পৃথিবীটা কি এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে? আমি তাকে খুব সহজে বললাম, কিছু লোক কোথাও একত্রিত হয়ে নাচবে, গাইবে, পরস্পরে হাত বদল করবে, রাতভর শরাব পান করবে। তারপর বেহুশ হয়ে পড়ে থাকবে। সারা সপ্তাহের উপার্জন এক রাতে এনে ঢেলে দেবে। পরদিন সকাল বেলা ওঠে গাধার মতো আবার উপার্জন শুরু করবে। বলো, এটা কি কোন মানুষের জীবনের চূড়ান্ত

লক্ষ্য হতে পারে? সে আমার প্রশ্ন শোনে চুপ হয়ে গেলো। বললো, এমন প্রশ্ন তো জীবনে আমাকে কেউ করেনি! আমি বললাম, তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও। বলো, এই পৃথিবীতে আমরা কি জন্যে এসেছি? এই তুচ্ছ কাজগুলোর জন্যেই কি আমরা পৃথিবীতে এসেছি? সে একটু ভেবেচিন্তে বললো, না! আমি বললাম, এগুলোই যদি জীবনের টার্গেট হয় তাহলে আমরা তো জানি, টার্গেট অর্জনের পর মানুষের জীবনে একটা সুখ ও স্থিরতা আসে। মানুষ শান্তি ও নিবিড়তা অনুভব করে। তুমি তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস করে দেখ তো। তুমি কি তোমার হৃদয়ে কখনও প্রশান্তি অনুভব করেছো? সে বললো, না। আমি বললাম, তাহলে তো তোমার জীবনের কোথাও একটা শূন্যতা আছে? আমি বললাম, আমরা এমন একটি ইসলাম গ্রহণ করেছি যেখানে আমাদের জীবনের একটি পরিপূর্ণ চিত্র আছে। কিন্তু কি করবো? আমরা তো নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মেরেছি। এ কথা বলে আমি তাকে ইসলাম বুঝাতে শুরু করলাম। আমি তাকে বুঝালাম, ইসলাম একটি পবিত্র ধর্ম। ইসলামের বেশ কিছু সুন্দর দিক তার সামনে তুলে ধরলাম। কথা প্রসঙ্গে আমার মুখ থেকে অলক্ষ্যেই বেরিয়ে এলো ইসলামে মদ পান সম্পূর্ণ হারাম। কারণ, মদ মানুষকে পাগল বানিয়ে ফেলে। সে আশ্চর্য হয়ে বললো, তোমাদের ধর্মে মদ হারাম? আমি বললাম, অবশ্যই। সে আমাকে বললো, আমি তো সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই এবং করাচীতে গিয়েই সবচাইতে ভালো মদ পাই। এ কথা শোনে আমি চুপ হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, এখন তাকে কি বলতে পারি। আমার হৃদয়টা তখন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। মনে হলো, মুসলমানরাই এখন কাফেরদের ইসলাম গ্রহণের পথে বড় বাধা। তবুও আমি তাকে বললাম, আমাদেরকে দেখো না, আমাদের ধর্মের কিতাব পড়। বাস্তব জীবনে আমরা দুর্বল। আমাদের কিতাবের সব কথা আমরা মানতে পারি না। কিন্তু আমাদের ধর্মগ্রন্থ পূর্ণ সত্য তাতে কোন খাদ নেই।

উভয় জাহানের সম্মান

আমাদের এই চলতি জীবনের পরিণতি খুবই ভয়াবহ। বাঁচতে হলে এই জীবন থেকে আমাদেরকে তাওবা করতে হবে। আল্লাহ ও হযরত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যে জীবন দিয়েছেন নারী-পুরুষ সকলে মিলেই সে জীবন অনুসরণ করে চলতে হবে। এ শুধু আমাদের জন্যেই নয়, এ জীবন পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে। তাই শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে তার অনুশীলনই যথেষ্ট নয়। বরং সমগ্র পৃথিবীতে এর দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এই কর্তব্য মুসলমান নারী-পুরুষ সকলেরই।

পৃথিবীতে আদমশুমারির বিচারে পুরুষের চাইতে নারীর সংখ্যা বেশি। তাই পুরুষের তুলনায় নারীর কর্তব্যও বেশি। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তো ইসলামের চার ভাগের একভাগ উম্মতের কাছে পৌঁছাবার দায়িত্ব পালন করেছেন। অবশিষ্ট তিন ভাগ পেয়েছি আমরা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবীর মাধ্যমে। আমাদের চার খলিফার মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কে এবং হযরত আলী (রা.)কে মুসলমান করেছিলেন আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উমরকে মুসলমান করেছিল তাঁর বোন ফাতেমার কুরআন তেলাওয়াত। আর হযরত উসমান (রা.) মুসলমান হয়েছিলেন তাঁর ফুফু সাওদা বিনতে কুরাইজা (রা.)-এর হাতে। সুতরাং চার খলিফার মধ্যে দুইজন মুসলমান হয়েছেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে। অপর দু'জন মুসলমান হয়েছেন নারীর দাওয়াতে। ইসলামে নারীর অবদান তো এই।

১৯৮৮ সালে আমরা কানাডায় যাই। টরেন্টো শহর পৃথিবীর অন্যতম একটি উলঙ্গ সভ্যতার শহর। আমরা সেখানে আট দিন কাজ করি। এতে সত্তরজন নারী বোরকা গ্রহণ করে। কিন্তু বোরকা পরিধান করার অর্থ এই নয়, তারা শুধু পর্দাটাকেই গ্রহণ করেছে। বরং তারা ইতোপূর্বে হাজার হাজার ডলার বেতনে চাকরি করতো। সেই চাকরিও তারা ছেড়ে দিয়েছে। পর্দার দাবীতে ঘরে বসে পড়েছে। অঙ্গীকার করেছে জীবনে আর কখনও আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করবো না।

শিকাগোতে গিয়ে যখন আলোচনা শুরু করলাম তখন মেয়েদের পক্ষ থেকে আমাকে একটি চিরকুট দেয়া হলো। সেই চিরকুটে লেখা ছিল আজ পর্যন্ত আমাদেরকে কেউ জীবনের পথ দেখায়নি। আপনি আমাদের

প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাদেরকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। আজ থেকে তাই হবে যা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল বলেন। আল্লাহ ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বাইরে আমরা কোথাও পা রাখবো না। লসএঞ্জেলেস থেকে আমরা যখন দাওয়াতের কাজ করে বেরিয়ে আসি তখন সেখানকার মেয়েরা আমাদের মেয়েদেরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। আর বলতে থাকে, খোদার দোহাই! আমাদেরকে এখানে রেখে যেয়ো না। আমরা সবেমাত্র আলো দেখতে শুরু করেছি, এখনই যদি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাও তাহলে আমরা আবার অন্ধকারে হারিয়ে যাবো। এ শুধু টরেন্টো, শিকাগো আর লসএঞ্জেলেসের অবস্থাই নয়। এ অবস্থা সমগ্র পৃথিবীর। সুতরাং আল্লাহর দীনের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়া নারী-পুরুষ সকলেরই কর্তব্য। আমাদেরকে কালিমার দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীব্যাপী এমনভাবে ছড়িয়ে পড়তে হবে যেন পৃথিবীতে একজন বোনও বেপর্দায় না থাকে, যেন একজন নারীও সুদী লেনদেনের সাথে জড়িত না থাকে। যেন একজন নারীও বেনামাযী না থাকে। আমাদের সমাজ যেন হয় মানুষের সমাজ। আমাদের সমাজে যেন প্রতিশোধ স্পৃহার স্থানে জায়গা করে নেয় অবাধ অবারিত কল্যাণ কামনা। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন, আমীন। ✿

বয়ান : ৪

মুসলিম নারীর দশটি পুরস্কার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّابَعْدُ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আল্লাহ তাআলা জগতের সকল নারী ও পুরুষের সফলতার জন্যে একটি নির্দিষ্ট বিধান রেখেছেন। দুনিয়া ও পরকালে প্রতিটি নারী ও পুরুষের সফলতা ও ব্যর্থতার বিধান একটিই। এতে কোন অবস্থাতেই কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটবার নয়। আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন–

اِنِّىْ اِذَا اُطِعْتُ رَضِيْتُ

বান্দা যখন আমার আনুগত্য করে তখন আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হই।

وَاِذَا رَضِيْتُ بَارَكْتُ

যখন আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হই তখন বরকত দান করি।

وَلَيْسَ لِبَرَكَتِىْ حَدٌّ

আর আমার বরকতের কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

এটা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসী। মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ণয়ে এ এক অমোঘ বিধান। এখানে আল্লাহ তাআলা এও বলেছেন–

وَاِنِّىْ اِذَا عُصِيْتُ غَضِبْتُ

বান্দা যখন আমার অবাধ্য হয় তখন আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হই।

وَاِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ

আর আমি যখন অসন্তুষ্ট হই তখন অভিশাপ বর্ষণ করি।

وَاَنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّىْ تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ...

আর আমার অভিশাপ ক্রমাগত সাত পুরুষ পর্যন্ত চলতে থাকে।

অর্থাৎ অবাধ্যতা যেমন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে আল্লাহর অভিশাপও।

এর বিপরীতে আরেক সাধনা রয়েছে শয়তানের।

بِمَا اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ

আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে অবশ্যই সুশোভিত করে তুলবো এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করে ছাড়বো। [হিজর : ৩৯]

لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَا ئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ... ...

আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্যে ওঁৎ পেতে বসে থাকবো। অতঃপর আমি তাদের কাছে আসবোই– তাদের সম্মুখ পশ্চাত ডান ও বাম দিক থেকে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে অকৃতজ্ঞ পাবে। [আরাফ : ১৬-১৭]

অর্থাৎ মানব জাতির সফলতার জন্যে আল্লাহ তাআলা একটি পথ স্থির করে দিয়েছেন। সে পথ হলো আল্লাহর আনুগত্যের। এ পথ নারী ও পুরুষ সকলের জন্যই সমান।

এর বিপরীতে রয়েছে শয়তান। শয়তানকে যখন আল্লাহ তাআলা বিতাড়িত করেন তখন সে আল্লাহ্ তাআলার কাছে কিছু অবকাশ প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তাআলা তার প্রার্থনা গ্রহণ করেন। তারপর সে আল্লাহ তাআলার সামনেই শপথ করে বলে– তুমি যখন আমাকে বিতাড়িতই করলে তখন আমি আর কি করবো। আমি তোমার সরল পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকবো এবং তোমার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে সচেষ্ট হবো। অগ্র-পশ্চাত, ডান-বাম সকল দিক থেকে আমি তাদের উপর আক্রমণ করবো। হয়তো বা আমার এই আক্রমণ অতিক্রম করে কেউ কেউ তোমার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তোমার কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তবে অবশিষ্ট সবাই হবে আমার ভক্তজন।

শয়তানের এই আক্রমণের রূপ কেমন হবে? এ কথা ইরশাদ হয়েছে অন্য আয়াতে।

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

তুমি আমাকে বিপথগামী করেছো সেজন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের কাছে পাপকর্মকে অবশ্যই সুসজ্জিত করে তুলবো এবং তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো। [হিজর : ৩৯]

অর্থাৎ তাদের সামনে পার্থিব জীবনকে এতটা সুন্দর ও সুশোভিত করে তুলবো যার ফাঁদে পড়ে তারা তোমার বেহেশতের কথা ভুলে যাবে। সেই সাথে দুনিয়ার বিপদাপদকে তাদের সামনে এতটা বীভৎস করে তুলবো যার ভয়ঙ্কর রূপ কল্পনা করে তারা দোযখের কথা ভুলে যাবে। এভাবেই আমি প্রতিটি মানুষকে তোমার পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বো।

এখন আমাদের সামনে দুটো পথ। একটি আল্লাহর, একটি শয়তানের। একটির নকশা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আল্লাহ, আরেকটির নকশা তুলে ধরেছে শয়তান। মানুষ স্বাধীনভাবে যার যে পথে খুশি চলছে। এখানে আল্লাহ তাআলা কাউকেই পাকড়াও করছেন না। বরং বলে দিয়েছেন—

وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ

আর আমি মানুষকে দুটি পথ দেখিয়েছি। [বালাদ : ১০]

إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে না হয় সে হবে অকৃতজ্ঞ। [দাহর : ৩]

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, আর যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক। [কাহফ : ২৯]

আল্লাহর বড়ত্ব

এই পৃথিবীতে আমরা দেখতেই পাচ্ছি আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, এই স্বাধীনতা কি পরকাল অবধিও এভাবেও বহাল থাকবে? বিষয়টা কি এমন, ভবিষ্যতে আমাদের কৃতকর্মের কোন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না? মারা গেলাম এবং শেষ? আসলে বিষয়টি তা নয়। বরং এই পার্থিব জীবনের বিপরীতে শাস্তি ও পুরস্কারের এক সুনিপুণ ব্যবস্থা রেখেছেন আল্লাহ। যার কিঞ্চিতৎ রূপ এই পৃথিবীতে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃত রূপ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে পরকালে। কারণ, এই বিশ্ব জাহানের সব কিছু তো আল্লাহর শক্তিরই অধীন।

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

সকল শক্তি আল্লাহরই। [বাকারা : ১৬৫]

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

বলো, সকল বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারে। [আলে-ইমরান : ১৫৪]

অর্থাৎ পৃথিবীর সবকিছুর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যেমন আল্লাহর তেমনি তাঁর ক্ষমতার কোন কুল-কিনারাও নেই।

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহরই। [রূম : ৪]

আল্লাহ তাআলা তাঁর ক্ষমতা ও শাসনে এক অদ্বিতীয় লা-শরীক। তাঁর কোন মন্ত্রী নেই, পরামর্শক নেই।

لَيْسَ مَعَهُ إِلَهٌ يُخْشَى

তাঁর সাথে ভয় পাওয়ার মতো কোন প্রতিপক্ষ নেই।

তাছাড়া তাঁর প্রতিপক্ষ এমন কোন প্রভু নেই যার কাছে কেউ কিছু আশা করতে পারে। আর তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার জন্যে এমন কোন

মধ্যস্থতাকারীও নেই যাকে ঘুষ দিয়ে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে হবে। যেমনটি আজকালের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর এমন কোন মন্ত্রীও নেই আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে হলে যার সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। বরং তিনি–

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। [হাদীদ : ৪]

اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনি অপেক্ষাও নিকটতর। [ক্বাফ : ১৬]

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّى فَاِنِّى قَرِيْبٌ

আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই আছি। [বাকারা : ১৮৬]

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ

লোকেরা তোমাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে– বলো, তাদের জন্যে সুব্যবস্থা করাটাই উত্তম। [বাকারা : ২২০]

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

মানুষ তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে– বলো, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের। [আনফাল : ১]

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

মানুষ তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে– [বাকারা : ২১৯]

قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ

বলো, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্যে উপকারও। [বাকারা : ২১৯]

এখানে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। সব প্রশ্নের জবাবই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন- আপনি এর জবাবে বলে দিন...। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর মুখে সে প্রশ্নের জবাব প্রদান করেছেন। প্রতিটি প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নকারীর প্রশ্ন, পরিবেশ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে প্রথমে তো বলেছেন 'উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্যে উপরকারও'। কিছুকাল পরে এই বিধান আবার রহিত হয়েছে। মদ ও জুয়া নিষিদ্ধ হয়েছে পরিপূর্ণরূপে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে এখন থেকে মদ ও জুয়ার কাছেও যেতে পারবে না। পক্ষান্তরে আমরা দেখি, যেখানে প্রশ্ন এসেছে আল্লাহ তাআলার বান্দাদের পক্ষ থেকে-

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ

যখন আপনার কাছে আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে ...

এখানে 'বলে দাও' বলে উত্তর দেননি। বরং এখানে বলেছেন, 'আমি তাদের নিকটেই আছি।' এর অর্থ হলো, এই জবাব কখনও রহিত কিংবা পরিবর্তিত হওয়ার নয়। আমার বান্দা যখন যে কালে আমার সম্পর্কে জানতে চাইবে তখন তার জওয়াব এটাই। আমি তার কাছে আছি। আর কতটুকু কাছে? তাও বলে দিয়েছেন- 'আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনি অপেক্ষাও নিকটতর।' আরও ইরশাদ হয়েছে-

مَايَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ

তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। [মুজাদালা : ৭]

وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَاكَانُوْا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا

তারা এর চাইতে কম হোক বা বেশি। তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন। তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তারা যা করে তিনি তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন। [মুজাদালা : ৭]

এক কথায়, পৃথিবীর মানুষ সর্বদাই আল্লাহ তাআলার দৃষ্টির সামনে রয়েছে। তিনি মানুষকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পথ বাতলে দিয়েছেন। অতঃপর জানিয়ে দিয়েছেন সে পথে চলতে যারা সচেষ্ট হয় তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাদের প্রতি বরকত অবতীর্ণ করেন। নিরংকুশ সর্বময় ক্ষমতার অধিকার মহান মালিকের এ এক অমোঘ বিধান। সেই সাথে জানিয়ে দিয়েছেন শয়তানের বিধানের কথাও। কিন্তু শয়তানের বিধান অমর ও স্থায়ী নয়। কারণ, শয়তান তো নিজেই জাহান্নামে যাবে। জাহান্নামে যাবে তার অনুসারীদেরকে সঙ্গে করেই।

পূর্ববর্তী উম্মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

শুরুতে যে হাদীসটি আমি উল্লেখ করেছি সেখানে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন– যদি তোমরা আমাকে মানো তাহলে বরকত লাভে ধন্য হবে, আর যদি না মানো তাহলে অভিশপ্ত বঞ্চিত ও বিতাড়িত হবে। দুনিয়াতেও পরকালেও। দুনিয়াতে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হবে কিভাবে তার বর্ণনা তুলে ধরেছেন পাক কুরআনেই।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি কি আচরণ করেছিলেন? যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের, যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি। [ফাজর : ৬-৮]

এ কথা আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি। আদ সম্প্রদায় ছিল এক বিস্ময়কর জাতি। তিনশ' বছর বয়সে গিয়ে তারা সাবালক হতো।

তাদের গড় আয়ু ছিল সাতশ' থেকে নয়শ' বছর। ছয় সাতশ' বছর বয়সেও তারা বুড়ো হতো না, চুল সাদা হতো না, দাঁত ভেঙ্গে পড়তো না, দৃষ্টি দুর্বল হতো না। আমরণ তাদের কেউ অসুস্থও হতো না। সারা জীবন শক্তি সুস্থতা ও বিলাসে সদা বহমান এক বিস্ময়কর জীবন ছিল তাদের। আর এত বিপুল নেয়ামতের অধিকারী হয়েও যখন অবাধ্য হয় তখন তাদের প্রতি আল্লাহর আযাব যদি আসে সে আযাব কেমন হবে? অতঃপর আগমন ঘটেছে আরেক সম্প্রদায়ের।

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

এবং সামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি– যারা উপত্যকায় নিবাস নির্মাণ করেছেন। [ফাজর : ৯]

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ

এবং কীলকের অধিকারী ফেরাউনের কথা কি তোমরা জানো?

এভাবে আল্লাহ তাআলা সংক্ষেপে অতীতকালের নানা জাতির কাহিনী তুলে ধরেছেন। অতঃপর তাদের কর্ম ও আচরণ সম্পর্কে বলেছেন–

الَّذِيْنَ طَغَوْ فِى الْبِلَادِ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ

যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং সেখানে সীমাহীন বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। [ফাজর : ১১]

مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

আমার চাইতে শক্তিশালী আর কে আছে? [হা-মীম আস-সিজদা : ১৫]

অর্থাৎ অবাধ্যচারীরা সীমালঙ্ঘনকারীরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছে, তোমরা আমাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখাও সে আযাব আন তো দেখি! ফেরাউন তো সরাসরি বলেছে আমিই খোদা। আমাকে মারতে পারে এমন কে আছে? অতঃপর আল্লাহ তাআলা কি করলেন?

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। [ফাজর : ১৩]

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। [ফাজর : ১৪]

অর্থাৎ যারাই সীমালঙ্ঘন করেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরই শাস্তি বিধান করেছেন। শাস্তির কষাঘাতে বিপর্যস্ত করেছেন, ধ্বংস করেছেন। আদ সম্প্রদায়কে ক্ষিপ্র বাতাস এমনভাবে আঘাত করেছে তাদের মাথা শরীর থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। ফিরিশতা এসে যখন চিৎকার দিয়েছে সামুদ সম্প্রদায়ের কলিজাগুলো বিদীর্ণ হয়ে গেছে, চেহারা হয়ে গেছে নীল। ফেরাউনের সম্প্রদায় যখন নদীতে নেমেছে তখন নদীর পানি তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। বনি ইসরাইলের লোকেরা বলতে শুরু করেছে, আমরা বিশ্বাসই করতে পারিনি ফেরাউন মারা গেছে। তারপর আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের লাশকে পানি থেকে তুলে এনে সমুদ্রের তীরে ফেলে দিলেন। আর আমাদেরকে বললেন—

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করবো যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো। [ইউনুস : ৯২]

ফেরাউনের লাশকে আল্লাহ তাআলা সংরক্ষণ করেছেন। সংরক্ষণ করেছেন যেন পরবর্তীকালের অবাধ্যরা আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণতির নমুনা দেখতে পারে।

তারপরও এটা দুনিয়া। দুনিয়ার একটা নিজস্ব নিয়ম-নীতি আছে। এই দুনিয়ার পর আসে আখিরাত। যে আখিরাত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ، وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُo وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ......ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَاۤءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَاۤئِمٌ وَّحَصِيْدٌo وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَمَاۤ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِىْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ لَّمَّا جَاۤءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍo وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌo

সে কিয়ামতের দিন তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদেরকে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করবে। যেখানে প্রবিষ্ট করা হবে তা কত যে নিকৃষ্ট স্থান। এই দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হবে তারা কিয়ামতের দিনও। কত যে নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যা তাদেরকে প্রদান করা হবে। এই জনপদসমূহের কিছু সংবাদ যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি। তাদের মধ্যে কিছু এখনও আছে এবং কিছু নির্মূল হয়ে গেছে। আমি তাদের প্রতি অবিচার করিনি। কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের বিধান আসলো, তখন আল্লাহ ব্যতীত যে সকল মাবুদের তারা ইবাদত করতো তারা তাদের কোন কাজে আসেনি। তারা ধ্বংস ব্যতীত তাদের অন্য কিছু বৃদ্ধি করেনি। এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন তারা অবিচার করে। নিশ্চয়ই তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ কঠিন। [হূদ : ৯৮–১০২]

আল্লাহ তাআলার বাচন ও বর্ণনাভঙ্গি কত সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত। অল্প কয়েকটি বাক্যে পুরো জাতির কাহিনী তার বিধান ও মানুষের চলার পথ সবকিছুই বলে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন এই ফেরাউন পরকালে তার অনুসারী জাতিকে নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর এই জাহান্নাম কত যে নিকৃষ্ট ঠিকানা। বলে দিয়েছেন, এটাই তোমার প্রভুর বিধান। যখন তোমার প্রভু কোন জাতিকে পাকড়াও করেন তখন তার আযাব থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। আল্লাহ তাআলার অদৃশ্য কষাঘাত থেকে কেউ পালাতে পারে না। তাঁর ফয়সালার সামনে সকলকেই আত্মসমর্পণ করতে হয়। তাদের কোন চেষ্টা কিংবা তাদের কোন মিথ্যা প্রভু আল্লাহর গ্রাস থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে না। অতীতে কখনও পারেনি।

নূহ (আ.)-এর তুফান এবং এক মা ও শিশু

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন- যেদিন নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর আযাব এলো সেদিন যদি আল্লাহ তাআলা কারও প্রতি অনুগ্রহ করতেন তাহলে নিষ্পাপ শিশু কোলে ব্যাকুল সেই নারীর প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করতেন। যে নারী তার নিষ্পাপ শিশুকে কোলে নিয়ে আযাব থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এবং কোন আশ্রয় সন্ধান করে ফিরছিল। ডান দিক বাম দিক থেকে তরঙ্গময় পানির সয়লাব তাকে তাড়া করছিল আর সে তার সন্তান কোলে নিয়ে ছুটছিল কোন আশ্রয়ের সন্ধানে। ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের একটি টিলায় গিয়ে উঠলো। তারপর আরেকটু উঁচু টিলায়। এভাবে উঠতে উঠতে শহরের সর্বোচ্চ টিলায় গিয়ে আশ্রয় নিলো। এদিকে পানিও সরিসৃপের মতো পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। আর তার সামনে সকল প্রকৃতিকে ছিন্নমূল তৃণের মতো ভাসমান মনে হতে থাকে। অবশেষে পানি সেই সর্বোচ্চ টিলাকেও গ্রাস করে নিল। পানি জড়িয়ে ধরলো সেই অসহায় নারীর পা। তার সামনে পালাবার কোন পথ নেই। এই পাহাড়চূড়াই ছিল তার সর্বশেষ আশ্রয়। পানি যখন এখানেও এসে তাকে হানা দিল তখন সে ভয়ে শংকায় অস্থির হয়ে পড়লো। পানি বাড়ছে, তার গতর বেয়ে ধীরে ধীরে যখন মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গেল তখন সে তার সন্তানকে দুই হাতে উঁচু করে ধরলো। পানি উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সেও তার সকল শক্তি দিয়ে সন্তানকে

পানির উপরে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। ঠিক এই সময় হঠাৎ করে একটি ক্ষুব্ধ ঢেউ এসে মা এবং শিশুকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং উভয়কে পানিতে ডুবিয়ে মারে।

وَكَذَا لِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ

এমনই তো তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি শাস্তি প্রদান করেন জনপদসমূহকে যখন তারা অবিচার করে। নিশ্চয়ই তার শাস্তি মর্মন্তুদ ও কঠিন। [হুদ : ১০২]

অর্থাৎ তাঁর শাস্তি খুবই ভয়ানক ও কঠিন। যখন তিনি কাউকে পাকড়াও করেন তখন তাঁর আযাব থেকে বাঁচার কোন পথ থাকে না। এ তো হলো দুনিয়ার শাস্তি। কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

هُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا، رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ

সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে নিস্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করবো। পূর্বে যা করতাম তা আর করবো না।
[ফাতির : ৩৭]

তাদের মর্মন্তুদ পরিণতি সম্পর্কে আরও বলেছেন–

سَرَا بِيْلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ تَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارَ

তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল। [ইবরাহীম : ৫০]

قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَّارٍ

তাদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক।
[হাজ্জ : ১৯]

يُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ

তাদেরকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ। যা অতি কষ্টে একেক ঢোক করে গলাধকরণ করবে এবং তা গলাধকরণ করা একেবারে সহজ হবে না। [ইবরাহীম : ১৬-১৭]

তাছাড়া তাদেরকে পান করতে দেয়া সে পুঁজ এতটা গরম হবে যে মুখের কাছে নেয়ার সাথে সাথে তাদের মুখ ঝলসে যাবে। তারপরও তারা সেই পুঁজ পান করবে। এখানে ভাববার বিষয় হলো, আমরা যদি অতিরিক্ত গরম চা অলক্ষ্যে মুখে দিই তাহলে আমাদের ঠোঁট পুড়ে যায়, জিহ্বা পুড়ে যায়। কয়েক দিন পর্যন্ত তার যন্ত্রণা আমাদেরকে বরদাশত করতে হয়। আর জাহান্নামের ফুটন্ত পানি তো এত গরম যদি সেখানকার এক বালতি পানি দুনিয়ার সাত সমুদ্রে ঢেলে দেয়া হয় তাহলে সাত সমুদ্র এক সাথে ফুটতে থাকবে। সুতরাং এই পানি যখন পেটের ভেতর যাবে তখন কি অবস্থা হবে তা সত্যিই কল্পনাতীত। কোন মানুষের পক্ষে সে ভয়ঙ্কর কষ্টের বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়।

চারদিক থেকে মৃত্যুযন্ত্রণা ঘিরে ধরবে। নিরাশায় তাদের চেহারা শুকিয়ে যাবে। চিৎকার করে কান্নাকাটি করবে। অবশেষে আল্লাহকে ডেকে ডেকে বলবে, হে মালিক! আমাদেরকে মৃত্যু দাও। এর জবাবে ইরশাদ হবে-

إِنَّكُمْ مَّا كِثُونَ ... لَقَدْ جِئْنَٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ○

তোমরা এভাবেই থাকবে। আল্লাহ বলবেন, আমি তো তোমাদের কাছে সত্য পৌঁছে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যবিমুখ। [যুখরুফ : ৭৭-৭৮]

আল্লাহ তাআলা যখন জানিয়ে দিবেন, আমি তো পৃথিবীতেই তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম- এখানে যদি আমাকে না মানো পরকালে ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং এখন কান্নাকাটি করে কী লাভ? তারা যখন নিরাশ হয়ে পড়বে, মৃত্যু আর আসবে না তখন তারা পুনরায়

আবেদন জানাবে, হে আমাদের মালিক! আমাদের আযাব অন্তত একটু হালকা করে দাও।

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ

জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে ... [মু'মিন : ৪৯]

উত্তরে তারা বলবে–

اَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا بَلٰى

তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আগমন করেননি? জাহান্নামীরা বলবে, অবশ্যই এসেছিলেন। [মু'মিন : ৫০]

তারা স্বীকার করবে, নবীগণ এসেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের ডাকে সাড়া দিইনি। ইরশাদ হবে–

وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ

আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়। [মু'মিন : ৫০]

অর্থাৎ তোমরাও রাসূলগণের আহ্বানে সাড়া দাওনি, আজ তোমাদের আহ্বানেও সাড়া দেয়া হবে না।

এবার তারা সকলে মিলে বসবে। বলবে, এখন কি করা যায়? তখন তারা দল বেঁধে আল্লাহ তাআলাকে ডাকতে শুরু করবে– ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ! এভাবে কেটে যাবে হাজার হাজার বছর। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাবে না। হাজার হাজার বছর পর আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন– কি হয়েছে তোমাদের বল? তারা বলবে–

غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ، رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ

দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতিপালক! এই আগুন থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর। অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী হবো। আল্লাহ বলবেন, তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলিস না। [মু'মিনুন : ১০৬-১০৮]

তারপর আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের ফিরিশতাগণকে বলবেন, জাহান্নামকে তালাবদ্ধ করে দাও যেন ভেতর থেকে কেউ বাইরে না আসতে পারে। বাইরে থেকেও যেন কেউ ভেতরে যেতে না পারে। ফিরিশতাগণ তালা লাগিয়ে দিবে। অজস্র নারী-পুরুষ এক অগ্নিময় দুর্বিসহ জগতে চিরদিনের জন্যে তালাবদ্ধ হয়ে থাকবে। তারা কামনা করবে, যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারতাম তাহলেও তো মুক্তি পেতাম। কিন্তু সেদিন মৃত্যু পাবে কোথায়?

তারপর কি হবে? তারপর কুরআনে কারীমে যে কথাটি বলা হয়েছে জাহান্নামীদের জন্যে সে কথাটি সবচে' কঠিন কথা।

فَذُوقُوا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করবো। [নাবা : ৩০]

আমার ভাই ও বোনেরা!

খোদার কসম! এই পৃথিবী আজ বড় গাফলতে ডুবে আছে। আমাদের এই গাফলত ও উদাসীনতার কোন সীমা নেই। পৃথিবীর মানুষ শয়তান প্রদর্শিত যে ভয়ঙ্কর পথে চলছে এর পথ তো শেষ হয়েছে গিয়ে জাহান্নামে।

সফলতার পথ

সফলতার পথ প্রদর্শন করেছেন আল্লাহ। হাদীসে কুদসীতে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, যে আমার আনুগত্য করে আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হই। আমি

যার প্রতি সন্তুষ্ট হই তার প্রতি বরকত অবতীর্ণ করি। আর আমার বরকতের কোন সীমা নেই। অর্থাৎ কেউ যদি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে তাহলে তিনি খানাপিনা জীবনোপকরণ সবকিছুতেই বরকত দিবেন। এই বরকতের পরিণতি পৃথিবীতে কেমন হবে? ইরশাদ হয়েছে–

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

যদি সে সব জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনতো ও আল্লাহকে ভয় করতো তাহলে আমি তাদের জন্যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম। [আ'রাফ : ৯৬]

অর্থাৎ তোমরা যদি ঈমান আনো, আমাকে ভয় করো তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর সমূহ বরকতের সকল দ্বার তোমাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিব। আরও ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًّا

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় প্রভু অবশ্যই তাদের জন্যে সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা। [মারিয়াম : ৯৬]

أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও। [আলে-ইমরান : ১৩৯]

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

মুমিনগণকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। [রূম : ৪৭]

وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

এভাবেই আমি মুমিনগণকে উদ্ধার করে থাকি। [আম্বিয়া : ৮৮]

অর্থাৎ মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে ভয় করে তাহলে তিনি তাদের পরস্পরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। তাদেরকে সাহায্য করবেন। দুশমনদের আঘাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে এই পৃথিবীতে করবেন বিজয়ী। এ সবই আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার। আরও অঙ্গীকার করেছেন–

وَعَدَاللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। [নূর : ৫৫]

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ঈমান আমল ঠিক করে নাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করবো। শুধু কি ক্ষমতা?

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا

এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে– যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন। এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। [নূর : ৫৫]

দুটি কাজ দুটি পুরস্কার

আল্লাহ তাআলার ফরমান খুবই স্পষ্ট। তোমরা দুটি কাজ করে নাও। ঈমান ঠিক কর এবং ভালোভাবে আমল কর। পরিণামে আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে শাসন ক্ষমতা দান করবো, তোমাদের দীনকে প্রতিষ্ঠিত করে দিব। তোমাদের অন্তর থেকে ভয়ভীতি দূর করে দেব, তোমাদেরকে দান করবো শান্তি ও নিরাপত্তা।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– এমন একটা সময় আসবে যখন ইরাকের সীমান্ত থেকে একজন সুন্দরী যুবতী অলংকার সজ্জিত হয়ে একাকী বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবে। কিন্তু এই দীর্ঘ সফরে কেউ চোখ তুলে তার দিকে তাকাবে না। কোন অত্যাচারী হাত তার দিকে প্রসারিত হবে না। পৃথিবী হবে শান্তি ও নিরাপত্তাময় এক পৃথিবী। এ হলো আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে।

তাঁর অঙ্গীকার রয়েছে পরকালের জান্নাত সম্পর্কেও। ইরশাদ হয়েছে–

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا

> যে দিন দয়াময়ের সান্নিধ্যে আল্লাহভীরুগণকে সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করবো। [মারিয়াম : ৮৫]

অতিথিরূপে যখন তারা আল্লাহ তাআলার সমীপে এসে উপস্থিত হবে আরশ তখন তাদেরকে ছায়া দিবে। বেহেশতের দিকে তাদের গমন সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰى
اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا

> যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা বেহেশতের কাছে উপস্থিত হবে ও তার দ্বারসমূহ খোলে দেয়া হবে। [যুমার : ৭৩]

অতঃপর তারা যখন বেহেশতের কাছে এসে পৌঁছবে তখন ঈমানদার নারীগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, এটা সম্মানের কারণে বরং অনুগ্রহপূর্বক আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে পুরুষদের আগে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দিবেন যেন তারা বেহেশতি সাজে সজ্জিত হয়ে পুরুষদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেন। বেহেশতে প্রবেশ করার পর তারা সারি সারি ঝরনা দেখতে পাবে। সেখানে বৃষ্টি নেই। ঝরনা থেকে শরাব প্রবাহিত হচ্ছে। সে শরাব বড়ই

বিস্ময়কর। আঙুলের মাথায় করে এক ফোঁটা শরাব যদি এই পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সমগ্র দুনিয়া সুবাসে মৌ মৌ হয়ে উঠবে। বেহেশতে তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখবে ফলবান বৃক্ষ। বৃক্ষের ডাল বেহেশতিদের প্রতি ঝুঁকে থাকবে। বেহেশতের ফল স্বাদে যেমন অনুপম, অনুপম তেমনি রূপে। বেহেশতি নারীদের পোশাক পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন পড়বে না। হেঁটে যাওয়ার সময় বৃক্ষশাখাকে বেহেশতি রমণী শুধু কল্পনায় বলবে, আমার এমন একটি শাড়ি চাই যার ধরন এই, রঙ এই। বলাও না, মনে শুধু কল্পনা করা। কল্পনা করতেই দেখবে তার কাঙ্ক্ষিত পোশাক তার সামনে উপস্থিত।

এ কথা এ কারণে বলছি, পোশাক-আশাকের প্রতি মেয়েদের আগ্রহ আজন্ম। আমি বলতে চাই তোমরা তোমাদের এই আগ্রহকে এখানেই সমাধিস্থ করে দাও। এখানে এই মাটির শরীর একে সাজিয়েই বা কি হবে? ঈমান সাজাও, ভবিষ্যতে সৌন্দর্য লাভ করবে। সেই সৌন্দর্য এই দুনিয়ার সৌন্দর্য নয়। এখানকার রূপ তো দশ বছর পর এমনভাবে ফিকে হয়ে যায় কেউ আর নজর তুলে তাকায় না। কিন্তু বেহেশতের রূপ কখনও ফিকে হবে না। সেখানকার কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকবে না। বৃক্ষ শাখার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মনে সুন্দর কাপড়ের কল্পনা উদিত হতেই দেখবে শত শত কাপড় তোমার সামনে উপস্থিত। তুমি কয়টা পরবে? কেউ হয়তো মনে করবে, এত কাপড় দিয়ে কি করবো? শীতের দিনে শীত ঠেকাতে আমরা কয়েক জোড়া পোশাক পরি। তখন তো কাপড় নিয়ে চলাফেরাই কষ্ট হয়ে পড়ে। আমি বলি, না এমন কিছু ভাববার প্রয়োজন নেই। কারণ, বেহেশতের পোশাক হবে নূরের তৈরি। বেহেশতের প্রতিটি জিনিসই হবে নূরের তৈরি। নূরের কোন ওজন হয় না।

তুলার ওজন আছে, ওজন আছে সব সুতারই। আজকাল আমরা যে পলিস্টার কাপড় পরি তারও ওজন আছে। কিন্তু নূরের কোন ওজন নেই। তাই শত শত জোড়া কাপড় বেহেশতি রমণী গায়ে জড়িয়ে নিবে। কিন্তু এই কাপড় জড়াতে কতটা সময় লাগবে? দুনিয়ার হিসেবে এটাও একটা বিপদের কথা। এখানে তো কাপড় পরতে হলে একটার পর একটা ভাঁজ করে সাজিয়ে পরতে হয়। ভাবতে হয়, কোনটা উপরে হবে,

কোণটা নিচে। তাছাড়া যারা মোটা মানুষ তাদের জন্যে তো কাপড় পরা এক ভীষণ কষ্টের বিষয়। কিন্তু বেহেশতের সবকিছুই হলো ভিন্ন রকম। সেখানে সদ্য উপস্থিত নয়ন জুড়ানো পোশাকে দৃষ্টি পড়তেই দেখবে, পোশাকগুলো নিজ থেকেই এসে গায়ে জড়িয়ে গেছে। আর আগের পোশাকগুলো গেছে অদৃশ্যে হারিয়ে। এখানে পোশাক ছাড়বারও ঝামেলা নেই, পরবারও ঝামেলা নেই। এখানে কাপড় পরিষ্কার করার কোন ওয়াশিং মেশিন নেই, ধোপাও নেই। আবার এর অর্থ এও নয়, এই নতুন পোশাক পরলাম। তো এটা পরে আমাকে এক সপ্তাহ কাটাতে হবে। এক মিনিট পরও যদি মনে হয় এটা আমার পছন্দ নয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন কাপড় এসে উপস্থিত হবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবেই শরীরের কাপড় বদলে যাবে। এভাবেই মনের সাধ পূর্ণ হতে থাকবে, মনের মতো। একেই তো বলে বেহেশত।

বেহেশতের স্বর্ণকার ও অলংকার

এই পৃথিবীতে মেয়েরা অলংকারের নেশায় পয়সা সঞ্চয় করে। স্বামীদেরকে না জানিয়ে না দেখিয়ে পয়সা জমা করতে থাকে। অতঃপর সেই সঞ্চিত পয়সা দিয়ে আংটি বানায়, চুড়ি বানায়, মাথার টিকলি বানায়, গলার হার বানায়। যুবতী বৃদ্ধা সকলেই এ ক্ষেত্রে সমান। নারীদের অলংকার প্রীতি অনেকটা প্রবাদতুল্য।

বেহেশতে আল্লাহ তাআলা একজন ফিরিশতা তৈরি করে রেখেছেন। সেই ফিরিশতা এখনও বসে বসে অলংকার তৈরি করছে। এই ফিরিশতা হলো স্বর্ণকার৷ বেহেশতের স্বর্ণকার। যেদিন সে সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই অলংকার তৈরি করছে। আজও বানাচ্ছে। সেই অলংকারের রূপ এত বেশি, তার পাশে যদি সূর্যকে দাঁড় করানো হয় তাহলে সূর্যের আলো তার সামনে ম্লান মনে হবে। এবার ভেবে দেখ, কী রূপ হবে সে অলংকারের।

সে অলংকারে স্থাপিত হবে নানা রঙের হীরে মোতি পান্না জহরত ও নানা রঙের পাথর। বেহেশতি অলংকারে স্থাপিত ক্ষুদ্র একটি মোতিও যদি এই পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা হয় তাহলে তার আলোকে এই পৃথিবী

এমনভাবে ঝলসে ওঠবে কোন মানুষ চোখ খোলে তাকাতে পারবে না। সারি সারি অলংকার সজ্জিত থাকবে। মিনিটে মিনিটে বেহেশতের নারীগণ অলংকার পরিবর্তন করবে। বিষয়টা কত সহজ! এখানে নিজেকে তাকওয়ার গুণে সজ্জিত কর তো সেখানে নিজেকে সজ্জিত করবে শত শত নূরের তৈরি পোশাকে। বিস্ময়কর সব অলংকারে। এখানে সামান্য ক'দিন কষ্ট করে নাও। সেই কষ্টও খুব দীর্ঘ নয়। এখানকার সবকিছুই সংক্ষিপ্ত। দশটি কাজ এমন রয়েছে, কেউ যদি এই দশটি কাজ ও গুণ অর্জন করতে পারে তাহলে পরকালে সে সুউচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকারী হবে।

বেহেশতের বাজার

প্রসঙ্গত আরেকটি কথা বলি, এই পৃথিবীতে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, নানা রকমের পোশাকে নানা রকমের অলংকারে সাজতে পারি। শরীরে হয়তো খানিকটা রঙও মাখাতে পারি। পাউডার ছিটাতে পারি। কিন্তু আকৃতি বদলাতে পারি না। যাদের কাড়ি কাড়ি অর্থ আছে তারা অবশ্য আকৃতি বদলের নেশায় প্লাস্টিক সার্জারি করে। কিন্তু কয়েক বছর না যেতেই এই প্লাস্টিক রূপ এমন বিকৃত আকার ধারণ করে তখন তাকে দেখে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই জাগ্রত হয় না। কিন্তু বেহেশতে আল্লাহ তাআলা একটা বাজার বসাবেন। এই দুনিয়াতে যেমন শুক্রবারে বাজার বসে। ঠিক তেমনি বেহেশতেও শুক্রবারে বাজার বসবে। শুক্রবারে সকলেই আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ করবে। দীদার লাভ করবে নারী-পুরুষ সকলেই। দীদারের নেশায় তারা বেহেশতের কথাও ভুলে যাবে। আল্লাহ তাআলার দীদার শেষে যখন তারা ফিরে আসবে তখন পথেই পড়বে শুক্রবারের বাজার। সে বাজারও বড় বিস্ময়কর। একটি বাজার হবে মেয়েদের। আরেকটি ছেলেদের। বাজারে ফ্রেমে বাঁধানো সারি সারি সুন্দর ছবি ঝুলানো থাকবে। প্রতিটি ছবির নিচে লেখা থাকবে, তুমি যদি চাও তাহলে আমি তোমার মধ্যে রূপান্তরিত হতে পারি।

প্রত্যেকেই ছবিগুলো দেখতে থাকবে আর হাঁটতে থাকবে। দেখতে দেখতে যে ছবিটি তার পছন্দ হবে এবং তার মন যে আকৃতিটির প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে তখন সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ সেই ছবিটির রূপ ধারণ করবে। বিষয়টি এমন নয় যে তার মাথা কেটে এখানে নতুন আরেকটি মস্তক স্থাপন করা হবে। সেখানে অপারেশনের কোন ঝায়-ঝামেলা নেই।

ওদিকে বেগম সাহেবাও ঘুরছেন বাজারে। তারও একটি আকৃতি পছন্দ হয়েছে। আকৃতি দেখে বিস্ময়ে সে যখন বিমূঢ়– লক্ষ্য করবে, তার রূপ সে ছবিটির মতো হয়ে গেছে। পলকে বদলে গেছে তার আকৃতি। স্বামীর আকৃতি বদলে গেছে, এদিকে বদলে গেছে স্ত্রীর আকৃতিও। তারপর উভয়েই ঘরে ফিরে আসবে। কিন্তু তারা একে অপরকে দেখে অপরিচিত ভেবে বিব্রত হবে না। ভাববে না, এ আবার আমার ঘরে কে আসলো? বরং তারা আকৃতি পরিবর্তন সত্ত্বেও একে অপরকে চিনতে পারবে এবং আহ্লাদ করে বলবে, তুমি এই আকৃতি পছন্দ করেছো!

প্রিয় বোনেরা!

এখানে পড়ে আছো মেকাপের নেশায়। এই মেকাপকে বিসর্জন দাও। কাঙ্ক্ষিত দশটি গুণের অলংকারে নিজেকে সজ্জিত কর। দেখবে, আল্লাহ তাআলা তোমার মনের সকল মেকাপকে বাস্তবে রূপায়িত করবেন।

দশটি বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَا شِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ

وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا...

অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌন অঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী তাদের জন্যে আল্লাহ রেখে দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। [আহযাব : ৩৫]

আরবী ভাষার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো এ ভাষায় কথাকে খুবই সংক্ষেপে বলা যায়। কিন্তু এখানে আল্লাহ তাআলা তারপরও কথাকে দীর্ঘ করেছেন। এখানে শুধু এতটুকু বলাও যথেষ্ট ছিল যেমনটি অন্যত্র বলেছেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে ...
[নাহল : ৯৭]

কিন্তু কথাটা এভাবে না বলে বিস্তারিতভাবে বলেছেন। বলেছেন মূলত নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আর এর পেছনে একটি ঘটনাও ছিল। একবার আনসারী নারীগণ একত্রিত হয়ে বলাবলি করছিল, কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা কেবল পুরুষদের কথা আলোচনা করেছেন। আমাদের কথা তো বলেননি। তখন তাদেরই একজন প্রতিনিধি হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসে এবং আরয করে– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঈমানদার নারীদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। জানতে চাচ্ছি, আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামে কেবল পুরুষদের কথাই বলেন। আমরা মেয়েদের কথা বলেন

না কেন? সে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলছে। এখনও কথাবার্তা সমাপ্ত হয়নি এরই মধ্যে হযরত জিবরাইল (আ.) ছুটে আসেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান। এখানে পুরুষের পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে নারীদের কথাও বলা হয়েছে। পুরুষদেরকে যেমন দশটি গুণের অলংকার গ্রহণ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তেমনি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে নারীদেরকেও। দাওয়াত দেয়া হয়েছে, হে নারী ও পুরুষগণ! তোমরা এই দশটি গুণের অলংকার পরিধান কর, তারপর দেখবে বেহেশতে তোমাদেরকে কী অলংকার পরানো হয়?

বেহেশতের হুর

বেহেশতে আল্লাহ তাআলা হুর তৈরি করে রেখেছেন। সেই হুর মাটির তৈরি নয়। মেশক আম্বর ও জাফরানের তৈরি। তাদের অপরূপ রূপের সামনে সূর্যের আলোও নস্যি। তাদের কেউ যদি সমুদ্রের নোনা পানিতে একবিন্দু থু থু ফেলে তাহলে নোনা দরিয়া মুহূর্তে মিষ্টি দরিয়ায় পরিণত হবে। আর বেহেশতের নারীগণ হবে এই হুরদের চাইতে সত্তরগুণ বেশি সুন্দরী। এই পৃথিবীতে যেসব নারী কুশ্রী বলে অবহেলিত ছিল তাদের সৌন্দর্যও এই পৃথিবীর যে কোন সুন্দরী নারীর চাইতে শতগুণ বেশি হবে। হাজার মাইল দূর থেকে বাতিঘরের মতো তাদের রূপের আলো দেখা যাবে। এই রূপ শুধু আরব নয়, আফ্রিকার কৃষ্ণ-কালো হাবশী নারী ও পুরুষরাও লাভ করবে। এই রূপ পাওয়ার পথ একটাই। তোমার ইসলামকে শুদ্ধ কর। তোমাকে ঈমানদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কর। ঈমান, সততা, ধৈর্য, বিনয়, দান, রোযা, আব্রু, যবান ও যিকর দ্বারা নিজেকে শোভিত কর। এই দশটি গুণ অর্জন করে কবরে আস। দেখ তোমার সাথে কি আচরণ করা হয়?

ইসলাম কি? ইসলামের স্পষ্ট লক্ষণ ও ভিত্তি হলো পাঁচটি বিষয়। তাওহীদ, নামায, রোযা, হজ ও যাকাত। এই পাঁচটি হলো ইসলামের ভিত্তি। কিন্তু ভিত্তি দ্বারাই কি ঘর পূর্ণ হয়। খুঁটি দ্বারা যেমন ঘর পূর্ণ হয় না তেমনি শুধু এই পাঁচটি বিষয় দ্বারাও ইসলাম পূর্ণ হয় না, পূর্ণ

মুসলমান হওয়া যায় না। পূর্ণ মুসলমান হতে হলে আরও কিছু কাজ করতে হয়।

পূর্ণ মুসলমান

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

> মুসলমান তো সেই যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।

দেখা গেল, একজন নারী তাহাজ্জুদ পড়ে। নামায কখনও কাযা হয় না। কিন্তু তার মুখ সংযত নয়। তাহলে সে পরিপূর্ণ মুসলমান নয়। একজন পুরুষ খুবই আবেদ। কিন্তু তার হাত সদাই মানুষের ক্ষতি করে বেড়ায়। মানুষের সম্পদ, মানুষের অর্থ কৌশলে বাগিয়ে নেয়। কাউকে মুখে আক্রমণ করে, কাউকে আক্রমণ করে হাতে। বুঝতে হবে সে আবেদ। কিন্তু পরিপূর্ণ মুসলমান নয়। একবার এক সাহাবী এসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রতিবেশী এক মহিলা আছে। সে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ে, রোযা রাখে কিন্তু তার মুখ খুবই কঠিন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে জাহান্নামে যাবে। আরেকজন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রতিবেশী একজন মহিলা আছেন। তিনি কেবল ফরয নামাযগুলোই পড়েন। নফলের প্রতি ততটা মনোযোগী নন। কিন্তু তার আচার-আচরণ খুবই ভালো। মুখের কথাও সুমিষ্ট। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে জান্নাতে যাবে।

সুতরাং আমাদেরকে বুঝতে হবে মুসলমান কাকে বলে। মুসলমান বলা হয় যার কথা ও আচরণে কেউ আক্রান্ত হয় না। যার হাত কাউকে আক্রমণ করে না। ঘরে মেহমান আছে। আর স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করছে। এটা মুসলমানের চরিত্র নয়। তাছাড়া মুখের সুমিষ্ট ভাষণ যেমন পরিপূর্ণ ইসলামের লক্ষণ তেমনি আতিথেয়তাও পরিপূর্ণ ইসলামের অন্যতম

লক্ষণ। তাই ঘরে অতিথি আসতেই স্বামীর উপর এই বলে আক্রমণ করা, রোজ রোজ মেহমান...! এটাও মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়।

অতিথি মুক্তির উপায়

আমাদের ইতিহাসের এক বিখ্যাত বুযুর্গ। নাম হযরত হাশিম (রহ.)। তিনি বলেন, একবার আমি সফরে ছিলাম। পথে এক তাঁবু দেখে অবতরণ করলাম। আমার তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছিল। তাঁবুর ভেতরে মহিলা বসা ছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, বোন! আমি খুবই ক্ষুধার্ত। আমাকে কিছু খেতে দিবে? সে বললো, আমি কি এখানে মুসাফিরদের জন্যে খাবার রান্না করে বসে আছি? যাও, নিজের রাস্তা দেখ। বুযুর্গ বলেন, আমি তখন এতটা ক্ষুধার্ত ছিলাম যে, ওঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। ভাবলাম, এখানেই পড়ে থাকি। এরই মধ্যে তার স্বামী এলো। আমাকে দেখেই বললো, মারহাবা তুমি কে? বললাম, আমি মুসাফির। বললো, খানা খাওনি? বললাম, না। বললো, কেন? বললাম, চেয়েছিলাম পাইনি। সে তার স্ত্রীকে বললো, অবিচারিণী! তুমি মুসাফিরকে খাবার দাওনি? সে বললো, আমি কি এখানে মুসাফিরদের জন্যে খাবার নিয়ে বসে আছি? আমি কি মুসাফিরদেরকে খাইয়ে খাইয়ে আমার ঘর উজাড় করে দেবো? তার এই কথায় তার স্বামী তার সাথে খারাপ কোন আচরণ করলো না, বরং শুধু বললো– আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত দান করুন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– উত্তম পুরুষ সেই যে তার স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করে। অতঃপর সে তার স্ত্রীকে বললো, তুমি তোমার ঘর বোঝাই করে রাখ। তারপর সে একটি ছাগল জবাই করলো এবং তা কেটে কুটে রান্না করলো এবং মুসাফিরকে খাওয়ালো ও দুঃখ প্রকাশ করলো।

বুযুর্গ খানাপিনা শেষে আপন পথে চলতে লাগলেন। এক মনযিল পথ অতিক্রম করার পর আবার তাঁবু নজরে পড়লো। দেখলো সেখানেও একজন নারী বসে আছে। তার কাছে বুযুর্গ বললেন, বোন আমি একজন মুসাফির। খুবই ক্ষুধার্ত। আমাকে কিছু খেতে দিবে? বললো, স্বাগতম!

আল্লাহর রহমত এসেছে। আল্লাহর বরকত এসেছে। তারপর সে একটি বকরি জবাই করে রান্না করে যখন তার সামনে রাখলো তখনই তার স্বামী এসে উপস্থিত। জিজ্ঞেস করলো, এ কে? বললো, মেহমান। বললো, খাবার কে দিয়েছে? বুযুর্গ বললেন, আপনার স্ত্রী। এ কথা শোনেই সে স্ত্রীর উপর চড়াও হলো এবং চিৎকার করে বললো, তোমার লজ্জা হয় না! তুমি কি এভাবে মেহমানদারী করে আমার ঘর খালি করে দিবে? এ কথা শোনে বুযুর্গ তার হাসি আর চেপে রাখতে পারলেন না। হা হা করে হেসে উঠলেন। গৃহস্বামী রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো। বললো, হাসছো কেন? বুযুর্গ বললেন, এক মনযিল আগে দেখে এলাম এর উল্টো চিত্র। এ কথা শোনার পর লোকটি বললো, জান! সেই মেয়েটি কে? সে হলো আমার বোন। আর এ মহিলা হলো সেই পুরুষটির বোন।

আসলে ঈমান কাকে বলে? ঈমান শুধুমাত্র নামায রোযাকেই বলে না। অন্যের সাথে ভালোভাবে হাসিমুখে কথা বলা, অন্যকে আতিথেয়তা দেয়া এগুলোও ঈমান। ধৈর্যধারণ করা, দান করা এগুলো ঈমানের অন্যতম অঙ্গ। এসব গুণ ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল– শ্রেষ্ঠ ঈমান কি? বলেছিলেন, উত্তম চরিত্র।

এক ব্যক্তি এসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বলেছিল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার ঈমানের পূর্ণতা চাই। ইরশাদ করেছিলেন– তুমি তোমার চরিত্রকে ভালো কর, তোমার ঈমান পূর্ণ হয়ে উঠবে।

পর্দার প্রতি যত্ন

اَلْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ

আয়াতে উল্লিখিত এ শব্দ দুটির মর্ম হলো আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ অনুগত নারী ও পুরুষ। যে নারী ও পুরুষ আল্লাহ তাআলার যে কোন ফরমানের সামনে অকুণ্ঠচিত্তে আত্মসমর্পণ করে।

পর্দার আয়াত নাযিল হয়েছিল রাতে। ফলে কেউ জেনেছে, কেউ বা জানতে পারেনি। সেকালে পুরুষদের সাথে মেয়েরাও মসজিদে এসে নামায পড়তো। এক সাহাবিয়া মসজিদে নামায পড়তে এসে দেখেন অন্য মেয়েরা কালো বোরকা ও চাদর পরে শরীর ঢেকে নামায পড়ছে। সে তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ কী! তারা বললো, তুমি জানো না, পর্দার নির্দেশ এসেছে? এ কথা শোনার সাথে সাথে সে তার সন্তানকে ঘরে পাঠিয়ে দিল। দৌড়ে যাও, ঘর থেকে আমার জন্যে একটি চাদর নিয়ে এসো। তারপর যখন সে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো তখন তার স্বামী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ কী! হঠাৎ করে এ আবার কি শুরু হলো? স্ত্রী বললো, তুমি জানো না, পর্দার নির্দেশ এসেছে? এই তো মুসলমান নারী। যখনই জানতে পেরেছেন এটা আল্লাহর নির্দেশ তখন আর আল্লাহর মর্জির বাইরে এক মুহূর্তও কাটাননি। আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে এক কদমও অগ্রসর হননি।

আজকাল আমাদের সমাজে বিকৃত-মস্তিষ্ক এমন মানুষও আছে যারা বলে, পর্দা হলো একটি মনের বিষয়। আমরা বলি, তাহলে খানাপিনাটা মনে মনে করে নাও। খানাপিনার জন্যে এত বিশাল আয়োজন কেন? যেমন- মূর্খ ফকীর দরবেশদের কেউ কেউ বলে থাকে নামায অন্তরের বিষয়, পর্দা মনের বিষয়। অথচ উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে- না, মনের বিষয় নয়। বরং আল্লাহ তাআলা যা বলেছেন সোজাসুজি তার সামনে আত্মসমর্পণ কর। এটাই মুমিনের চরিত্র।

আমরা এও বলেছি, পুরো কুরআন শরীফে একমাত্র হযরত মারিয়াম (আ.) ছাড়া আর কারও নাম আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেননি। আর হযরত মারিয়ামের নামও নেয়া হয়েছে একটি ভুল দাবি নিরসনের জন্যে। কুরআনে কারীমে যেখানেই কোন নারীর প্রসঙ্গ এসেছে তখন সেখানে তার স্বামীর সাথে যুক্ত করে তার কথা আলোচিত হয়েছে। কোন নারীর নাম নেয়া হয়নি। কুরআনে কারীমে মিশরের গভর্নরের স্ত্রীকে ইমরাআতুল আযীয, হযরত নূহ (আ.)-এর স্ত্রীকে ইমরাআতু নূহ, হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীকে ইমরাআতু লূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তাআলা নাম নেননি কেন? ইমরাআতুল আযীয না বলে তো যুলেখাও বলতে পারতেন। ইমরাআতু ফেরাউন না বলে আছিয়াও

বলতে পারতেন। উলামায়ে কেরাম বলেছেন– এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, বিনা প্রয়োজনে মেয়েদের নাম নেয়াটাও আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয় নয়। সুতরাং মেয়েদের পর্দার বিষয়টা এমন গুরুত্বপূর্ণ যে স্বয়ং তার নামটিও পর্দাবৃত হওয়ার যোগ্য। বিনা প্রয়োজনে মেয়েদের নাম আলোচনা করাও পছন্দনীয় নয়। হ্যাঁ, যেখানে প্রয়োজন পড়ে– পাসপোর্ট, সরকারী কাগজ-পত্র, ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন ইত্যাদি– সেখানে নাম নিতে কোন অসুবিধা নেই।

সত্যবাদী নারী

اَلصّٰدِقِیْنَ وَالصّٰدِقٰتِ

সত্যবাদিতা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যেই এক মহা কাঙ্ক্ষিত গুণ। ইসলামে এর গুরুত্ব এত বেশি, একবার এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুসলমান কি কাপুরুষ হতে পারে? বললেন, হ্যাঁ, হতে পারে। বললো– কৃপণ হতে পারে? বললেন– হ্যাঁ, হতে পারে। বললো, মিথ্যাবাদী হতে পারে? বললেন– না, মুসলমান কখনও মিথ্যা বলতে পারে না। অথচ আজ মুসলমান নারী ও পুরুষদের মধ্যে সবচাইতে ভয়াবহ যে ব্যাধি তাহলো এই মিথ্যা। উপরোক্ত আয়াতে আহ্বান জানানো হয়েছে– হে মুসলমান নারী ও পুরুষগণ! তোমরা নিজেদেরকে সত্যবাদিতার গুণে সজ্জিত কর।

ধৈর্যের পুরস্কার

তারপর উল্লিখিত আয়াতটিতে মুসলমান নারী ও পুরুষের যে গুণটির কথা আলোচনা করা হয়েছে তা হলো ধৈর্য। এক স্বামী আল্লাহর রাস্তায় সফরে যাচ্ছে। স্ত্রীকে বলে যাচ্ছে, তুমি ঘরে থেকো। এদিকে তার বাবা অসুস্থ। এই স্ত্রী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে গিয়ে আরয করছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী আমাকে

বলে গেছে আমি যেনো ঘরে থাকি। এদিকে আমার বাবা অসুস্থ। এখন আমি কী করবো? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ধৈর্য ধর এবং ঘর থেকে বের হয়ো না। অথচ তার স্বামীর উদ্দেশ্য আদৌ এটা ছিল না যে, স্ত্রী তার অসুস্থ বাবাকে দেখতে যেতে পারবে না। বরং এভাবেই মানুষ কোথাও যাওয়ার সময় যেমন স্ত্রীকে বলে যায়, বাচ্চাদের প্রতি লক্ষ্য রেখো, সব সময় ঘরে থেকো। বলাটা ঠিক এ ধরনেরই একটা বলা ছিল।

কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, ধৈর্য ধর এবং স্বামীর কথার উপরই অটল থেকো। এদিকে স্ত্রী জানতে পারলো তার বাবা এখন মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে। তাই সে পুনরায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পয়গাম পাঠালো– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাবা তো মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে। আমি কি তাকে দেখতে যেতে পারি? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিলেন, ধৈর্য ধর। স্বামীর কথার উপর অবিচল থেকো। তারপর তার বাবার ইন্তেকাল হয়ে গেল। এবার আরয করলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি কি আমার বাবার লাশ দেখতে যাবো? দেখার বিষয় হলো, মানুষ তো লাশ দেখার জন্য এক শহর থেকে আরেক শহর পর্যন্ত চলে যায়। চলে যায় এক দেশ থেকে আরেক দেশে।

মনে পড়ে, আমার মায়ের যখন ইন্তেকাল হয় তখন আমি সফরে ছিলাম। তাই তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারিনি। এই বেদনা আমি আজো ভুলতে পারিনি। তাই এই নারীও কাছেই বাবা মারা গেছেন বলে বাবার লাশ দেখতে যাওয়ার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দেননি। ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দিয়েছেন। অতঃপর যখন তার বাবাকে দাফন করা হয়ে গেছে তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে পাঠালেন, শুভ সংবাদ শোন! আল্লাহ তাআলা তোমার বাবাকে বেহেশত দান করেছেন। এ হলো ধৈর্যের পুরস্কার।

আল্লাহর ভয়

তারপর যে গুণটির কথা আলোচনা করা হয়েছে তা হলো আল্লাহর ভয়। প্রতিটি মুসলমান পুরুষ ও নারীর মধ্যেই আল্লাহর ভয় থাকা একান্ত কাম্য। আল্লাহর ভয় মূলত মানুষের হৃদয়ে একটি বিশেষ অবস্থা ও অনুভূতির নাম। হৃদয় আল্লাহর ভালোবাসায় এমন পূর্ণ থাকবে যে, তার অবাধ্যতার কথা ভাবতেই অন্তর কেঁপে উঠবে। এর অর্থ এই নয়, হৃদয় সর্বদা আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবে। এই ভয় প্রতিটি নারী এবং পুরুষের মাঝেই থাকতে হবে। এই ভয়ই মূলত ঈমানদারগণকে সর্বদা সব রকমের অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে দিবসের আলোতেও, রাতের অন্ধকারেও।

সম্ভ্রম রক্ষা

হালাকু খান যখন বাগদাদ জয় করে তখন মুসলমানদের খলীফা ছিলেন আমিরুল মুমিনীন মু'তাসিম বিল্লাহ। সর্বশেষ এই আব্বাসী খলীফাকে হালাকু খান হত্যা করে ফেলে এবং তাঁর বেগমকে কব্জা করে ফেলে। বেগম ভাবলো, এখন তো আমার সম্ভ্রম যাবে। আমি কি করতে পারি? কী করে আমি আমার সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারি? তখন সে ঘরের এক সেবিকাকে ডেকে তার কানে কানে কি যেন বললো। তারপর তারা উভয়ে মিলে হাজির হলো হালাকু খানের সামনে। দাসী এসে বললো, হে মহান অধিপতি! আব্বাসী খান্দানের মেয়েদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্যটি হলো, তাদের গলায় তলোয়ার চলে না। হালাকু খান ছিল তপ্ত মেজাজের মানুষ। সে ভাবলো, এটা কি করে হয়! তলোয়ার তাদের বেলায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে, এটা কী করে সম্ভব? সেবিকা বললো, যদি অনুমতি হয় তাহলে পরীক্ষা করে দেখাতে পারি। হালাকু খান বললো, দেখাও! তখন সে একটি কোষমুক্ত তলোয়ার নিয়ে বেগমের গর্দানে আঘাত করতেই বেগম দু'টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

এই হলো আল্লাহর ভয়। শির দিয়েছে কিন্তু সম্ভ্রম দেয়নি। এই ঘটনায় হালাকু খান এতটা ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, সে তার চুল খামচে

দয়ে চিৎকার করতে থাকে- এই দাসী তো আমাকে প্রবঞ্চিত করলো। অতঃপর সে দাসীটিকে নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে হত্যা করে। সে হত্যার দৃশ্য যারাই দেখেছে তারাই শিউরে উঠেছে। কিন্তু আল্লাহভীতু সেই ভাগ্যবান নারী জীবন দিয়েছে তবুও ইজ্জত দেয়নি। এদেরই প্রশংসা করেছেন আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামে- 'আল্লাহকে ভয়কারী পুরুষ ও আল্লাহকে ভয়কারী নারীগণ...'।

আল্লাহ তাআলা প্রশংসা করেছেন আল্লাহর নামে অর্থ ব্যয়কারী নারী ও পুরুষদের। এক পয়সা দু'পয়সা করে অর্থ সঞ্চয় করা নারীদের স্বভাব। আজকাল এ স্বভাব পুরুষদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ তাআলা মুমিন পুরুষ ও নারীদের যে গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন তাহলো 'আল্লাহর পথে দানশীল. পুরুষ ও দানশীল নারী'। সুতরাং পরিপূর্ণ অর্থে মুমিন মুসলমান হতে হলে নারী-পুরুষ সকলকেই আল্লাহর নামে অর্থ দানের চরিত্র অর্জন করতে হবে।

এক ওলীর দান

এক ওলীর স্ত্রী আটার খামিরা তৈরি করে প্রতিবেশীর ঘরে গেছেন আগুন আনতে। এদিকে এক ফকীর এসে আল্লাহর নামে হাঁক দিয়েছে। ঘরে তখন সেই সামান্য খামিরা করা আটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই মাখানো আটাটুকুই তিনি ফকীরের হাতে তুলে দিলেন। স্ত্রী আগুন নিয়ে এসে যখন দেখলেন নির্দিষ্ট স্থানে আটা নেই, তখন স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, আটা কোথায়? স্বামী বললেন, এক বন্ধু এসেছিল। তাকে রুটি তৈরি করার জন্যে আটাগুলো দিয়ে দিয়েছি। স্ত্রী কিছু সময় অপেক্ষা করলেন। কিন্তু কেউ আসছে না। অবশেষে বললেন, মনে হয় আটাগুলো আপনি দান করে দিয়েছেন। ওলী বললেন, হ্যাঁ। স্ত্রী বললেন, আল্লাহর বান্দা! অন্তত একটি রুটি পরিমাণ আটা রেখে দিতেন! দুইজনে ভাগ করে খেয়ে নিতাম। বুযুর্গ বললেন, আমি খুবই ভালো বন্ধুকে দিয়েছি। চিন্তা করো না। কিছুক্ষণ পরই দরোজায় আওয়াজ শোনা গেল। বুযুর্গ উঠে গেলেন। দেখলেন তাঁর বন্ধু উপস্থিত। তার এক হাতে গোশত বোঝাই একটি পেয়ালা, আরেক হাতে রুটি বোঝাই একটি পাত্র। বুযুর্গ

হাসতে হাসতে ভেতরে আসলেন। বললেন, দেখ! আমি তো আমার বন্ধুকে খালি আটা দিয়েছিলাম। আমার বন্ধু এমন দয়ালু, তিনি রুটি তৈরি করে তার সাথে গোশত রান্না করে পাঠিয়েছেন।

মূলত আল্লাহর রাস্তায় দান করার বিষয়টি এমনই। তাই আমি আমার প্রিয় বোনদেরকে বলবো, আমাদের কর্তব্য সঞ্চয় নয়। বরং আমরা আমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর নামে দান করতে শেখাবো। শেখাবো এই পয়সা অবশ্যই একদিন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ফিরিয়ে দিবেন।

মেয়েদের স্বভাব হলো তারা যাকাত দেয় না। অলংকারের যাকাত দেয় না। অথচ তারা ভেবে দেখে না, যাকাত না দেয়ার কারণে এই অলংকারই একদা আগুন হয়ে তাকে দগ্ধ করবে। আমাদের সমাজে মুসলমান এমন অনেক বিত্তবান আছে যারা যাকাত দেয় না। অথচ যাকাত ইসলামের একটি অকাট্য বিধান।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বদান্যতা

হযরত আয়েশা (রা.) রোযা রেখেছেন। এ অবস্থায় কোথাও থেকে এক লাখ দেরহাম তাঁর কাছে উপহারস্বরূপ এসেছে। সেকালের এক লাখ দেরহামকে যদি আজকের বাজার অনুযায়ী হিসাব করা হয় তাহলে তার মূল্য দাঁড়াবে বিশ লাখ রুপি। হযরত আয়েশা (রা.) দেরহামগুলো একটি পাত্রে রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেললেন। তারপর ঘরের দাসীকে বললেন, মদীনার অসহায় গরীব-দুঃখীদেরকে ডেকে আনো। দলে দলে গরীর-দুঃখীরা আসছে। আর তিনি মুঠোয় মুঠোয় তাদের হাতে দেরহাম তুলে দিচ্ছেন। অথচ তাঁর ঘরে চলছে অনাহার। ঘরে এক মুঠো খাবার নেই। দান করতে করতে যখন আসরের সময় হলো তখন পাত্র শূন্য হলো। ঘরের দাসী এসে বললো, আম্মাজান! অন্তত একটি দেরহাম যদি রেখে দিতেন তাহলে গোশত কিনে আপনাকে রান্না করে দিতাম। আপনি রোযা রেখেছেন। ঘরে তো খাবার কিছু নেই। বললেন, বেটি! আগে বলোনি কেন? আগে মনে করিয়ে দিতে! তাহলে একটি দেরহাম রেখে দিতাম। যাঁর ঘরে অবিরাম দারিদ্র ও অনাহার চলছে তিনিই তুলে

গেছেন তাঁর ঘরের অভাবের কথা। বলো, পৃথিবীতে কেউ এমন নারী দেখেছে কি?

বুযুর্গের দুয়ারে ভিক্ষুক

হযরত আবু উমামা বা'লী (রহ.)-এর দুয়ারে এক ভিক্ষুক উপস্থিত। তখন তাঁর কাছে ত্রিশটি দেরহাম ছিল। ভিক্ষুক আল্লাহর নামে মাগুতেই ত্রিশটি দেরহাম তিনি ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিলেন। তাঁর ঘরেই এক দাসী ছিল খৃষ্টান। হযরত আবু উমামা (রহ.) ছিলেন রোযা। এই কাণ্ড দেখে দাসীটি খুবই ক্ষুব্ধ হলো। সে বলে, ঘটনাটি দেখে আমার মনে খুব রাগ হলো। আল্লাহর বান্দা সবগুলো পয়সা ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিল। নিজের জন্যেও কিছু রাখলো না, আমাদের জন্যেও কিছু রাখলো না। অথচ রোযাদার। নিজেও ক্ষুধায় মরলো, আমাদেরকেও ক্ষুধায় মারলো। দিন গড়িয়ে যখন আসরের সময় হলো তখন আমার মনের ভেতর তাঁর প্রতি দয়ার সৃষ্টি হলো। ভাবলাম, আল্লাহর নেক বান্দা। রোযা রেখেছে। আচ্ছা, আমিই তাঁর ইফতারের ব্যবস্থা করি। আমি প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে কিছু খাবার ধার করলাম এবং ইফতারির ব্যবস্থা করলাম। তারপর যখন তাঁর বিছানা ভাঁজ করতে গেলাম তখন তাঁর মাথার কাছে দেখি তিনশ'টি দিনার পড়ে আছে। আমি তখন বললাম, আচ্ছা এই কাণ্ড! এজন্যেই সবগুলো দেরহাম দান করে দিয়েছেন! আর দিনারগুলো এখানে লুকিয়ে রেখেছেন! আমাকে বলেনওনি।

সন্ধ্যায় যখন হযরত আবু উমামা (রহ.) ঘরে ফিরলেন তখন সে বললো, আপনি এতগুলো পয়সা এখানে রেখেছেন তা আমাকে বলবেন না? আমি মনে করেছি ঘরে কিছুই নেই। তাই প্রতিবেশীর কাছ থেকে খাবার ধার করেছি। ঘরে যখন পয়সা ছিল তখন তো আমি বাজার করেই আনতে পারতাম। বুযুর্গ বললেন, পয়সা কোথায়? বললো, এই যে আপনার মাথার কাছে বালিশের নিচে। বুযুর্গ বললেন, আল্লাহর কসম! এখানে তো একটি পয়সাও ছিল না। দাসীটি বললো, তাহলে এ পয়সা কোত্থেকে এলো। হযরত আবু উমামা বললেন, আমার প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে।

আমাদের বোনদের কর্তব্য হবে তাদের সন্তানদের সামনে এসব কথা তুলে ধরা এবং তাদেরকে এই আদর্শে গড়ে তোলা।

রোযা এবং আল্লাহর রাসূল (সা.)

অতঃপর যে গুণটির কথা আলোচনা করা হয়েছে তাহলো রোযা। এ রোযাও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখবে সে সারা বছর রোযাদার হিসেবে বিবেচিত হবে। যে ব্যক্তি পুরো রমযান মাস রোযা রাখবে এবং প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখবে আল্লাহ তাআলার দরবারে সে সারা বছর সিয়াম পালনকারী হিসেবে গণ্য হবে। বরং তিনি বিষয়টিকে আরও সহজ করে বলেছেন– যদি কোন ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখে অতঃপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে সেও সারা বছর রোযা পালনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

নবম বৈশিষ্ট্য

অতঃপর নবম বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

স্বীয় আব্রু সংরক্ষণকারী ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ। অর্থাৎ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী নারী ও পুরুষ।

দশম বৈশিষ্ট্য

দশম বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর যিকরকারী মুসলমান নারী ও পুরুষ। আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো, কাপড়ের প্রশংসায় মেয়েদের জিহ্বা কত দ্রুত চলে। কোথাও রাজনীতির আলোচনার সূত্রপাত হলে পুরুষের জিহ্বা কত দ্রুত সঞ্চালিত হয়। দোকানে ক্রেতাকে জয় করার জন্যে দোকানদার কত দীর্ঘ বক্তৃতা করে। ঘরের সন্তানদের এবং ঘরের বউয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে পুত্রের সামনে শাশুড়ি কত দীর্ঘ অভিযোগ বক্তৃতা করে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন, ঠোঁট বন্ধ রাখ।

মুখ বন্ধ রাখ। বুকে যদি তীর বিদ্ধ হয় তবুও মুখ বন্ধ রাখ। কারও গীবত করো না, দোষচর্চা করো না। এই জিহ্বার একমাত্র কাজ হলো আল্লাহকে স্মরণ করা। জিহ্বাকে সদাই আল্লাহর স্মরণে আল্লাহর যিকরে মশগুল রাখ। তাহলে দেখবে, বারবার মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে। কবরে গিয়ে স্মরণ হবে আল্লাহর নাম।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) ইন্তেকাল করার পর স্বপ্নে তাঁর সেবিকা তাঁকে দেখে প্রশ্ন করলো– আম্মাজান! আপনার সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে? বললেন, কবরে শায়িত হওয়ার পর মুনকার নাকীর এসে আমাকে প্রশ্ন করলো– তোমার প্রভু কে? আমি বললাম, জীবনে কখনও যে প্রভুকে ভুলিনি মাত্র চার হাত মাটির নিচে আসতেই তাঁকে ভুলে গেলাম। অর্থাৎ এ কথা বলেননি, আমার রব আল্লাহ। বরং উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়ে মেরেছেন, সারা জীবন যাঁকে ভুলিনি মাত্র চার হাত মাটির নিচে এসে তাঁকে ভুলে গেলাম? তখন ফিরিশতা বললো, রাখো! এঁর আবার কিসের হিসাব? সেবিকা বললো, আম্মাজান! আপনার জুব্বাটার কি খবর? অর্থাৎ রাবেয়া বসরীর একটি বিশাল ঢিলেঢালা জুব্বা ছিল। এই ধরনের পোশাক সেকালে আরবরা পরতো। আমাদের দেশে এর প্রচলন নেই। হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) বলে রেখেছিলেন– আমি মারা যাওয়ার পর আমাকে আমার এই পুরনো জুব্বাতেই কাফন দিও। আমার জন্যে নতুন কাপড় আনা লাগবে না। তাই তাঁকে সেই পুরাতন জুব্বাতেই কাফন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন যখন সেবিকা তাঁকে উজ্জ্বল পোশাকে সজ্জিত দেখলো তখন তার মনে প্রশ্ন জাগলো, আপনার সেই জুব্বাটি কোথায়? বললেন, জুব্বাটি আল্লাহ তাআলা সামলে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন যখন আমার নেকী ওজন করা হবে তখন তার সাথে এই জুব্বাটিও ওজন করা হবে। মূলত তাবলীগের নামে এই যে আমাদের সাধনা এর মূল লক্ষ্য হলো এই দশটি গুণ প্রতিটি মুসলমান পুরুষ ও নারীর মধ্যে সৃষ্টি করা। আমি যা কিছু বলেছি আল্লাহ তাআলার কালামের আলোকেই বলেছি। আমি আপনাদের সামনে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথাগুলোই উপস্থাপন করেছি এবং এগুলোই পৃথিবীর সকল নারী ও পুরুষের পরিপূর্ণ সফলতার নিশ্চিত পথ। মুক্তি পেতে হলে সফলকাম হতে হলে এই গুণগুলো আমাদেরকে অবশ্যই

অর্জন করতে হবে। তাছাড়া এ বিষয়গুলো সূর্যের আলোর মতোই উজ্জ্বল ও স্পষ্ট। মূলত আমরা যে তাবলীগে যেতে বলি, এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পথে বেরিয়ে এই গুণগুলোর চর্চা করা, অনুশীলন করা।

এক নর্তকীর ইসলাম গ্রহণ

একবার আমাদের একটি জামাত কানাডায় গিয়েছিল। সেখানে ভারতীয় একজন কর্নেল ছিলেন। নাম আমীরুদ্দীন। কিন্তু থাকেন কানাডাতেই। কানাডার বিখ্যাত শহর Danvir -এ একটি মুসলমান ক্লাব আছে। সেখানে নাচ-গান হয়। সেখানে জামাত গাশতে গিয়েছে। কর্নেল আমীরুদ্দীন সাহেব বুড়ো মানুষ। তাই তাকে গাশতে পাঠানো হয়েছিল। তিনি ক্লাবে গেলেন। গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- এখানে কি হচ্ছে? লক্ষ্য করলেন, স্টেজে একজন মেয়ে উলঙ্গপ্রায় অবস্থায় নাচছে, আরেকজন ছেলে তার সাথে ড্রাম বাজাচ্ছে। আর উপস্থিত দর্শক যারা আছে তারা সকলেই মুসলমান। আরব যুবকরা বসে বসে মদ পান করছে। আমাদের কর্নেল সাহেব ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। চেহারা বিশাল আকৃতির। মুখে সাদা দাড়ি। তাছাড়া সারা জীবন কাটিয়েছেন ফৌজি হিসেবে। তিনি ক্লাবে ঢুকেই জোরে ধমক দিলেন। তাঁর ধমকে নর্তকী চুপ হয়ে গেল। থেমে গেল তার নাচ। যারা বসে বসে মদ পান করছিল তারাও থমকে গেলো। দেখলো চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ। সবাই চকিত হয়ে তাঁর দিকে তাকালো। তিনি ভারী ও গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, আমার কথা শোন! তারপর তিনি তাদেরকে দীনের দাওয়াত দিতে লাগলেন। তখন নর্তকী মেয়েটি চুপে চুপে স্টেজ থেকে নেমে এসে হোটেলের পর্দা গায়ে জড়িয়ে তাঁর কথা শোনতে থাকে। হোটেলে উপস্থিত দর্শকরা সকলেই ছিল তখন মদ পানে মাতালপ্রায়। তাই তারা টেরও পায়নি কখন এই নর্তকী তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন কর্নেল সাহেবের কথা শেষ হলো তখন নর্তকী বলে উঠলো, আপনি যে কথাগুলো বলেছেন তার সবক'টি কথাই আমি বুঝেছি। এরা কেউ বুঝতে পারেনি। এখন আপনিই বলুন, আমি কী করতে পারি? আপনি যে জীবনের সন্ধান দিয়েছেন আমি সে জীবন চাই। কর্নেল সাহেব বললেন, আমি বলবো তুমি কালিমা পড়ে নাও। নর্তকী

বললো, আমাকে কালিমা পড়িয়ে দিন। কর্নেল সাহেব সেখানেই তাকে কালিমা পড়িয়ে দিলেন। মেয়েটি বললো, আমার সাথে যে ড্রাম বাজাচ্ছিল সে আমার স্বামী। তাকেও কালিমা পড়িয়ে দিন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলো। তারপর বললো, বলুন, এখন আমাদেরকে কি কি করতে হবে? কর্নেল সাহেব বললেন, আমাদের এই জামাত এখানে তিনদিন থাকবে। তোমরা আমাদের কাছে এসো। আমরা তোমাদেরকে কি করতে হবে তা বলে দিবো।

তারপর প্রতিদিনই তারা আসতে থাকে। কর্নেল সাহেব তাদেরকে দীনের কথা বলতে থাকেন। তারপর জামাত যখন সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে তখন কর্নেল সাহেব তাদের হাতে Danvir -এ অবস্থিত একটি ইসলামিক সেন্টারের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দিয়ে বলেন– আমি এখানেই আছি। যখনই কোন প্রয়োজন পড়বে আমাকে ফোন দিও।

দুই মাস পর এই মেয়ে ফোন করে বললো– হ্যালো মিস্টার কর্নেল আমীরুদ্দীন! কর্নেল সাহেব বলেন, আমি আওয়াজ শোনেই অনুমান করলাম এ সেই নর্তকী মেয়েই হবে। আমি তাকে ইঙ্গিত দিতেই সে বললো, হ্যাঁ, আমি সেই নর্তকী। বললাম, বলো কি হয়েছে? বললো, বিরাট সমস্যা। বললাম, খুলে বলো বিষয়টা কি? সে জানালো, আমি তো একজন নর্তকী! আমি যখন নৃত্য পরিবেশন করতাম তো রাত পিছু পাঁচশ' ডলার নিতাম। এখন মুসলমান হওয়ার পর জানতে পারলাম ইসলাম নারীকে ঘরের বাইরে যাওয়ারই অনুমতি দেয়নি। আমি আমার স্বামীকে বললাম, এখন তুমি রোজগার করবে, আমি ঘরে আছি। তার তো কোন পেশা ছিল না। পরে সে একটি ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ নিয়েছে। এখন সে দৈনিক চল্লিশ ডলার পারিশ্রমিক পায়। আমাদের পাকিস্তানী মুদ্রা মানে তিন হাজার রুপি। অথচ এই নর্তকী রাত পিছু পেতো আমাদের দেশী মুদ্রায় ত্রিশ হাজার রুপি। সে আরও বললো, আমাদের ব্যবহারের যে গাড়িগুলো ছিল সেগুলো বিক্রি করে দিয়েছি। এখন আমরা দুই কামরার ছোট্ট একটি বাড়িতে ভাড়া থাকি।

আজকাল তো আমাদের দেশের মেয়েদের শরীর প্রতিদিনই একটু একটু করে পোশাক মুক্ত হচ্ছে। ধীরে ধীরে পূর্ণ উলঙ্গতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের নারী সমাজ। অথচ নওমুসলিম এই নর্তকীর কাহিনী শুনুন। সে

কর্নেল আমীরুদ্দীনকে প্রশ্ন করছে- আপনি তো বলেছিলেন আমরা যেন অন্যদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পেশ করি। আচ্ছা, আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়া তো মুসলমান পুরুষদের দায়িত্ব। এটা কি মেয়েদেরও দায়িত্ব? কথা প্রসঙ্গে সে আরো বলে, আমি ও আমার স্বামী বাসে চড়ে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। আমি হেলান দিয়ে বসা ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ করে ড্রাইভার ব্রেক কষে। ফলে আমি ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাই। তখন আমার গায়ে যে জামা ছিল তার হাতা পেছনে সরে গিয়ে আমার হাতের এক চতুর্থাংশ বেরিয়ে পড়ে। এখন আমার হাতের এই অংশটি কি দোযখে যাবে? এ কথা বলেই সে টেলিফোনে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে?

আমি বলি, বোনেরা আমার! লক্ষ্য কর। এক নর্তকী নারী। তন্বী তরুণী। মাত্র দু'মাস হলো ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর তাতেই তার ভেতরে এই ভয় ঢুকেছে- আমার শরীর যে আবরণ মুক্ত হয়ে পড়লো এটা আবার জাহান্নামে যাবে না তো? আমরা মূলত জামাতে ঘুরে ঘুরে মুসলমান নারী ও পুরুষকে এই গুণগুলোর কথাই বলি। আমরা বলি, উলঙ্গপ্রায় যেসব নারী পথেঘাটে ঘুরে বেড়ায় তারা তোমাদের আদর্শ নয়। তোমাদের আদর্শ হলো আম্মাজান হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.), হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত মায়মুনা (রা.)।

প্রসঙ্গত আরেকটি ঘটনা মনে পড়লো। আমেরিকার নওমুসলিম মেয়েদের একটি জামাত একবার রাইভেন্ড-এ চল্লিশ দিনের জন্যে আগমন করে। আমাদের দেশ থেকেও বিভিন্ন দেশে মেয়েদের জামাত যায়। আমি নিজেও আমার স্ত্রীর সাথে কয়েকবার সৌদী আরব, কাতার, আরব আমীরাত, কানাডা এবং আমেরিকায় গিয়েছি। আমাদের এই সফরের দ্বারা আমরা বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখেছি। এই আধুনিককালের মেয়েদের মধ্যেও। একেক শহরে ষাট সত্তরজন মেয়েকে তিন চার দিনের মধ্যে গায়ে বোরকা ওঠাতে দেখেছি। দেখেছি তারা অনেকেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। হাজার হাজার ডলারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে পড়েছে। আর যারা চাকরিতে রয়েছে তারাও বোরকাসহই রয়েছে।

আমেরিকান এই নওমুসলিম মেয়েদের জামাতটি করাচি হয়ে আসছিল। তারা যখন বিমান বন্দরে এসে নামে তখন তাদের পেছনে মুসলমান মেয়েরাও দাঁড়ানো ছিল। এক ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা তখন তাদেরকে বোরকা পরিহিত অবস্থায় দেখে ঠাট্টা করে বলেছিল- তোমাদের পেছনে

যারা দাঁড়ানো তারাও তো মুসলমান মেয়ে! পেছনে দাঁড়ানো মেয়েদের গায়ে খুব সংক্ষিপ্ত পোশাকই ছিল। তখন আমেরিকান নওমুসলিম মেয়েরা বলে উঠলো, এরা আমাদের আদর্শ নয়। আমরা এদেরকে দেখে ইসলাম গ্রহণ করিনি। আমাদের আদর্শ হলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণ। তারপর তারা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলো, আমরা আমাদের চেহারা তোমাদেরকে দেখাবো না। তোমাদের সাথে নারী কর্মকর্তা আছে। তাদেরকে পাঠাও। কিন্তু নারী কর্মকর্তা তাদের সামনে আসতেই তারা নেকাব ফেলে সঙ্গে সঙ্গে চেহারা ঢেকে ফেলে। তখন বিস্মিত হয়ে সে নারী কর্মকর্তা বলে, আমার সাথে পর্দা করছো কেন? আমি তো তোমাদের মতই একজন মেয়ে। নওমুসলিম মেয়েরা তাকে উত্তর দেয়– আমাদের ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে যে নারী বেপর্দায় থাকে তার সাথেও পর্দা করতে হবে। তাই তোমাকে দেখেও আমাদের লজ্জা হচ্ছে। এজন্য আমরা মুখ ঢেকে ফেলেছি।

প্রিয় বোনেরা আমার!

আজ আমাদের প্রয়োজন পরিপূর্ণরূপে মুসলমান হওয়া। তাছাড়া আমরা যদি আমাদের সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যত চাই তাহলে একমাত্র মায়েরাই পারে সন্তানদেরকে সুন্দর গুণে গুণান্বিত করে গড়ে তুলতে। মায়েরাই চাইলে পারে কন্যাদেরকে ছোট বয়স থেকেই পর্দায় অভ্যস্ত করে তুলতে। মায়েরাই পারে ছোট বয়স থেকেই সন্তানদেরকে নামাযী করে তুলতে। মায়েরাই পারে তাদের কোমল হৃদয়ে হালাল-হারামের ব্যবধান ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যের বীজ রোপন করতে। আমরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে এসব ঈমানী গুণে গড়ে তুলতে না পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যত হবে খুবই অন্ধকার। অন্ধকার হবে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যত। তাই প্রতিটি মায়েরই কর্তব্য হলো ঘরে নিয়মিত সাহাবায়ে কেরামের জীবনী কবর হাশর ও আখিরাত বিষয়ক ঘটনাবলী বাচ্চাদেরকে বলে শোনানো এবং সেই আদলে তাদেরকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করা। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন। ꘎

বয়ান : ৫

আল্লাহ তাআলার সাক্ষী

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَاتَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ- اَوْكَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন– হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে। [ফাতির : ৫]

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

এই সমগ্র সৃষ্টি জগত আল্লাহ তাআলারই অবদান। বিশ্ব জাহান তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আমি মানুষ, আপনি মানুষ। আর এই যে আমাদের শক্তি ও সম্ভাবনা– এগুলো অর্জন করতে আমাদের কি কোন কিছু ব্যয় করতে হয়েছে? আমরা নারী ও পুরুষরা কি ইলেকশন করে আমাদের এই জীবন অর্জন করেছি? এই যে ময়লা আবর্জনার ড্রেন রয়েছে, সেই ড্রেন দিয়ে পোকা-মাকড় সাঁতার কাটছে। আমি তো তার একটি পোকাও হতে পারতাম। হতে পারতেন আপনিও। আবার আল্লাহ চাইলে এক মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু ধ্বংসও করে দিতে পারেন। তাঁর মধ্যে সকল ক্ষমতাই রয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন–

وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَالَا تَعْلَمُوْنَ

তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারি যা তোমরা জান না। [ওয়াকিয়া : ৬১]

এই আয়াতে মূলত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাবধান করেছেন। বলে দিয়েছেন, চাইলে তোমাদেরকে এমন আকৃতিতে বদলে দিতে পারি যা তোমরা কল্পনাও করতে পার না। তাফসীর বিশারদগণ লিখেছেন– এর অর্থ হলো আমি চাইলে তোমাদের রূপ বিকৃত করে বানর কুকুর সাপ-বিচ্ছুতেও পরিণত করতে পারি। তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন। মহান বাদশাহ তিনি। সমগ্র মখলুক তাঁর। এই জগতে তিনি এমন একটি পাতা সৃষ্টি করেছেন যার সুবাসে পুরো ঘর সুবাসিত হয়ে ওঠে। আবার এমন বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন যার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কাঁটার আচড়ে শরীর থেকে রক্ত ঝরে। আবার এমন বৃক্ষ তৈরি করেছেন যার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফলে ঝুড়ি পূর্ণ হয়ে ওঠে। বাবলা বৃক্ষকে কাঁটা দিয়ে, গোলাপকে সুন্দর রঙ ও খুশবো দিয়ে, চামেলিকে শুভ্র রঙের প্রস্ফুটিত পাপড়ি দিয়ে, আঙুর গাছকে থোকা থোকা ফল দিয়ে, পাহাড়কে শুভ্র বরফের চাদর দিয়ে, মাটিকে সবুজ ঘাসের কার্পেট দিয়ে তিনিই তো সাজিয়েছেন। তাঁর সে ক্ষমতা সৃষ্টি ও অবদানকে কি শুমার করা যায়?

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ

তিনি প্রতিদিনই গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত। [রাহমান : ২৯]

তাঁর শানই বিস্ময়কর। যখন তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতার দিকে আমরা তাকাই তখন বিস্মিত না হয়ে পারি না। কত রঙ কত ফুল কত রূপ! তিনি তাঁর বিপুল শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছেন। আর আমরা এখানে এসেছি মাত্র চারদিনের জন্যে। যেন মুসাফিরের যাত্রা পথে একটি স্টেশন মাত্র। স্টেশনে যেভাবে যাত্রা বিরতি ঘটলে কেউ এদিকে বসে পড়ে কেউ ওদিকে। অতঃপর যার যার গন্তব্যে চলে যায়। তিনিই তো এই চলার পথকে দু'দিনের পান্থশালাকে এই অস্থায়ী স্টেশনকে সৃষ্টি করেছেন। সমুদ্রে দিয়েছেন স্বতন্ত্র সৌন্দর্য। সূর্য যখন সমুদ্র বক্ষে অস্তমিত হয় তখন তার সে কি অপরূপ রূপ। আবার পাহাড়ের শৃঙ্গ বেয়ে সকালে যখন সূর্য তার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় সে রূপ আরও ভিন্ন। মরু সাহারায় যখন সূর্য উদিত হয় তার রূপ আলাদা। মাঠে অবুঝ জানোয়ারগুলো যে চড়ে বেড়ায় তার সৌন্দর্যও আলাদা। সন্ধ্যায় দল বেঁধে বন-বিহঙ্গরা যে আপন আলয়ে ছুটে যায় আবার নিজ নিজ বাসা ছেড়ে কিচির-মিচির রব তুলে সারিবদ্ধভাবে যে বেরিয়ে পড়ে তার সৌন্দর্যও সম্পূর্ণ আলাদা। কোকিলের মধু কণ্ঠ, বুলবুলের অকৃত্রিম সুর, ময়ূরের চির সুন্দর পেখম সবকিছুই আলাদা। ময়ূরের নাচন আলাদা। বনে নাচন তুলে যে হরিণের দল ছুটে চলে সেই দৃশ্যও কম সুন্দর নয়। বাঘের ভয়ানক পাঞ্জা, তার মজবুত দাঁত এবং ভয়ঙ্কর চিৎকার, সাপদের ফণা তুলে তেজস্বী উত্থান কি কম সুন্দর। মানুষ প্রকৃতির এ সকল সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হয়, বিমুগ্ধ হয়। গাভীর স্তন থেকে নির্গত সাদা দুধ, মাঠে সবুজের ঢেউ খেলা দৃশ্য কার চোখ না জুড়ায়।

كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ

যেমন আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি। যদ্দারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়। [ইউনুস : ২৪]

আকাশ থেকে বর্ষিত পানিতে সিঞ্চিত হয়ে শূন্য মাঠ সবুজের চাদরে আবৃত হয়ে ওঠার দৃশ্য, কোথাও বা ফুলে ফুলে আকীর্ণ পুষ্প বাগিচা,

কোথাও বা সারি সারি ফলবান বৃক্ষ সবই আমাদেরকে আলোড়িত করে। কখনও বা ফুলের সুবাসে আমাদের মনপ্রাণ মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। হাজার হাজার মাইল ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ফুলের গন্ধ।

এই বরফ আচ্ছাদিত পর্বত শৃঙ্গ।

এই বর্ষণমুখর মেঘমালা।

আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ধারা।

এই প্রবাহিত নদী-নালা।

গড়িয়ে পড়া স্বচ্ছ পানির ঝরনা।

পানির কুলুকুলু ধ্বনি।

তরঙ্গে তরঙ্গে সৃষ্ট পানির বুদ্বুদ।

সন্তরণরত মাছের ঝাঁক।

অপরূপ বিচিত্র মৎসদল। যার সূক্ষ্ম রঙ, আকার ও আকৃতি দেখে মানুষ বিস্মিত হয়। আল্লাহ্ তাআলা কত সুন্দর করে এই জগত সৃষ্টি করেছেন। কোথাও বা রাস্তা নিচের দিকে চলে গেছে। কোথাও বা চলে গেছে উপরের দিকে। কোথাও জানোয়ারগুলো উপরের দিকে যাচ্ছে। আবার কোথাও নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। বিস্ময়কর এই সৃষ্টি লীলার যেন অন্ত নেই।

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ

বলো, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর। [আনআম : ১১]

তোমরা এই বিশাল বিস্তীর্ণ অতিথিশালা ঘুরে দেখ। চারদিনের এই পান্থশালাকে তিনি তাঁর রূপ-সৌন্দর্য দিয়ে কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন! এ হলো দু'দিনের অস্থায়ী পান্থশালার রূপ। যে রূপ সকলকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। তাহলে ভেবে দেখুন, সেই ঘরের রূপ কেমন হবে যে ঘরকে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ম বলেছেন। যে ঘরকে প্রতিদিন পাঁচবার সজ্জিত করা হয়। আর এই বিশাল পান্থশালাকে সৃষ্টি করেছেন মাত্র ছয় দিনে। কোন ইট ব্যবহার করেননি। কোন পাথর জোড়া দেননি।

পরবর্তীতে কোন কিছু সংযোজনও করেননি। বরং এখানে প্রতিদিনই কিছু কিছু করে কমছে,হ্রাস পাচ্ছে।

বেহেশতের ঘর

আর সেই বেহেশত যেখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকারী গুণের পূর্ণক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। যাকে তিনি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। সেখানে কোন পাথর স্থাপন করেননি। মাটি ব্যবহার করেননি। কীলক কাঁটা কিছুই ব্যবহার করেননি। সেখানে ময়লা-আবর্জনার কোন নালা নেই। নেই দুর্গন্ধময় পানি। কোন আবর্জনা নেই। বালুর স্তূপ নেই। বিশুষ্ক মরুভূমি নেই। সেখানে চিৎকার করে পরিবেশ দূষিত করার কোন হিংস্র প্রাণী নেই। নেই দংশনকারী সাপ কিংবা ভক্ষক অজগর। সেখানে কোন খানা-খন্দক নেই। যেখানে কেউ পড়ে মারা যাবে। সেখানে কালো পাথর নেই। কুশ্রী আকৃতি নেই। নেই অসুন্দর কোন রূপ। তাকে আল্লাহ তাআলা যেদিন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচবার করে সাজাচ্ছেন। সেই সৃষ্টিকর্তা যাঁর এক ক্ষুদ্র ইশারায় এই আকাশ ও পৃথিবী মাত্র ছয় দিনে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ ءَ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

বলো, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। [হা-মীম সিজদা : ৯]

অর্থাৎ তিনি দুই দিনে এই বিশাল মৃত্তিকা জগত বিছিয়েছেন। দুই দিনে তাঁর যাবতীয় শৃঙ্খলা বিধান করেছেন। অতঃপর দুই দিনে এর মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন সকল খাদ্য সামগ্রী।

وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ

চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের সমভাবে যাচনাকারীদের জন্যে। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন। [হা-মীম সিজদা : ১০-১১]

خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا

যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। [মূলক : ৩]

এ সকল কিছু সৃষ্টি সমাপন করেছেন মাত্র ছ'দিনে। তাঁর 'কুন' নির্দেশে সৃষ্টি লাভ করেছে এ বিশাল জগত। তাঁর সৃষ্টিশীল অসীম ক্ষমতার প্রকৃত বিকাশ ঘটিয়েছেন বেহেশতে। বেহেশত নির্মিত হওয়ার পর থেকে প্রতিদিনই আল্লাহ তাআলা পাঁচবার এই ঘরকে সজ্জিত করেন। আল্লাহ তাআলা ঘর বানিয়েছেন নিজে। ফিরিশতাগণ বানায়নি। এই ঘর মাটি পাথর চুনা ও সিমেন্ট দিয়ে বানাননি। এই ঘর বানাবার পূর্বে নিজে তার নকশা তৈরি করেছেন। অতঃপর সেই নকশা মাফিক নির্মাণ করেছেন এই ঘর। এই ঘর নির্মাণ করেছেন সোনা-রূপার ইট, জমরত, ইয়াকুত পাথর দিয়ে। এখানে সবিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই ঘরের নকশাকারী ও নির্মাতা স্বয়ং আল্লাহ। ইঞ্জিনিয়ার ঘরের একটি নকশা তৈরি করে। তারপর অভিজ্ঞ মিস্ত্রি সেই নকশা অনুযায়ী বিল্ডিং নির্মাণ করে। তখন সে বিল্ডিং এক স্বতন্ত্র রূপ ও বৈশিষ্ট্য লাভ করে। ভেবে দেখুন, এই বাড়ি তিনি নির্মাণ করেছেন এমন মাটিতে যার মেজে স্বর্ণের। যার মশলা মেশকের এবং যার ঘাস জাফরানের। এই ঘরের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে ঝরনা। সে ঝরনা মধুর, পানির ও শরাবের। তার চারপাশে বিশাল বিস্তীর্ণ বাগান। যেখানে রয়েছে মেশকের পাহাড়। আম্বরের পাহাড়।

আল্লাহ তাআলা নিজে এই ঘরের নকশা তৈরি করেছেন, ভিত্তি রেখেছেন, নির্মাণ করেছেন নিজ হাতে। এর ডিজাইন তৈরি হয়েছে তার ইলম মাফিক। তিনি যেমন সুন্দর এই বাড়িও তৈরি করেছেন তেমনি সুন্দর করে। এখানকার আসবাবপত্র সবকিছুই রেখেছেন তিনিই। এমন তো হতে পারে না যে, এখানকার ফার্নিচারগুলো কারখানা থেকে এনেছেন। দর্জিদের তৈরি পর্দা ঝুলিয়েছেন। পর্দায় ব্যবহার করেছেন মিলের কাপড়। বরং এখানকার ফার্নিচার, পর্দা ও অন্যান্য উপকরণ সবই তাঁর

হাতে তৈরি। পূর্ণ সুষমায় আল্লাহ সজ্জিত করেছেন যে বাড়ি তাতে কি কোন ত্রুটি থাকতে পারে? অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিদিনই তিনি এই বাড়িকে পাঁচবার সজ্জিত করছেন এবং করবেন।

শুধুই নূর আর নূর

একবার ধ্যানের চোখে কল্পনা করে দেখুন, যে বাড়ি স্বয়ং আল্লাহ নির্মাণ করেছেন কেমন হতে পারে সে বাড়িটি?

بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা সর্বজ্ঞ। [ইয়াসিন : ১]

কোন ছোটখাট স্রষ্টা নন। তিনি এক মহাস্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতা এত বড়- দুর্গন্ধময় পানির দিকে যদি নজর দেন তাহলে সে পানি থেকে কত সুন্দর অবয়বপূর্ণ সৃষ্টি জন্মলাভ করে। সেই সৃষ্টিকর্তা যখন নূর থেকে আকৃতি গঠন করবেন সে আকৃতি কত যে সুন্দর হবে! তিনি যখন পাথরের প্রতি স্বীয় তাজাল্লী ঢেলে দিয়েছেন তখন পাথর রূপান্তরিত হয়েছে মর্মরে। পাথর হয়েছে জমরুদ। কয়লায় দৃষ্টি দিয়েছেন কয়লা হয়েছে হীরা। পানিতে দৃষ্টি দিয়েছেন তো পানি হয়েছে মোতি। রেশম পোকার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন সৃষ্টি হয়েছে রেশমি কাপড়। সেই প্রভুই যখন বেহেশতে তাজাল্লী দিবেন, তাছাড়া সেখানকার সকল সৃষ্টিই যখন নূর থেকে, নূরের তৈরি অট্টালিকা, নূরের তৈরি আকার, নূরের তৈরি রূপ, নূরের তৈরি যৌবন, নূরের তৈরি শক্তি, নূরের তৈরি বাহন, নূরের তৈরি আসবাব, নূরের তৈরি মাঠ, নূরের তৈরি বিছানা, নূরের তৈরি ঘাস, নূরের তৈরি ঝুলন্ত ফল, নূরের পরশে রোপিত বৃক্ষ, নূর থেকে উৎসারিত পানির ঝরনা, নূর ছোঁয়া পানি, নূর অতিক্রান্ত ফোয়ারা, নূরের তৈরি সমুদ্র, নূরের তৈরি নালা-প্রস্রবণ, নূর থেকে উৎসারিত শরাব, নূর থেকে সৃষ্ট জাম, পেয়ালা, নূর থেকে তৈরি বিছানা, কুরসী ও অন্য সকল আসবাবপত্র। যেদিকেই নজর পড়বে কেবল নূরই নূর। পৃথিবীর এই তুচ্ছ পাহাড়কে যিনি এত সুন্দর করে সাজিয়েছেন তাঁর সাজানো বেহেশত কেমন হবে? তাছাড়া তিনি তো সাধারণ সৃষ্টিকর্তা নন। বরং তিনি হলেন মহাসৃষ্টিকর্তা।

আমি বলছিলাম, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যাকে খুশি সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছেন, যাকে খুশি বানিয়েছেন শ্রীহীন। কাউকে উন্নত করে গড়েছেন, কাউকে করেছেন অতি সাধারণ। এই নির্বাচন কেবল আল্লাহর। তিনি এই উম্মতকে অন্য সকল উম্মতের চাইতে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। তিনিই আমাদেরকে তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় উম্মত করেছেন।

হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– হে আল্লাহ! আমার উম্মতের চাইতে ভালো উম্মতও কি আছে? মেঘ দিয়ে আপনি আমার উম্মতকে ছায়া দিয়েছেন। তাদেরকে মান্না-সালওয়া খাইয়েছেন। সুতরাং আমার উম্মতই তো শ্রেষ্ঠ উম্মত। আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, মুসা! আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত অন্য সকল উম্মতের চাইতে এতটা উত্তম, আমি একটি তুচ্ছ মাখলুকের চাইতে যতটা উত্তম। ভেবে দেখুন, কি বিস্ময়কর উপমা!

হযরত মুসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ তাআলার অতি প্রিয় একজন নবী। সেই প্রিয় নবীই যখন দীদার প্রত্যাশা করেছেন তখন আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন–

لَنْ تَرَانِيْ

তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। [আ'রাফ : ১৪৩]

তারপরও হযরত মুসা (আ.) বারবার আবদার করেছেন– না, আমাকে দেখতেই হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– এটা হযরত মুসা (আ.)-এর পক্ষেই সম্ভব ছিল, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা কত স্পষ্ট করে বলছেন, তুমি আমাকে কখনও দেখতে পাবে না। এ কথা বলেননি, তুমি আমাকে দেখবে না। বরং বলেছেন, তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবে না। তারপরও হযরত মুসা (আ.) বলছিলেন, আমাকে দেখতেই হবে। মূলত এ ছিল বাঁধনের দাবী। তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার অতি প্রিয়। প্রিয়তার এই অধিকার আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.)কেই দিয়েছিলেন।

সেই প্রিয় নবী আল্লাহ তাআলাকে বলছেন– হে আল্লাহ! এই শ্রেষ্ঠ উম্মত আমাকেই দিয়ে দাও না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন– আপনাকে তো এই উম্মত দিতে পারছি না। কারণ, এই উম্মত হলো আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত। মুসা (আ.) বললেন– যদি নাই দাও তাহলে অন্তত দেখাও। আল্লাহ তাআলা বললেন, দেখতেও পাবে না। কারণ, তুমি তো দুনিয়াতে চলে এসেছো, আর তাদের আগমনের এখনও কয়েক হাজার বছর বাকী। মুসা (আ.) আবদার করলেন, তাহলে তাদের আওয়াজ শুনিয়ে দাও। তখন আল্লাহ তাআলা তূর পাহাড়ে এই উম্মতকে এই বলে আহ্বান করেন–

يَاأُمَّةُ

হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত! সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উম্মাহ বলে ওঠে–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

তখন হযরত মুসা (আ.) বলে ওঠেন– হে আল্লাহ! এই উম্মতের আওয়াজ কত সুন্দর! তাদের কণ্ঠ কত সুন্দর। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– মুসা! এরা হলো সেই উম্মত যারা হাত উঠাবার আগেই আমি তাদের ডাক শোনবো। তাদের প্রতি কেউ বাঁকা দৃষ্টিতে তাকালে আমি তাদের দৃষ্টি বের করে ফেলবো। কেউ তাদের অবিচার করতে চাইলে আমি নিজেই তা প্রতিরোধ করবো। তবে এগুলো দুনিয়ার বিষয় নয়। তাই কারও মনে যেনো এ সংশয় সৃষ্টি না হয়, মুসলমানরা মার খাচ্ছে আল্লাহ কোথায় প্রতিরোধ করছেন? এই মুহূর্তে কুরআনে কারীমের একটি আয়াত আমার মনে পড়লো– আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يَضْحَكُوْنَ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ...وَاِذَا
انْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ

যারা অপরাধী তারা তো মুমিনদেরকে উপহাস করতো এবং তারা যখন মুমিনদের পাশ দিয়ে যেতো তখন

চোখ টিপে ইশারা করতো। আর যখন তাদের আপনজনদের পাশ দিয়ে ঘুরে আসতো তখন তারা ঘুরে আসতো উৎফুল্লচিত্তে। [মুতাফফিফীন : ২৯–৩১]

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ

আজ মুমিনগণ উপহাস করছে কাফেরদেরকে। [মুতাফফিফীন : ৩৪]

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

সুসজ্জিত আসন থেকে তাদেরকে অবলোকন করে কাফেররা তাদের কৃতকর্মের ফল পেলো তো? [মুতাফফিফীন : ৩৫–৩৬]

সুতরাং আল্লাহ যে মুমিনদের পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ নিবেন এ কেবল দুনিয়ার বিষয়ই নয়। আজ কাফের সম্প্রদায় ঈমানদারদের প্রতি বাঁকা দৃষ্টিতে দেখে, উপহাস করে। অহংকার করে বেড়ায়, আমরা এই করেছি, সেই করেছি। একটা দিন আসবে যেদিন কাফেরও মারা যাবে, মৃত্যুবরণ করবে মুমিনও। সেই দিনটাই হলো প্রকৃত দিন। সেদিন মুমিন বান্দাগণ সুসজ্জিত আসনে উপবিষ্ট থাকবেন আর তাদের পাশ দিয়ে তাদেরকে দেখে হেঁটে চলে যাবে কাফের সম্প্রদায়। এখন কাফেরদের হাসার দিন, আর সেদিন হাসবে মুমিন বান্দাগণ। কাফেররা সেদিন কেবলই কাঁদবে। এ কথাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন– আমি তাদের প্রতিশোধ নেবো। মূলত এটাই হলো আয়াতের মর্ম।

উম্মতের মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানকে করেছেন অন্যান্য উম্মতের তুলনায় অনেকগুণ বেশি।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا

কেউ কোন সৎকর্ম করলে সে তার দশগুণ প্রতিদান পাবে। [আনআম : ১৬০]

এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরয করেন- এই প্রতিদান তো অন্যান্য উম্মতের জন্যেও রয়েছে। সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের প্রতিদানকে আরও বাড়িয়ে দাও। তখন আল্লাহ তাআলা আরেকটি আয়াত নাযিল করেন। যে আয়াতে বলা হয়েছে কেউ যদি আল্লাহ তাআলাকে ঋণ দেয় আল্লাহ তাআলা তাকে তার প্রতিদান অনেক গুণ বাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু সে অনেক গুণ কত? সে কথা উল্লেখ করা হয়নি। অতঃপর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় দুআ করেন- হে আল্লাহ! আমার উম্মতের প্রতিদান আরও বাড়িয়ে দাও। তখন অবতীর্ণ হয়-

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্য বীজ। যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে। প্রত্যেক শীষে রয়েছে একশত শস্য দানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে বহু গুণে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। [বাকারা : ২৬১]

তারপর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় আল্লাহ তাআলার দরবারে মিনতি জানান- হে আল্লাহ! আমার উম্মতের প্রতিদান আরও বাড়িয়ে দাও। এবার আল্লাহ তাআলা হিসাব-কিতাবের গণ্ডি পরিহার করে ইরশাদ করলেন-

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।
[যুমার : ১০]

অর্থাৎ আপনার উম্মতের মধ্যে যারা ধৈর্যধারণ করবে আমি তাদেরকে বেহিসাব পুরস্কারে ভূষিত করবো। তারা যা চাইবে তাদেরকে তাই দেব।

এক কথায়, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুআর বরকতে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের প্রতিদানকে বৃদ্ধি করে এমন মাত্রায় নিয়ে গেছেন যেখানে অন্য কোন উম্মত কোনদিন পৌঁছতে পারবে না। অধিকন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমাদেরকে কাজ দিয়েছেন কম, প্রতিদান দিয়েছেন বেশি। আমাদের কর্তব্য ও পরিশ্রমের সাধারণ সময়সীমা হলো পঞ্চাশ বছর, ষাট বছর, সত্তর বছর। অথচ ইতোপূর্বে অন্যান্য উম্মতের দায়িত্বসীমা ছিল একশ' বছর দুইশ' বছর থেকে শুরু করে হাজার বছর পর্যন্ত। অথচ বনি ইসরাইলের একজন মুসলমান যে এই পৃথিবীতে পাঁচশ' বছর জীবিত ছিল প্রতিদানের বিচারে দেখা যাবে সে এই উম্মতের পঞ্চাশ কি ষাট বছরের একজন উম্মতের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। এ হলো আমাদের ও অন্যান্য উম্মতের মধ্যে পার্থক্য।

আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার আরেকটি অনুগ্রহ হলো তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সকলের শেষে। বনি ইসরাইলসহ অন্যান্য উম্মতের আগমন ঘটেছে আমাদের পূর্বে। এতে করে কিয়ামতের জন্যে আমাদের অপেক্ষার সময় তাদের তুলনায় অনেক কম। আপনি এখান থেকে লাহোর স্টেশনে গিয়ে যদি জানতে পারেন ট্রেন আসতে আরও আট ঘণ্টা দেরি হবে তখন আপনার মাথা নির্ঘাৎ গরম হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি দেখেন স্টেশনে যেতেই গাড়ি আসছে, তখন আর আনন্দের সীমা থাকে না। তখন সকলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। যাক, আজকে স্টেশনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষার যন্ত্রণা ভোগ করতে হলো না। কিয়ামতের জন্যে অপেক্ষাটাও অনুরূপ যন্ত্রণার বিষয়। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কিয়ামতের তীরে। যেন আমাদের কিয়ামতের অপেক্ষায় যন্ত্রণাদগ্ধ না হতে হয়। তাছাড়া সকল উম্মতের শেষে আমাদেরকে সৃষ্টি করে আমাদের প্রতি আরেকটি অনুগ্রহ করেছেন। আমরা শেষে এসেছি বলে পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনাবলী জানতে পেরেছি।

তাদের উত্থান-পতনের ইতিহাস জানতে পেরেছি। জানতে পেরেছি ফেরাউন কি করেছিল, হামান কি করেছিল, শাদ্দাদ কি করেছিল, আদ-সামুদ কি করেছিল।

তারপর যখন আমরা এলাম তখন আমাদের সকল ব্যর্থতা অপরাধ ও পাপকে তিনি এমনভাবে পর্দাবৃত করে দিলেন যে, আমাদের পর আর কোন জাতি নেই। আমাদের পর পৃথিবীতে এমন কোন জাতি ও গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে না যারা আমাদের পাপের ও পতনের ইতিহাস শুনবে। অথচ আমরা জানি, বনি ইসরাইল কি করতো। তাদের পরিণতির কথাও জানি। তারা যে বানরে শূকরে পরিণত হয়েছিল সে ইতিহাস আমরা পড়েছি। আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে জেনেছি, হযরত লূত (আ.) ও হযরত শোয়াইব (আ.)-এর জাতির পাপ ও পতনের কাহিনী। সাবা সম্প্রদায় কি করেছিল? হযরত হুদ ও সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায় কি করেছিল, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় কি করেছিল, কি করেছিল জাত পাপী ফেরাউন এ সবই আমরা জেনেছি। কিন্তু আমরা কি করেছি সে কথা আল্লাহ তাআলা কাউকে জানতে দেননি। এটা আমাদের প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ।

তারপর যখন হিসাব-কিতাবের পালা আসবে তখন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন— হে আল্লাহ! আমার উম্মতের হিসাব আমার দায়িত্বে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাআলা বলবেন, কেন? হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন— আমি চাই না অন্য কেউ আমার উম্মতের হিসাব নিক, আর তাদের সামনে আমার উম্মত লজ্জিত হোক। তখন আমাদের দয়াময় প্রভু বলবেন, প্রিয় রাসূল আমার! আপনি যদি তাদের হিসাব নিতে যান তাহলে তো তাদের পাপগুলো আপনার চোখে ধরা পড়বে। তখন তো তারা আপনার সামনে অবশ্যই লজ্জিত হবে। অথচ আমি আপনার উম্মতকে আপনার সামনেও লজ্জিত করতে চাই না। আমিই তাদের হিসাব নেবো এবং গোপনেই নেবো।

এই হলো এই উম্মাহর মর্যাদা। এই উম্মাহর শান ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বেহেশতে নেতৃত্ব লাভ করবে সে তো এই উম্মাহই। হযরত

হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.) বেহেশতের সরদার হবেন। বেহেশতি নারীদের সরদার হবেন হযরত ফাতিমা (রা.)। তাঁরা তো এই উম্মতেরই সদস্য। এই পৃথিবীতে এমন কোন নারী নেই যার বিয়ে আল্লাহ তাআলা আসমানে পড়িয়েছেন। কিন্তু হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রা.) এই উম্মাহর এমন এক গর্বিতা নারী যাঁর বিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং আকাশে। পৃথিবীতে এমন কোন উম্মত আজও আগমন করেনি যারা দুই রাকাত নফল পড়লে একটি হজের সওয়াব পেতে পারে। অথচ এই উম্মাহর যে কোন পুরুষ কিংবা নারী যদি ফজর নামায পড়ে মুসল্লায় বসে থাকে, অতঃপর সূর্য উপরে ওঠার পর দুই রাকাত নামায আদায় করে তাহলে সে এই দুই রাকাত নামাযের বিনিময়ে একটি হজ ও একটি উমরার প্রতিদান লাভ করে। আচ্ছা, মা-বাবাকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে একবার দেখলে হজের সওয়াব পাওয়া যায় এমন বৈশিষ্ট্য কি অন্য কোন উম্মতের আছে?

এর চাইতেও মজার আরেকটি বিষয় শুনুন, এই উম্মতের প্রতিটি পুরুষ ও নারী যতই বুড়ো হতে থাকে আল্লাহ তাআলার দরবারে ততই প্রিয় হতে থাকে। যখন এই উম্মতের কোন ব্যক্তি সত্তর কিংবা আশি বছরে উত্তীর্ণ হয় তখন আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদের মাঝে ঘোষণা করে দেন, একে আমি ভালোবাসি, তোমরাও ভালোবাস। কি আশ্চর্য! কাজকর্মে দুর্বল হয়ে পড়েছে, অথচ এর বিপরীতে আল্লাহর ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে। যখন আশি বছরে উত্তীর্ণ হয় তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করে দেন– আমার সত্তার কসম! আমি আশি বছরের কোন মুসলমান পুরুষ কিংবা নারীকে আযাব দেবো না। কি মজার কাণ্ড! এখন কোন বিশেষ দায়-দায়িত্ব নেই। আশি বছরে পা দিয়েছে, বেচারা কাজকাম করবেটাই বা কি? তার পক্ষে তো ফরয নামাযটাও যথারীতি আদায় করা কঠিন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ দেখুন! রিটায়ার্ডমেন্টে যাওয়ার পর শুধু পেনশানই নয় বরং বেতন ভাতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। দুনিয়াতে তো পেনশনও পায় না সকলে। অথচ আল্লাহ তাআলার বিচার দেখুন। তিনি শুধুমাত্র বেতন-ভাতাই বাড়িয়ে দেননি বরং ঘোষণা দিয়েছেন– আমি একে কোন আযাবই দিব না। এটাই মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য।

সাদা চুলের মর্যাদা

ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম (রহ.) ছিলেন একজন অনেক বড় মুহাদ্দিস। তিনি মারা গেলেন। বেঁচে থাকতে তিনি স্বভাবগতভাবে ছিলেন খুবই রসিক। হাসি তাঁর মুখে লেগেই থাকতো। অথচ ছিলেন সমকালীন সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস। তিনি ইন্তেকাল করার পর জনৈক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পেলো। দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো– আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কি আচরণ করেছেন? বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করালেন। বললেন, আরে পাপী বুড়ো! তুমি এই করেছো, সেই করেছো। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমি তো আপনার সম্পর্কে এমনটি শুনিনি যেমনটি আপনি বলছেন।

তাঁর ইলমের অবস্থা দেখুন! আল্লাহ তাআলার সাথে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যেমনটি বলছেন, আপনার সম্পর্কে তো আমি তেমনটি জানতাম না! আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার সম্পর্কে কী শুনেছো? তিনি বললেন–

حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْمَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِىِّ
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ زُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ جِبْرَائِيْلَ قَالَ، قَالَ اللهُ
تَعَالٰى اِنِّىْ اَسْتَحِيِىْ اَنْ اُعَذِّبَ شَيْبَةً فِى
الْاِسْلَامِ- وَاِنِّىْ شَيْبَةٌ فِيْهِ الْاِسْلَامُ

হে আল্লাহ! আমি আপনার সম্পর্কে যা শুনেছি তা পূর্ণ দলীলসহ আপনাকে শোনাচ্ছি। আমাকে আবদুর রাযযাক বলেছেন, তাঁকে বলেছেন মা'মার, তাঁকে বলেছেন যুহরী, তাঁকে বলেছেন ওরওয়া ইবনে যুবায়ের আর তাঁকে বলেছেন তাঁর খালা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), তাঁকে বলেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁকে বলেছেন হযরত জিবরাইল (আ.) যে, আল্লাহ তাআলা নিজ মুখে বলেছেন– যখন কোন মুসলমান বুড়ো হয়ে মারা যায় তখন আমি তাকে শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করি। হে আল্লাহ! তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ আমি বুড়ো হয়েই তোমার কাছে এসেছি। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন–

صَدَقَ عَبْدُالرَّزَّاقِ وَصَدَقَ مَعْمَرٌ وَصَدَقَ
زُهْرِيٌّ وَصَدَقَ عُرْوَةٌ وَصَدَقَتْ عَائِشَةُ رَضِ
وَصَدَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَصَدَقَ جِبْرَائِيْلُ قَالَ، وَاَنَا اَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ...

আবদুর রাযযাক সত্য বলেছে।

মা'মার সত্য বলেছে।

যুহরী সত্য বলেছে।

ওরওয়া সত্য বলেছে।

আয়েশা সত্য বলেছে।

আমার প্রিয় নবী সত্য বলেছেন।

জিবরাইল সত্য বলেছে। আর আমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী। যাও গিয়ে ফূর্তি কর। বেহেশতে যাও, বেহেশত উপভোগ কর।

এটা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। এই উম্মতের ভাগ্যে আল্লাহ তাআলা বেহেশতের মোহর অঙ্কিত করে রেখেছেন। এই উম্মতের জন্যে আল্লাহ তাআলা বেহেশতকে সহজ করে দিয়েছেন। সাহস করে সামান্য সাধনা করে নাও, দেখবে বেহেশত এসে তোমার পায়ে চুমু খাচ্ছে।

এই উম্মতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য

প্রশ্ন হতে পারে, এই সুযোগ শুধুই আমাদের বেলায় কেন? বলবো, এর একটি বড় কারণ হলো আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত এবং এটাই সবচে' বড় কারণ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত বানিয়েছেন এটাই আমাদের প্রতি সবচে' বড় করুণা। কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে তখন তার সে ভালোবাসা শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সে ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ে তার সন্তানদের মাঝেও। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে একটি বিশেষ কাজ দিয়েছেন। একটি বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন। আর

এটা এমন একটা দায়িত্ব যে দায়িত্বটা সাধারণভাবে নবীদের উপরই আরোপিত হয়। নবীগণের পর এই দায়িত্ব আমরা উম্মতে মুহাম্মদীই পেয়েছি। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অন্য সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, ভূষিত করেছেন সর্বোচ্চ মর্যাদায়। ইরশাদ হয়েছে−

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানব জাতির জন্যে সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষীস্বরূপ হতে পারেন। [বাকারা : ১৪৩]

আরও ইরশাদ করেছেন−

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। [আলে-ইমরান : ১১০]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছেন। আমাদেরকে বানিয়েছেন মানব জাতির জন্যে সাক্ষীস্বরূপ। আর আমাদের সাক্ষী হবেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা মধ্যপন্থী উম্মত হলাম কিভাবে? দেখুন, চাক্কির দুটি পার্ট থাকে। এই পৃথিবীও একটি চাক্কির মতোই। একটি পার্ট আসমান। আর দ্বিতীয় পার্ট হলো জমিন। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এই দুই পার্টের মাঝখানে রয়েছে একটি লৌহদণ্ড। যাকে কেন্দ্র করে চাক্কিদুটি ঘুরে থাকে। চাই সেটা হাতে চালাবার চাক্কি হোক কিংবা গরু দিয়ে চালাবার চাক্কি হোক। হোক যন্ত্রচালিত চাক্কি। কিংবা হোক বিশাল বড় পাওয়ার প্লান্ট জেনারেটর। আমাদের এই বিজ্ঞানের যুগেও মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত এই লৌহদণ্ডটি কম উপকারী নয়। প্রাচীন যুগে এটা মানুষকে যেভাবে উপকার করতো ঠিক এখনও সেভাবেই উপকার করছে। মাঝখানের এই পেরেকটি যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়ানো আছে ততক্ষণ পর্যন্তই জেনারেটর

ঘুরবে, নতুন চাক্কি ঘুরবে, পুরাতন চাক্কি ঘুরবে, হস্তচালিত চাক্কি ঘুরবে। মাঝখানের এই পেরেকটি যদি বাঁকা হয়ে যায় কিংবা ভেঙ্গে যায় তখন আর চাক্কি ঘুরবে না। বরং তা বারবার ভুল পথে চালিত হবে। আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে এই আয়াতে মূলত এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন- হে আমার রাসূল! আপনার উম্মত এবং আপনি এই আসমান ও জমিনের মাঝখানে হলেন সেই পেরেকের মতো। আপনি ও আপনার উম্মতের বরকতেই আসমান ও জমিনের চাক্কি ঘুরছে এবং যথাযথ পথে ঘুরছে। যেদিন তোমরা বাঁকা হয়ে যাবে কিংবা থাকবে না সেদিন এই আকাশ ও পৃথিবী তার নিজ পথে আর চলতে পারবে না। তখন যা ঘটবে তোমরা তা দেখতে পাবে। তোমরা দেখতে পাবে মানুষে মানুষে ঘৃণা, মানুষে মানুষে শত্রুতা, খুন, অবিচার, ঘুষ, মদ্যপান, সুদ, ব্যভিচার, চুরি ও ডাকাতির সয়লাব। মনে করবে, এ সবের মূল কারণ হলো তোমরা তোমাদের স্থান থেকে সরে পড়েছো। মনে রাখবে, যেদিন তোমরা তোমাদের জায়গা থেকে সরে পড়বে, নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে, নাই হয়ে যাবে সেদিন চাক্কির পেরেক সরে যাওয়ার মতোই আকাশ ও পৃথিবীর উভয় পার্ট একে অপরের উপর ছিটকে পড়বে। এই তো কিয়ামত। ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ...وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ...وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ...وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ...

সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হবে, যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে, পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে, যখন পূর্ণগর্ভা স্ত্রী উপেক্ষিত হবে। [তাকভীর : ১-৪]

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ...وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ

আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে। [ইনফিতার : ১-২]

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

সমুদ্র যখন স্ফীত করা হবে। [তাকভীর : ৬]

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। [যিলযাল : ১]

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

যখন কিয়ামত ঘটবে। [ওয়াকিয়া : ১]

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ

এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে আর সেদিন তা বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে। [হাক্কা : ১৬]

يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ ...وَنُزِّلَ الْمَلٰئِكَةُ تَنْزِيْلًا

সেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফিরিশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে। [ফুরকান : ২৫]

إِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا...وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا...وَجِيْئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ

পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশতাগণও। সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে। [ফাজর : ২১-২৩]

اَلْقَارِعَةُ مَاالْقَارِعَةُ وَمَاأَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ

মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয় কি? মহাপ্রলয় সম্পর্কে তুমি কি জান? [কারিআ : ১-৩]

اَلْحَاقَّةُ مَاالْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ

সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা! সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা? আর তুমি কি জান সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কি? [হাক্কা : ১-৩]

وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ

কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কি জান? আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কি জান? [ইনফিতার : ১৭-১৮]

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

তোমার কাছে কি কিয়ামতের সংবাদ এসেছে? [গাশিয়া : ১]

এ হলো কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য। মাঝখানের পেরেকটি যখনই সরে যাবে তখন উপর ও নিচের দুটি পার্ট এসে এক সাথে মিশে যাবে এবং মাঝখানের সবকিছুকে এসে চূর্ণ করে ফেলবে। সুতরাং হে আমার প্রিয় নবীর প্রিয় উম্মত! তোমাদের উসিলাতেই এই আকাশ ও পৃথিবী যথাস্থানে বহাল রয়েছে। যেদিন তোমরা মৃত্যুবরণ করবে সেদিন কিয়ামতের ডামাডোল বেজে উঠবে।

হীনমন্যতার বিষয় নয়। মনে রাখতে হবে, এটা আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের বরকতেই সারা পৃথিবী আজ খানাপিনা করছে। আমেরিকা খাচ্ছে আমাদের বরকতেই। আমাদের বরকতেই অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, এশিয়া খাচ্ছে। আমাদের উসিলাতেই পৃথিবীর সমগ্র মানুষ খাচ্ছে। জীব-জানোয়ার খাচ্ছে। বন-বিহঙ্গরা খাচ্ছে। সমুদ্রের মাছেরা খাচ্ছে। খাচ্ছে কীট-পতঙ্গ ও বন্য হায়েনারা। বিশাল দেহ হাতি আমাদের উসিলাতেই খাবার পাচ্ছে। সাপ খাবার পাচ্ছে আমাদের বরকতেই। মশা-মাছি, শূকর-বানর সকলেই আমাদের উসিলাতেই খাচ্ছে। কাফের মুশরিক মুনাফিক হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলেই খাচ্ছে আমাদের উসিলাতেই। আমাদের উসিলাতেই তারা খাবার পানীয় ও শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাস পাচ্ছে। আমাদের উসিলাতেই চাঁদ তার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না পাচ্ছে, রাত পাচ্ছে তার কৃষ্ণ চাদর। দিবস আলোকিত হচ্ছে আমাদের উসিলাতেই। আমরা যখন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেব তখন এ বিশ্ব চরাচর চূর্ণ-বিচূর্ণ

হয়ে যাবে। এ কারণেই পাক কুরআনে আমাদেরকে বলা হয়েছে মধ্যপন্থী জাতি। যেন আমরা এই সৃষ্টি জগতের মাঝে দুই চাক্কির মধ্যবর্তী পেরেকের মতো।

এ কারণেই আমি বলেছি, মহান শক্তিধর আল্লাহ যাকে খুশি সাপ বানিয়েছেন, যাকে খুশি বুলবুলি বানিয়েছেন। দেখতে তো একই রকমের ডিম। কিন্তু তার কোনটি থেকে সাপ বেরিয়ে আসছে, কোনটি থেকে কচ্ছপ, কোনটি থেকে ঘুঘু বেরুচ্ছে, কোনটি থেকে হাঁস। সবই আল্লাহর ইচ্ছার ফসল। সুতরাং এই যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছেন এতে তো আমাদের শক্তির কোন কৃতিত্ব নেই। বরং এটা আল্লাহর ইচ্ছে হয়েছে বলেই হয়েছে। তিনি আমাদেরকে ইচ্ছে করেছেন তাই মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি দয়া করে আমাদেরকে এই মহান সম্মানে ভূষিত করেছেন। কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে, কেন আমাদেরকে এই মধ্যপন্থায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে। কি আমাদের কর্তব্য। আমাদেরকে সাক্ষী বানানো হয়েছে। কী এর মর্ম?

আল্লাহর উকিল ও শয়তানের উকিল

মনে করুন, একটি জনাকীর্ণ আদালত প্রাঙ্গণ। অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি মোকদ্দমা চলছে। উভয় পক্ষের উকিলদের হাতেই রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ। সে আদালত প্রাঙ্গণ সুবিশাল, সুবিস্তীর্ণ। সাত মহাদেশের সকল মানুষ সেখানকার শ্রোতা। সেখানকার শ্রোতা পৃথিবীর সকল আদম সন্তান। সেই দরবারে একদিকে রয়েছে আল্লাহ তাআলার উকিল ও অন্যদিকে শয়তানের উকিল। আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকলেই হলেন আল্লাহ তাআলার পক্ষের উকিল। তাঁদের বিপক্ষে শয়তান নিজেই নিজের উকিল। অবশ্য তার সাথে রয়েছে ছোট ছোট অসংখ্য শয়তান। তারা সকলেই শয়তান পক্ষের উকিল। আল্লাহ তাআলার উকিলদের একমাত্র দাবী হলো, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। পক্ষান্তরে শয়তানের উকিলদের দাবী হলো আল্লাহ বলতে কিছুই নেই।

وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তারা বলে, আল্লাহ্ বলতে কিছুই নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহর পক্ষের উকিলগণের দাবী হলো আল্লাহ্ আছেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। যখন এই মোকদ্দমায় কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে তখন বলে– আল্লাহ আছেন, তবে একা নন। তার সাথে তার পুত্র আছে, তার কিছু কন্যা আছে। সাথে আরও কিছু অংশীদার খোদা আছে।

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

> সে কি বহু মাবুদকে এক মাবূদ বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক আশ্চর্য ব্যাপার! [সাদ : ৫]

শয়তানের উকিল প্রমাণ দিয়ে বলবে– দুনিয়ার সকল কাজ এক আল্লাহ কিভাবে করবে? বৃষ্টি বর্ষণ করবে, পানি প্রবাহিত করবে, খানাপিনার ব্যবস্থা করবে, মানুষ সৃষ্টি করবে, জিন সৃষ্টি করবে, পশু-পাখি সৃষ্টি করবে, পানির প্রাণীসমূহ, স্থলের প্রাণীসমূহ এমনকি ঊর্ধ্বজগতের সকল ব্যবস্থাপনা একজন কিভাবে করবে?

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার উকিলগণের দাবী হলো, আল্লাহ আছেন। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। এ এক ভয়ঙ্কর ও অমীমাংসিত মোকদ্দমা। অমীমাংসিত বলছি বা কঠিন মোকদ্দমা বলছি আমাদের হিসেবে এবং এই কারণে বলছি, এই সৃষ্টিজগতের এক বিশাল অংশ শয়তানের উকিলদের দলীল-প্রমাণ শোনে তাদের ফাঁদে পা দিচ্ছে এবং তাদের শিকার হচ্ছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর পক্ষের উকিলদের সর্বদাই এক দাবী– আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই।

দ্বিতীয় দাবী হলো– আল্লাহ্ তাআলার অনুগত হয়ে চললে জীবন গড়ে জীবনে সফলতা আসে, সফলতা আসে আখিরাতে। আর শয়তানের উকিলের দাবী হলো– দুনিয়ার পেছনে চললেই জীবন গড়ে। কারণ, দুনিয়ার পেছনে ঘুরলেই অর্থ আসে। অর্থ আছে তো সবই আছে। অর্থ নেই তো কিছুই নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার উকিলগণ বলেন– তোমরা ওদের পেছনে নয়, আমাদের পেছনে চল। আমাদের অনুসরণ

কর তাহলে সবই পাবে। আমাদের অনুসরণ যদি না কর তাহলে কিছুই পাবে না।

এই মোকদ্দমার তৃতীয় বিষয় হলো এই দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী। একদা এই পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পরকালটাই আসল। পরকালের জীবনই শাশ্বত জীবন। আর শয়তানের উকিল বলে— না না। এই পৃথিবী এভাবেই চলে আসছে এবং এভাবেই চলবে।

إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِى الْحَافِرَةِ

আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবো? [নাযিআত : ১০]

অর্থাৎ শয়তানের উকিল বলে, কবর থেকে উঠে কি এই পর্যন্ত কেউ ফিরে এসেছে? পৃথিবীব্যাপী এই যে কোটি কোটি সমাধি, আজ পর্যন্ত এর ভেতর থেকে কেউ কি ওঠে এসেছে?

إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً

গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও? [নাযিআ : ১১]

অর্থাৎ মৃত্যুর পরও কি আবার কোন জীবন আছে? নেই। কোন হিসাব-কিতাবও নেই। আল্লাহ নেই, জান্নাত জাহান্নামও নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহর উকিলগণ বলেন— এর সবই আছে।

রাসূল (সা.) সাক্ষী

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদালতে আসেন এবং সাক্ষ্য-প্রমাণসহ আসেন। তিনি সাক্ষ্য পেশ করেন— হে আল্লাহ! আমি এই বিশাল জনতার মাঝে তোমাকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি—

إِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ
الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَشْهَدُ

إِنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ لِقَائِكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ
حَقٌّ لَارَيْبَ فِيْهَا وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ...

তোমার আরশ বহনকারী ফিরিশতাদেরকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, তুমি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই। তুমি এক। তোমার কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও প্রশংসার মালিক তুমি। তুমি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার অঙ্গীকার সত্য। তোমার সাক্ষাত সত্য। বেহেশত-দোযখ সত্য। কিয়ামত সত্য। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর যারা কবরে চলে গেছে তুমি তাদেরকে পুনরায় উত্থিত করবে।

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত সমগ্র সৃষ্টি জগতকে সামনে রেখে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিলেন–

إِنَّكَ أَنْتَ اللهُ

তুমি আল্লাহ! তুমি এক। তোমার কোন শরীক নেই। তুমি ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তুমি এক। তোমার স্ত্রী নেই। তুমি এক। তোমার পুত্র নেই। তুমি এক। তোমার কোন মন্ত্রী নেই। তুমি এক। তোমার কোন পরামর্শক নেই। তুমি এক। তুমি ছাড়া আর কোন খোদা নেই। তুমি এক। তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন রক্ষক নেই।

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

বলো, তিনি আল্লাহ– এক অদ্বিতীয়। [ইখলাস : ১]

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। [ইখলাস : ৩]

إِنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

তুমি মাবূদ, তুমি আল্লাহ। তুমি এক, তোমার কোন শরীক নেই।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ

কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহরই। [আনআম : ৫৭]

إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

সকল বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারে। [আলে-ইমরান : ১৫৪]

اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

সকল শক্তি আল্লাহরই। [বাকারা : ১৬৫]

রাজত্ব তোমার।

শক্তি তোমার।

শাসন তোমার।

প্রভাবও তোমার।

তুমিই সকল প্রশংসার মালিক।

সৌন্দর্যের মালিক তুমি। লালিত্যের মালিক তুমি। সুন্দর সব গুণাবলীর মালিক তুমি। তুমি অনাদি অনন্ত। তোমার সত্তা ও গুণাবলী সবই অসীম। তোমার শক্তি অসীম। তোমার নামাবলী অসীম। তুমি কোন সীমায় সীমিত নও। তুমি কাল ও স্থানের সকল বেষ্টনির উর্ধ্বে। আরশ কুরসী কোন কিছুরই তুমি ঠেকা নও। তুমি ঠেকা নও ফিরিশতাদেরও। তুমি পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষী।

আল্লাহর নবী আদালতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। দলীল-প্রমাণ পেশ করছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দাবী করছেন—

وَاَشْهَدُ اَنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই তোমার অঙ্গীকার সত্য।

অর্থাৎ এতে কোন সন্দেহ নেই, এই পৃথিবী ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। তুমি সকলকে মেরে ফেলবে। জীবিত থাকবে কেবল তুমি।

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

> আমি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আবার মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং মাটি থেকে পুনর্বার তোমাদেরকে বের করবো। [ত্বহা : ৫৫]

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার সকল গুণ সত্য। একদিন সকলকেই তোমার সামনে দাঁড়াতে হবে। সকলকেই তার কৃতকর্মের পরিণামের মুখোমুখি হতে হবে। বেহেশত সত্য। দোযখও সত্য। তুমি মৃতদেরকে জীবিত করবে। কবর থেকে আমাদেরকে পুনরায় উত্থিত করবে।

اَنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ

কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। [হিজর : ৮৫]

আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে প্রতিটি জীবকে পুনরায় জীবিত করবেন। মানুষ তো অনেক বড় এক সৃষ্টি। মশা-মাছির মতো ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অসংখ্য অগণিত প্রাণীকেও আল্লাহ তাআলা পুনরায় জীবিত করবেন।

بَلٰى قَادِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ

> বস্তুত আমি তার অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। [কিয়ামা : ৪]

অর্থাৎ এখন তো তুমি তোমার অস্তিত্ব সম্পর্কে দ্বিধায় পড়ে আছো। কিন্তু কিয়ামতের দিন তুমি দেখতে পাবে তোমার হাতের আঙুলগুলোকে পর্যন্ত এমনভাবে সৃষ্টি করবেন যে হাতের রেখাগুলো পর্যন্ত তুমি লক্ষ্য করলে অপরিবর্তিত দেখতে পাবে। তুমি চাইলে মিলিয়ে দেখতে পারবে অন্য কারও সাথে তোমার হাতের রেখা পর্যন্ত মিলবে না।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ

> মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবো না? [কিয়ামা : ৩]

মানুষের এই ভাবনা ঠিক নয়। এই নিঃশেষিত শরীরের প্রতিটি ক্ষুদ্র কণাকে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা পুনঃস্থাপিত করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই।

بَلٰى قَادِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ

বস্তুত আমি তার আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম। [কিয়ামা : ৪]

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ

তবুও মানুষ তার ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়। [কিয়ামা : ৫]

অর্থাৎ এই সবকিছু জেনে শুনেই এই জালেম মানুষ আমার সামনেই আমার অবাধ্যতায় ব্যস্ত। আমার সামনেই সে শরাব পান করে। আমার সামনেই সে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়। আমার সামনেই সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। সুদ খায়, মিথ্যা বলে, পর্দা লঙ্ঘন করে।

আমি মহান ধৈর্যশীল। আমার নির্দেশ হলো, বান্দা! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَ خَسَفَ الْقَمَرُ وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ، كَلَّا لَا وَزَرَ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَبَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ

-যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে এবং চাঁদ হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন, যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে সেদিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকেরই কাছে। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে, সে কী অগ্রে পাঠিয়েছিল ও কি পশ্চাতে রেখে গেছে। বস্তুত মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত। যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। [কিয়ামা : ৭-১৫]

আল্লাহ তাআলার এই বাণী এক মহান শক্তিশালী অহংকারী বাদশাহরই বাণী। যে শক্তিশালী বাদশাহ পূর্ণ অহংকারের সাথে শাসকের কুরসীতে বসে তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। এই জাতীয় অহংকার ও অহংকারী ভাষণ কেবল আল্লাহকেই মানায়। অন্য কাউকে নয়। তিনি মানুষকে বজ্রকণ্ঠে জানাচ্ছেন- আজ তোমরা আমার সামনে অহংকার করে ফিরছো, কখনও গান শুনছো, কখনও নাচ দেখছো, কখনও বা মেহেদী অনুষ্ঠানের নামে বেহায়াপনার আয়োজন করছো। মুসলমান হয়ে হিন্দুদের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুকরণ করছো।

আমি বলি, এটা আমাদের জন্যে খুবই লজ্জার বিষয়। আমাদের উচিত পানিতে ডুবে মরা। যারা আমাদের সন্তানদেরকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে আজ আমরা আমাদের ঘরে তাদেরই সংস্কৃতির চর্চা করছি। তাদেরই অনুসরণে কার্ড ছাপিয়ে নানা রকমের উৎসব করছি। আমরা আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলেছি। যে জালেম গোষ্ঠী একদা আমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, যারা আমাদের দুগ্ধপায়ী শিশুদেরকে পুড়িয়ে মেরেছে আজ আমরা তাদের সভ্যতায় তাদের সংস্কৃতিতে গড়ে তুলছি আমাদের সন্তানদেরকে।

আল্লাহ তাআলা পূর্ণ প্রতাপের সাথে বলছেন, তোমরা লুকিয়ে লুকিয়ে নয় আমার সামনে জলসা করে নাচ-গান করছো। অনুষ্ঠান করে শরাব পান করছো। পর্দা ভঙ্গ করছো। সীমালঙ্ঘন করছো। আমি কি এসব দেখতে পাচ্ছি না? আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছি? আমি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? আচ্ছা, একটু ধৈর্যধারণ কর। যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে, শ্বাস যখন ভেঙ্গে যাবে, সূর্য যখন আলোহীন হয়ে পড়বে, পৃথিবী যখন ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাবে, যখন তোমরা আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসবে তখন আমি বলবো, বলো। তুমি বলবে, আমি পালিয়ে যাবো। তুমি বলবে, আমি লুকিয়ে থাকবো। আমি বলি, না না। পালাতে পারবে না, লুকাতে পারবে না। আজ তোমাকে আমার সামনে দাঁড়াতেই হবে। অতঃপর আমি তোমার অতীত জীবনের প্রতিটি কর্মের কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবো। সেদিন কারও কোনরূপ ওজর আপত্তি কবুল করা হবে না।

এ এমনই এক সত্য। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর সকলেই এই সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। সকলেই এই সত্যের পক্ষে দলীল উপস্থাপন করে গেছেন। এই মোকদ্দমা চলবে আল্লাহর দরবারে। আল্লাহর পক্ষের উকিলগণের দাবী হবে তাওহীদ। তাঁদের দাবী হবে রিসালাত। পক্ষান্তরে শয়তান পক্ষের উকিলরা অস্বীকার করবে তাওহীদ, অস্বীকার করবে রিসালাত। অস্বীকার করবে বেহেশত-দোযখ সব।

আদালতে মামলা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। উভয় পক্ষই নিজ দাবী ও প্রমাণে তপ্ত। আপনি জানেন, আদালতে সর্বশেষ ফয়সালা হয় সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। সচক্ষে অবলোকনকারী তথা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ডাকা হয়। প্রত্যক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য যদি বাদীর পক্ষে হয় তাহলে রায় পায় বাদী। বিবাদীর পক্ষে হলে রায় পায় বিবাদী। তাই এ পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা সাক্ষী ডাকবেন। বলবেন, আমি যে এক, বেহেশত দোযখ যে সত্য, আমার নবী-রাসূলগণ যে সত্য এর পক্ষে সাক্ষী আনো। কাদেরকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হবে? সেদিন সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হবে এই উম্মতে মুহাম্মদীকে।

شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

তোমরা সাক্ষীস্বরূপ মানব জাতির জন্যে। [হাজ্জ : ৭৮]

অর্থাৎ আল্লাহর আদালতে সাক্ষ্য দানের জন্যে এই উম্মতে মুহাম্মদীকে আহ্বান করা হবে।

এখানে শুধু একটি দিকই তুলে ধরা হয়েছে আর তাহলো আখেরাতে আমরা এই উম্মতে মুহাম্মদীরাই সাক্ষী দিব। আর সে কথাই আমরা দুনিয়াতে আলোচনা করছি। আখিরাত তো হলো সর্বশেষ বিষয়। সেটা তো হলো ফয়সালার দিন। আর আমাদেরকে এই দুনিয়াতেই ডাকা হয়েছে। এখানে এসে সাক্ষী দেয়ার জন্যে। আমরা কি সাক্ষী দেবো? আমরা পৃথিবীর সকল মানুষের সামনে এ কথা বলবো– আল্লাহ এক। আর আমাদের এ কথার ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। সুতরাং আমাদের কাজ হলো সমগ্র পৃথিবীকে এ কথা জানিয়ে দেয়া– হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। কারণ, আমাদের এ

কথার উপরই ফয়সালা হবে। আমাদের কর্তব্য হলো, সারা পৃথিবীকে এ কথা জানিয়ে দেয়া বেহেশত আছে, দোযখও আছে। শয়তানের শিক্ষা অলীক। আল্লাহর শিক্ষা সত্য। আমাদেরকে এই সাক্ষ্য দেয়ার জন্যেই উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে ডাকা হয়েছে। এখানে আমি আমার কল্পনা থেকেই আদালতের এই নকশা এঁকেছি। সুতরাং কেউ যেন এ থেকে এ কথা মনে না করে– আচ্ছা, আমারা আমাদের আদালত পাড়ায় গিয়ে সাক্ষ্য দিই, আল্লাহ এক।

এ কারণেই আমি বলেছি, সে আদালত হবে ছয় মহাদেশের বিশাল প্রাঙ্গণব্যাপী। ছয় মহাদেশের সকলকেই এই সাক্ষী দিতে হবে। এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বরের দাবীর পক্ষে এই সাক্ষী। তাঁরা এই পৃথিবীতে এ কথাগুলো বলার জন্যেই এসেছিলেন। আমি বলতে চাই, এই সাক্ষ্য আমরা কিভাবে দেবো? আমরা যদি তাকাই তাহলে দেখবো ধর্মহীনতা সমগ্র পৃথিবী ছেয়ে গেছে। নবী-রাসূলগণের এই দাবীর পক্ষে কে সাক্ষী দিবে? এজন্য আমাদের কর্তব্য হলো মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে দরজায় নক করা। এবং তাদেরকে জানিয়ে দেয়া, আল্লাহ এক। এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া, ঘরে বসে থাকলে হবে না তোমরা বেরিয়ে আসো। তোমাদেরকে তো সোয়া লক্ষ নবীর দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য দিতে হবে। পৃথিবীর সকল মানুষের সামনে আমরা কিভাবে সাক্ষ্য দিব? পৃথিবীর সকল মানুষ তো আর এক জায়গায় সমবেত নয়। তাই আমাদেরকে দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে হবে। গ্রামে গ্রামে যেতে হবে। গলিতে গলিতে যেতে হবে। ঘরে ঘরে যেতে হবে এবং ঘরে ঘরে গিয়ে সাক্ষী দিতে হবে– হে লোক সকল! তোমরা মেনে নাও, আল্লাহ এক। আসমান জমিনের তিনিই মালিক। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ থেকে আরশে আযীম পর্যন্ত সবকিছুরই মালিক তিনি। তিনি ফিরিশতার মালিক, বাতাসের মালিক, বহমান সমুদ্রের মালিক, সমুদ্রস্থিত মাছ, মণি-মুক্তা সবকিছুরই মালিক তিনি। স্থলভাগে বিক্ষিপ্ত জন্তু-জানোয়ার ফলমূল ক্ষেত খামার সবকিছুই তাঁর।

اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ

লক্ষ্য কর, তার ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। [আনআম : ৯৯]

এখানে মূলত আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন, এই ফল, তাতে পরিপক্কতা দান, তার রঙ, ঘ্রাণ সবই আল্লাহর দেয়া।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এ এমন এক আদালত যে আদালতের প্রধান হলেন স্বয়ং আল্লাহ। আর আদালত প্রধান যখন বলেন- আমার সাক্ষী অমুক ব্যক্তি। তখন সে ব্যক্তির কি আর খুশির কোন সীমা থাকে? আমরা উম্মতে মুহাম্মদী কত যে ভাগ্যবান! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর পক্ষে সাক্ষী হিসেবে কবুল করেছেন। তিনিই আমাদেরকে আহ্বান করেছেন- হে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমরা আমার তাওহীদের পক্ষে সাক্ষী দিও। সুতরাং তাওহীদের সাক্ষী দেয়া, রিসালাতের সাক্ষী দেয়া, জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষী দেয়া এ আমাদের গৌরবময় কর্তব্য। যতক্ষণ পর্যন্ত ছয়টি মহাদেশের প্রত্যেকটি ঘরে আমরা আমাদের এই সাক্ষ্যদান পৌঁছে দিতে না পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বস্তি পাবো না। আমরা সাক্ষী দেবো আমাদের রাসূলের পক্ষে। তিনি সত্য রাসূল ছিলেন। তাঁর পক্ষে আরও যারা সাক্ষী দেয়ার তারা সাক্ষী দিয়ে গেছেন। প্রাণহীন জড় পদার্থ পর্যন্ত তাঁর রিসালাতের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছেন। তিনি পাথরের পাশে বসে আছেন। তাঁকে দেখে পাথর পর্যন্ত বলে ওঠেছে- 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ'! এই সাক্ষ্যদান সম্পর্কে পাথর, গাছ-গাছালির অনেক গল্পই বিখ্যাত হয়ে আছে। আমি এখানে আপনাদেরকে একটি মাত্র গল্প শোনাচ্ছি।

গাছের সাক্ষী

একবার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এক বৃদ্ধ হাজির। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি আমাকে নবী মানো? সে বলল, না। ইরশাদ করলেন- এই যে তোমার সামনে খেজুর গাছটি আছে যাতে ঝুলে আছে বেশ কিছু খর্জুর শাখা। আমি যদি একে ডাকি এবং সে যদি এসে আমার নবুওয়াত

ও রিসালাতের সাক্ষী দেয় তাহলে কি তুমি আমাকে নবী মানবে? বললো, হ্যাঁ, অবশ্যই মানবো। তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছটিকে ডাকেননি বরং গাছের শাখাকে ইংগিত করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে খেজুর গাছের ডালাটি গাছ থেকে ছিন্ন হয়ে মানুষের মতোই নেমে আসে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করেন–

مَنْ اَنَا

বলো তো আমি কে?

اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ

বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই প্রশ্নটি তিনবার করেন। সে তিনবার একই উত্তর প্রদান করে। বলুন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আল্লাহর রাসূল। তাঁর ও তাঁর রিসালাতের সাথে এই ছিন্ন বৃক্ষ শাখার কী সম্পর্ক আছে? তবুও সে নেমে এসে সাক্ষ্য দিয়েছে। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলেছেন– যাও, ফিরে যাও। তখন সে তার আপন জায়গায় ফিরে যায় এবং তার ছিন্ন অঙ্গের সাথে এমনভাবে গিয়ে মিলিত হয় যেন তা কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি।

গুই সাপের সাক্ষী

মৃত গুই সাপের গোশত এক সময় আরবরা খুব মজা করে খেতো। একবার এমনি একটি মৃত গুই সাপকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে ছুঁড়ে মারা হয় এবং প্রতিপক্ষ মুশরিকরা দাবী করে বসে– একে বলো যেন তোমাকে রাসূল বলে। এ যদি তোমাকে রাসূল মানে তাহলে আমরাও মানবো। আর এ যদি না মানে তাহলে আমরাও মানবো না। তারা মনে মনে ভেবেছিল, এ তো মৃত।

তাছাড়া গুই হলো একটি বোবা প্রাণী। সুতরাং একে তো মৃত, তার উপর বোবা– সে কিভাবে সাক্ষ্য দিবে? কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কেবল তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছেন। আহা! যাঁর দৃষ্টি মৃত জানোয়ারের মাঝে প্রাণ সঞ্চারিত করেছে আজ আমরা তাঁর জীবনাদর্শকেই ডাস্টবিনে ছুঁড়ে মেরেছি। যার হৃদয়ে বিন্দু ভালোবাসা আছে সে কখনও তার অনুগ্রহকারীকে ভুলে না। বিশ্বস্ত কুকুর কখনও তার মালিককে ভুলে না। সামান্য রুটি খেয়ে বিশ্বস্তের মতো পূর্ণ জীবনটা এক মালিকের কাছে কাটিয়ে দেয়। আমরা যদি আমাদের নবীর জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো তিনি আমাদের জন্যে কত কেঁদেছেন। তায়েফের পাহাড়কে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, সেখানে তিনি কিভাবে রক্ত বিসর্জন দিয়েছেন। সেদিনকার তাঁর কষ্ট দেখে তায়েফের পাহাড় চিৎকার করে উঠেছিল। চিৎকার করে উঠেছিল সপ্তাকাশের ফিরিশতাগণ। সপ্তাকাশের ফিরিশতাগণ কেঁদে উঠেছিল। আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এখতিয়ার দিয়েছিলেন– আপনি অনুমতি দিলে এই অঞ্চলের সকলকে ধ্বংস করে দিব। কিন্তুহযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মেনে নেননি। বরং তিনি উল্টো এ কথা বলেছেন– যদি আমি আক্রান্ত হওয়ার দ্বারা তুমি সন্তুষ্ট হয়ে থাকো তাহলে আমিও সন্তুষ্ট আছি। এ হলো আমাদের নবীর চরিত্র। তাঁর তো এখতিয়ার ছিল– তিনি চাইলে তায়েফবাসীকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। আমাদের সে এখতিয়ার নেই। তারপরও আমরা ক্ষমা করতে পারি না। আজ আমাদের কাজ হলো তাঁর রিসালাতের সাক্ষী দেয়া। যে সাক্ষী দিয়েছিলো মৃত গুই সাপ। আমাদের কর্তব্য হলো– পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে এ কথা পৌঁছে দেয়া, আমাদের নবী এক পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শক। পরিপূর্ণ পয়গম্বর। তাঁকে অনুসরণ করলেই জীবনের পথ পাওয়া যাবে। এ বিধান নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই সমান। এবং এটা তাবলীগ জামাতের বিষয় নয়। তাওহীদ ও রিসালাত সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করা প্রতিটি ঈমানদার নর-নারীর কর্তব্য। ভাববার বিষয় হলো, আমরা কেমন সাক্ষী? আমরা তো তাঁর জীবনাদর্শকে আমাদের জীবন থেকে তুলে এনে বাইরে ফেলে দিয়েছি। এক টুকরো রুটি খেয়ে একটি কুকুর

তার মালিকের দরজা ভুলে না। এমনকি রুটি না দিলেও দরজা ছাড়ে না। অথচ আমাদের নবী আমাদের জন্যে তেইশ বছর কেঁদেছেন। তাঁর চোখের পানি শুকায়নি। তিনি আমাদেরই জন্যে রাতের পর রাত সিজদায় বিনিদ্র কাটিয়েছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁর কান্নাকাটি দেখে পেছনে বসে কাঁদতেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীর্ঘ সিজদা দেখে কখনও বা বলতেন, আমার ভয় লাগে আবার তিনি ইন্তেকাল করলেন কি না। আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন কি না।

মনে রাখতে হবে, এই পৃথিবীতে আমাদের আগমনের লক্ষ্য ছিল তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়ন করা। দুর্ভাগ্যবশত আজ আমরা তাঁর জ্বালানো প্রদীপকে নেভাতে বসেছি। আমরা নিজ হাতে তাঁর রচিত জীবনাদর্শের একেকটি ইট তুলে এনে ছুঁড়ে মারছি। অথচ তাঁর পক্ষে একদা মৃত জানোয়ার সাক্ষী দিয়েছে। মৃত জানোয়ারের প্রতি চোখ তুলে যখন তিনি মনে মনে 'ইয়া দব' বলেছেন তখন সঙ্গে সঙ্গে মৃত ওই সাপ মাথা তুলে তাকিয়েছে। বলেছে–

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا مَنْ زَيَّنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

> আমি উপস্থিত ইয়া রাসূলাল্লাহ! হে কিয়ামতকে সুশোভিতকারী।

তার শব্দ ও বাচনভঙ্গি দেখুন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন–

مَنْ تَعْبُدُ

তোমার রব কে?

مَنْ فِى السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهُ
وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهُ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِى النَّارِ
عقابه

সে বললো, আমার রব তিনি–

যাঁর আরশ আসমানে।

যাঁর রাজত্ব পৃথিবীতে।

সমুদ্রে যাঁর পথসমূহ।

জাহান্নাম যাঁর শাস্তি।

বেহেশত যাঁর রহমত।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় প্রশ্ন করলেন–

مَنْ اَنَا

বলো তো আমি কে?

তখন মৃত ওই সাপটি বলে উঠলো–

اَنْتَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ

আপনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।

এই সাক্ষ্যদানই আমাদের বৈশিষ্ট্য। এ সাক্ষ্য আমাদেরকে দিতেই হবে। মুসলমানদের হৃদয়ে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মালির কাজ হলো বীজ ছড়িয়ে দেয়া। সে বৃক্ষ উৎপাত করতে পারে না। তবে বীজ ছড়িয়ে দেয়া ও তাতে যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে সে কোনরূপ ত্রুটি করে না। বাগান চর্চায় যখন ঘামের সাথে তার রক্তও ঝরে পরে তখনই বাগান সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। তখনই মাটিতে হারানো ক্ষুদ্র দানা থেকে সৃষ্টি হয় সুন্দর গাছ। ফুলে ফলে ভরে ওঠে বাগান। বাগান নির্মাণে মালি যখন ঘাম ঝরায় চোখের পানি ঝরায় তখন তার একটি চারার মৃত্যু একটি ফুলের পতনও তাকে দুঃখিত করে। সে কোনভাবেই তার বাগানের একটি বৃক্ষের পতনকে মেনে নিতে পারে না। অথচ আজ পৃথিবীর যেদিকেই তাকাই দেখি আমাদের বাগান উজাড়। কিন্তু মালিদের মনে কোন বেদনা নেই। আমরা কেমন মালি? আমাদের বাগান উজাড় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে আমাদের হৃদয়ে কোন ক্ষতের সৃষ্টি হচ্ছে না। কোন বেদনার সৃষ্টি হচ্ছে না।

মালি নিজেই যদি অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে তখন বাগান আবাদ হবে কিভাবে? মালি নিজেই যদি ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে সাক্ষী দিবে কে? সুতরাং আমরা যারা এই মুহাম্মদী বাগানের মালি তাদের তো ঘুমুবার সুযোগ নেই। তাদের কাজ হলো পৃথিবীর প্রতিটি নারী ও পুরুষের সামনে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতের সাক্ষী দেয়া। এই তো তাবলীগ।

সাক্ষ্যদান উম্মাহ হিসেবে আমাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্য দিতেই হবে। মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলতে হবে, এই দুনিয়া নশ্বর। অবিনশ্বর হলো আখিরাত। এটা হলো ধোকার ঘর। এ ঘর খুব শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। স্থায়ী ঘর হলো আখিরাতের ঘর। আখিরাতের ঘরই উত্থানের ঘর। দুনিয়ার ঘর হলো পতনের ঘর। এখানে তো কেবলই পরস্পর ঘৃণা। আখিরাত হলো পরস্পর ভালোবাসার স্থান। এখানে শুধুই যুদ্ধ-লড়াই। আখিরাত হলো নিরাপত্তার জায়গা। দুনিয়া কেবলই অসুস্থতার ঘর। সুস্থতার ঠিকানা আখিরাত। দুনিয়া বার্ধক্যের জায়গা। আখিরাত হলো অনিঃশেষ যৌবনের ঠিকানা। দুনিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণার ঘর। আখিরাত হলো সম্পদ রাজত্ব ও ভোগ-উপভোগের জায়গা। এটা তো মাটির তৈরি ঠিকানা। আখিরাত হলো সোনা-রুপার তৈরি ঠিকানা। এই দুনিয়ার জীবন ধ্বংস হবার জন্যই। এখানকার ঘরবাড়ি সবই ভেঙ্গে যাবে। চিরস্থায়ী তো কেবলই আল্লাহ ও আল্লাহর ঘর। এখানকার মাহফিল প্রধান আমাদেরই মতো বাদশাহ, আমাদেরই মতো সভাপতি, আমাদেরই মতো মন্ত্রী, আমাদেরই মা-বোন। পক্ষান্তরে আখিরাতের সভাপ্রধান হবেন স্বয়ং আল্লাহ। আখিরাত এমন একটি মাহফিল, এমন একটি আলয়, এমন একটি জলসা, এমন একটি পার্লামেন্ট, এমন একটি জগত যেখানে উপবিষ্ট থাকবেন স্বয়ং আল্লাহ। ডানে বামে সমবেত থাকবে তাঁর বান্দা-বান্দীগণ। পরকালই এমন একটি জগত যেখানে সান্নিধ্য পাওয়া যায় নবীগণের। যেখানে মা খাদিজা, মা আয়েশা, মা জুয়াইরিয়া, মা উম্মে সালমার সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। আখিরাতই এমন ঠিকানা যেখানে মা হাজেরার সঙ্গ লাভে ধন্য হওয়া যায়।

মা হাজেরা উম্মতের প্রতি অসীম অনুগ্রহ করে গেছেন। যৌবনে যৌবনকে বিসর্জন দিয়েছেন। স্বামীর বিচ্ছেদ যাতনা সয়েছেন। যৌবনকাল অতিক্রান্ত করেছেন পাথরের সাথে বসবাস করে। স্বামী যেমনই হোক তার বিয়োগ যন্ত্রণা দুঃসহ। আর সে স্বামী যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো স্বামী তখন তাঁকে ছেড়ে ফিলিস্তিনের মতো শহর ছেড়ে মক্কার কৃষ্ণ পাহাড়ে হেলান দিয়ে যৌবন কাটিয়ে দেয়া সহজ কথা নয়। আখিরাতই এমন স্থান যেখানে মা হাজেরার দীদার পাওয়া যায়। এখানে দীদার পাওয়া যায় নবীগণের। আখিরাতই এমন এক জগত যেখানে দীদার হয় স্বয়ং আল্লাহ তাআলার। তিনি সকল পর্দা থেকে বেরিয়ে এসে বান্দাকে সান্নিধ্য দানে ধন্য করেন। সুতরাং আখিরাতই হবে আমাদের জীবনের টার্গেট। দুনিয়া হলো কেবলই ধোকা। দুনিয়া হলো মশা-মাছির ডানা। দুনিয়া হলো মাকড়সার জাল। এখানে কেউ কোনদিন থাকেনি। কেউ কোনদিন থাকবেও না। এখান থেকে সকলকেই বিদায় গ্রহণ করতে হবে। তবে ইরশাদ হয়েছে—

لَاتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

> তোমরা আত্মসমর্পণ না করে পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে কোন অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করো না। [আলে-ইমরান : ১০২]

এটাই হলো সত্যের পক্ষে সাক্ষী। তাওহীদের পক্ষে সাক্ষী। রিসালাতের পক্ষে সাক্ষী। বেহেশতের পক্ষে সাক্ষী। এটাই আমাদের জীবনের প্রধান কাজ। এ কাজ পেয়েছি আমরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। আমাদের নবীর পক্ষ থেকে। আমাদের কর্তব্য হলো সাক্ষ্যদানের এই পয়গাম নিয়ে আমরা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াবো। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে গড়ে তুলবো এই পয়গামের উপর।

সাক্ষী সত্যবাদী হতে হবে

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় তাহলো সাক্ষীকে অবশ্যই সত্যবাদী হতে হবে। নইলে মামলা দুর্বল হয়ে পড়বে। যদি প্রমাণিত হয় সাক্ষী

মিথ্যাবাদী তাহলে মামলা শেষ হয়ে যায়। সুতরাং এখন দেখার বিষয় হলো, সাক্ষিদাতারা যে সত্যবাদী,. এই উম্মত যে সত্যাবাদী সাক্ষী– এ কথার সাক্ষী দিবে কে? এ আরেক বিষয়। উম্মতের শান দেখুন! এই উম্মাহকে যখন এই বিশাল আদালতে সাক্ষী দেয়ার জন্যে উপস্থিত করা হবে তখন সকল বাতিল এক সাথে চিৎকার করে উঠবে। শয়তান চিৎকার করে উঠবে, চিৎকার করে উঠবে শয়তানের উকিলরা। তারা বলে উঠবে, এই সাক্ষীদাতারা সত্য কি মিথ্যা আমরা কিভাবে বুঝবো? মামলায় সৃষ্টি হবে জটিলতা। কিভাবে প্রমাণিত হবে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী? তখন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, হে আমার হাবীব! হে আমার মুহাম্মদ! হে আমার আহমদ! হে আমার ফাতিহ! হে আমার খাতম! হে আমার আবুল কাসিম! হে আমার ত্বহা! হে আমার ইয়াসিন! হে আমার বাশীর! হে আমার নাযীর! হে আমার সিরাজে মুনীর! হে আমার রাহমাতাল্লিল আলামীন! হে সমগ্র জাহানের রাসূল! আপনি আসুন। আপনিই বলুন, এই সাক্ষ্যদাতাগণ সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এরা সত্যবাদী। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, ব্যাস! আরশ ও ফরশে লওহে কলমে জমিন ও আসমানে পুবে-পশ্চিমে আপনার চাইতে সত্যবাদী তো আর কেউ নেই। সুতরাং আপনি যখন সাক্ষী দিচ্ছেন তখন আমিও তাদেরকে সত্যবাদী হিসেবে ঘোষণা করছি। এবং এখানেই আদালত মূলতবী ঘোষণা করছি। ফয়সালা আগামীকাল শোনানো হবে। ফয়সালা শোনানো হবে দ্বিতীয় তারিখে। ফয়সালা শোনানো হবে কিয়ামতের দিন।

اِتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আমাগীকালের জন্যে সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। [হাশর : ১৮]

আল্লাহ্ তাআলা আদালত মূলতবী করে দিবেন। নবীগণ যার যার কবরে চলে যাবেন। আমরাও আমাদের কবরে চলে যাবো। কাফির মুশরিকরাও নিজ নিজ কবরে চলে যাবে। অতঃপর সিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। এবার

পুনরায় আদালত বসবে। সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সত্য এখন পরিপূর্ণ উদ্ভাসিত। আল্লাহ তাঁর আরশসহ সমুপস্থিত।

جَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

তোমার প্রভু সারিবদ্ধ ফিরিশতাগণসহ উপস্থিত হবেন।

জাহান্নামও উপস্থিত। প্রস্তুত বেহেশতও। প্রস্তুত পুলসিরাত। নবী উপস্থিত। উপস্থিত তাঁর উম্মতও। আমাদের রাসূল উপস্থিত। তাঁর সাথে উপস্থিত আমরা উম্মতীরাও। মোকদ্দমা উঠবে। নূহ (আ.)-এর উম্মতকে ডাকা হবে। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন– হে নূহ! তুমি কি আমার পয়গাম পৌছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, আমি পৌছে দিয়েছি। উম্মতকে জিজ্ঞেস করবেন, নূহ কি তোমাদের কাছে আমার পয়গাম পৌছে দিয়েছিল? তারা অস্বীকার করবে। বলবে, না। আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে নূহ! এরা তো অস্বীকার করছে। তোমার কাছে কি কোন প্রমাণ আছে? হযরত নূহ (আ.) বলবেন, আমার এই তিন পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফিস আমার সাক্ষী। হে আল্লাহ! আর এই নারী ও পুরুষগণ যারা আমার কালিমা পড়েছিল তাদেরকেও আমি সাক্ষী হিসেবে পেশ করছি। কারণ, তারা পরস্পরে মিলেমিশে আমাদের সাথে জীবনযাপন করেছে। সুতরাং তারা সবকিছুরই প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আমি যে সাড়ে নয়শ' বছর তোমাকে ডেকেছি, তোমার প্রতি তাদেরকে আহ্বান করেছি এ কথা এরা জানে।

إِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلاً وَّنَهَارًا ۝ فَلَمْ يَزِدْهُمْ
دُعَائِىْ إِلاَّ فِرَارًا وَإِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ
جَعَلُوْا أَصَابِعَهُمْ فِىْ أٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ
وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوْا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ
جِهَارًا ثُمَّ إِنِّىْ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ
إِسْرَارًا ۝ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔
يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا

আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবা-নিশি আহ্বান করেছি। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়নপ্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি যাতে তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও তারা কানে আঙুল দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদেরকে ও জিদ করতে থাকে। এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অতঃপর আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে। পরে আমি উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে। বলেছি, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। [নূহ : ৫–১১]

হে আল্লাহ! আমার এই তিন পুত্র আমার সাক্ষী। অতঃপর আমাদেরকে আহ্বান করা হবে সাক্ষী দেয়ার জন্যে। হযরত নূহ (আ.) বলবেন, হে আল্লাহ! আমি যে আমার জাতির কাছে তোমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি সে জন্যে তোমার আখেরী নবীর উম্মতকে ডাক, তারা যেন আমার পক্ষে সাক্ষী দেয়। আমরা উপস্থিত হবো সাক্ষী দেয়ার জন্যে। এই উম্মতের নারী-পুরুষ, আলেম-অআলেম, বাদশাহ-ফকীর সকলেই সাক্ষী দেয়ার জন্যে এগিয়ে আসবে। আজ এ পৃথিবীতে যারা খুবই সাধারণ মানুষ, ফুটপাথে জুতা সেলাই করে যাদের জীবিকা নির্বাহ হয় তারাও সেদিন সাক্ষী দেয়ার জন্যে আসবে। এই হলো উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদা। তখন আমরা সকলে মিলে সাক্ষী দেবো– হে আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত নূহ (আ.) তোমার পয়গাম তাঁর জাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। এ কথা শোনার তাঁর সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। তারা বলবে, এরা কোত্থেকে এসেছে? আমাদের কালে তো এরা পৃথিবীতেই আগমন করেনি। আমাদের জীবনধারা তারা প্রত্যক্ষ করেনি। সুতরাং তারা কিভাবে সাক্ষী দিবে? তখন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে আমার প্রিয় নবীর উম্মতীগণ! এরা বলছে তোমরা এদের কালে উপস্থিত ছিলে না। তাহলে তোমরা কিভাবে সাক্ষী দিতে এলে, তোমরাই বলো। আমরা বলবো, আপনি আমাদের কাছে একজন সত্যবাদী রাসূল পাঠিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি আপনার সত্য কিতাব

অবতীর্ণ করেছিলেন। আপনার রাসূল এসে আমাদেরকে এই কাহিনী শুনিয়েছেন। এ হলো সাহাবায়ে কেরামের জবাব। তাবিঈগণ বলবেন, তোমার নবীর সাহাবীগণ আমাদের এই কাহিনী শুনিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেকেই তার পূর্ববর্তীদের রেফারেন্সে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে। একেবারে সবশেষে আগত মুসলমানও বলবে, হে আল্লাহ! এ কথা আমি তোমার নবীর সূত্রে জেনেছি। তাছাড়া তোমার কিতাবে সূরায়ে নূহ-এও পড়েছি। সুতরাং তোমার নবী যখন বলেছেন, তোমার কিতাবে যখন আছে তখন আমরা অবশ্যই সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত নূহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে তোমার পয়গাম পৌছে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা এর জবাবে বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী কবুল করছি। এখানেই আমাদের দায়িত্ব শেষ। তারপর আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিবেন– যাও বেহেশতে। বেহেশতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী ফুর্তি করো। সন্তানদের সাথে সাক্ষাত করো, মা-বাবা ও প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাত করো। এখন আর তোমাদের কোন কাজ নেই। বিদ্যালয়ে সর্বশেষ ঘণ্টা বাজার পর যেভাবে শিক্ষার্থীরা উল্লাস করে উঠে আমাদের দশাও হবে অনুরূপ। এতদিন আমরা পার্থিব জগতের বাঁধনে আটকা ছিলাম। এই ঘোষণার পর মনে হবে, আমরা মুক্ত। আমরাও সেদিন উল্লাস করতে করতে বেহেশতের দিকে ছুটবো। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করবেন–

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ

তাদেরকে বলা হবে, পানাহার কর তৃপ্তির সাথে। তোমরা অতীত দিনে যা কিছু করেছিলে তার বিনিময়ে।

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا

সেখানে তারা নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করতে থাকবে পানপাত্র যা থেকে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপকর্মেও লিপ্ত হবে না। [তূর : ২৩]

وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ...

তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। [মুরছালাত : ৪২]

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

আর তাদের ইপ্সিত পাখির গোশত নিয়ে। [ওয়াকিয়া : ২১]

এ হলো বেহেশতে পাখির গোশতে আহার করার চিত্র।

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ

তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ। [ওয়াকিয়া : ২৩]

مُتَّكِئِينَ عَلَى الْأَرَائِكِ...

সেখানে তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। [দাহর : ১৩]

بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ...

সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরো রেশমের আস্ত র বিশিষ্ট ফরাসে। [রাহমান : ৫৪]

عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

(তারা হেলান দিয়ে বসবে) সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপর। [রাহমান : ৭৬]

وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী। [রাহমান : ৫৪]

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ○ قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا...

তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে এবং ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানপাত্রে- রজতশুভ্র ফটিক পানপাত্রে পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ পান করবে। [দাহর : ১৫]

وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا...

তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। [দাহর : ২১]

সত্যিকার অর্থে এই তো জীবনের সফলতা। আল্লাহ যখন নিজে বান্দাকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন। সেখানকার পরিবেশই হবে ভিন্ন। স্ত্রী স্বামীকে পান করাবে, স্বামী স্ত্রীকে। সেবক স্বামীকে পান করাবে, হুর পান করাবে স্ত্রীকে। চাকর-বাকর এসে স্বামীকে পান করাবে। ফিরিশতা পান করাবে স্ত্রীকে। মূলত এই মর্যাদা লাভ করার পথই হলো- আমাদের উপর যে তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি মানুষকে আহ্বান করার দায়িত্ব রয়েছে সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। এ পথে চলতে গিয়ে হয়তো নিজেদের আবেগকে বিসর্জন দিতে হবে বিসর্জন দিতে হবে চোখের সামনে দেখা অনেক স্বার্থকে। তবেই পরকালে পাবো আমরা এর যথাযথ পুরস্কার।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ۔

স্থায়ী জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। এবং ফিরিশতাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। [রা'দ : ২৩]

এই তো জীবনের প্রকৃত সফলতা। শ্রেষ্ঠ উম্মাহ হিসেবে এই তো হওয়া উচিত আমাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত টার্গেট। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন। ✿

বয়ান : ৬

দুনিয়া পরীক্ষা কেন্দ্র

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ!

সফলতার মাপকাঠি

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আল্লাহ তাআলার দরবারে মানব জাতির সফলতার মাপকাঠি বংশ খান্দান বা রূপ-সৌন্দর্য নয়। আল্লাহ তাআলার দরবারে সফলতার মাপকাঠি হলো মানুষের আমল। চোখ দেখে, কান শোনে, জিহ্বা বলে, হাত-পা সঞ্চালিত হয়, মস্তিষ্ক ভাবে, হৃদয় নানারূপ আবেগ পোষণ করে– এ সবই তার আমল। মানুষ চব্বিশ ঘন্টাই কোন না কোন আমলে কোন না কোন কাজে ব্যাপৃত থাকে। এখন দেখার বিষয় হলো তার এই আমলের লক্ষ্য কি? যদি এর লক্ষ্য হয় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও পরকালীন সফলতা তাহলেই তার জীবন সফল। সফল তার সকল আমল ও কর্ম। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ...

আল্লাহ তাআলা তোমাদের বাহ্যিক রূপ ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না।

وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

তিনি দেখেন তোমাদের হৃদয় ও আমল।

আসমান থেকে আল্লাহ তাআলা আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে মানব জাতিকে যে জ্ঞান দান করেছেন সে জ্ঞান সব রকমের সংশয় ও বিচ্যুতির উর্ধ্বে। এর বিপরীতে মানুষের জ্ঞান পদে পদে ভুল করে, পদে পদে বিচ্যুতির শিকার হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত ইলমে কোনরূপ পরিবর্তনের অবকাশ নেই।

لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ

আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই। [ইউনুস : ৬৪]

আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হলো অভিজ্ঞতা। আর অভিজ্ঞতা অর্জন করি আমরা দেখেশুনে। তাই আমাদের জ্ঞানের পরিধিও খুব সীমিত। তাছাড়া

আমাদের বিবেক-বুদ্ধিও অসম্পূর্ণ। আমাদের বিবেক দৃষ্টি শ্রবণক্ষমতা কোনটিই পরিপূর্ণ নয়। ইরশাদ হয়েছে–

خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে। [নিসা : ২৮]

আয়াতটি ক্ষুদ্র হলেও এর মর্ম অনেক গভীর ও ব্যাপক। এ আয়াতে স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে, আমাদের দৃষ্টি দুর্বল, আমাদের শ্রবণক্ষমতা দুর্বল, আমাদের বলার ক্ষমতা দুর্বল। এক কথায় যেসব মাধ্যমে আমরা জ্ঞান অর্জন করে থাকি তার সবক'টিই দুর্বল। এর কোনটিই স্থিতিশীল ও সংশয়মুক্ত নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা যে জ্ঞান আমাদেরকে দান করেছেন তা সব রকমের ত্রুটি সংশয় ও দুর্বলতার উর্ধ্বে। তিনি কুরআনে কারীমের সূচনাই করেছেন এভাবে–

الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

আলিফ লাম মীম... এটা সেই কিতাব– এতে কোন সন্দেহ নেই। [বাকারা : ১-২]

সব রকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয় থেকে পবিত্র এই জ্ঞানভাণ্ডার। সুতরাং এই পাক গ্রন্থে যা কিছু নিহিত আছে সব শুদ্ধ আর এর বাইরে যা কিছু আছে সবই সংশয়যুক্ত। কারণ, এই গ্রন্থ এসেছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। ইরশাদ হয়েছে–

مِمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى

যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন (এই গ্রন্থ) তাঁরই পক্ষ থেকে। [ত্বহা : ৪]

আল্লাহর রাজত্বের পরিধি

আল্লাহর রাজত্ব দৃশ্যত কতটুকু? ইরশাদ হয়েছে–

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

যা আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এ দুয়ের অন্ত বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই। [ত্বহা : ৬]

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তাঁকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে। [রাহমান : ১-৪]

অর্থাৎ আকাশ পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে সবকিছুর নিরংকুশ মালিকানা তাঁরই। তিনিই মানুষকে কুরআন দান করেছেন। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ক্ষমতা দিয়েছেন হৃদয়ের ভাব প্রকাশের।

তাঁর ক্ষমতা কত যে ব্যাপক ও গভীর তা কি আমরা বলে শেষ করতে পারবো? তাঁরই অনুগ্রহে আমাদের কল্পনায় ভাবের উদয় হয়। আমরা আবেগ অনুভূতি লাভ করি তাঁরই ক্ষমতায়। অতঃপর সে আবেগ ও অনুভূতিকে ব্যক্ত করার ভাষাও দিয়েছেন তিনিই। এই ভাব ও শব্দ তাঁরই অনুগ্রহ। আমরা যেহেতু সর্বদাই ভাবি ও তা ব্যক্ত করি তাই আমাদের কাছে মনেই হয় না, এটা কত বড় শক্তির বিকাশ। আমার হৃদয়ে কত রকমের ভাব ও চিন্তার উদয় হয়। অতঃপর আমি আমার ক্ষুদ্র জিহ্বাটি সঞ্চালিত করতেই আমার হৃদয়ের ভাবনাগুলো শব্দের মোড়কে কত সহজে অন্যের হৃদয়ে পৌঁছে যাচ্ছে। এ যে কত বড় শক্তির বিকাশ তা কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? আল্লাহ তাআলা সূরা-এ রাহমানে সেই ক্ষমতা ও অনুগ্রহের কথাই উল্লেখ করেছেন। আরও ইরশাদ করেছেন–

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰىo اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰىo لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰىo وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى

তিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পক্ষ থেকেই এই কুরআন অবতীর্ণ। দয়াময়

> আরশে সমাসীন। যা আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এ দুয়ের অন্তবর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই। যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বলো তবে তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সকলই জানেন। [ত্বহা : ৪-৭]

এ হলো আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের পরিধি। এই জ্ঞান দান ও অনুগ্রহে তাঁর কোন শরীক নেই। কেউ যদি উচ্চকণ্ঠে তাঁকে ডাকে তিনি তা শোনেন যেমনটি শোনেন হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাও। তাঁর অনেকগুলো সুন্দরতম নাম রয়েছে। তাছাড়া এই পৃথিবীতে যত সুন্দর নাম আমরা কল্পনা করতে পারি সবই তাঁর। তবে এক জায়গায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নিরান্নব্বইটি নাম আছে বলে উল্লেখ করেছেন। পাক কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى...

> আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তাঁর রয়েছে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম। [ত্বহা : ৮]

আল্লাহ তাআলার গুণাবলী

যাঁর নাম আওয়াল– প্রথম, যাঁর নাম আখির– শেষ। যিনি আদি থেকে পাক, পাক অন্ত থেকে। তাঁর গুণাবলীও অনুরূপ। তাঁর গুণাবলীরও কোন আদি-অন্ত নেই। তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সবই সব রকমের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। একটি হাদীসে আছে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার দরবারে এই ভাষায় দুআ করেছেন–

اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِىْ سَمَّيْتَهُ نَفْسَكَ وَاَنْزَلْتَهُ فِىْ كِتَابِكَ اَوْعَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ...

> হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার সেই নাম নিয়ে প্রার্থনা করছি যে নাম তুমি গোপন করে রেখেছো। আমি তোমাকে তোমার সেই নামে ডাকছি যে নাম তুমি তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছো।

অথবা যে নাম তুমি তোমার কোন মাখলুককে শিখিয়েছো।

অর্থাৎ যে নাম তুমি তোমার কিতাবে উল্লেখ করেছো, কিংবা তুমি তোমার কোন সৃষ্টিকে শিখিয়েছো অথবা আজও পর্যন্ত গোপন করেই রেখেছো— আমি সেই নামের উসিলা লয়ে তোমাকে ডাকছি। এমনিতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ্য নাম 'আল্লাহ'। তবে তাঁর বিশেষণ নাম রয়েছে অগণিত। তাঁর সব চাইতে বড় বিশেষণ হলো তিনি লা-শরীক। তাঁর কোন শরীক নেই। সঙ্গী নেই। সাহায্যকারী নেই। সন্তান নেই। স্ত্রী নেই। মন্ত্রী নেই। পরামর্শক নেই। সেবক নেই। তিনি কারও সেবা গ্রহণ থেকেও পাক। তাঁকে কখনও ক্লান্তি পায় না। ঘুম পায় না। তন্দ্রা পায় না। তাঁর কখনও বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে না। তিনি খানাপিনা করেন না। তিনি কারও কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করেন না। তবে পৃথিবীর সকলেই তাঁর অনুগ্রহের মুহতাজ। তিনি কখনও তাঁর কোন কর্ম ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। তবে জিজ্ঞাসিত হবো আমরা।

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

কান চোখ হৃদয় এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। [বনি ইসরাইল : ৩৬]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার দরবারে আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর কথা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—

أَنْتَ أَوَّلُ لَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ آخِرُ لَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ ظَاهِرٌ لَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ لَا تَخْلِطُهُ الظُّنُونُ لَا يَسْبِقُهُ السَّابِقُونَ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ

এক কথায়, পৃথিবীর কেউ তাঁর যথাযথ প্রশংসা করতেও অক্ষম। আল্লাহ তাআলা নিজেই ইরশাদ করেছেন—

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ

পৃথিবীর সকল বৃক্ষ যদি কলম হয়...। [লুকমান : ২৭]

এই পৃথিবীতে কি পরিমাণে বন-জঙ্গল রয়েছে, কি পরিমাণে গাছ-গাছালি আছে তা কি আমরা বলতে পারি? কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন- যদি পৃথিবীর সমুদয় বৃক্ষকে কেটে কলম বানানো হয় অতঃপর-

لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا

সকল সমুদ্রের সকল পানি যদি হয় কালি...।

অতঃপর আমরা যদি এই কলম ও কালি নিয়ে লিখতে শুরু করি এবং আমাদের সাথে যদি গত অনাগত সকল মানুষও অংশগ্রহণ করে অংশগ্রহণ করে সকল জিন ও ফিরিশতা তবুও আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না। কারণ, আমাদের জ্ঞানের পরিধি খুবই সংকীর্ণ। তাই নবী-রাসূলগণ এমনকি ফিরিশতাগণ যুগের পর যুগ যদি প্রশংসা বাণী লিখতে থাকেন তবুও তা লিখে শেষ করতে পারবেন না।

لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا...

তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, আমি এর সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র আনলেও। [কাহফ : ১০৯]

অর্থাৎ বর্তমান সকল বৃক্ষকে যদি আমরা কলম বানিয়ে নিই আর সকল সমুদ্রের সকল পানিকে যদি কালি বানিয়ে তাঁর প্রশংসা বাণী লিখতে শুরু করি অতঃপর এই কলম ও কালি ফুরিয়ে যাওয়ার পর যদি অনুরূপ আরও কলম ও কালি আনয়ন করি তবুও তাঁর প্রশংসা শেষ হবে না।

কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা ও দুর্বলতা এত ভয়াবহ যে আমরা তো পাঁচ মিনিটও আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে পারি না। অথচ আমরা যদি একজন অবলা নারীকেও জিজ্ঞেস করি, তোমার ছেলেটি কেমন? তাহলে সে ঘন্টার পর ঘণ্টা ছেলের প্রশংসা করে যাবে, প্রশংসা ফুরাবে না। অথচ তাকেই যদি জিজ্ঞেস করা হয়, বোন তোমার আল্লাহ কেমন?

তাহলে সে হয়তো বলবে, আমার আল্লাহ এক। তারপর চুপ। অথচ বিষয়টা তো এমন ছিল– প্রতিটি মুসলমান নারী-পুরুষের কর্তব্য ছিল পৃথিবীর সামনে আল্লাহকে তুলে ধরা। অথচ আমরা নিজেরাই জানি না আমাদের আল্লাহ কেমন। আচ্ছা, এই আকাশ ও পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এমন কে আছে– সত্যিকার অর্থেই যাঁর প্রশংসা করা যায়? পাক কুরআন খুলে দেখুন, তার সূচনাই হয়েছে 'আলহামদুলিল্লাহ' দিয়ে। যারা আরবী ভাষার ব্যাকরণ জানেন তারা জানেন ক্ষুদ্র হলেও এই বাক্যটির ভাব ও মর্ম কত গভীর। আমরা সাধারণত এর তরজমা করি– 'সকল প্রশংসা আল্লাহর।' এজন্য করি যে, আমাদের ভাষায় এর চেয়ে ব্যাপক কোন শব্দ নেই। অথচ এই 'আলহামদু' শব্দের মধ্যে আল্লাহ তাআলা চার আসমানী কিতাব এবং দুনিয়ার সকল ভাণ্ডার প্রবিষ্ট করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সকল মুসলমান পুরুষ ও নারীকে জানিয়ে দিয়েছেন তোমাদের জীবনব্যাপী কাজ একটাই– সে হলো আমার প্রশংসা করা।

আল্লাহ তাআলার একটি বিশিষ্ট গুণ

তিনি 'রাব্বুল আলামীন'। সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। রব শব্দের মধ্যেই ভালোবাসার অর্থ আছে। এ কারণে মাকেও রব বলা হয়। রূপক অর্থে হলেও মা যেহেতু ভালোবাসা দিয়ে সন্তানকে লালন-পালন করে এজন্য তাকেও রব বলা হয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا...

> হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।
> [বনি ইসরাইল : ২৪]

প্রকৃত পালনকর্তা তো আল্লাহ। তারপরও রূপক অর্থে মা-বাবাকেও পালনকারী বলা হয়েছে। যেহেতু তারা আমাদের লালন-পালনের মাধ্যম হন। মূলত এই রব ও পালনকারী গুণটি আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ। এই গুণটি সবিশেষ বান্দাকে টানে। বান্দা পালনকারী কথাটির মধ্যে বিশেষ এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করে। এ কারণেই

দেখা যায়, শিশুরা যে কোন কষ্টেই মা মা বলে ডেকে ওঠে। তারপর ডাকে বাবাকে। কারণ, তার লালন-পালনে মা সর্বদা তার সাথে ছায়ার মতো থাকে।

আল্লাহ তাআলা হলেন সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। এই বিশ্ব জগতের প্রতিটি অনু-পরমাণুর প্রতিপালক। আমরা একটু চিন্তা করলেই দেখবো, মানুষ কেন, তুচ্ছ সাপ-বিচ্ছু শিয়াল-শূকরকেও তিনি রিযিক দান করেন। কুকুরের গায়ে হাত লাগালে হাত নাপাক হয় না। অথচ তার উচ্ছিষ্ট নাপাক। এই কুকুরকেও আল্লাহ রিযিক দেন। রিযিক দেন চির নাপাক শূকরকেও। অথচ শূকরের গায়ে হাত লাগলে হাত পর্যন্ত নাপাক হয়ে যায়।

আল্লাহর প্রশংসা আমাদের জীবনের লক্ষ্য

মানুষের কর্তব্য হলো, এ সমগ্র সৃষ্টি জগতে তাঁর প্রশংসা করা। তাঁর তারানা গাওয়া। সৃষ্টি জগতের কাছে আল্লাহ তাআলার পয়গাম পৌঁছে দেয়া। নিজের জীবনে তাঁর অনুশাসন মেনে চলা ও অন্য সকলকে আল্লাহর অনুশাসনের প্রতি আহ্বান করা মানুষের অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ،

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর।

আল্লাহই হলেন রব। তিনিই আমাদের খানাপিনার ব্যবস্থা করেন। আমাদের একমাত্র প্রতিপালক তিনিই।

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى،

আল্লাহই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন। [আনআম : ৯৫]

মাটির নিচ থেকে আঁটির শরীর দীর্ণ করে তিনি বৃক্ষ উদ্গত করেন। তিনিই মাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মানুষের জীবিকা পৌঁছে দেন। বৃক্ষরাজির শেকড়ে শেকড়ে তিনিই শক্তি সঞ্চার করেন। শাখা-পল্লবে বৃক্ষরাজিকে তিনিই পূর্ণতা দান করেন। গাছের শেকড় অনায়াসে মাটির গভীরে পৌঁছে যায়। সেই শেকড়ের মাধ্যমে গাছ খাদ্য সংগ্রহ করে। তাছাড়া

এই গাছের শেকড়ের মধ্যেও আল্লাহ তাআলা এমন জাল বিছিয়ে রেখেছেন যার কারণে কেবল আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় অংশটুকুই সে শুষে আনে, আর অপ্রয়োজনীয়গুলো মাটিতেই রেখে দেয়। আমাদের জন্য এ সকল কাজ আল্লাহ তাআলাই আঞ্জাম দিচ্ছেন। তিনিই রাব্বুল আলামীন। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশেই গাছের ডালাগুলো মোটা হয়ে ওঠে। তাতে আরও শাখা-প্রশাখা ছড়ায়। অতঃপর তাতে পত্র-পল্লবের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ নির্দেশ দেন সেই শাখা-প্রশাখা ভেদ করে বেরিয়ে আসে ফুল। বেরিয়ে আসে খোসা এবং খোসার ভেতর জন্য নেয় সুস্বাদু ফল।

وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا

তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ থেকে বের হয় না। [হা-মীম সিজদা : ৪৭]

অর্থাৎ তাঁরই নির্দেশে মাটির নিচ থেকে বৃক্ষরাজি উৎপাদিত হয়, তাঁরই নির্দেশে তাতে শাখা-প্রশাখা অতঃপর ফুল-ফলের সৃষ্টি হয়। কারণ, তিনি তো রাব্বুল আলামীন। অতঃপর তিনিই ফলের মধ্যে মিষ্টতা প্রবিষ্ট করেন, দান করেন তাতে হৃদয়কাড়া খুশবো। আমরা তো মাটির ভেতর চিনি ঢেলে দেইনি। তারপরও মাটি থেকে উৎপাদিত আখের মধ্যে মিষ্টতা এলো কোত্থেকে? তাছাড়া আম গাছের তলায়ও তো আমরা চিনি ছড়িয়ে রাখিনি। আমাদের সে চিনির রস শুষে আম মিষ্টি হয়নি। কি আশ্চর্য! ফিকে মাটি, ফিকে পানি আর সেখানে উৎপাদিত আমের ভেতর সুমিষ্ট রস। এই যে বাতাস অবারিতভাবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে চলেছে। অবিরাম সূর্য আলো বিকিরণ করছে। চাঁদ বিলিয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্না। এ তো আল্লাহ তাআলারই নির্দেশে। আমরা মাটির নিচে আমের আঁটি ছুঁড়ে মেরেছি। আর সে আঁটি থেকে আস্ত একটি গাছ। অতঃপর গাছ পূর্ণ সুমিষ্ট আমের আয়োজন তো তিনিই করেছেন। এই সুন্দর আম, সুন্দর পেয়ারা ও সুন্দর ডালিম কে সৃষ্টি করেছেন? এর নয়নকাড়া রঙ এবং হৃদয়কাড়া সুঘ্রাণ কোত্থেকে এলো? আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই তো!

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক। আমি তোমাদের জন্যে মাটির নিচ থেকে খাদ্য শস্য উৎপাদন করি। আমিই তোমাদের জন্যে ফল-ফুলের ব্যবস্থা করি। আমিই ফলকে পরিপক্ক করি। এর মধ্যে রস-গন্ধ আমিই ঢেলে দিই। বাঙির বীচিগুলো দিয়েছি মাঝখানে আর তরমুজের বীচিগুলো দিয়েছি ছড়িয়ে। একটার রঙ করেছি সাদা, আরেকটার রঙ করেছি লাল। একই মাটিতে উৎপাদিত একটি মিষ্টি আরেকটি পানসে। একই মাটিতে উৎপাদিত একটির রঙ সাদা, আরেকটির রঙ লাল। আবার এই তরমুজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বাইরে থেকে সবুজ। কিন্তু কাটার পর তার ভেতরের রঙ লাল। বিভিন্ন ফলের বিভিন্ন স্বাদ। বিভিন্ন রঙ ও গন্ধের। এই আয়োজন কে করছেন? তিনিই করছেন যিনি আমাদের রব যিনি আমাদের প্রতিপালক।

আল্লাহ তাআলা যদি গাভীকে পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি দিতেন তাহলে সে কি আমাদেরকে তার স্তন থেকে দুধ সংগ্রহ করতে দিত? তার তো মাথায় আত্মরক্ষার জন্যে বড় বড় শিং রয়েছে। দুধ নিতে গেলে সে যদি তার শিং দিয়ে হামলা করতো তাহলে কি আমরা দুধ সংগ্রহ করতে পারতাম? কিন্তু আল্লাহ তাআলার ফয়সালা হলো আমরণ এই গাভী আমাদের সেবা করবে। আমরা যদি তাঁকে মানি তবুও সেবা করবে, যদি না মানি তবুও সেবা করবে।

إِنَّ لَكُمْ فِى الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

অবশ্যই গবাদি পশুরু মধ্যেও তোমাদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে। [নাহল : ৬৬]

আমরা যদি চাই তাহলে এই নির্বোধ পশুগুলো দেখেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আল্লাহর আনুগত্যের পথে উঠে আসতে পারি।

কোত্থেকে আসে এই সাদা দুধ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন–

نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِى بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ

তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে আমি তোমাদেরকে পান করাই। [নাহল : ৬৬]

আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো, আমাদের চোখের সামনে এই গাভীগুলো সবুজ ঘাস খাচ্ছে। সেই ঘাস তার শরীরে গিয়ে রক্ত সৃষ্টি করছে লাল রঙের। আর তাতে গোবর সৃষ্টি হচ্ছে পিঙ্গল বর্ণের। গোবর এবং রক্ত উভয়টিই নাপাক। একদিকে রক্তের নালা, অন্যদিকে গোবরের স্তূপ।

لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

বিশুদ্ধ দুধ যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু। [নাহল : ৬৬]

অর্থাৎ আমাদের প্রভুই তো গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে আমাদের জন্যে খাঁটি দুধ সৃষ্টি করেছেন। দুই নাপাকীর মাঝখানে প্রবাহিত করেছেন পবিত্র দুধের ধারা। আমরা গাঁয়ের মানুষ। ছোটকাল থেকেই নিজ হাতে দুধ দোহন করেছি। কখনও কখনও গাভীর স্তনে হাত দিয়ে দেখেছি, চাপ দিলেই তা থেকে দুধ বেরিয়ে আসে। অথচ এই গাভীটিকে জবাই করার পর খোঁজ করে তার শরীরের কোথাও এক ফোঁটা দুধ দেখতে পাইনি। প্রশ্ন হলো, এই দুধের ট্যাঙ্কি কোথায় থাকে? মূলত এ সবই হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাণ্ড। আল্লাহ তাআলা এই গাভী, গাভীর গোশত ও দুধ সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্যে।

لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ...

তোমাদের জন্যে তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা থেকে তোমরা আহার করে থাক। [নাহল : ৫]

কুদরতের বিস্ময়কর বিকাশ

আল্লাহ তাআলা সূর্যকে তাপিত করেন। অতঃপর সূর্যের অগ্নিকে নিক্ষিপ্ত করেন সমুদ্রে। তারপর তাঁরই নির্দেশে সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে উপরে ওঠে যায়। সেখানে গিয়ে ।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে। [নূর : ৪৩]

ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا

তারপর তাদেরকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন। [নূর : ৪৩]

সূর্য থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়েছে। সেই অগ্নি সমুদ্রের পানিকে বাষ্প বানিয়ে তুলে দিয়েছে শূন্যে। সৃষ্টি হয়েছে মেঘমালার। তারপর আল্লাহর নির্দেশে সেই মেঘ বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ছে ঝিনুকের মুখে। সৃষ্টি হচ্ছে মূল্যবান মোতি। সেই মেঘ থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের ক্ষেত-খামারে। সবুজ হয়ে উঠছে মাঠের পর মাঠ। আম্রবৃক্ষ মুখ খোলে গ্রহণ করেছে বৃষ্টি। মধুর মতো মিষ্টি হয়েছে আম। করলা ক্ষেত গ্রহণ করেছে বৃষ্টি। তিক্ত হয়েছে করলার স্বাদ। মানুষ যখন এই বৃষ্টির পানি পান করে তখন তার জীবনে ফিরে আসে প্রাণ। এই পানিই যখন সাপ পান করে তখন তা থেকে বিষ সৃষ্টি হয়। হরিণ পান করলে সৃষ্টি হয় মেশক। এই পানি ছাগল পান করে। তাতে তার স্তনে সৃষ্টি হয় দুধ। আবার এই পানিই যখন প্রয়োজনের সীমা পার করে ফেলে তখন এই পানিই হয়ে ওঠে মানুষের মরণ। আবার এই পানি যদি প্রয়োজন সীমার নিচে নেমে যায় তখন দেখা দেয় আকাল। তাই তিনি এক সুসঙ্গত পরিমাণে প্রবাহিত করছেন পানি। পাহাড়ের উপর বরফ বানিয়ে আপতিত করেন পানিকে। সেখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরনা হয়ে নেমে আসে আমাদের জীবন পানি। আল্লাহ তাআলা যদি আকাশের মেঘমালা থেকে মুক্ত মুখে পানি ছেড়ে দিতেন তখন আমাদের কী অবস্থা হতো? আমাদের ঘর বাড়ি ধসে গিয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি হতাম। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটার সাথে একজন ফিরিশতা আসে। সে ফিরিশতা বৃষ্টির ফোঁটাটিকে আদিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়ে যায়। একবার একটি ফোঁটা নিয়ে যে ফিরিশতার আগমন হয় সে দ্বিতীয়বার আর কখনও বৃষ্টির ফোঁটা নিয়ে আগমন করে না। আমাদের বরষা মৌসুমে মাঠে প্রান্তরে অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে। এর প্রতিটি ফোঁটার সাথেই রয়েছে একজন ফিরিশতা। পাহাড়ের উপর যখন বৃষ্টি বর্ষণ

করেছেন তখন তাকে বরফ বানিয়ে বর্ষণ করেছেন। তাছাড়া সমুদ্র থেকে তুলে নিয়েছেন নোনা পানি। তারপর সে পানিকে কিভাবে ফিল্টার করলেন যে, পুরো পানিটাই ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে বর্ষিত হচ্ছে।

পানির কুদরতী স্টোর

অতঃপর আল্লাহ তাআলা পানিকে বরফ বানিয়ে পাহাড়ের উপর বিছিয়ে রেখেছেন। এগুলো হলো পানির কুদরতী স্টোর। এক গিলসিয়ার পানির শতকরা পঁচাশি ভাগ পৃথিবীর সবগুলো সমুদ্রের মধ্যে পড়ে আছে। অবশিষ্ট পনের ভাগ বরফ বানিয়ে বিছিয়ে রাখা হয়েছে পাহাড়ের উপর। যদি এই পাহাড়ের উপর বরফ করে রাখা পানিকে আল্লাহ তাআলা গলে যাওয়ার নির্দেশ দেন তাহলে সাথে সাথে সমুদ্রগুলোর পানি সত্তর ফুট উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে। আর সমুদ্রের যে দুই ডিগ্রি তাপমাত্রা তা সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে যাবে। অথচ সমুদ্রের তাপমাত্রার এক ডিগ্রির হাজার ভাগের এক ভাগ টেম্পারেচার নিচে নেমে গেলে স্থলভাগের পুরো এক ডিগ্রি টেম্পারেচার নিচে নেমে যায়। সুতরাং যদি সমুদ্রের পূর্ণ হাজার ভাগ টেম্পারেচারই নিচে নেমে যায় তাহলে স্থলভাগ হয়ে যাবে টেম্পারেচার শূন্য। আর পূর্ণ দুই ডিগ্রি তাপমাত্রাই যদি নিচে নেমে যায় তাহলে স্থলভাগের তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়াবে মাইনাস দুই হাজার ডিগ্রিতে। বলুন, তখন কি এই পৃথিবীতে কোন প্রাণী বেঁচে থাকবে?

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা করেননি। তিনি পাহাড়কে নির্দেশ দিয়েছেন রাস্তা করে দাও। অতঃপর পাহাড় পানি প্রবাহের জন্যে পথ করে দেয়। সৃষ্টি হয় ঝরনা, ঝরনা থেকে নদী। সে পথে বরফ পানি হয়ে নেমে যায় সমুদ্রে। সঙ্গে টেনে নিয়ে যায় মাটির লবণাক্ততাকে। আর এভাবেই অবশিষ্ট পানি মানুষের পান করার উপযোগী হয়ে ওঠে।

আল্লাহ তাআলা যদি মানুষের মাঝে পিপাসার সৃষ্টি না করতেন তাহলে তার হার্ট অকেজো হয়ে পড়তো। কিন্তু আল্লাহ তাআলাই মানুষের মধ্যে পানির চাহিদা সৃষ্টি করেছেন। ফলে কুদরতীভাবেই জিহ্বা ও ঠোঁট বিশুষ্ক হয়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় পানির প্রার্থনা। আল্লাহ তাআলা যদি এই পিপাসার কানেকশন ছিন্ন করে দেন তাহলে একজন মানুষ টেরও পাবে না যে কখন তার হার্ট অকেজো হয়ে পড়েছে। তাই আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ পূর্বক মানুষকে শুধুমাত্র পানি পান করার কর্তব্যটুকু দিয়েছেন। আর সেই

পানিও সৃষ্টি করেছেন তিনি। যদি আমাদেরকে পানি তৈরি করতে হতো তাহলেই আমরা টের পেতাম পানি কত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এজন্যেই আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

জীবনের লক্ষ্য

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি আল্লাহ তাআলার পূজা করতে। কিন্তু আমাদের জানা নেই, এই পৃথিবীতে আমরা কত মূর্তি তৈরি করেছি এবং দিবানিশি কত ভগবানের পূজা করছি। অথচ আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল কেবল আল্লাহ তাআলাকেই মানবো। তাঁর নির্দেশনা মাফিকই জীবনযাপন করবো এবং পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিবো তাঁর দেয়া জীবনাদর্শ। কারণ, এই উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পৃথিবী খুব শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের সকলকেই উপস্থিত হতে হবে আল্লাহর দরবারে—

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। [মুদ্দাছ্ছির : ৩৮]

كُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ

প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করে দিয়েছি। [বনি ইসরাইল : ১৩]

اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا

এবং কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর কাছে আসবে একাকী অবস্থায়। [মারিয়াম : ৯৫]

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ

এবং যেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নিবে না। [মু'মিনুন : ১০১]

لَقَدْ أَحْصٰهُمْ

তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। [মারিয়াম : ৯৪]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাদের কৃতকর্মকে গণনা করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা কখনও ভুলেন না। আমরা অবশ্য আমাদের গণনা করা বিষয়কেও ভুলে যাই। পকেটে রাখা বস্তুর কথাও ভুলে যাই। কিন্তু তিনি তো সব রকমের ভুল বিস্মৃতির উর্ধ্বে।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

এবং তোমার প্রতিপালক ভুলবার নন। [মারিয়াম : ৬৪]

إِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। [মারিয়াম : ৯৩]

অর্থাৎ এই পৃথিবীর সকলকেই একদিন আপনার প্রভুর সামনে বিনীত লাঞ্ছিত দাস হয়ে উপস্থিত হতে হবে। পৃথিবীর কোন সৃষ্টিরই এক চুল এদিক সেদিক করার সুযোগ নেই।

أَحْصَاهُمْ

তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

وَعَدَّهُمْ

তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করে রেখেছেন। [মারিয়াম : ৯৪]

এই পৃথিবীর প্রতিটি পর্বত, পর্বতশৃঙ্গ, লোকদৃষ্টির অন্তরালে চলমান কীট-পতঙ্গ, ক্ষুদ্র অনু-পরমাণু এমনকি বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা পর্যন্ত তিনি গণনা করে রেখেছেন। অদৃশ্য ফিরিশতা জগতের একজন সদস্যও তাঁর গণনার বাইরে নয়।

কিয়ামতের ভয়ানক দৃশ্য

তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তোমাদের এই পৃথিবীর সকল শৃঙ্খলা ভেঙ্গে দিয়ে আমার সামনে উপস্থিত করে জিজ্ঞেস করবো- বলো, তোমরা দুনিয়াতে কী করে এসেছো? সেদিন বড়ই ভয়াবহ অবস্থা হবে।

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا

সেদিন যেদিনটি কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে। [মুযযাম্মিল : ১৭]

كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ

প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে। [হাজ্জ : ২]

মায়ের কাছে এই পৃথিবীতে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ তার সন্তান। আর সে সন্তান যদি দুগ্ধপোষ্য হয় তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু সেই দিনের ভয়াবহতা হবে এমন, মা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তুলে ছুঁড়ে মারবে। বলবে, সন্তান চাই না। আমাকে রক্ষা কর! এই সেই দিন যেদিন পৃথবীর প্রতিটি নারী ও পুরুষ নিজের মুক্তি ভাবনায় এতটা আত্মমগ্ন থাকবে, পৃথিবীর সকল বন্ধনের কথা কোনভাবেই সে স্মরণ করতে পারবে না। আমরা মূলত পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে মানুষকে সেই দিনের ভয়াবহতার কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমরা পৃথিবীর প্রতিটি নারী ও পুরুষকে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদেরকে একজন অনেক বড় বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে। সেখানে কড়ায়-গণ্ডায় আমাদের কৃতকর্মের হিসাব নেয়া হবে। সেই সাথে আমাদের প্রতি তাঁর নেআমার অনুগ্রহের কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি তো আমাদের জন্যেই এই মাটির পৃথিবীতে সবুজ-শ্যামল গাছ-গাছালি উৎপন্ন করেন। ঝরনায় পানি প্রবাহিত হয় তাঁরই নির্দেশে। আমাদের জন্যে এই পানি, আমাদের জন্যেই তিনি সৃষ্টি করেন নানা রঙের, নানা স্বাদের ফলমূল। আমরা ঘরে বসে তা আহার করি। একদিনে কী পরিমাণে প্রাণী জবাই করা হয়? কি পরিমাণে মাছ প্রতিদিন ধরা পড়ে? অতঃপর তা কুদরতের

> করবে, অসৎকর্মে বাধা দান করবে। আর ঈমান আনবে আল্লাহ তাআলার প্রতি। [আলে-ইমরান : ১১০]

মুসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বাছুরের ইবাদতে মগ্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের তাওবার পথ ছিল রুদ্ধ এবং তাওবার ধরনও ছিল কঠিন। এ মর্মে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল–

فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

> তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করে ফেলো। [বাকারা : ৫৪]

কিন্তু তারা কিভাবে পালন করবে এ নির্দেশ? বাছুরের ইবাদতে যারা মগ্ন হয়েছিল তারা তো কেউ বা কারও মা, কেউ বা কারও বোন, কেউ বা কারও ভাই, কেউ বা কারও চাচা। অবশেষে হযরত মুসা (আ.) সচে হলেন–

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا

> মুসা স্বীয় সম্প্রদায়ের সত্তরজনকে নির্বাচিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্যে মনোনীত করলেন। [আ'রাফ : ১৫৫]

হযরত মুসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের সত্তরজনকে সঙ্গে করে তূর পাহাড়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা জানালেন– হে আল্লাহ! এরা তাওবা করছে, এদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, এদের তাওবা তো একটাই। হত্যা। আপনার পর এমন একটি উম্মতের আগমন ঘটবে, আপনার পর এমন এক নবীর আগমন ঘটবে যারা যত বড় গুনাহই করবে তাওবার বিনিময়ে আমি তাদেরকে মা করে দেবো। হযরত মুসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! আমি তো প্রার্থ করেছিলাম আমার উম্মতের জন্যে। আপনি গল্প শোনাচ্ছেন এমন এ উম্মতের যারা এখনও আসেনি। তাই যদি হতো তাহলে তুমি আমা পরেই সৃষ্টি করতে। মুসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ তাআলার এক অতি নি পয়গাম্বর। আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর। তাই তি সাহস করে এমন অনেক কথাই বলতে পারতেন যা অন্যদের পক্ষে স হতো না। একবার হযরত মুসা (আ.) আবদার করে বললেন,

আল্লাহ! আমি তোমাকে দেখতে চাই। আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন- 'লান তারানী'- মুসা! তুমি কখনও আমাকে দেখতে পারবে না।

মুসা (আ.) আবার আকুতি জানালেন, অন্তত একবার দেখা দাও। আল্লাহ তাআলা বললেন, দেখ তাহলে! যখন দেখলেন চল্লিশ দিন বেহুশ হয়ে পড়ে রইলেন। একবার তাজাল্লী পড়েছে আর চল্লিশ দিন পড়ে রয়েছেন বেহুশ হয়ে। কিন্তু দেখার আবদার ছাড়েননি। যে কথা বলছিলাম, হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা জানালেন, হে আল্লাহ! আমি তো ক্ষমা চেয়েছিলাম আমার উম্মতের জন্যে। আর তুমি শুনিয়ে দিলে অন্য উম্মতের ক্ষমার কথা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন-

إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِي وَبِكَلَامِي

আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। [আ'রাফ : ১৪৪]

অথচ এই উম্মতের মর্যাদা দেখুন, হযরত মুসা (আ.) তাঁর উম্মতের জন্যে তাওবার বিনিময়ে মাগফিরাত প্রার্থনা করেও পাননি। আর আমরা পেয়েছি প্রার্থনা ছাড়াই। কারণ, আমরা সর্বশেষ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। আমাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি এটাই আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামকে শুধুমাত্র নিজেদের জীবনে অনুশীলন করেই ক্ষান্ত হই না, আমরা এই পয়গামকে পৌছে দিই অন্যদের কাছেও। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত আমরা এই কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকবো ততদিনই আমরা ভূষিত হবো শ্রেষ্ঠত্বের অভিধায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ হিসেবে পরকালে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন। ✿

ইশারা ও তত্ত্বাবধানে পৌঁছে যায় বাজার হয়ে আমাদের ঘরে। কত হাজার হাজার মুরগী প্রতিদিন জবাই হচ্ছে। সব তো আমাদের জন্যেই। বিনিময়ে তিনি চান, আমরা যেন তাঁর জন্যে সামান্য কিছু করি।

মাঝে মধ্যে আমার অনুগ্রহের কথাও ভাব

হাদীস শরীফে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

يَا ابْنَ اٰدَمَ خَلَقْتُ الْاَشْيَاءَ لِاَ جْلِكَ وَخَلَقْتُكَ لِاَجْلِىْ

বান্দা! পৃথিবীর সকল বস্তু আমি সৃষ্টি করেছি তোমার জন্য। আর তোমাকে সৃষ্টি করেছি আমার জন্য।

তুমি আমার হয়ে দেখো। মা-বাবা কেন কষ্ট পান? তারা জীবন দিয়ে সন্তানকে লালন-পালন করেন আর সে সন্তান যখন পথহারা হয়ে যায় তখন মা-বাবা নিভৃতে কাঁদে। মায়ের অস্থিরতার সীমা থাকে না। আর যে মালিক এক ফোঁটা নাপাক পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ কি মা-বাবার চাইতে অধিক নয়? মা-বাবা তো অনেক সময় সন্তানকে ঘর থেকেও বের করে দেন। কিন্তু আল্লাহ কি কখনও তাঁর কোন বান্দাকে তাঁর ঘর থেকে বের করে দেন? অমুকের রুটি ছিনিয়ে এনেছো, অমুকের চোখ ছিদ্র করে ফেলেছো, ফিল্ম দেখেছো, গান শুনেছো। সুতরাং তোমার চোখ তুলে ফেলবো, তোমার কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবো– আল্লাহ কি কখনও এমনটি করেছেন? করেননি।

তিনি বরং বান্দার অপেক্ষায় বসে আছেন। অপেক্ষায় বসে আছেন, বান্দা! তুমি এটা কর, এভাবে কর তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিবো।

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا قَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا مَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا

কেউ যদি আমার দিকে আধ হাত অগ্রসর হয় আমি তার প্রতি এক হাত এগিয়ে যাই। কেউ যদি আমার প্রতি এক হাত আসে আমি তার প্রতি এক গজ অগ্রসর হই।

এমন তো নয় যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের ইবাদতের মুহতাজ। কত অসংখ্য ফিরিশতা সর্বদা তাঁর ইবাদত করছে। সুতরাং আমাদের ইবাদতের প্রতি তাঁর কি ঠেকা রয়েছে? বরং পৃথিবীর সকল মানুষ যদি এক সাথে কাফের হয়ে যায় তাহলে এতে তাঁর কী ক্ষতি হবে? যদি পৃথিবীর সকল মানুষ এক সাথে তাঁর অনুগত হয়ে যায় তাহলে এতেই তাঁর কী লাভ আছে? কিন্তু অমুখাপেক্ষিতার এই চূড়ান্ত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও তিনি বলেছেন– বান্দা, তুমি যদি আমার প্রতি হেঁটে আসো তাহলে আমি তোমার প্রতি ছুটে আসবো। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, অতীতে কৃত সকল পাপের জন্যে তাওবা করে তাঁর দরবারে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর দেয়া পথে চলার জন্যে আমল শেখা। শেখা ছাড়া তো লোহার গাড়িও চালানো যায় না। তাহলে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের গাড়ি আমরা শেখা ছাড়া কিভাবে চালাবো? আমাদেরকে ঈমান শিখতে হবে, আমল শিখতে হবে, আখলাক শিখতে হবে। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এ সবকিছু শিখতে হবে ও তার অনুশীলন করতে হবে। অতঃপর এই পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে হবে।

উম্মতে মুহাম্মদীর কর্তব্য

যেহেতু আমাদের নবী সর্বশেষ নবী, তাঁর পর এ পৃথিবীতে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না তাই তাঁর উম্মত হিসেবে তাঁর পয়গামকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া এটা আমাদের অনস্বীকার্য কর্তব্য।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِا للهِ...

তোমরাই তো শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের সৃষ্টি। তোমরা সৎকর্মের আদেশ

বয়ান : ৭

উপমাময় বিয়ে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ :

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে এই পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, এই মানব জাতি জানে না তাদের এই স্বাধীনতাকে তারা কোন পথে ব্যবহার করবে? এই স্বাধীনতাকে কিভাবে ব্যবহার করলে তারা তাদের নিজেদের জীবনে সুখ-শান্তি অনুভব করবে। তাছাড়া তাদের দ্বারা অন্যদের সুখ-শান্তিও বিঘ্নিত হবে না। মানুষ ব্যতীত এই পৃথিবীতে আরও যত প্রাণী আছে তাদের ক্ষেত্রে অবশ্য এই সমস্যা নেই। কারণ, তারা জন্মগতভাবেই জীবন চলার পথ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। ইরশাদ হয়েছে—

رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

> আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন। [ত্বহা : ৫০]

অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টিই তার প্রয়োজনীয় জ্ঞান নিয়েই এ পৃথিবীতে আসে। জীবনের পদে পদে যে প্রয়োজনের মুখোমুখি তারা হয় সে প্রয়োজন পূরণ করার জ্ঞান ও নির্দেশনা তারা জন্মগতভাবেই লাভ করে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো, একটি মুরগির ডিম থেকে একুশ দিন তা পাওয়ার পর যখন একটি বাচ্চা বেরিয়ে আসে তখন সে সঙ্গে সঙ্গেই নিজ উদ্যোগে খাবার খেতে শুরু করে। খাবার খাওয়া তাকে শিখিয়ে দিতে হয় না। অথচ আমাদের সন্তানরা একুশ মাস পরও নিজ হাতে খেতে পারে না, খাইয়ে দিতে হয়। অথচ মুরগির বাচ্চা জন্মগ্রহণের পাঁচ মিনিট পরই খেতে শুরু করে। সে তার মাকে এই আবদার করে না, আমাকে খাইয়ে দাও। এও জিজ্ঞেস করে না, কিভাবে খেতে হবে দেখিয়ে দাও। তাছাড়া কোনটা আমার উপকারী, কোনটা অপকারী তাও তাকে দেখিয়ে দিতে হয় না। অতঃপর শরীরে সামান্য শক্তি সঞ্চয় হতেই ডানা ঝাপটে উড়তে চেষ্টা করে। একটি মহিষের দিকে তাকিয়ে দেখুন, মহিষের বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার সামান্য পর নিজ থেকেই মায়ের স্তনের দিকে এগিয়ে যায়। তাকে তুলে ধরে স্তনের কাছে নিয়ে যেতে হয় না। অথচ একজন মানব শিশুকে কতটা জোর করে মায়ের দুধ চোষাতে হয় সে কথা একজন মা-ই ভালো জানে। অথচ নির্বুদ্ধিতার ক্ষেত্রে যে মহিষকে আমরা উপমা হিসেবে ব্যবহার করি সে মহিষের বাচ্চাকে জোর করে তো নয়ই হাত দিয়ে ধরেও তার মায়ের স্তন দেখিয়ে দিতে হয় না। আমি মূলত এই উপমার মাধ্যমে আপনাদের সামনে এ কথাটাই স্পষ্ট করতে চাচ্ছি– পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীই জীবন ধারণের যাবতীয় জ্ঞান ও নির্দেশনা নিয়েই এই পৃথিবীতে আসে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে বলতে পারে না, তাকে কি করতে হবে। সবকিছু তাকে এখানে এসে শিখতে হয়। জীবন চলার এই যে নির্দেশনা এটাকেই বলা হয় ওহী। এটাকেই বলা হয় কুরআন। এটাকেই বলা হয় জীবনদর্শন।

নির্দেশিত এ পথে চলেই একজন মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারে। আর এ পথকেই আল্লাহ তাআলা নাম দিয়েছেন ইসলাম।

মুরগির বাচ্চা ঘর থেকে বেরিয়েই যখন সম্মুখে একটি বিড়াল দেখতে পায় তখন সে দৌড়ে পালায়। ঘরের ভেতর গিয়ে আশ্রয় নেয়। অথচ বিড়াল যে তার শত্রু এ কথা তাকে তার মাও বলেনি, তার বাবাও বলেনি। তাহলে সে এটা জানলো কি করে?

মাকড়সা জাল বুনে। মাকড়সা সোয়েটার বানায়। সে এক পরিপূর্ণ টেক্সটাইল মিল। শিল্পনৈপুণ্যতার বিচারে তাকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বলতেও বাধা নেই। টেক্সটাইল কর্মকর্তাদের বাইরে থেকে সুতো কিনে আনতে হয়, তুলা কিনতে হয়। অতঃপর অনেক দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিকের খাটুনির পর সেই তুলা থেকে সৃষ্টি হয় সুতা। অথচ মাকড়সাকে কোন কৃষকের বাড়ি গিয়ে তুলা কিনতে হয় না, সুতা তৈরি করতে হয় না। তার ভেতর থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেরিয়ে আসে সুতা। অন্ধকারে বসে বসে সে তার জাল বুনে। অথচ মিলে বসে শ্রমিকরা সোয়েটার বানাতে হলে সেখানে লাইট মেশিন আরও কত কিছুরই না ব্যবস্থা করতে হয়! তারপর দেখা যায়, সুতা ছিঁড়ে যাচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে। এর বিপরীতে মাকড়সার দিকে তাকিয়ে দেখুন, রাতের গভীর অন্ধকারে আমাদের ঘরের টয়লেটের কোণে বসে সে নিরিবিলি জাল বোনে। সোয়েটারের মতো এত নিপুণ হাতে এত মজবুত সোয়েটার তৈরি করছে যা সত্যিই বিস্ময়কর। মাকড়সা তার জাল বুনতে গিয়ে যে তার টানে সেই তারের সমপরিমাণ মোটা যদি লোহার সুতা তৈরি করা হয় তাহলে দেখা যাবে এই লোহার সুতার তুলনায় মাকড়সার তৈরি সুতা এক হাজারগুণ বেশি শক্ত। দশগুণ বা শতগুণ নয়, পাক্কা এক হাজারগুণ।

رَبُّنَا الَّذِىٓ اَعۡطٰى كُلَّ شَىۡءٍ خَلۡقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন। [ত্বহা : ৫০]

প্রতিপালক তো তিনিই যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেন এবং প্রতিটি সৃষ্টিকে তার জীবন চলার পথ বাতলে দেন। কিন্তু মানুষকে বাতলে দেন না। বরং মানুষকে শিখতে হয়। পক্ষান্তরে এই মানুষ আবার নিজেই নিজের দায়িত্বশীল নয়। যেভাবে অন্যান্য সৃষ্টির সকলেই নিজেই নিজের দায়িত্বশীল। আমাদের কারও হাতে যদি পয়সা হয় তখন আমরা বলি, এখন সে নিজেই নিজের দায়িত্বশীল। আসলে কি সে নিজেই নিজের ঘর বানিয়েছে? তার গায়ের জামাটি কি সে নিজেই সেলাই করেছে? বিষয়টি তো আসলে তা নয়। বরং আমি আমার গায়ের এই জামাটি বানাবার পূর্বে একজনের কাছ থেকে কাপড় কিনেছি, সেলাই করেছি অন্যকে দিয়ে। যার কাছ থেকে কাপড় কিনেছি সেও হয়তো কিনেছে অন্য আরেকজনের কাছ থেকে। তাই কোন মানুষই তার নিজের সবকিছুর দায়দায়িত্ব নিজে পালন করতে পারে না। খুব বেশি হলে সে খুশহাল স্বচ্ছল হতে পারে। তার কাছে পয়সা আছে। এখন সে ঘর বানাতে চাইলে কারিগর মিস্ত্রি ডেকে ঘর বানাতে পারে। দরজি ডেকে কাপড় সেলাই করাতে পারে। বাবুর্চি ডেকে রান্নাবান্না করাতে পারে। কিন্তু নিজের সব কাজ নিজে করা সম্ভব নয়। তাই এই পৃথিবীতে অন্যের প্রতি সর্বাধিক মুহতাজ ও ঠেকা হলো মানুষ। মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। নিজে নিজের সকল দায়ভার বহন করতে পারে না। অথচ একটি ক্ষুদ্র বিড়াল, একটি গাধা, একটি মশা, একটি মাছি এরা সকলেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এদের সকল দায়ভার এরা নিজেরাই বহন করে বেড়ায়। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এদেরকে কখনও বাতির মুহতাজ হতে হয় না। এদের ভেতরে জেনারেটর লাগানো আছে। দিনের বেলা নিভে যায় আবার রাতের বেলা নিজে নিজেই জ্বলে ওঠে। অথচ আমাদেরকে রাতের বেলা বাতি জ্বালাতে হয়, আবার দিনের বেলা স্বউদ্যোগে বাতি নেভাতে হয়।

দীনের উপর চলতে শেখো

মানব জাতির জন্য জীবন চলার দুটি পথ রয়েছে। তার জীবনে যত প্রয়োজন রয়েছে এ প্রয়োজনগুলোকে সে দুটি পন্থার যে কোন একটি পন্থায় পূরণ করতে পারে। একটি হলো তার আকল ও বিবেক নির্ভর,

আরেকটি হলো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্দেশিত। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্দেশিত জীবন পথের নামই ইসলাম।

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর কাছে একমাত্র দীন। [আলে-ইমরান : ১৯]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা একমাত্র ইসলাম। এবং এটাই পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম। [মায়েদা : ৩]

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের দ্বারা আসমানী গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ইসলামের দ্বারা পরিসমাপ্তি ঘটেছে দীনের। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়তের দ্বারা পরিসমাপ্তি ঘটেছে সকল শরীয়তের। সুতরাং আমাদের জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা হলো ইসলাম। আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত এই নির্দেশনাই মূলত কুরআনের আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাতের আকৃতিতে আজও পর্যন্ত আমাদের মাঝে সংরক্ষিত আছে। এই জীবন ব্যবস্থার মূল কথা হলো, নিজস্ব আকল ও বিবেক বুদ্ধিকে অনুসরণ না করে ওহীর অনুসরণে জীবনযাপন করা। এই জীবন ব্যবস্থায় আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম আচার আচরণ বিয়ে-শাদী সবই রয়েছে।

ফ্যাশন থেকে সাবধান

শরীয়ত আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে- তোমরা শারীরিক চাহিদা পূরণ করার জন্যে বিয়ে কর। সেই সাথে এও বলেছে-

لَاتَقْرَبُوا الزِّنَا ـ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا ـ

ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। কারণ, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। [বনি ইসরাইল : ৩২]

যে দেশে যে শহরে যে গ্রামে গান-বাজনা ছড়িয়ে পড়ে, যিনা ব্যভিচার সেখানে আর ডেকে আনতে হয় না। বরং তা নিজে নিজেই ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য ও তার আলোর সম্পর্ক যেমন পরস্পর অঙ্গাঙ্গি, গান-বাজনা ও ব্যভিচারের সম্পর্কও তেমনি অবিচ্ছেদ্য। তাই কোথাও গান-বাজনার প্রচলন হলে সেখানে যিনা-ব্যভিচারের প্রচলন এমনিতেই হয়ে যায়। এজন্য আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ

তোমরা অশ্লীল কাজের কাছেও যেয়ো না। [আনআম : ১৫১]

لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا

তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। কারণ, ব্যভিচার হলো অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। [বনি ইসরাইল : ৩২]

এখানে আমাদেরকে অশ্লীলতার কাছেও যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু অশ্লীলতা বলতে কি বুঝায়? যে কাজ ও আচরণ মানুষকে ব্যভিচারের দিকে টানে তাকেই অশ্লীলতা বলে। পর্দাহীনতা মানুষকে ব্যভিচারের দিকে টানে। ব্যভিচারের দিকে টানে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। গান-বাজনাও মানুষকে যিনা ব্যভিচারের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। তাছাড়া হারাম খাদ্য মানুষের ভেতরে ক্লেদাক্ত ও অপবিত্র আবেগ সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে নির্লজ্জতার আকর্ষণ।

এক কথায়, যে সকল কর্ম ও আচরণ মানুষকে যিনা ও ব্যভিচারের প্রতি আকৃষ্ট করে উৎসাহিত করে তাকেই অশ্লীলতা বলে। পর্দাহীনতা লোলুপ দৃষ্টি গান-বাজনা নাচের অনুষ্ঠান টিভি-ভিসিআর ডিশ-ক্যাবল– যেখানেই এগুলো থাকবে সেখানে যিনা ব্যভিচার ঘটবেই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যিনা-ব্যভিচার থেকে বিরত থাকতে বলেছেন এবং তার

শাস্তি রেখেছেন 'সঙ্গেসার' তথা প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড। অথচ ইসলাম হলো রহমতের ধর্ম। তারপরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিবাহিত কেউ যদি ব্যভিচার করে তাহলে তাকে পাথর মেরে শেষ করে দেয়া। যদি অবিবাহিত হয় তাহলে তাকে একশ'টি দোররা মারা। আর যেন কাউকে এ অপরাধের পথে পা বাড়াতে না হয় সেজন্য পূর্বেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিয়ে কর। ব্যভিচার করো না। ব্যভিচারের দ্বারা মানব বংশ কলংকিত ও ধ্বংস হয়ে যায়। ধ্বংস হয়ে যায় জীবন, ভেঙ্গে পড়ে পারিবারিক বন্ধন। জীবনের শৃঙ্খলাবোধ বিক্ষিপ্ততায় হারিয়ে যায়।

ইউরোপীয় সভ্যতা : ধ্বংসের পথ

যেমনটি আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো, ইউরোপে পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে। ১৭৯২ সালে ইংল্যান্ডে এক মহিলা ছিল। তার নাম ছিল মেরি ভ্যাসস্টোন ক্রাফট। সে একটি বই লিখেছিল নারী স্বাধীনতা নামে। ঐ বইয়ে সে নারী স্বাধীনতা দাবী করে যুক্তি দিয়েছিল– মেয়েরা ঘরে বন্দী হয়ে থাকবে কেন? তারাও বাইরে আসবে। পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। সুতরাং বন্দী নয়, মেয়েদেরকে স্বাধীনতা দাও। তার এই বই প্রকাশিত হওয়ার আগে খোদ ইউরোপেও মেয়েরা পর্দার বাইরে এসে খোলামেলা জীবনযাপন করবে এমন ধারণা ছিল না। সেখানকার সভ্যতায়ও লজ্জার আবরণ ছিল। কিন্তু পেছন থেকে শয়তান তাদেরকে উস্কে দিয়েছে। এদিকে ইংরেজদের তখন ছিল পৃথিবীময় রাজত্ব। বলা হতো তাদের রাজ্যে কখনও সূর্য ডোবে না। একদিকে শয়তানের শক্তি, অন্যদিকে রাজত্বের শক্তি। তার সাথে রয়েছে রিপু ও প্রবৃত্তির তাড়না। অবশেষে নারী কথিত স্বাধীনতা পেল। পুরুষরাও পেল চাহিদা পূরণের অবিশ্বাস্য সুযোগ। নারীরাও পেল খায়েশ পূরণের অবারিত পথ। এবং সেই যে আগুন জ্বললো যার ক্রমবর্ধমান আগুনে ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থা পুড়ে এতদিনে ছাই হয়ে গেছে।

গত ইংরেজি ২০০০ সালে একটি জরিপ করা হয়েছে। সেই জরিপে দেখা গেছে, ১৭৭২ সালে যখন নারী স্বাধীনতার এই আন্দোলনের সূচনা

হয়। তখন সেখানকার মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– তোমরা কি ঘরে থাকতে চাও না ঘরের বাইরে কাজ করতে চাও? তখন তাদের শতকরা আটান্নব্বইজন বলেছিল, আমরা ঘরে ফিরে যেতে চাই। কিন্তু সমস্যা হলো, ঘরে যাওয়ার জন্যে পেছনে আমাদের স্বামী নেই, মা-বাবা নেই। অর্থাৎ এই স্বাধীনতার ফল দাঁড়িয়েছে এই– এই স্বাধীনতার বিনিময়ে তাদেরকে মা-বাবা ও ভাইবোনের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়েছে। তাদের সমাজ ব্যবস্থায় হারিয়ে গেছে মা-বাবার রূপ, ভাইবোনের রূপ, স্বামী-স্ত্রীর রূপ। এখানে তাদের শুধু গার্লফ্রেন্ড আছে, বয়ফ্রেন্ড আছে। তাদের সমাজে পরিচয় দেয়ার মতো বাপ নেই, ভাই নেই, চাচা নেই, দাদা নেই, নানা নেই, মামা নেই। আছে শুধুই ফ্রেন্ড। এই ফ্রেন্ড-এর সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ের সম্পর্ক টিকে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এখানেই তারা হৃদয়ের শান্তি অনুসন্ধান করবে। আর এই ফ্রেন্ডের সাথে সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলে এখানেই ঘুচাতে হবে হৃদয়ের শান্তির পালাও। দেখা গেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্রেন্ডের সাথে সম্পর্ক ভালো থাকে, হৃদয় যতক্ষণ পর্যন্ত টানে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বন্ধন বহাল থাকে। হৃদয়ের টান শীতল হতেই ব্যবহৃত সো-পিচের মতো বাইরে ছুঁড়ে মারে। সেখানে তাদের হৃদয়ের ব্যথা শোনার আর কেউ থাকে না।

এক ইউরোপিয়ান তরুণীর কান্না

একবার আমাদের একটি জামাত এডমবরা গেল। মসজিদে সবেমাত্র মাগরিবের নামায শেষ হয়েছে। এক তরুণী এসে জামাতের একজনকে জিজ্ঞেস করলো, ইংরেজি জান? সে বললো, হ্যাঁ জানি। মেয়েটি বললো, তোমরা এখানে কী করলে? সে বললো, আমরা ইবাদত করলাম। মেয়েটি বললো, আজ তো রোববার নয়। আজ কিসের ইবাদত? লোকটি বললো, আমরা দিনে পাঁচবার আল্লাহ তাআলার ইবাদত করি। মেয়েটি বললো, এ তো অনেক বেশি। তারপর আমাদের জামাতের সাথী তাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু ধারণা দিল। তার কথাবার্তা শোনার পর মেয়েটি হ্যান্ডশেক করার জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। জামাতের যুবকটি তাকে বললো, আমি তো আপনার সাথে হাত মিলাতে পারবো না।

দুঃখিত! মেয়েটি বললো, কেনো? যুবক বললো, এই হাতটি দিয়ে আমি কেবল আমার স্ত্রীকে স্পর্শ করি। এটা তার আমানত। এই হাত দিয়ে আমি তাকে ব্যতীত অন্য কোন নারীকে স্পর্শ করতে পারি না। এ কথা শোনার সাথে সাথে মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে এবং সে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে পড়ে যায়। আর বলতে থাকে, তুমি যে মেয়ের স্বামী সে মেয়েটা কত যে ভাগ্যবান! আহা! আমাদের ইউরোপের পুরুষরাও যদি এমন হতো!

এ হলো নারী-স্বাধীনতার মূল্য। আমার ভয় হয়, আমাদের চলমান প্রজন্মরাও নারী-স্বাধীনতার এই ফাঁদে আটকা পড়ে কি না। কারণ, তারাও তো সর্বক্ষণ বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে এই ডিশ-ক্যাবলের সামনে। তাই আমরা যদি আমাদের এই চলতি প্রজন্মকে এই ভয়ানক পরিবেশ থেকে টেনে বের না করি তাহলে তারাও পথহারা হবে। তারাও শিকার হবে ভয়ানক পরিণতির। কাফের সম্প্রদায়কে তো আল্লাহ তাআলা ছেড়ে দেন, দীর্ঘ সুযোগ দেন। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়কে খুব বেশি ছাড় দেন না। এটা আল্লাহ তাআলার বিধান।

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

গুরু শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাবো যেন তারা ফিরে আসে। [সিজদা : ২১]

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا

তাদেরকে ছাড়। তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক। [হিজর : ৩]

حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ،

যে দিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। [মা'আরিজ : ৪২]

অর্থাৎ মুসলমানদেরকে আল্লাহ তাআলা দীর্ঘ ছাড় দেন না। বরং তাদেরকে গুরু শাস্তির পূর্বে সময়েই লঘু শাস্তি আস্বাদন করান। কিন্তু

যারা কাফের বেঈমান তাদেরকে ছাড় দেন অফুরন্ত। তাদেরকে ছাড় দেন কিয়ামত দিবসের পূর্ব পর্যন্ত।

মজলুম নারী

আমার যুবক ভাই ও বোনেরা!

আমাদেরকে বাতিলের কৌশল বুঝতে হবে। তারা আমাদেরকে পথহারা করতে চায়। তারা আমাদের মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে চায়। তারা আমাদের যুবকদের হাতে গিটার তুলে দিতে চায়। যেন তাদের সভ্যতা তাদের কালচার আমাদের জীবনে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর তারা যে আযাব ও গযবের শিকার হয়েছে আমাদের তরুণ-তরুণীরা যেন সেই আযাব ও গযবের শিকার হয়। অথচ এর বিপরীতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন এক পবিত্র জীবনবিধান। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা বিয়ে কর। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এক সুন্দর শালীন সুস্থ সমাজ জীবন দিয়েছেন যেখানে নারী-পুরুষ কেউই কোনরূপ অবিচারের শিকার নয়। পক্ষান্তরে কথিত আধুনিক সভ্যতার দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে একজন মেয়েকে এগার বছর বয়সেই সঙ্গী সন্ধানের কথা ভাবতে হয়। অথচ চল্লিশ বছর পার হয়ে যায় কিন্তু সত্যিকারের কোন সঙ্গী তারা জুটাতে পারে না। আর আমাদের জীবন ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমাদের মেয়েরা বেড়ে ওঠে মায়ের কোলে। তারা বড় হয় বাবার স্নেহের ছায়ায়। তারা বেড়ে ওঠে ভাইয়ের সোহাগের তত্ত্বাবধানে। অতঃপর তাদেরকে বিশাল অনুষ্ঠান করে এক সম্মানিত পন্থায় মর্যাদাপূর্ণ আয়োজনে একজন যুবকের হাতে তুলে দেয়া হয়। এবং সেই সাথে থাকে মোহরের ব্যবস্থা। মোহর এটা কোন মূল্য নয়। একজন পবিত্র মেয়ের তো কোন মূল্য হতে পারে না। সাত আসমান ও সাত জমিন বোঝাই করে যদি স্বর্ণ দেয়া হয় সে স্বর্ণও একজন মেয়ের মূল্য হতে পারে না। তাছাড়া সম্মানিত বন্ধনেরও কি কোন মূল্য হয়? প্রশ্ন হলো, তাহলে এই মোহর কেন? মোহর ব্যতীত তো বিয়ে হয় না। আসলে মোহর বিষয়টি হলো একটি সম্মানের প্রতীক। পুরুষের উপর মোহরের দণ্ড চাপিয়ে দিয়ে শরীয়ত এ

কথাই বলে দিতে চায়, এই মেয়ে তোমার ঘরে গিয়ে বাজারে যাবে না, চাকরি করবে না, কোথাও শ্রম দিবে না। বরং সে তোমার সন্তানের লালন-পালন করবে। আর তোমার কর্তব্য হলো, সারা জীবন উপার্জন করবে এবং হালাল উপার্জন দিয়ে এই মেয়ের প্রয়োজন মিটাবে। সেই সাথে বৈধ স্ত্রীর জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা উপার্জনের সাধনাকেও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেনি শরীয়ত। বরং শরীয়ত বলেছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হালাল রোজগারের পেছনে ছোটাছুটি করে সন্ধ্যা বেলায় ক্লান্ত হয়ে যখন ঘরে ফিরে তখন এই ক্লান্তি তার সারা দিনের সকল গুনাহকে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে দেয়।

বিয়ে ও আল্লাহর পুরস্কার

আল্লাহর এক নেক বান্দা ছিল। কিন্তু সে বিয়ে করেনি। তার অনেক মুরীদ ছিল। মারা যাওয়ার পর এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কি আচরণ করেছেন? সে বললো, আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। তবে একজন বিবাহিত মুসলমান যে দুনিয়াতে তার স্ত্রী-সন্তানদের জীবিকা অন্বেষণে অস্থির ক্লান্ত হয়ে পরপারে আসে তার জন্যে আল্লাহ তাআলা যে বেহেশত তৈরি করেছেন সেই বেহেশতের বাতাসও আমি পাইনি।

এই ঘটনায় কোন খাঁদ থাকতে পারে। তবে এর মর্ম হাদীস শরীফ দ্বারা সমর্থিত। হাদীস শরীফে আছে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَدَرَجَةً لَا يَنَالُهَا إِلَّا ثَلٰثٌ

বেহেশতে এমন একটি সুউচ্চ মর্যাদা আছে যা কেবল তিন শ্রেণীর মানুষই প্রাপ্ত হবে।

এক. ন্যায়বিচারক শাসক। দুই. আত্মীয়-স্বজনের প্রতি উত্তম আচরণকারী, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী। এবং তিন. সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা সন্তান দান করেছেন। কিন্তু রিযিক দিয়েছেন স্বল্প। অথচ সে হারাম গ্রহণ করে না, মিথ্যা বলে না, প্রতারণা করে না। হালাল

জীবিকায় কষ্ট করে দিনাতিপাত করে নিজ সন্তানদেরকে লালন-পালন করে।

বিয়ের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জীবন চলার একটি পবিত্র পথ নির্দেশ করেছেন। আমাদেরকে বিয়ের বিধান দান করেছেন। আমাদের প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যাদেরকে বিয়ে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। নিজের বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানে অন্যদেরকে দাওয়াত করেছেন। এটাই আমাদের জন্য জীবন চলার পথ।

হযরত ঈসা (আ.) তো বিয়েই করেননি। তাই তাদের সামনে নবীর পক্ষ থেকে এ জাতীয় পরিপূর্ণ জীবনচিত্র নেই। তিনি বিয়ে করেননি। তাঁর ছেলে-সন্তানও ছিল না। পক্ষান্তরে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিয়ে করেছেন। তাঁর সন্তান ছিল এবং তাঁর বিয়ে-শাদীর বিষয়টিও ছিল বিস্ময়কর। তিনি তাঁর যৌবনের একটি বিরাট অংশ হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে কাটিয়েছেন। অথচ হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইতোপূর্বে আরও দুটি বিয়ে হয়েছিল এবং প্রত্যেক স্বামীর পক্ষ থেকেই সন্তানও ছিল।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হালা (রা.)কে বলা হতো 'সাফুর রাসূল'। আবু হালা হলেন হযরত খাদিজা (রা.)-এর আগের ঘরের সন্তান। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহাবয়েব বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি খুবই বিখ্যাত। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত খাদিজা (রা.)কে বিয়ে করেন তখন হযরত খাদিজ (রা.)-এর বয়স ছিল চল্লিশ এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ছিল পঁচিশ। তাঁর রূপ ছিল অপরূপ। কোন মানুষের পক্ষে সে রূপের বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। বিখ্যাত কবি সাহাবী হযরত হাসসান (রা.) বলেছিলেন–

وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِىْ

'তোমার মতো সুশ্রী মানব দৃষ্টি আমার হেরেনি কভু।'

তাঁর সম্পর্কে তাঁকে যারা দেখেছেন তারা বলেছেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাঁর মুখ ছিল সমুজ্জ্বল।

طَلَعَ الْوَجْهُ طَلَعَ الْقَمَرُ اللَّيْلَةَ الْبَدْرِ

তাঁর চেহারা ছিল চতুর্দশী চাঁদের ন্যায় স্নিগ্ধ।

তাঁর ললাট ছিল প্রশস্ত। মাথার কেশ ছিল ঈষৎ কুঞ্চিত। মস্তক বড়। সুশ্রী ভ্রূ। ভাষা পলক। চোখ দুটি ছিল বড় বড়। তাঁর আওয়াজ ছিল যাদুময়। কথায় ভালোবাসা ঝরে পড়তো। তাঁর মাঝে ছিল প্রীতি ও ভীতির সমন্বয়। যেই তাঁর সান্নিধ্যে আসতো সেই তাঁর প্রতি আকুলভাবে আকৃষ্ট হতো। গ্রীবা দীর্ঘ ছিল। শ্মশ্রু ছিল ঘন। শরীরের উচ্চতা ছিল মাঝারী। তাঁর অবয়ব ছিল মুজেযাপূর্ণ। অনেক উচ্চতার অধিকারীকেও তাঁর পাশে দাঁড়ালে তাকে খাটো দেখাতো। যে কোন দীর্ঘ বদন মানুষের পাশে দাঁড়ালেও আমাদের নবীজীকে কখনও খাটো দেখাতো না।

হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা। তিনি এতটা উচ্চতার অধিকারী ছিলেন যে, স্বাভাবিকভাবে ঘোড়ার উপর ওঠে বসলে তাঁর পা গিয়ে মাটিতে ঠেকতো। আনুমানিক তাঁর উচ্চতা দশ ফুটের কম ছিল না। অথচ তিনি যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে দাঁড়াতেন তখন তাঁকে খাটো মনে হতো। যাঁকে আল্লাহ তাআলা এমন সৌন্দর্যে বিভূষিত করেছিলেন তিনি কেনো পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছরের একজন বিধবা নারীকে বিয়ে করতে গেলেন?

তাঁর শরীর মেদবহুলও ছিল না, আবার কৃশকায়ও ছিল না। দেখতে তাঁকে স্থূলও মনে হতো না, আবার শীর্ণ-দুর্বলও মনে হতো না। তাঁর বক্ষ ও উদর ছিল সমতল। বক্ষ প্রশস্ত ছিল। তাঁর উপর কারও দৃষ্টি পড়লে চুম্বকের মতো আটকে থাকতো। এক কথায়, মাথা থেকে পায়ের গোছা, বাহু থেকে উদর, চুল থেকে ঠোঁট যে দিকেই তাকাও কেবল সুন্দরই সুন্দর। প্রশ্ন হলো, এত যাঁর রূপ তিনি কেন একজন চল্লিশ বছরের বিধবাকে বিয়ে করতে গেলেন? তিনি চাইলে তো আঠার বিশ

বছরের মেয়েকেও বিয়ে করতে পারতেন। তাছাড়া তাঁর সৌন্দর্যের দিকে যেই তাকাতো সেই তাঁর জন্যে পাগলপারা হয়ে যেতো।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন– মিশরের মেয়েরা তো হযরত ইউসুফ (আ.)-এর রূপ দেখে হাতের আঙুল কেটে ফেলেছিল। তারা যদি আমার প্রিয়তমের রূপ দেখতো তাহলে বক্ষ দীর্ণ করে বসে পড়তো। তাঁর বয়স যখন পঞ্চাশ বছর তখন হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়। একান্ন বছর বয়সে বিয়ে করেন হযরত সাওদা (রা.)কে। বায়ান্ন বছর বয়সে বিয়ে করেন হযরত আয়েশা (রা.)কে। অতঃপর তিপ্পান্ন থেকে তেষট্টি পর্যন্ত এই দশ বছরে তাঁর ঘরে আসেন উম্মাহাতুল মুমিনীনের অবশিষ্ট সদস্যগণ। তাঁদের সংখ্যাও আট।

তিনি এতগুলো বিয়ে কেন করেছিলেন

একটি হাদীসে আছে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَالِىْ فِى النِّسَاءِ بِا لْحَاجَةِ

নারীদের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই।

যদি সত্যিই নারীদের প্রতি তাঁর আগ্রহ থাকতো তাহলে তিনি যৌবনে এক সাথে নয়জন স্ত্রীকে ঘরে তুলতেন। অথচ তিনি বিয়ে করেছেন ষাট বছর বয়সে। হযরত মায়মুনা (রা.)কে বিয়ে করেছেন তেষট্টি বছর বয়সে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তিনি সংসার করেছেন মাত্র চার দিন। ইংরেজি হিসেবে তাঁর বয়স দাঁড়ায় একষট্টি বছর দুই মাস তেইশ দিন। যা দিনের হিসেবে বাইশ হাজার তিনশ' তিন দিন ছয় ঘণ্টা। আর নবুওয়াতের সময়কাল হলো আট হাজার একশ' ছাব্বিশ দিন।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে খুব সাধারণ বিয়েও করেছেন, মধ্যবিত্তও করেছেন এবং ধনী পরিবারেও করেছেন। এজন্য করেছেন যেন তিন শ্রেণীরই মানুষের জন্যে একটা

সরল নমুনা তাঁর মাঝে থাকে। গরীব, মধ্যবিত্ত ও ধনী সব ধরনের স্ত্রী তাঁর ঘরে ছিল। কিন্তু এর কি প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন এই ছিল- মেয়েরা যেন সহজভাবে দীন শিখতে পারে। দিনের বেলা তো তিনি সাধারণতভাবে পুরুষদের মাঝেই বসবাস করতেন। কখনও যুদ্ধে, কখনও মসজিদে। একাধিক বিয়ের দ্বারা সুবিধা এই হয়েছিল- তিনি যখন ঘরে থাকতেন তো এক বিবির কাছে অবস্থান করতেন। অবশিষ্ট বিবিদের ঘর থাকতো অবসর। আর মেয়েরা তো সর্বদাই তাঁর কাছে নানা বিষয়ে জানতে আসতো। তখন তারা অবসর বিবিদের কাছে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলোর সমাধান জেনে নিতেন। ফলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশাল পরিবার জুড়ে সর্বদাই একটি শিক্ষাঙ্গণের পরিবেশ বিরাজ করতো।

সাদামাটা বিয়ে

হযরত সাফিয়া (রা.)কে যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেন তখন তিনি ছিলেন সফরে। সফরসঙ্গীদেরকে ডেকে বলেন, তোমরা যার যার রুটিগুলো নিয়ে আমার দস্তরখানে চলে আসো। সকলেই নিজ নিজ খাবার নিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দস্তরখানে চলে আসেন। অতঃপর সকলে মিলে এক সাথে খানাপিনা করেন। এটাই ছিল বিবাহোত্তর ওলীমা। আমাদের সমাজ যদি ইসলামী সমাজ হতো তাহলে আমাদের সন্তানদের বিয়েও হতো অনুরূপ এবং গরীব মুসলমানদের জন্যে এটাই উত্তম পদ্ধতি। অবশ্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কোন বিয়েতে বেশ মর্যাদাপূর্ণ ওলীমাও হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিয়ের ওলীমায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে দুধ পান করিয়েছেন। যখন হযরত যায়নাব (রা.)কে বিয়ে করেন তখন হযরত যায়নাব (রা.) খুশিতে নিজেই ওলীমার আয়োজন করেন। তিনি বলেছিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ওলীমার ব্যবস্থা করবো এবং তিনি গরু জবাই করে ওলীমার আয়োজন করেন। মদীনার সকল পুরুষ ও নারী এতে অংশগ্রহণ করেন।

সুতরাং কেউ যদি বিত্তবান হয় তাহলে বড় করে ওলীমা করারও অবকাশ আছে। সেই সাথে এও মনে রাখতে হবে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ওলীমায় গরীবদেরকে দাওয়াত করা হয় না সেটা হলো মন্দতর ওলীমা।

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ে

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

আমরা যদি আমাদের বিয়ে-শাদীকে সাদামাটাভাবে আঞ্জাম দিতে পারি তাহলে বিয়ে-শাদীটা আমাদের জন্যে সহজ হয়ে ওঠবে। আর কঠিন হয়ে পড়বে যিনা-ব্যভিচার। এর বিপরীতে আমরা যদি বিয়ে-শাদীকে কঠিন করে ফেলি তখন সহজ হয়ে পড়বে যিনা-ব্যভিচার। লক্ষ্য করুন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ে হয় মসজিদে। দু'চার মাস পর হযরত আলী (রা.) আরয করেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফাতিমাকে তুলে দিলে ভালো হয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ঠিক আছে, তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করছি। অতঃপর তিনি মাগরিব নামায পড়ে ঘরে আসেন। ঘরে এসে বলেন, উম্মে আয়মানকে ডাক। হযরত ফাতিমা (রা.) বলেন, আমি তখন ঘরে কাজ করছিলাম। আমি শুনতে পেলাম আব্বাজান বলছেন, উম্মে আয়মানকে ডাক। সংবাদ পেয়ে উম্মে আয়মান ছুটে আসলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, ফাতিমাকে আলীর ঘরে দিয়ে আসো এবং এ কথা বলে আসো, আমি ইশা পড়ে চলে আসবো, তোমরা আমার জন্যে অপেক্ষা করো। দেখুন, দু'জাহানের বাদশাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)। তাঁকে তুলে দেয়া হচ্ছে এভাবে। কত সাদামাটা ব্যবস্থা! বরও নিতে আসেনি, বাবাও সঙ্গে যাচ্ছেন না। বরং ঘরের দাসী হযরত উম্মে আয়মানকে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছেন। উভয়জনই নারী। দু'জন হযরত আলী (রা.)-এর ঘরে এসে নক করলেন। আওয়াজ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হযরত আলী (রা.)। উম্মে আয়মান (রা.) তাঁকে বললেন, ভাই!

এই নাও তোমার আমানত। আর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তিনি ইশার পর তোমাদের ঘরে আসবেন, তোমরা অপেক্ষা করো।

আমাদের আমীর ছিলেন ভাই বশির সাহেব (রহ.)। তিনি তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিলেন। তখনও উঠিয়ে দেয়া বাকি ছিল। বর পক্ষের আত্মীয়-স্বজন সবাই তো আর এক রকম হয় না! যখন তাদেরকে বলা হলো, তোমরা দু'চারজন এসে মেয়ে নিয়ে যেয়ো তখন তারা বেঁকে বসলো। বললো, আমরা গ্রামের মানুষ। এভাবে বিয়ে হবে না। আমরা বরযাত্রী নিয়ে যাবো। অবশেষে তিনি বাধ্য হয়ে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর তিনি কী করলেন, বিয়ের নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগে কনে নিজের স্ত্রী ও ছেলেদের নিয়ে সোজা বরের বাড়িতে চলে গেলেন। গিয়ে বললেন, এই নাও ভাই! আমার আমানত, আমি তোমাদের কাছে রেখে যেতে এসেছি। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এ কাজটি তিনি তখন করেছেন যখন তিনি অল-পাকিস্তান টেলিফোনের ডাইরেক্টর জেনারেল। কত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। অথচ এমন কাজ করেছেন যা আমাদের সমাজে খুব সাধারণ একজন মানুষও করতে পারবে না। আসল কথা হলো, সরলতার ভেতরই সুখ। সরলতা ও ভালো আচার-আচরণের দ্বারাই সংসারে সুখ প্রতিষ্ঠিত হয়। সোনা-গয়না আর স্ফীত মোহর দিয়ে ঘরে সুখ আসে না। স্বামী-স্ত্রী যদি চরিত্রবান হয়, তারা যদি একজন আরেকজনকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে তখনই তাদের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ছেলে পক্ষের দায়িত্ব থাকে বেশি। মেয়ের মা-বাবা তো আদর-যত্নে মেয়েকে লালন-পালন করে নিজ হাতে অন্যের ঘরে রেখে আসে।

একজন মেয়ে সতের আঠার বছর একটা দেয়ালের ভেতর পরিচিত একটা সংসারে বেড়ে ওঠে। এখানে তার পাশে থাকে তার মা, তার বাবা। এখানে তার মান-অভিমানে তার পাশে থাকে তার ভাই, তার বোন। এখানে কেউই তার কর্তা নয়। বরং চারদিক থেকেই হৃদ্যতা করুণা ও ভালোবাসা নিয়ে সে বেড়ে ওঠে। তারপর যখন সে তার এই চির পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে স্বামীর ঘরে যায় তখন পেছনে রেখে যায় আপন ভাইবোন, মা-বাবা এবং আপন বেড়ে ওঠা প্রিয় পরিবেশ। তাই

এক্ষেত্রে বরপক্ষের কর্তব্য হলো নববধূকে এমনভাবে ভালোবাসা দেয়া যেন সে তার নিজের ঘর ভুলে যেতে পারে।

বউ শাশুড়ির ঝগড়া ও তার সমাধান

কিন্তু আমাদের দেশে কি হয়? আমাদের এখানে সে স্বামীর ঘরে পৌঁছতেই স্বামী জানিয়ে দেয়, এখন থেকে আমি তোমার স্বামী। তুমি আমার স্ত্রী। আমি তোমাকে যা বলবো তোমাকে তাই করতে হবে। তোমাকে আমার মায়ের সেবা করতে হবে, আমার বাবার সেবা করতে হবে। অথচ শরীয়ত কিন্তু স্বামীর খাবার রান্না করার কর্তব্যও তার উপর চাপায়নি। অথচ স্বামী তাকে বলছে, তোমাকে আমার খাবার রান্না করতে হবে, আমার বোনের খাবার রান্না করতে হবে। যদি না করে তাহলে সে বেয়াদব ও বেতমিজ হয়ে হয়ে যায়। তখন তাকে এই বলে তিরস্কার করা হয়, তোমার মা-বাবা তোমাকে কিছুই শিক্ষা দেয়নি? তাছাড়া শাশুড়ি ননদ তো আছেই শাসন চালাবার জন্য। এখানে শ্বশুরও শাসন চালাতে ত্রুটি করে না। এর কারণ হলো, আমাদের সমাজে ইসলাম নেই। যতটুকু আছে তা কেবলই ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমাদের সমাজ জীবনে ইসলামের কোন আলো নেই। যে কারণে বিয়ে-শাদীর পর কনে পক্ষের চোখ আর শুকায় না। লাখের মধ্যে হয়তো এমন একজন খুঁজে পাওয়া যাবে যে বলে, আলহামদুলিল্লাহ! ভালো বউ পেয়েছি। এর কারণ হলো, ছেলেরা ইসলামী জীবন শিখেনি। আমাদের পরিবারগুলো গড়ে ওঠেনি ইসলামী শিক্ষার আদলে।

বিয়েতে দীন দেখ দৌলত নয়

আমাদের এখানে বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে প্রধানত দেখা হয় ছেলে ব্যবসায়ী কি না, ধনী কি না। বিত্তটাই বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় থাকে। আমাদের এখানে এক বুযুর্গ মহিলা ছিল। সে একবার তার ভাতিজির বিয়ের কথা আলোচনা করছিল। বলছিল, আমাদের এখানে তো জমিদারী আছে। তাই আমরা ব্যবসা বাণিজ্য দেখি না, দেখি ছেলের

জমি কতটুকু আছে। সে কথা প্রসঙ্গে তার ভাতিজির বরের কথা বলছিলো। বলছিলো তাদের চৌদ্দ একর জমি আছে, পেপার মিল আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তা তো ঠিক আছে। কিন্তু ছেলে কেমন? বললো, চৌদ্দ একর জমি আছে, পেপার মিল আছে। পুনরায় বললাম, তা তো বুঝলাম, কিন্তু ছেলে কেমন? তার একই উত্তর, চৌদ্দ একর জমি আছে, পেপার মিল আছে। অর্থাৎ তিনি আমার কথা বুঝতেই পারছিলেন না, আমি কি জানতে চাচ্ছি। সেই বিয়ে হলো এবং এক বছর পর তালাকও হয়ে গেলো।

আজ আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় সংকট হলো এটা। আমরা আমাদের জীবনের সীমানা চিনি না। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাটা আমরা বুঝি না। একটি রাস্তা দিয়ে যদি দশ হাজার গাড়িও চলে যায়, ট্রাফিক বাধা দিবে না। কিন্তু লাইন ভেঙ্গে যদি দশটি গাড়িও যেতে চায় ট্রাফিক যেতে দিবে না। অনুরূপভাবে আমাদের জীবনেরও সীমানা আছে। সীমা আছে স্বামীর, সীমা আছে স্ত্রীর। শ্বশুর-শাশুড়িরও সীমা আছে, সীমা আছে ননদেরও। যদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ সীমার ভেতরে থাকে তাহলে সেখানে আন্তরিক এবং সুখের পরিবেশ বিরাজ করবে। কিন্তু যদি সীমা ভেঙ্গে ফেলা হয় তাহলে সংসার ভেঙ্গে পড়বে। মর্মর পাথরে তৈরি ঘরও কাঁটা বিছানো মরুসাহারা হয়ে যাবে। আলোকোজ্জ্বল বাড়িঘর হয়ে যাবে অমাবশ্যার অন্ধকার রাতের মতো। আজন্ম লালিত সুন্দর স্বপ্নগুলো হয়ে যাবে প্রাচীনকালের পর্বত গুহা। কিন্তু যদি আখলাক ভালো হয় তাহলে অন্ধকার ঘরও দ্বাদশীর আলোকোজ্জ্বল আকাশের মতো মনে হবে এবং ঠাণ্ডা চুলায়ও বইবে শান্তির সুবাতাস। সামান্য ডাল-ভাতেও পোলাও-কোর্মার স্বাদ অনুভূত হবে। পুরাতন সাদাসিধা খাটে শুয়েও আলীশান পুষ্পশয্যার স্বাদ অনুভূত হবে। পক্ষান্তরে যদি আখলাক বিকৃত হয়ে যায় তাহলে জীবন বিরান হয়ে পড়বে। হৃদয় যদি কাঁটাবিদ্ধ হয় তাহলে ফুলশয্যায়ও ঘুম আসে না। ঘরেও ঘুম আসে না, বাইরেও ঘুম আসে না। যদি পরস্পরে হৃদ্যতা দরদ ও ভালোবাসা না থাকে তাহলে কোন মুহূর্তেই শান্তি ও স্বস্তি অনুভূত হয় না। যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানে কি জীবন থাকে? মানুষের হৃদয় হলো কাঁচের মতো। একবার ভেঙ্গে গেলে আর জোড়া লাগে না। মানুষের হৃদয়ও একবার ভেঙ্গে গেলে আর

জুড়া লাগে না। হৃদয় ভাঙ্গে কথায়। মানুষের কথায় অন্তরে সবচে' বেশি আঘাত করে। আল্লাহ তাআলা মানুষের মুখের উপর বত্রিশটি তালা লাগিয়েছেন। তার উপর লাগিয়েছেন প্রধান গেট। কিন্তু জিহ্বা এমন জালেম সে এই সকল তালা ভেঙ্গে প্রধান গেট ভেঙ্গে বাইরে চলে আসে। অথচ আমাদের সমাজের চোরেরা তো একটি তালাও সহজে ভাঙ্গতে পারে না। আর জিহ্বা ভাঙ্গে বত্রিশটি তালা। প্রতিদিন ভাঙ্গে, প্রতিক্ষণ ভাঙ্গে। মূলত আমাদের সমাজের সকল ঝগড়ার উৎস হলো এই জিহ্বা। মুখই সমাজ সংকটের প্রধান উৎস। সুতরাং মুখের ভাষাকে মিষ্টি করতে সচেষ্ট হও।

ঝগড়া এবং তাবিজ

আমাদের এক ধোপী ছিল। কাপড় ধোয়ে দিত। কিন্তু সে ছিল ভারী ঝগড়াটে। সে একবার এসে আমার বোনের কাছে তার ছেলের বউদের বদনাম করছিল। বলছিল, আমার বউরা আমার সাথে ভীষণ ঝগড়া করে। আমাকে এমন একটা তাবিজ দাও, যেন তারা সকলে আমার গোলাম হয়ে যায়। আমার বোন বললো, ঠিক আছে। তারপর সে একটি কাগজে কিছু লিখে কোন রকম ভাজ করে তার হাতে তুলে দিল। হাতে তুলে দিয়ে বললো, মাসি! তোমার বউয়েরা যখন তোমার সাথে ঝগড়া শুরু করবে তখন তুমি এই তাবিজটি দাঁতের মাঝখানে দিয়ে দাঁত চেপে রাখবে। দাঁত ফাঁক হতে দিবে না। এভাবে এক সপ্তাহ করবে, দেখবে তোমার বউয়েরা তোমার গোলাম হয়ে গেছে। এক সপ্তাহ পর সে বেশ হাসি-খুশি। আমার বোনের কাছে এসে হাজির। বললো, বিবি সাব! আমার ঘরের সকল ঝগড়া শেষ। অথচ সে নিজেই ছিল ঝগড়ার রানী। এখন তার ঘরের সব ঝগড়া শেষ হয়ে গেছে। কারণ, সে জিহ্বার নিচে তাবিজ দিয়েছিল। আমাদের এখানে তাবিজ-কবজের রেওয়াজ আছে। সে ভেবেছিল, হয়তো তাবিজের ভেতর এমন কিছু লেখা আছে যার দ্বারা নিজে নিজেই ঝগড়া বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ তাবিজে তেমন কিছুই লেখা ছিল না। তাবিজ যা করেছে তা হলো তার মুখটা বন্ধ রেখেছে।

আমি বলি, আমাদের সংসার বিরান হয় মুখের কারণে। তাই এটা আমার বোনদেরও কর্তব্য। তারা যদি পরের সংসারে গিয়ে সুন্দর আচরণ উপহার দিতে পারে তাহলে পুরো ঘর তার অনুগত হয়ে পড়বে। তবে তার চাইতে বড় দায়িত্ব হলো ছেলেপক্ষের। কারণ, তারা পরের ঘর থেকে একটি মেয়েকে এনে অপরিচিত একটি পরিবেশে তুলেছে। এখানকার সকলেই তার অপরিচিত। এখানকার আচার-আচরণও তার কাছে নতুন। এতে কোন সন্দেহ নেই, কোন শাশুড়িই মা হন না। কোন শ্বশুরও বাবা হন না। এজন্যেই আল্লাহ তাআলা শ্বশুর-শাশুড়ি সকলের জন্যেই একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেন ঘরে ঝগড়ার সৃষ্টি না হয়। যে কোন সংসারকে আবাদ করতে হলে সর্বপ্রথম যা জরুরি তাহলো মিষ্টি কথা এবং সুন্দর চরিত্র। শুধু জ্ঞান-পাণ্ডিত্য দিয়ে সংসার সুখের হয় না। যারা পড়াশোনায় পণ্ডিত হয় তারা বরং দ্রুত ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে। ঘন ঘন ফতোয়া দিয়ে বসে।

উত্তম চরিত্র : একটি বিরল ঘটনা

সংসার চালাবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ হলো মুখের মিষ্টি ভাষা ও চারিত্রিক স্থিরতা। ধৈর্য ছাড়া কোন সংসারই সুখের হয় না। এজন্যে বিয়ে-শাদীর পূর্বেই আমাদের উচিত আমাদের সমাজ জীবন সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা ও নির্দেশনামূলক বাণীগুলো যত্নের সাথে পাঠ করে নেয়া। আমাদেরকে গভীরভাবে দেখা উচিত, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিদের প্রতি কতটা হৃদয়বান ছিলেন। এখানে উপমা হিসেবে একটি ঘটনা বলি। হিজরী ষষ্ঠ সালে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মায়মুনা (রা.)কে বিয়ে করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উমরাতুল কাযা করার জন্যে মক্কায় যান তখন হযরত মায়মুনা (রা.)ও সঙ্গে ছিলেন। রাতের বেলা ঘুম ভাঙ্গতেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রস্রাবের প্রয়োজন হয়। তিনি উঠে বাইরে চলে যান। কিছুক্ষণ পর হযরত মায়মুনা (রা.)-এর ঘুম ভাঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গার

পর তিনি দেখেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় নেই। তিনি চিন্তিত হন। ভাবেন, কোন সতীনের ঘরে গেলেন কি না। যা মেয়েদের সাধারণ স্বভাব। এই ভেবে তিনি ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে দেন। সামান্য পর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসেন এবং দরজায় নক করেন। বলেন, দরজা খোল। হযরত মায়মুনা (রা.) বলেন, দরজা খুলবো না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন? বললেন, আমাকে ছেড়ে অন্যের ঘরে চলে গেছেন। আমি কেন দরজা খুলবো? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– আরে আল্লাহর বান্দী। আমি আল্লাহর নবী। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি না। এ কথা বলতেই হযরত মায়মুনা (রা.) চকিত হয়ে ওঠেন। ভাবেন, সত্যিই তো! আল্লাহর নবী তো খেয়ানত করতে পারেন না। তারপর তিনি দরজা খোলে দেন। দরজা খোলার পর আল্লাহর রাসূল চাইলে তো জুতা তুলে পিটুনি শুরু করে দিতে পারতেন। বলতে পারতেন, কত বড় বেয়াদব বেতমিজ! কিন্তু পিটুনি তো দূরের কথা, একটি শক্ত শব্দও বলেননি। বরং ঈষৎ মুচকি হেসে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

এই হলো আমাদের চলার পথ। আমাদের কর্তব্য হলো, আমাদের সন্তানদেরকে এই আদলে গড়ে তোলা। কিন্তু আমরা তো আমাদের জীবনের টার্গেট বানিয়ে নিয়েছি বিত্ত-বৈভব। ফলে আমাদের সংসারে যখন কোন মেয়ে বউ হয়ে আসে তখন আমরা তাকে কাজের মেয়ে বানিয়ে ফেলি। আমাদের সমাজে এমন মানুষ কমই আছে যে পুত্রবধূকে নিজের মেয়ে মনে করতে পারে। বরং আমাদের এখানে প্রতিযোগিতা হয়, কে নতুন বউকে কত নতুন কায়দায় আক্রান্ত করতে পারে তার। অথচ ঘরকে সুন্দর করতে হলে, সমাজকে সুন্দর করতে হলে ছেলেদের উচিত স্ত্রীদেরকে ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দেয়া। মা-বাবার উচিত নতুন বউকে সময় দেয়া এবং তাকে আপন করে নেয়া। তখন হয়তো সে নিজেই সৌভাগ্য মনে করে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করবে।

এটা বড়ই বেদনার বিষয়, যে মেয়ে নিজের ঘরে কখনও চুলার পাড়ে যায়নি তাকে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে চাকরানীর মতো কাজ করতে হয় এবং স্বামী তাকে শাসিয়ে বলে দেয়, ঘরের সকলের রান্নাবান্না করা তার

কর্তব্য। অথচ শরীয়ত তো স্বামীর রান্না করাটাও তার উপর চাপায়নি। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদেরকে কাচের সাথে তুলনা করেছেন। সুতরাং তাদেরকে এভাবে লালন করাটাই আমাদের কর্তব্য। যেভাবে পরম যত্নের সাথে আমরা কাচকে হেফাজত করি। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলি, সংসার গড়ে চরিত্রে ভালোবাসায়। শাসনে গর্জনে তিক্ততা বাড়ে, ঝগড়া বাড়ে। ভালোবাসায় অন্তর জয় করা যায়। অর্থ দিয়ে অলংকার দিয়ে শাসন দিয়ে হৃদয় জয় করা যায় না। হৃদয় সেই জয় করতে পারে যে নীরব থাকতে শিখেছে। যে মাথা নত করতে শিখেছে, ক্ষমা করতে শিখেছে, ভুল দেখেও চুপ থাকতে শিখেছে সেই পারে চারপাশকে জয় করতে।

আখলাক খুবই মূল্যবান সম্পদ। আখলাক গঠনের জন্য যে মানের ঈমান চাই, যে পরিমাণে সাধনা চাই বেদনার বিষয় হলো সে ঈমান ও সাধনা আজ কোথায়? আমরা দেখি, একজন তাবলীগ করছে। তাহাজ্জুদ পড়ছে। অসংখ্য দীনি কাজে ত্যাগের সাথে অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু চারিত্রিক উন্নতির জন্যে যে ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন তা থেকে সদাই সে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা হলো—

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ

যে তোমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তুমি তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন প্রতিষ্ঠা কর।

وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

যে তোমার প্রতি অবিচার করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।

وَاعْطِ مَنْ حَرَّمَكَ

যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দাও।

এ হলো চরিত্র। এগুলো হলো উত্তম চরিত্রের ভিত্তি। যে সংসার এসব গুণ অর্জনে সচেষ্ট হবে তারা সোজা বেহেশতে চলে যাবে। যাদের চরিত্র খারাপ, যারা আখলাকের ধন অর্জন করতে পারেনি অনেক ইবাদত করেও তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে। সে পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ

তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও। [আ'রাফ : ৪১]

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ

তাদের জন্যে থাকবে তাদের উপর দিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিচের দিকেও আচ্ছাদন। [যুমার : ১৬]

এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে ডেকে বলেছেন–

يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর। [যুমার : ১৬]

ভয় কর আমাকে। ভয় কর আমার জাহান্নামকে। দুনিয়ার অভাব ক্ষুধা ও দারিদ্রকে ভয় কর? এটা তো ভয়ের বিষয় নয়। ভয়ের বিষয় হলো জাহান্নাম।

كُلَّمَا زِدْنَا هُمْ سَعِيْرًا

যখনই তা স্তিমিত হয়ে পড়বে আমি তখনই তার জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দিব। [বনি ইসরাইল : ৯৭]

এই হলো সৌন্দর্য

বেহেশতের কোন কন্যা যদি তার গায়ের ওড়নাটি একবার এই পৃথিবীতে এক পলকের জন্যে ছড়িয়ে দেয় তাহলে সমগ্র জগত আলোয় উদ্ভাসিত

ও সুবাসে আমোদিত হয়ে উঠবে। কোন জীবিত মানুষ যদি বেহেশতি নারীর এক ঝলক প্রত্যক্ষ করে তাহলে তার কলিজা দীর্ণ হয়ে যাবে। কোন মৃতের সাথে যদি তারা কথা বলে, তাহলে মৃতদেহে প্রাণ নেচে উঠবে। সমুদ্রে যদি থুথু ফেলে তাহলে সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে উঠবে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে যদি এক বিন্দু মুচকি হাসে তাহলে তার দাঁতের রৌশনীতে সমগ্র জগত উদ্ভাসিত করে তুলবে। তার মাথার চুল যদি বিকশিত হয়ে পড়ে তাহলে তা থেকে গোলাবের ঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হবে। এই হলো সৌন্দর্য। এই হলো বেহেশত। এই বেহেশত লাভ করতে হলে ভয় করতে হবে আল্লাহকে।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٰنِ

আর যে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। [রাহমান : ৪৬]

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ

উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ। [রাহমান : ৫০]

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ

উভয় উদ্যানে রয়েছে সব রকমের ফল দুই দুই প্রকার। [রাহমান : ৫২]

بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ

পুরো রেশমের আস্তর বিশিষ্ট। [রাহমান : ৫৪]

অর্থাৎ রেশমের তৈরি চাণক্যময় বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে বেহেশতিদের জন্যে।

وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী। [রাহমান : ৫৪]

দল ঝুঁকে থাকবে, ছড়িয়ে থাকবে ছায়া, পাখিরা উড়ে যাবে, প্রবাহিত হবে ঝরনা, সারি সারি সাজানো থাকবে পালংক। সজ্জিত থাকবে দস্তরখান। পূর্ণ থাকবে পান পাত্র। আরও থাকবে–

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ

সে সবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না। [রাহমান : ৫৬]

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল। [রাহমান : ৫৮]

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

যাদেরকে পূর্বের কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। [রাহমান : ৫৬]

আল্লাহ তাদেরকে আগুন পানি মাটি বাতাস দিয়ে তৈরি করেননি। তাদেরকে তৈরি করেছেন মেশক আম্বর জাফরান ও কর্পূর দিয়ে। পায়ের আঙুল থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত আম্বর ও জাফরানের তৈরি। হাঁটু থেকে বুকের ছাতি পর্যন্ত মেশকের তৈরি। বুকের ছাতি থেকে গ্রীবা পর্যন্ত আম্বরের তৈরি। গ্রীবা থেকে মস্তক পর্যন্ত কর্পূরের তৈরি। এ হলো বেহেশতের আনত নয়না হুর। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বেহেশতি পানি দ্বারা বিধৌত করেছেন। ঢেলে দিয়েছেন ইলাহী নূর। তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ঝলক। সেজেছে বধূ। পূর্ণ যৌবনা বধূ। কোনরূপ প্রশ্রাব-পায়খানা থেকে পাক, ঋতুস্রাব কিংবা বার্ধক্য কখনও স্পর্শ করবে না তাদেরকে। গর্ভধারণ কখনও আক্রান্ত করবে না তাদের রূপ-সৌন্দর্যকে। তাদেরকে কোন মৃত্যু পাবে না। তারা বিশ্বাসঘাতকতা ভালমন্দ এবং সব রকমের চারিত্রিক ত্রুটি থেকে মুক্ত। তাদের এসব গুণাবলীর কথা বলেছেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা থাকবে সদা সজ্জিতা। তাদের রূপবিভায় কখনও ভাটা পড়বে না। ভাটা পড়বে না তাদের যৌবনে। তারা হবে সদা আনন্দিতা। তাদের শরীর আবরণ থেকে সর্বদা বিচ্ছুরিত হবে পুষ্পের মদির সুরভি। তাদের পোশাক ও সাজ-সজ্জার আয়োজন করবেন আল্লাহ নিজে।

মৃতদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর

আল্লাহ তাআলা এই বেহেশতি রমণীদেরকে সব রকমের ক্লেদ থেকে পবিত্র রেখেছেন এবং এদের অধিকারী হবে তারাই যারা পবিত্র থাকবে পার্থিব পাপ-পঙ্কিলতা থেকে। এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বারবার সতর্ক করেছেন আমরা যেন আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকি। কবীরা গুনাহ থেকে হারাম উপার্জন থেকে সদা যেন আমরা বিরত থাকি।

কিন্তু আমরা তো এতটা নির্বোধ। সদা ডুবে আছি শরাবে, সুদে, ঘুষে, অবিচারে, গানবাদ্যে এবং মা-বাবার অবাধ্যতায়। আবার এরই ভেতর দিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা আমাদের মনের আকুতি জানাই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেসব অন্যায় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে মুহূর্তের জন্য বিরত থাকার কথা ভাবি না। ভাবি না এই অন্যায় অপরাধ আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। বেহেশতের কথা ভাবি না, দোযখের কথা ভাবি না, আল্লাহর কথা ভাবি না, মৃত্যু কবর হাশর, কবরের একাকীত্ব হাশরের অসহায়ত্ব কোন কিছুই ভাবি না। আমাদের চোখের সামনে কত চেনা মুখ অসংখ্য সম্পদ পেছনে রেখে চলে গেলো। কিন্তু তাদের দেখে আমরা সামান্যতমও শিক্ষা গ্রহণ করি না।

যারা এক সময় দাপটের সাথে এই পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে আজ তাদের কবরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, তোমার সামনে তো এক সময় পৃথিবীর শক্তিশালী বাহাদুরও মাথানত করে বসে পড়তো। আজ তুমি কেন মাটির নিচে পড়ে আছো? আজ তোমার ভেঙ্গে পড়া কবরের মুখে কেন মাকড়সার বাসা? এই পৃথিবীতে তুমি ছিলে রূপের সম্রাজ্ঞী গোলাবের পানি দিয়ে গোসল করতে। আজ তোমার শরীরের হাড়গুলো আলাদা হয়ে পড়ে আছে। তোমার কবরের পাশে এসে তোমাকে স্মরণ করার মতো কেউ নেই। তোমার কবরের পাশে এসে ফাতেহা পড়ে দুআ করার কেউ নেই। আমাদের উচিত, এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। যারা একদা এ পৃথিবীতে বিত্তের প্রতিযোগিতায় সুদ ঘুষ খুন জুলুম শরাব ব্যভিচার গানবাদ্য কোন কিছুই ছাড়েনি। তারা তো সকলেই আজ মাটির নিচে পড়ে আছে।

একদা আমরাও এদেরই পথ অনুসরণ করে এই কবরের বাসিন্দা হবো। প্রতিদিনের মতো পৃথিবীতে সূর্য ওঠবে, ঘরবাড়ি আবাদ হবে, কাজকর্ম সবই চলবে আগের মতো। চলবে ব্যবসা-বাণিজ্য, সন্তানরা মাকে ভুলে যাবে, ভুলে যাবে সেই সোহাগিনী মায়ের কথা যে মা একদা সন্তানের অসুস্থতায় রাতভর শিয়রের কাছে নির্ঘুম কাটিয়েছে। ভুলে যাবে সেই পিতার কথা যে পিতা সন্তানের মুখে হাসি ফুটাতে গিয়ে নিজের জীবনের সকল সুখ-স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েছে। সন্তানের মুখে শখের খাবার তুলে দেয়ার জন্যে তপ্ত রোদে বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছে। গ্রীষ্মের দাবদাহে এক দেশ থেকে আরেক দেশে সফর করেছে। পৃথিবী এভাবেই এগিয়ে চলে। কেউ কাউকে মনে রাখে না।

কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য

বিশ্বস্ত একমাত্র আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এর বাইরে যারা আছে সবাই বিশ্বাসঘাতক। সবাই। সেই নবীকে প্রাণখুলে দুআ দাও যিনি তেইশ বছর তোমাদের জন্য কেঁদেছেন। তেইশ বছর উম্মত উম্মত বলে বিচলিত হয়েছেন এবং পৃথিবী থেকে যাওয়ার সময়ও তাঁর জপ ছিল একটাই- উম্মত উম্মত। পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের এক সপ্তাহ পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও তাঁর এক সঙ্গী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। তাঁর চোখ তখন অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোমরা আমার সর্বশেষ সালাম গ্রহণ কর। আর তোমাদের পর আমার যে সকল উম্মত আগমন করবে তাদেরকেও বলে দিও, তোমাদের নবী তোমাদের প্রতি সালাম বলে গেছেন।

এই হলেন আমাদের নবী। আজ আমরা কাদের প্রতি নিজেদের বিশ্বাসকে অর্পণ করে রেখেছি। আর বিশ্বাসঘাতকতা করছি কার সাথে? হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিয়োগ তো মানবতার জন্যে এমন বেদনাবিধুর বিষয়, তাঁর বিচ্ছেদে জড় পদার্থ

পর্যন্ত কেঁদে উঠেছিল। মসজিদে নববীতে একটি খেজুর গাছ স্থাপিত ছিল। তাতে হেলান দিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতেন। লোকজন বেড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর জন্যে মসজিদে মিম্বর পাতা হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেই খেজুর গাছ ছেড়ে দিয়ে মিম্বরে তশরীফ নেন তখন এই জড় খেজুর গাছ পর্যন্ত বেদনায় হু হু করে ওঠে। আর সেই প্রিয়তম নবী সাহাবায়ে কেরামকে নয় বরং তাঁদের পরবর্তীকালে আগতব্য উম্মতকে সালাম পেশ করে যাচ্ছেন। এই সালাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত অনাগত সকল মুসলমানের জন্যে।

যখন কিয়ামত ঘনিয়ে আসবে, জাহান্নামকে হাশরের মাঠে টেনে উপস্থিত করা হবে, জাহান্নাম সজোরে একটি চিৎকার করবে তখন বড় বড় গুণী আবদাল পর্যন্ত, বড় মুজাহিদ, শহীদ, আলিম পর্যন্ত মাটিতে পড়ে যাবে। কী ফাসেক কী পাপী কী ফিরিশতা কী নবী সকলেই মাটিতে পড়ে যাবে। সকলের মুখে থাকবে একই জপ–

رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي

হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!

এটা আমরা সকলেই জানি, ফিরিশতাগণ তো আর জাহান্নামে যাবে না। তবুও পরিস্থিতির ভয়াবহতায় তারাও ভয়ে শংকিত হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। সকল মানুষ নাফসী নাফসী বলে চিৎকার করতে থাকবে। নাফসী নাফসী বলে চিৎকার করবেন সকল নবী। কী আদম (আ.), কী নূহ (আ.), কী ইদরীস (আ.), কী ইবরাহীম (আ.), কী হারুন (আ.), কী ইয়াকুব (আ.), কী ইসহাক (আ.), কী ইউসুফ (আ.), কী ইসমাঈল (আ.), কী দাউদ (আ.), কী সুলাইমান (আ.), কী ইয়াহইয়া (আ.), কী যাকারিয়া (আ.), কী ইউনুস (আ.), কী ঈসা (আ.) সকলের মুখে একই আকুতি– নাফসী নাফসী! হযরত ইবরাহীম (আ.) বলবেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার বাবার জন্য প্রার্থনা করছি না, তুমি শুধু আমাকে রক্ষা কর। হযরত ঈসা (আ.) বলবেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার মায়ের জন্য প্রার্থনা করছি না, তুমি আমাকে রক্ষা কর। অথচ তাঁরা হলেন কত উঁচু স্তরের নবী। নবী হয়েও সেদিন তাঁদের প্রার্থনা হবে– নাফসী নাফসী।

আর আমরা? আমরা নামায ছেড়েছি, রোযা রাখিনি, সুদ খেয়েছি, মাকে গালি দিয়েছি, বাপকে ধাক্কা দিয়েছি, ভাইয়ের অধিকার গ্রাস করেছি, মদ পান করেছি, গানবাদ্য শুনেছি, মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছি, অন্যের সম্পদ জোর করে দখল করেছি, মাপে ভেজাল করেছি, জুয়া খেলেছি। অথচ আমরা এখনও মধুর ঘুমে বিভোর। আমাদের অবস্থা দেখে মনে হয় যেন আমরা জীবনে কখনও পাপ করিনি।

আজ খলীলুল্লাহকে দেখ–

খলীলুল্লাহ বলছেন, হে খোদা আমাকে বাঁচাও!

আজ কালীমুল্লাহকে দেখ–

কালীমুল্লাহ বলছেন, হে খোদা আমাকে রক্ষা কর!

আজ যবীহুল্লাহকে দেখ–

যবীহুল্লাহ বলছেন– হে খোদা আমাকে বাঁচাও!

আজ রূহুল্লাহকে দেখ–

রূহুল্লাহ বলছেন– হে খোদা আমাকে রক্ষা কর!

হযরত ঈসা (আ.) বলবেন– আমি আমার মায়ের জন্য প্রার্থনা করছি না। আমি প্রার্থনা করছি আমার জন্য। হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও।

নবী যখন আপন মায়ের কথা ভুলে যাবেন তখন কি কোন স্ত্রী তার স্বামীকে স্মরণ করবে? তখন কি বাবা তার সন্তানকে স্মরণ করবে? স্বামী কি স্মরণ করবে তার বিবির কথা?

এদিকে তাকিয়ে দেখ, এ হলো হাশরের ময়দান। যে নবীর বাণী ও পয়গাম পৃথিবীর সকল মানুষ থেকে আলাদা। যাঁর ফরিয়াদা স্বতন্ত্র। যাঁর কান্না অন্যদের মতো নয়। যাঁর দুআ সকল মানুষের দুআ থেকে আলাদা। সেই নবীও আজ মহান প্রভুর দরবারে হাত সম্প্রসারিত করে কাঁদছেন– নাফসী, নাফসী! আর তখন আমাদের নবী তাঁর প্রভুর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করছেন–

يَارَبِّ أُمَّتِىْ أُمَّتِىْ

ইয়া রব! উম্মতী, উম্মতী!

হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে বাঁচাও! আমার উম্মতকে বাঁচাও!

এত বড় দয়ালু নবী পেয়েও আজ আমরা তাঁর জীবনাদর্শকে উপেক্ষা করে চলছি। আমরা আমাদের জীবনের পদে পদে তাঁর রেখে যাওয়া প্রিয় সুন্নতগুলোকে অবলীলায় হত্যা করে চলছি।

যেভাবে একদা আমার নবী এই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন এতীম হয়ে, কোন ধাত্রী এতীম বলে তাঁকে কোলে তুলে নিতে চায়নি– আজ আমার নবীর দীনও এতীম হয়ে পড়েছে। আজকের তরুণরা আমার নবীর দীনকে বুকে তুলে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা নাচ-গানের প্রেমিক। সমাজের ব্যবসায়ীরা আমার নবীর দীনকে তুলে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা বলে, আমার ব্যবসা নষ্ট হবে। সমাজের জমিদাররা আমার নবীর দীনকে তুলে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা বলে, তাহলে আমাদের কৃষি খামার উজাড় হয়ে যাবে। রাজনীতিকরা আমার নবীর দীনকে বুকে তুলে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা বলে, তাহলে আমাদের রাজনীতি শেষ হয়ে যাবে। আজ দেশের শাসক, আদালতের বিচারপতি এবং চেম্বারের উকিল কেউই আমার নবীর দীনকে বুকে তুলে নিতে প্রস্তুত নয়।

তাদের কথা কী বলবো, এই যে পথের পারে বসে অসহায় গরীব মজদুর যারা কলা বিক্রি করে তারাও আমার নবীর আদর্শকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। সেদিন আরবের প্রতিটি ধাত্রী যেভাবে আমার নবীকে উপেক্ষা করেছিল ঠিক সেভাবে আজ আমাদের সমাজের প্রতিটি মানুষ আমার নবীর দীনকে উপেক্ষা করে চলছে। পবিত্র ইসলামকে তুলে নেয়ার মতো আজ কেউ নেই। এখন সকলেই সম্পদের গোলাম। খানাপিনার গোলাম। আরাম-আয়েশের গোলাম। কাপড়ের গোলাম। ঘরবাড়ির গোলাম। চাকরির গোলাম। অথচ একবার ভেবে দেখ, যে নবীকে তুমি জীবনের কোথাও বুকে তুলে নিতে পারনি, সেই নবীই হাশরের ভয়ানক মুহূর্তে তোমাদেরকে ভুলে যাননি। বরং তিনি সেখানেও কাঁদছেন। ইয়া আল্লাহ! উম্মাতী, উম্মাতী!

এক বেদুইনের নবীপ্রেম

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) ও ইমাম নববী (রহ.)। একদা আলকামী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরের পাশে উপবিষ্ট। তখনই এক বেদুইন এসে উপস্থিত। এসেই সে এই বলে সালাম আরয করলো–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ...

অথঃপর বলতে লাগলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রভুকে আমি বলতে শুনেছি–

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَائُوْكَ فَا سْتَغْفَرُوْا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে তখন তারা তোমার কাছে আসলে ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে। [নিসা : ৬৪]

অতঃপর সে বলতে লাগলো–

يَا رَسُوْلَ اللهِ اِسْتَغْفِرْ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ يَارَسُوْلَ اللهِ...

হে রাসূল! আমি আপনার কাছে এসেছি, আমি আমার পাপকে স্বীকার করছি। আপনার উসিলা নয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাআলা যেন আপনার উসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর সে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে তার পবিত্র রওজার পাশে দাঁড়িয়ে দুটি কবিতা আবৃত্তি করে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজার দুই পাশে আজও

সেই কবিতা দুটি লেখা আছে। এর বাইরে আরও দুটি কবিতা আছে যেগুলো কিতাবে লেখা আছে। অতঃপর বেদুইন আবৃত্তি করে–

نَفْسِ الْفِدَاءِ لِقَبْرٍ اَنْتَ سَاكِنُهٗ

فِيْهِ الْعِفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

জীবন আমার উৎসর্গ হোক

তোমার সমাধির তরে–

পবিত্রতা বদান্যতা আর

সম্মানের নিবাস যেখানে

اَنْتَ الشَّفِيْعُ الَّذِىْ تُرْجٰى شَفَاعَتُهٗ

عَلَى الصِّرَاطِ مَا زَاقَ قَدَمٌ

পুলসিরাত! যেখানে পা স্খলিত হয় সেখানে তোমার শাফায়াতই কাম্য।

কিয়ামত হবে বড়ই ভয়াবহ। ইরশাদ হয়েছে–

وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ

এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। [কামার : ৪৬]

কিয়ামত এক ভয়ানক বিষয়। কিয়ামত হবে প্রতিটি মানুষের জন্যেই এক ভীতিপ্রদ পরিবেশ। মানব জীবনের সবচাইতে বড় সংকট হলো কিয়ামত। অথচ শয়তান আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের জীবনের সবচাইতে বড় সংকট দুনিয়া। দুনিয়াই আমাদের জীবনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং ছুট দুনিয়ার পেছনে। তাই আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভুলে গেছি। দুনিয়ার দু'পয়সায় আমরা বিক্রি হয়ে গেছি। অথচ আমাদের সামনে রয়েছে পুলসিরাত। পুলসিরাত সেই পার হতে পারবে যাকে আল্লাহ পার করবেন। তিন হাজার বছরের পথ, তিন হাজার বছরের অন্ধকার, আলো নেই, ধারালো, প্রশস্ত নয় সংকীর্ণ, এই পুলসিরাত সেই পার হতে পারবে যাকে আল্লাহ তাআলা পার করবেন। বেদুইন সেই পুলসিরাতের কথাই বলেছে উপরের

কবিতায়। বেদুইন বলেছে– 'আমাদের কাছে তো কিছু নেই। পুলসিরাত পার হয়ে যাওয়ার মতো তোমার শাফায়াত ছাড়া আর কোন ভরসা নেই।'

সত্যিই পুলসিরাত পার হওয়ার একমাত্র ভরসা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত। তাঁর শাফায়াত যার কপালে জুটবে না সে পুলসিরাত পার হতে পারবে না। উম্মত যখন পুলসিরাতে ওঠে দাঁড়াবে তখন আমাদের নবী পুলসিরাতের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে যাবেন। বলতে থাকবেন–

يَارَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ

হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে পারে পৌছে দাও, আমার উম্মতকে পারে পৌছে দাও।

আমি আবু বকর ও উমর (রা.)কেও ভুলতে পারি না। যতদিন পর্যন্ত কলম চলবে, চলবে সাহিত্যিকের সাহিত্য, লেখকের লেখনি যতদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে হে নবী! আমার সালাম আপনার প্রতি, আপনার মহান দুই সঙ্গীর প্রতি।

বেদুইন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে কবিতা আবৃত্তি করে শোনালো। তারপর চলে গেলো। সেখানে উপবিষ্ট আলকামী তন্দ্রাচ্ছন্ন হলো এবং তাকে ঘুম পেল। ঘুমুতেই স্বপ্নে দেখে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত। হুযুর তাকে বলছেন, আলকামী ওঠ! আমার উম্মতীকে গিয়ে ধর। সুসংবাদ দাও। তোমাকে তোমার প্রভু ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ হলো আমাদের নবী। দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করার পরও আমাদের প্রতি করুণা করতে ভুলেননি। অথচ আমরা তাঁকে ভুলে গেছি। এর চেয়ে অবিচারের কথা আর কি হতে পারে? আমরা আজ আমাদের নবীর পথ ভুলে গেছি। আমরা কোথায় যাচ্ছি তা আমরা নিজেরাও জানি না। অথচ কিয়ামতের ঘন্টা বেজে ওঠেছে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যখন দেখবে সন্তান তার মায়ের সাথে চাকর-বাকরের মতো আচরণ করবে,

আরবরা উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করবে মনে করবে কিয়ামত ঘনিয়ে এসেছে। আজ আমাদের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সন্তানরা তাদের মায়েদের সাথে কি আচরণ করছে? সৌদী আরবের দিকে চোখ তুলে তাকান, দেখুন গগনস্পর্শী সারি সারি প্রাসাদ। এ দেখে কি মনে হয়? সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সূর্য রক্তিম হয়ে উঠেছে। কিয়ামতের আর বেশি বাকি নেই। তাছাড়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন–

مَنْ مَاتَ فَقَا مَتْ قِيَامَتُهُ...

'যে মারা গেল সে তো কিয়ামতের মুখোমুখি হয়ে গেল।' সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত কিয়ামতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আমাদের প্রভু তো পরম দয়ালু। তিনি আমাদের সবকিছুই জানেন। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের পরকালকে সহজ করে নেয়া। তাছাড়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক শুধরে নেয়ার এই তো সময়। তিনি তো আমাদের জন্যেই পেটে পাথর বেঁধেছেন। তালিযুক্ত ছেঁড়া কাপড় পরিধান করেছেন। নিজের সন্তানকে দুঃখ-দুর্দশায় লালন-পালন করেছেন। দুআ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا،

হে আল্লাহ! মুহাম্মদের পরিবারকে খুব সামান্য রিযিক দাও।

এই কষ্ট এজন্য করেছেন যেন আমরা ভালো থাকি। যেন আমাদের সন্তানরা সুখে থাকে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের চাইতে উত্তম পরিবার এই পৃথিবীতে আর কোন পরিবার হতে পারে? তাঁদের জন্যে তো আল্লাহ তাআলা বেহেশতে সুউচ্চ আসন তৈরি করে রেখেছেন। তাঁর স্ত্রীগণকে আল্লাহ তাআলা আমাদের মা বানিয়েছেন। তাঁর সন্তানদেরকে বানিয়েছেন বেহেশতের সরদার। হযরত হাসান হুসাইন হবেন বেহেশতি যুবকদের সরদার। হযরত ফাতিমা (রা.) হবেন বেহেশতি নারীদের সরদার। অথচ তাঁদেরই জন্যে আল্লাহর রাসূল দুআ

করছেন স্বল্প রিযিকের। যেন কিয়ামত পর্যন্ত উম্মত এ কথা বলতে না পারে, তিনি তো তাঁর সন্তান-সন্ততিকে আদর-আহ্লাদে সুখে-ভোগে লালন-পালন করেছেন। আর আমাদেরকে ছেড়ে গেছেন দুঃখ-কষ্টে।

তিনি তাঁর সন্তানদেরকে বরং দুঃখে কষ্টে ঠেলে দিয়েছিলেন। অসহায় নিষ্পাপ শিশুরা জীবন দিয়েছে। হযরত হুসাইন (রা.) কারবালায় নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেছেন। এটা এজন্য হয়েছে যেন এ থেকে আমরা সান্ত্বনা লাভ করি। আমরা যেন হুকমতের কুরসী, অর্থের তরলতা আর সম্পদের প্ররোচণার কাছে না হেরে যাই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়েছেন, বর্শার উপর দাঁড়িয়ে থেকেও আমার সন্তানরা বিক্রি হয়নি। তাঁদের শরীরের উপর দিয়ে ঘোড়া চালানো হয়েছে। তবুও তাঁরা বিক্রি হয়নি। তাঁরা জীবনবাজি রেখে আখিরাতকে জয় করেছেন। বেহেশত জয় করেছেন। তাঁরা শানিত বর্শার উপর দাঁড়িয়ে আরশে আজীমে নিজেদের নাম লিখিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং তাঁর উম্মত হয়ে আমরা অর্থের দাস হবো, অট্টালিকার দাস হবো, বাণিজ্যের দাস হবো, সুনামের দাস হবো– এ তো হতে পারে না।

আমি সর্বদাই বলি, আমাদের প্রভু এত দয়ালু, এক বছর নয় হাজার বছর নয় কোটি বছর নয়, তোমার পাপ যদি আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত পৌছে যায় আর একবার তুমি আল্লাহ বলে চিৎকার করতে পার তাহলে তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। কোন মা-ও কি তার সন্তানের প্রতি এতটা দয়াপরবশ হয়? একবার অপরাধ কর, তারপর ক্ষমা চাইতে যাও। দেখবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এখানে হাজারবার অপরাধ করেও যদি একবার বলতে পার, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও! মুখ ফিরিয়ে নিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে রহমতের কোলে তুলে নিবেন। সত্যিই তাঁর সবকিছুই তুলনাহীন।

مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ تَلَقَّيْتُهُ مِنْ بَعِيْدٍ...

বান্দা যদি আমার দিকে এগিয়ে আসে আমি আরশ থেকে নেমে এসে তাকে তুলে নিই।

তিনি আরও বলেছেন–

مَنْ اَعْرَضَ عَنِّى نَادَيْتُهُ عَنْ قَرِيْبٍ

যে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমি নিজে তার কাছে চলে আসি।

সুতরাং আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তাঁর অপছন্দের পথকে পরিহার করে তাঁর পথে ওঠে আসা। যে পথ প্রদর্শন করেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিয়ামত ঘনিয়ে এসেছে। চারদিকে হুশিয়ারি সংকেত বেজে ওঠেছে। আল্লাহর শাস্তি বড়ই ভয়াবহ।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ...

অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের প্রতি শাস্তির কষাঘাত হানলেন। [ফাজর : ১৩]

তিনি অতীতে অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। আমরা যেন সাবধান হতে পারি। আমরা যেন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি। এটাই আমার শেষ পয়গাম। আপনাদের প্রতি এটাই আমার শেষ আহ্বান। আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন তাহলে মনে করতে হবে, আমাদের এ জীবন কোন জীবন নয়। এমন জীবনের চাইতে মরে যাওয়াটাই উত্তম। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সুমতি দান করুন। তাওবা করে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার তাওফীক দিন। আমীন। ✿

বয়ান : ৮

কবরের অন্ধকার রাত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّابَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَااَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ....وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَااَبَا سُفْيَانَ جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

আল্লাহর পরিচয়

এই বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ।

لَيْسَ مَعَهُ اِلٰهٌ يَخْشٰى

তাঁর সাথে এমন কোন শরীক নেই যাকে ভয় করা হবে।

وَلَارَبٌّ يُرْجٰى

এমন কোন প্রতিপালক নেই যার কাছে কিছু আশা করা যায়।

وَلَا حَجَبٌ يَرْشٰى

মাঝে এমন কোন মধ্যস্থতাকারী নেই যাকে দিয়ে সুপারিশ করাতে হবে।

وَلَا وَزِيْرٌ يُوْتٰى

তাঁর কোন উজির নেই যাকে ঘুস দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হবে।

قَاهِرٌ بِلَا مُعِيْنٍ

তিনি পরাক্রমশীল। তাঁর কোন সহযোগী নেই।

مُدَبِّرٌ بِلَا مُشِيْرٍ

তিনি বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপক। তাঁর কোন পরামর্শক নেই।

وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا

এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। [বাকারা : ২৫৫]

لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ

তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করে না। [প্রাগুক্ত]

وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ

আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। [ক্বাফ : ৩৮]

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

তোমার প্রতিপালক ভুলবার নন। [মারিয়াম : ৬৪]

وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

তারা ব্যর্থও করতে পারবে না। [জুমার : ৫১]

لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسٰى

আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। [ত্বহা : ৫২]

اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَاتَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ

তিনি চিরঞ্জীব সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই। [বাকারা : ২৫৫]

هُوَالْاَوَّلُ...لَيْسَ قَبْلَهٗ شَيْءٌ

তিনিই প্রথম, তাঁর পূর্বে কেউ নেই।

قَدِيْمٌ بِلَا اِبْتِدَاءٍ

অনাদি। তাঁর কোন আদি নেই।

وَدَائِمٌ بِلَا اِنْتِهَاءٍ

তিনি চিরন্তন, তাঁর কোন অন্ত নেই।

وَالظَّاهِرُ لَيْسَ فَوْقَهٗ شَيْءٌ

তিনি চির প্রকাশিত। তাঁর উপরে কিছু নেই।

وَالْبَاطِنُ لَيْسَ دُوْنَهُ شَيْءٌ

তিনি গোপন, তাঁর নিচেও কিছু নেই।

لَاتَرَاهُ الْعُيُوْنُ

মানুষের চোখ তাঁর পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম।

وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ

কল্পনাও তাঁকে স্পর্শ করতে অপারগ।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ

আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল। [কাসাস : ৮৮]

বিচার দিবস

একদিন আমাদের সকলকেই তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, তিনি গাফেল নন। তিনি দুর্বল নন। তিনি পাকড়াও করতে পারেন। মারতে পারেন। বিনাশ করতে পারেন। তারপরও তিনি আমাদেরকে মারেন না। পাকড়াও করেন না। কেন করেন না? এর দুটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো, এই দুনিয়াটাকে তিনি বিচারের জগত হিসেবে সৃষ্টি করেননি। বিচারের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন আখিরাত। ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا

নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে বিচার দিবস। [নাবা : ১৭]

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ

নিশ্চয়ই সকলের জন্যে নির্ধারিত আছে তাদের বিচার দিবস। [দুখান : ৪০]

সুতরাং আমাদের বিচার দিবস সমাগত। সেদিন ভালোমন্দ তিনি আলাদা করে ফেলবেন। কিয়ামতের দিন তিনি ঘোষণা দিবেন—

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ

হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।
[ইয়াসীন : ৫৯]

হতে পারে এই পৃথিবীতে যারা ভালো মানুষ নেক মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিল তারা হয়তো সেদিন পাপীদের কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। প্রত্যেকের ভেতরের অবস্থা আল্লাহ তাআলাই খুব ভালো জানেন। তিনি তো ভালো করেই জানেন, আমার অন্তরে কি আছে। তিনি সকল ত্রুটির উর্ধ্বে। সকল সৃষ্টি তার অনুগত। তিনি এই বিশাল সৃষ্টি জগত তাঁর কোন স্বার্থে সৃষ্টি করেননি। তিনি ইরশাদ করেছেন— হে মানবগোষ্ঠী! আমি তোমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করিনি যে, তোমাদের দ্বারা আমি আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করবো। আমার একাকীত্ব দূর করবো। কিংবা আমার কোন কাজে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। বরং আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি—

إِنَّمَا خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُوْنِىْ فَضِيْلًا وَتَذْكُرُوْنِىْ كَثِيْرًا وَتُسَبِّحُوْنِىْ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

যেন তোমরা সকাল-সন্ধ্যা আমার ইবাদত কর, আমাকে স্মরণ কর এবং আমার পবিত্রতা বর্ণনা কর।

যখন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী সুউচ্চ আকাশ সবকিছুই বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি সেদিন ধমকের সুরে শুধাবেন, কে তোমাদের বাদশাহ? ইরশাদ হবে—

اَلْمَلِكُ

তিনিই অধিপতি। [হাশর : ২৩]

اَلْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক। [প্রাগুক্ত]

اَلْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশীল, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। [প্রাগুক্ত]

তিনি সেদিন সকলকে লক্ষ্য করে বলবেন-

اَيْنَ الْمُلُوْكُ

তোমাদের রাজা-বাদশাহরা আজ কোথায়?

اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ

আজ কোথায় দুনিয়ার জালিমরা?

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

আজ কর্তৃত্ব কার? [মু'মিন : ১৬]

সেদিন কথা বলার কেউ থাকবে না। জবাব দেয়ার কেউ থাকবে না। বরং সেদিন নিজেই জবাব দিবেন। ঘোষিত হবে-

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

পরাক্রমশীল এক আল্লাহর!

অর্থাৎ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই। তাঁর সাথে কেউ লড়তে পারে না। তাঁর শক্তিকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। তাঁর থেকে কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারে না। ইরশাদ হবে-

اَيْنَ الْمَفَرُّ

আজ পালাবার স্থান কোথায়? [কিয়ামা : ১০]

আরও ইরশাদ হবে-

لَاتَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

তোমাদের কিছুই আজ গোপন থাকবে না। [হাক্কা : ১৮]

আরও ইরশাদ হবে–

لَاتَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ

তোমরা সনদ ব্যতিরেকে অতিক্রম করতে পারবে না। [রাহমান : ৩৩]

এ হলো আমাদের আল্লাহ। এ হলো আল্লাহর পরিচয়। এমনি মহান শক্তিশালী আল্লাহর সামনে আমাদেরকে কাল কিয়ামতের দিন উপস্থিত হতে হবে। উপস্থিত হতে হবে একাকী।

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

তোমরা তো আমার কাছে নিঃসঙ্গরূপে এসেছো। যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। [আনআম : ৯৪]

সেখানে সবাই একাকী হবে। মা অপরিচিত হয়ে যাবেন। স্ত্রী স্বামীকে চিনবে না। সন্তানরা সঙ্গ ছেড়ে দিবে। বন্ধুরা মুখ ফিরিয়ে নিবে। সেখানে শত্রু-মিত্র সমান। সকলেই ভাববে নিজের মুক্তির কথা। হাত কথা বলবে, আমি জুলুম করেছিলাম। পা বলে দিবে, হে প্রভু! আমি তোমার অবাধ্যতায় পথ চলেছিলাম। পেট বলবে, আমি তোমার নিষিদ্ধ খাবার গ্রহণ করেছিলাম। আমার এই শরীর, আমার এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হবে আমার প্রতিপক্ষ। আমার পরিবার-পরিজন আমাকে ছেড়ে যাবে। অপরাধী সেদিন এই বলে আক্ষেপ করবে–

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ

অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে। [মাআরিজ : ১১]

وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ

তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে। [প্রাগুক্ত]

وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُؤْوِيْهِ

তার জ্ঞাতী গোষ্ঠী যারা তাকে আশ্রয় দিত। [প্রাগুক্ত : ১৩]

সকল আপনজনকে বিসর্জন দিয়ে হলেও নিজেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হবে। অতঃপর বলবে, এও যদি কবুল না হয় তাহলে–

وَمَنْ فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا

এবং পৃথিবীর সকলকে। [প্রাগুক্ত : ১৪]

বলবে, পৃথিবীর সকল মানুষকে দোযখে নিয়ে হলেও আমাকে বাঁচাও প্রভু। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সাফ-সাপটা জবাব–

كَلَّا

না, কখনো না। [প্রাগুক্ত : ১৫]

প্রিয় ভাইয়েরা!

মরণ যদি মরণ হতো তাহলে তো কোন ভয় ছিল না। মৃত্যুর পর যদি আর জেগে ওঠার বিষয় না থাকতো তাহলে তো সবই ছিল পানির মতো সহজ। কিন্তু বিপদ হলো এ মরণ তো মরণ নয়। এ মরণ থেকে পুনরায় জেগে উঠতে হবে। সুতরাং এখানে যদি আমরা গাফলতের সাথে, অলসতার সাথে মৃত্যুবরণ করি তাহলে আগামীতে আমাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। আর যদি সঙ্গে করে কিছু নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যত জীবন হবে খুবই সুন্দর। সে এক মহাজীবন। শুরু আছে শেষ নেই। আমাদের এই পৃথিবী বড় দ্রুতগতিতে তার পরিণতির দিকে ছুটে চলেছে। যে মারা যায় সেই কিয়ামতের মুখোমুখি দাঁড়ায়। এই পৃথিবীতেও একটি কিয়ামত সংঘটিত হবে। এই পৃথিবীর দিন দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর আঘাত এই পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। আমরা অসহায় হয়ে পড়বো, আমরা নিক্ষিপ্ত হবো কবরের সংকীর্ণ কোঠরীতে। সেখানে একজন মানুষ চিৎকার করতে চাইলে চিৎকার করতে পারবে না। কিছু বলতে চাইলে বলার অবকাশ পাবে না। মৃতকে যখন কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে কাতরকণ্ঠে আকুতি জানায়–

আমাকে কবরের দিকে নিয়ে যেয়ো না।

পৃথিবীর সকল সৃষ্টি তার এই কান্না শোনে। তার এই আকুতি সকলেই শুনতে পায়। কিন্তু তখন তার অবকাশের সময় শেষ।

কবরে পোকা-মাকড়ের আচ্ছাদন

সমগ্র পৃথিবীই এখন দ্রুত ধাবমান এই ভয়ানক পরিণতির দিকে। আমরা ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আকণ্ঠ ব্যস্ত আছি। আমাদেরকে মরতে হবে। এটা কত বড় বিষয়! কিন্তু সে কথা ভাবি না। আমরা প্রতিদিনই আমাদের বিছানা থেকে পুরান চাদর সরিয়ে সেখানে নতুন চাদর বিছাই। একবার কি ভেবে দেখেছি, যখন আমরা মাটির বিছানায় শুব তখন আমাদের অবস্থা কী হবে? এখানে বাল্ব ফিউজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি নতুন বাল্ব লাগিয়ে নিই। কিন্তু তখন আমাদের অবস্থা কি হবে, যখন আমরা আশ্রিত হবো অন্ধকার ঘরে। অন্ধকার কবরে। এখানে কলিং বেল লাগানো আছে। কলিং বেলে চাপ দিতেই চাকর উপস্থিত। কিন্তু যেদিন আমরা কবরে শায়িত হবো সেদিন হাজার চিৎকার করলেও কেউ সাড়া দিবে না। আমাদের ভবিষ্যত বড়ই ভয়ানক। এখানে কাপড়ে একটু দাগ লাগতেই তা শরীর থেকে খোলে ছুঁড়ে মারি। আর যখন কবরে শায়িত হবো তখন পোকা-মাকড় শরীরে এসে দংশন করতে থাকবে। ফিরাতে পারবো না। এখানে ঘন্টার পর ঘণ্টা বসে শরীর পরিষ্কার করি। সাবান লাগাই। শ্যাম্পু লাগাই। কত রকমের সুগন্ধি ব্যবহার করি। কিন্তু সেদিন আমাদের অবস্থা কি হবে যেদিন আমাদের এই সাধের চোখগুলো কবরের পোকা-মাকড় কুটে কুটে খাবে? আমাদের এই শরীর, আমাদের এই চোখ হবে পোকা-মাকড়ের খাবার।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? [মু'মিনূন : ১১৫]

অর্থাৎ তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি। মনগড়া জীবনযাপনের জন্যে সৃষ্টি করিনি। বিষয়টি এমন নয় যে, কেউ

তোমাদের লক্ষ্য রাখছে না, তোমাদের প্রতি কারও কোন নজরদারী নেই। বরং তোমরা তো এক কঠিন শৃঙ্খলার অধীন।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

মানুষ যা কিছুই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে। [ক্বাফ : ১৮]

بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

অবশ্যই রাখি। আমার ফিরিশতাগণ তো তাদের কাছে থেকে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে। [যুখরুফ : ৮০]

সুতরাং আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট কিতাব কুরআনে কারীম আমাদেরকে বলে দিচ্ছে, আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্ম ফিরিশতাগণ নোট করে রাখছে। আমাদের সবকিছুই ফিরিশতাদের খাতায় সংরক্ষিত হয়ে থাকছে। তাছাড়া–

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

চোখের অপব্যবহার ও অন্তরে যা কিছু গোপন আছে তাও তিনি জানেন। [মু'মিন : ১৯]

এই আকাশ ও পৃথিবী এবং এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু... আল্লাহ তাআলা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন। এ... খেলাধুলার জন্যে সৃষ্টি করেননি।

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا

আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তাহলে আমি আমার কাছে যা কিছু আছে তা দিয়েই তা করতাম। [আম্বিয়া : ১৭]

অর্থাৎ আমি এই মানব জাতিকে খেলাধুলার জন্যে সৃষ্টি করিনি। আ... আমরা তো এটা বুঝি, এই পৃথিবীতে আমরা নিজে নিজেই ... করিনি এবং নিজের ইচ্ছায় এখান থেকে যেতেও পারবো না। ...

আমাদের মরে যাওয়াটাও মরে যাওয়া নয়। বরং মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আমরা একটি নতুন জীবনে প্রবেশ করি।

দুনিয়া একটি স্বপ্ন

হযরত আলী (রা.) বলেছেন–

اَلنَّاسُ نِيَامٌ

মানুষ ঘুমিয়ে আছে।

اِذَامَا تُوْا اِنْتَبِهُوْا

যখন তারা মৃত্যুবরণ করবে তখন জেগে ওঠবে।

এই দুনিয়ার জীবনটা হলো একটা দীর্ঘ স্বপ্ন। এখানে মানুষ বসে বসে স্বপ্ন দেখছে। সে একটি সুন্দর ঘরের মধ্যে বসে আছে। কেউ বা স্বপ্ন দেখছে সে একটি ঝুপড়ির মধ্যে বসে আছে। কেউ বা স্বপ্ন দেখছে, আমি মেলায় যাচ্ছি। কেউ বা স্বপ্ন দেখছে অন্য কিছু। কিন্তু মৃত্যু সকলকেই একটি গর্তে পৌঁছে দেয়। সে গর্ত কবরের। কবরের মাটি সকলের মাঝে এক বিস্ময়কর সমতা সৃষ্টি করে। এখানে ধনবানের জন্যে টাইলস বিছানো হয় না। আবার ঝুপড়িতে বসবাসকারীর জন্যও কোন অবহেলার সুযোগ নেই। এখানে সবার জন্যেই মাটির সাদাসিধে বিছানা। যে সুউচ্চ প্রাসাদে বাস করতো সেও মাটিতে শুয়ে আছে। মাটিতে শুয়ে আছে সেও যার জীবন কেটেছে অবহেলিত বস্তিতে। এখানে রাজা-ফকীর সমান।

একবার আমরা কাতার থেকে ফিরছিলাম। এয়ারপোর্টে আসার সময় পথে একটি সুউচ্চ মহল নজরে পড়লো। তার আয়তন ও উচ্চতা সবই দৃষ্টি কাড়ার মতো। আমি ভাবলাম, কোন শাহী মহল হবে হয়তো। জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমীরের মহল এটা? আমাদের এক সঙ্গী বললো, এটা শাহী খান্দানের কারও মহল নয়। তবে এর মালিক কাতারের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী ছিল। সে ছিল কাতারের সবচেয়ে বড় ধনী। সেই এই মহলটি নির্মাণ করেছিল। এই মহল নির্মিত হওয়ার পর

সে এই পৃথিবীতে ছিল পাঁচ বছর। অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করে এবং তাকে এমন কবরস্থানে দাফন করা হয় যেখানে ঘুমিয়ে আছে হাজার হাজার গরীব ফকীর। একদিকে সমাধিস্থ কাতারের বিরাট বড় ব্যবসায়ী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী। আর তার কোল ঘেঁষেই সমাধিস্থ হয়ে আছে কাতারের দরিদ্রতম এক অসহায় ফকীর। যে ফকীর এই পার্থিব জীবনে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে ফিরতো। তাদের উভয়ের কবর পাশাপাশি। মরণ যদি মরণ হতো তাহলে তো খুবই ভালো হতো। কিন্তু মরণ তো মরণ নয়। মরণ হলো জীবনের সূচনা।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ

হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। [ফাতির : ৫]

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

এ কবর থেকে তোমাদেরকে পুনর্বার বের করা হবে। [ত্বহা : ৫৫]

قُلْ بَلَى وَرَبِّي

বলো, আসবেই। শপথ আমার প্রতিপালকের। [সাবা : ৩]

সুতরাং এক মহান সত্যের দিকে আমরা সকলেই ধাবমান। আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য। তাতে এক চুল ব্যত্যয় ঘটার অবকাশ নেই। আমরা কবরে শায়িত হবো এবং সেখান থেকে পুনর্বার উত্থিত হবো। অতঃপর আমাদের আশ্রয় হবে হয় জাহান্নামে না হয় জান্নাতে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

أُطْلُبِ الْجَنَّةَ جُهْدَكُمْ

জান্নাত লাভের জন্যে তোমরা তোমাদের সাধনাকে কাজে লাগাও।

وَاهْرُبْ مِنَ النَّارِ جُهْدَكُمْ

যতটুকু সম্ভব জাহান্নাম থেকে পালাতে চেষ্টা কর।

فَاِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَنَامُ طَالِبُهَا

বেহেশত প্রত্যাশীরা নিদ্রা যায় না।

وَالنَّارُ لَا يَنَامُ غَائِبُهَا

জাহান্নাম থেকে যারা বাঁচতে চায় তারা কখনও অলস হয়ে পড়ে না।

فَاِنَّ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ مَحْفُوْفَةٌ بِالْمَكَارِهِ

আজ বেহেশত আচ্ছাদিত হয়ে আছে কষ্টময় কাজকর্মের দ্বারা।

وَاَنَّ النَّارَ مَحْفُوْفَةٌ بِالشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ

আর দুনিয়া ও জাহান্নাম আচ্ছাদিত হয়ে আছে ভোগ ও কামনার দ্বারা।

সুতরাং এই দুনিয়ার ভোগ-স্বপ্ন যেন তোমাদেরকে বেহেশত সম্পর্কে বিভ্রান্ত না করে। তোমরা যেন বেহেশতের পথ ভুলে না যাও। কারণ, বেহেশতই তো একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়।

فَاِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا

বেহেশত এমন আশ্রয় যেখানে কোন ভয় নেই।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যবানে তিন ভাইয়ের গল্প

একবার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, এক ব্যক্তির তিনজন ভাই ছিল। যখন তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো সে তার এক ভাইকে ডেকে বললো, আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। তুমি আমার জন্যে কি করতে পার? সে বললো, তুমি যদি মারা যাও তাহলে আমি তোমার পর হয়ে যাবো। দ্বিতীয়জনকে বললো, ভাই তুমি আমার জন্যে কি করবে? সে বললো, আমি তোমার জন্যে তোমার মৃত্যু পর্যন্ত [illegible]। অতঃপর তুমি যখন মারা

যাবে তখন আমি তোমাকে তোমার কবরে রেখে চলে আসবো। তৃতীয় ভাইকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার জন্য কি করবে? সে বললো, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। কবরে তোমার সঙ্গে থাকবো, হাশরে তোমার সঙ্গে থাকবো, তোমার আমল মাপার সময় তোমার সঙ্গে থাকবো, বেহেশতে যাওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকবো। এবার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন- বলো তো, এই তিন ভাইয়ের মধ্যে উত্তম কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, যে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকবে সেই তো উত্তম। তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- প্রথম ভাই হলো তার সম্পদ। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে পর হয়ে যায়। দ্বিতীয় ভাই তার সন্তান এবং আত্মীয়-স্বজন। যারা কবর পর্যন্ত গিয়ে তার পর হয়ে যায়। যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন একজন ফিরিশতা কবরের মাটি তুলে আগত মানুষের মেলায় ছুঁড়ে মারে এবং বলে- যাও। একে তুমি ভুলিয়ে দিয়েছো আর এও তোমাদেরকে ভুলিয়ে দিবে। তিনদিন পর কান্না থেমে যায়। শোকের পরিবেশ বদলে যায়। সকলেই ভুলে যায় বেদনার আঘাত। বিষয়টা এমন সহজ হয়ে যায় যেন এখানে একজন এসেছিল সে চলে গেছে। এক সময় তার নামও কেউ স্মরণ রাখে না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- তৃতীয় ভাইটি হলো তোমাদের আমল। যা তোমাদের সঙ্গে যাবে।

মজলিসে উপস্থিত ছিলেন এক সাহাবী। তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবনে কুরয (রা.)। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি অনুমতি হয় তাহলে আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করবো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কর!

পরের দিন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত করলেন। বললেন, শোন! আবদুল্লাহ কি বলে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরয (রা.) ওঠে দাঁড়ালো এবং আবৃত্তি করলেন যার মর্ম এই-

আমার মা-বাবা আমার স্ত্রী-সন্তান আমার স্বজন-সজনী আমার অর্থবিত্ত আর আমার আমল- তার উপমা তো সেই ব্যক্তির ন্যায় যে মারা যাচ্ছে

আর সকলকে ডেকে বলছে, আমাকে সাহায্য কর। বিয়োগের বিশাল সফর শুরু হয়েছে। একাকীত্বের দীর্ঘ পথের সূচনা হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য কর।

প্রথম ভাই বললো, ভাই! আমি তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তবে আমার এই বন্ধুত্ব তোমার মরণ অবধি। যখন তুমি মৃত্যুবরণ করবে তখন তোমার কাফন-দাফন সম্পন্ন হবার পূর্বেই লড়াই শুরু হবে আমাকে নিয়ে। সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর। সুতরাং তুমি যদি আমার দ্বারা উপকৃত হতে চাও তাহলে তুমি কখনও আমার প্রতি দয়া করো না। আমার প্রতি সদয় না হয়ে বরং আমাকে খরচ করে দাও, বিলিয়ে দাও। আর মৃত্যুর পূর্বেই কিছু কল্যাণ পাঠিয়ে দাও। তোমার মৃত্যুর পর আমি আর তোমার থাকবো না। বরং তুমি সমাধিস্থ হওয়ার পূর্বেই শুরু হবে আমাকে দখল করার লড়াই।

দ্বিতীয় ভাই বললো– যার জন্যে এই পৃথিবীতে আমি অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা সয়েছি, যাকে আমি এই পৃথিবীর সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছি আমার সেই স্বজন-আপনজনরা বললো, মৃত্যু পর্যন্ত আমরা তোমার সঙ্গে আছি। আমরা তোমার চিকিৎসা করবো, কবর পর্যন্ত আমরা তোমার সঙ্গে থাকবো, তোমার রোগ-ব্যাধিতে ভালো ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক খোঁজ করে আনবো, তোমার আরাম ও সুখের দিকে আমরা পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখবো, তোমার যত্নে আমরা কোনরূপ ত্রুটি করবো না। কিন্তু তোমার মৃত্যুযন্ত্রণার সাথে আমরা লড়াই করতে পারবো না। তবে তুমি যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন আমরা বুকের কাপড় ছিঁড়ে চিৎকার করে তোমার জন্যে বিলাপ করবো। তোমার বিয়োগ ব্যথায় আমরা মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলবো। কেউ যদি তোমার মৃত্যুতে সমবেদনা জানাতে আসে তাহলে আমরা বলবো, আমাদের বাবা এই ছিলেন। আমার মা এই ছিলেন। আমার স্বামী এই ছিলেন। এক কথায়, তোমার প্রশংসায় আমরা তাদের মুখ ভরে দিব।

তৃতীয় ভাই বললো– আমি এদের মতো নই। মৃত্যু পর্যন্ত এসেই থেমে যাওয়ার পাত্র আমি নই। এ কেমন আপনজন হলো, কফিন কাঁধে করে নিয়ে কবরে যাবে। আর আজকাল তো কফিন কাঁধে করে কবরস্থান

পর্যন্ত যাওয়ার রেওয়াজও শেষ হয়ে গেছে। এখন গাড়িতে করে কফিন সোজা কবরস্থানে পৌছে দেয়া হয়। তৃতীয় ভাই বললো, আমি তোমার এমন ভাই নই যে, কবরস্থানে নিয়ে তোমাকে তোমার ঠিকানায় শুইয়ে দিয়ে অতঃপর তোমার উপর মাটিচাপা দিয়ে আমি ঘরে চলে আসবো। কারণ, আমার তো আরও অনেক কাজ রয়েছে। আমি তো তোমার দুর্দিনের সাথী। যখন তোমার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হবে আমি তখন তোমার সে যন্ত্রণা লাঘব করতে সাহায্য করবো। তুমি যখন কবরে আসবে তখন কবরে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে অভ্যর্থনা করবো। মুনকার-নাকীর যখন তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবে আমি তখন তাদের মাঝে আড় হয়ে দাঁড়াবো। আমি তখন তোমার পক্ষ হয়ে তাদেরকে ঠেকাতে চেষ্টা করবো যেন তারা তোমার কাছে না ভিড়তে পারে। আমি তোমার পক্ষ হয়ে আগত ফিরিশতার বিরুদ্ধে লড়াই করবো।

হাদীস শরীফে আছে, হাফেযে কুরআনকে যখন কবরে রাখা হয় এবং মুনকার-নাকীর যখন উপস্থিত হয় তখন অত্যন্ত সুশ্রী একজন যুবক কবরে বিকশিত হয়। সে হাফেযে কুরআন ও মুনকার-নাকীরের মাঝখানে ওঠে দাঁড়ায়। মুনকার-নাকীরকে হাফেযে কুরআনের দিকে অগ্রসর হতে বাধা দেয়। তখন হাফেযে কুরআন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে- ভাই, তুমি কে? সে বলে, ভয় পেয়ো না, আমি তোমার কুরআন। এতদিন তোমার বুকের ভেতর লুকায়িত ছিলাম।

হ্যাঁ, এখানে এসে ডাক্তারি ডিগ্রি অচল। এখানে ইঞ্জিনিয়ার ব্যবসায়ী জমিদার সব পরিচয়ই অর্থহীন। কিন্তু হাফেয সাহেবের হাফেজী পরিচয় এখানেও সরব সক্রিয়। কুরআন বলবে, এখানে আমি তোমার সঙ্গী। মুনকার-নাকীর বলবে, তোমাকে কে পাঠিয়েছে? আমরা একে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছি, আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দাও। কুরআন বলবে, যিনি তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি সেই কুরআন যাকে এ কখনও রাতের বেলা পড়তো, কখনও পড়তো দিনের বেলা। সুতরাং আমি আজ তার পক্ষ হয়ে তোমাদের প্রশ্নের জবাব দিব।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরয (রা.) যখন তাঁর কবিতা পাঠ শেষ করলেন তখন লক্ষ্য করলেন চোখের পানিতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাড়িগুলো ভিজে গেছে। সাহাবায়ে কেরাম তখন ঢেকুর তুলে কাঁদছিলেন। হযরত জিবরাইল (আ.) তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন–

عِشْ مَاشِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ

যতদিন খুশি এই দুনিয়াতে থাকুন। তবে আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

وَاحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهٗ

আপনি যাকে খুশি ভালোবাসুন কিন্তু একদিন তাকে ছেড়ে যেতেই হবে।

উমাইয়া ইবনে খালফের অভিযোগ এবং আল্লাহ তাআলার জবাব

উমাইয়া ইবনে খালফ অথবা আস ইবনে ওয়াইল কিংবা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এসে উপস্থিত হলো। হাতে একটি পুরাতন হাড়। হাড়টি পিষে বাতাসে উড়িয়ে দিল। তারপর বললো–

اَتَزْعَمُ اَنَّ رَبَّكَ يُحْيِ هٰذِهٖ وَهِىَ رَمِيْمٌ

হে মুহাম্মদ! তুমি কি মনে কর এই হাড়টি ছাই হয়ে বাতাসে উড়ে যাওয়ার পর তোমার প্রভু পুনরায় এটাকে জীবিত করবেন?

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল (আ.)কে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত জিবরাইল (আ.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন–

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ

সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে। অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে? যখন তা পচে গলে যাবে বলো, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। [ইয়াসিন : ৭৮–৭৯]

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

কালপ্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। [দাহর : ১]

আমি তাকে সৃষ্টি করেছি–

مِنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ

তুচ্ছ পানি থেকে। [মুরসালাত : ২০]

مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ

মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে। [দাহর : ২]

مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ

মৃত্তিকার উপাদান থেকে। [মু'মিনুন : ১২]

এক কথায়, আমি যখন তোমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছি তখন পুনর্বার সৃষ্টি করতে সমস্যা কোথায়? এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার

পর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, শোন! আল্লাহ কী বলছেন। তিনি বাতাসে উড়ে যাওয়া এই হাড়কে একত্রিত করবেন। তাতে প্রাণ দান করবেন আর তোমাকে জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন করাবেন।

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ইন্তেকাল

হযরত ফাতিমা (রা.) যখন জীবন সায়াহ্নে উপনীত তখন তিনি অসুস্থ। হযরত আলী (রা.) বাইরে কোথাও গেছেন। তিনি ঘরের সেবিকাকে ডেকে বললেন, আমার জন্যে পানির ব্যবস্থা কর। আমি গোসল করবো। তিনি গোসল করেন। পবিত্র কাপড় পরিধান করেন এবং সেবিকাকে বলেন, খাটিয়াটা ঘরের মাঝখানে পেতে দাও। অতঃপর তিনি খাটিয়ার উপর কিবলামুখী হয়ে শুয়ে পড়েন। অতঃপর বলেন, আমি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করছি। আমি গোসল করে নিয়েছি। কাপড়ও পরিধান করে নিয়েছি। সুতরাং আমার শরীর যেন কেউ না দেখে।

হযরত আলী (রা.) ঘরে ফিরে এসে দেখেন সব শেষ। দীর্ঘ চব্বিশ বছরের টানা দাম্পত্যের মুহূর্তে অবসান। হযরত আলী (রা.)কে ঘরের সেবিকা এসে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বলা পয়গাম শুনিয়ে দেয়। হযরত আলী (রা.) সঙ্গে সঙ্গে দাফনের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর যখন তাকে সমাধিস্থ করা হয় তখন হযরত আলী (রা.) তাঁর বিয়োগ ব্যথায় দুটি কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতার ছন্দে ছন্দে সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের হৃদ্যতা, বন্ধনের গভীরতা অতঃপর বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে।

একবার হযরত ঈসা (আ.) একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় তিনি কবরটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন– এটা হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র সাম-এর কবর। হযরত নূহ (আ.)-এর দুআর প্রেক্ষিতে যখন ভয়ঙ্কর তুফান নেমে আসে তখন সকল মানুষ মারা যায়। বেঁচে যায় তাঁর তিন পুত্র। সেই তিন পুত্র থেকেই পরবর্তীকালে হযরত নূহ (আ.)-এর বংশ বিস্তার লাভ করে। সেই তিন পুত্র হলেন সাম, হাম ও ইয়াফিস। আমরা সামের [illegible] আর সমগ্র ইউরোপবাসী হলো

ইয়াফিসের সন্তান। আর সমগ্র আফ্রিকাবাসী হলো হামের সন্তান। হযরত ঈসা (আ.) কবরটি দেখিয়ে বললেন, এটা সামের কবর। উপস্থিত সঙ্গীগণ আরয করলো, হে আল্লাহর নবী! তাকে জীবিত করে দিন। কারণ, হযরত ঈসা (আ.)-এর আবেদনে আল্লাহ্ তাআলা মৃত মানুষকেও জীবিত করে দিতেন। তাদের আবদারের প্রেক্ষিতে হযরত ঈসা (আ.) যখন নির্দেশ করলেন তখন সাম জীবিত হয়ে কবর থেকে বেরিয়ে এলো। সামান্য কথাবার্তাও হলো। তারপর বললেন, কবরে চলে যাও। সাম বললো, এই শর্তে ফিরে যেতে পারি– আমার যেন পুনরায় মৃত্যু কষ্টের মুখোমুখি না হতে হয়। কারণ, আমি প্রথমবার যে মৃত্যুবরণ করেছি সে মৃত্যুযন্ত্রণা এখনও আমার হাড়ে লেগে আছে।

মৃত্যুযন্ত্রণা দূর করার মতো কোন পেইন কিলার ট্যাবলেট তো নেই। এই বেদনা দূর করার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর উপর ভরসা। পৃথিবীর কোন পুরুষ কিংবা নারী সে যত বড়ই হোক মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে না। অথচ এই মৃত্যুর মতো এত বড় একটা বিষয়কে আমরা ঘুণাক্ষরেও স্মরণ করি না। আমরা ভাবি না, আমাদের নির্ঘাৎ পরিণতি মৃত্যু ও কবরের কথা। অথচ এই দু'দিনের পান্থশালা দুনিয়ার ঘরবাড়ি নিয়ে কত ভাবি! দিন-রাত বসে বসে প্ল্যান তৈরি করি কিভাবে ঘর তৈরি করবো, কিভাবে বাড়ি বানাবো, কিভাবে সাজাবো। অথচ যে কবরে অবশ্যই থাকতে হবে এবং সেখান থেকেই পুনরায় উঠতে হবে সেই ঘরও যে সাজাবার প্রয়োজন আছে এবং সেই ঘরই যে আমাদের প্রকৃত ঘর এ কথা যেন আমরা স্বপ্নেও ভাবি না। অথচ এই ঘর সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করে গেছেন–

بَيْتُ الْوَحْشَةِ... بَيْتُ الْغُرْبَةِ...بَيْتُ
الْوَحْدَةِ...بَيْتُ الدُّوْدِ...

কবর হলো ভীতির ঘর। একাকীত্বের ঘর। পোকা-মাকড়ের ঘর। অন্ধকারের ঘর।

মৃত্যু এমন এক অপরাজেয় শক্তি– রুদ্ধকক্ষেও তার প্রবেশ সদা অবারিত। সে যে কোন মুহূর্তে শয়নকক্ষে এসে হাজির হয়। শক্তিশালী পাহারাদাররাও তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কেউ মৃত্যুকে ঠেকাতে পারেনি। তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

ইতিহাস বিখ্যাত জালেম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.)কে ধমক দিয়ে বলেছিল, আমি এখনই তোমার গর্দান উড়িয়ে দিব। হযরত সাঈদ (রা.) উত্তরে বলেছিলেন, আমি যদি তোমাকে মৃত্যুর মালিক বলে বিশ্বাস করতাম তাহলে তোমার ইবাদতও করতাম। কিন্তু আমার সম্পর্কে আমার প্রভু বহু পূর্বেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন কখন আমি মৃত্যুবরণ করবো।

একবার হযরত ঈসা (আ.) কোন এক জনবসতির পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্য করলেন এই অঞ্চলের সমস্ত মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে। বললেন, এদের প্রতি আল্লাহ তাআলা আযাব বর্ষণ করেছেন।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ...إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

ভাই ও বোনেরা আমার!

আল্লাহ তাআলা ইতোপূর্বে বহু জাতির প্রতি শাস্তির কষাঘাত হেনেছেন। কিন্তু আজ তিনি কাফের ও অবিচারী সম্প্রদায়গুলোর প্রতি কেন শাস্তির কষাঘাত হানছেন না? এর কারণ একটাই– সত্যিকার অর্থে আজ কোথাও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই। আজ কোথাও সত্যিকার অর্থে কালিমার পতাকাবাহী নেই। যখনই অতীতে ভবিষ্যতে কিংবা বর্তমানে কোন জাতি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দীনকে গ্রহণ করবে তখন তার প্রতিপক্ষ যত বড় শক্তিশালী হোক চাই তারা তলোয়ারের শক্তিতে বলীয়ান হোক কিংবা এটমের শক্তিতে আল্লাহ তাদের প্রতি আঘাত হানবেনই। যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) ধ্বংসপ্রাপ্ত সে জনপদ দিয়ে যাওয়ার সময়

বলেছিলেন, এরা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়েছিল। তাই আল্লাহ তাআলা এদের প্রতি আযাব বর্ষণ করেছেন।

মৃতদের সাথে হযরত ঈসা (আ.)-এর কথোপকথন

হযরত ঈসা (আ.) মৃত লোকগুলোকে ডাকলেন।

يَا اَهْلَ الْقَرْيَةِ

হে এলাকাবাসী!

তারা সকলেই জীবিত হয়ে উঠলো। বললো–

لَبَّيْكَ يَانَبِيَّ اللهِ...لَبَّيْكَ

হে আল্লাহর নবী! আমরা উপস্থিত।

তিনি প্রশ্ন করলেন–

مَاذَا جِنَايَتُكُمْ وَمَا ذَا سَبَبُ هَلَاكِكُمْ

কি অপরাধের কারণে তোমাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল?

حُبُّ الدُّنْيَا وَصُحْبَةِ طَوَاغِيْتُ

তারা বললো, দুনিয়ার প্রতি লালসা ও 'তাওয়াগীত'-এর সংস্পর্শের কারণে।

হযরত ঈসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন– 'তাওয়াগীত'-এর সংস্পর্শ ও সান্নিধ্য মানে কি?

তারা বললো, আমরা মন্দ লোকদের সঙ্গে চলাফেরা করতাম। তাদের সান্নিধ্যে জীবনযাপন করতাম।

হযরত ঈসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, দুনিয়ার লালসা মানে কি?

তারা বললো, সে ভালোবাসা হলো সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার মতো। দুনিয়ার সম্পদ পেলে আমরা খুশি হতাম, হাত ছাড়া হয়ে গেলে

ব্যথিত হতাম। সম্পদ উপার্জনের সময় হালাল-হারামের তোয়াক্কা করতাম না। বৈধ-অবৈধের ধার ধারতাম না। খরচ করার বেলায়ও বৈধ-অবৈধ দেখতাম না। এ কারণেই আমরা আযাবের শিকার হয়েছি।

হযরত ঈসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কিভাবে আযাবের শিকার হলে?

তারা বললো–

بِتْنَا بِالْعَافِيَةِ وَاَصْبَحْنَا فِى الْهَاوِيَةِ

আমরা রাতের বেলা নিজ নিজ ঘরেই শুয়ে ছিলাম। কিন্তু সকাল হতেই 'হাবিয়ায়' আক্রান্ত হলাম।

হযরত ঈসা (আ.) প্রশ্ন করলেন, হাবিয়া কি?

তারা বললো, সিজ্জীন।

হযরত ঈসা (আ.) প্রশ্ন করলেন, সিজ্জীন কি?

তারা বললো–

كُلُّ جَمْرَةٍ مِّنْهَا مِثْلُ اَطْبَاقِ الدُّنْيَا كُلِّهَا

সিজ্জীন হলো সেই কয়েদখানা যার প্রতিটি অঙ্গার এই ভূমণ্ডলের সাত স্তরের সমান। আর আমাদের রূহগুলো তাতেই সমাধিস্থ করে দেয়া হয়েছে।

হযরত ঈসা (আ.) বললেন, তুমি একা বলছো কেন? অন্যরা কথা বলছে না কেন?

বললো, হে আল্লাহর নবী! সকলের মুখেই আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার মুখে লাগাম পরানো হয়নি তাই বলতে পারছি।

হযরত ঈসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মুখে লাগাম পরানো হয়নি কেন?

বললো, কারণ আমি তাদের সাথেই বসবাস করতাম। কিন্তু তাদের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতাম না। যেহেতু তাদের সাথে বসবাস করতাম

তাই তাদের সাথে পাকড়াও হয়েছি। এখন হাবিয়ার কিনারায় বসে আছি। জানি না কখন আবার হাবিয়ার ভেতরে পতিত হই। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে রক্ষা কর।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার!

আজ আমরা কোথায় ছুটেছি? একবার এদিকেও তাকাও। এ পথ খুবই ভয়ানক। এ পথ গভীর গর্তে গিয়ে মিলিত হয়েছে। তোমরা নিজেদেরকে অন্ধদের হাতে সঁপে দিয়ো না। নিজেদেরকে চক্ষুষ্মানদের হাতে সঁপে দাও। এমন ব্যক্তির হাতে সঁপে দাও যিনি এই মাটির পৃথিবীতে বসে আরশের লেখা পড়তে পারেন। যিনি বেহেশতকে দেখেন, দোযখকে দেখেন।

সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.)

সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.) হলেন পৃথিবীর দ্বিতীয় দেশ বিজয়ী। প্রথম বিজয়ী হলেন চেঙ্গিস খান। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দেশ চেঙ্গিস খান জয় করেছেন। তারপর সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.)। তারপর তৈমুর লং। সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.) এক আলীশান মহল বানালেন। তখনকার দিনে সে শহরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা সাধারণত কয়েক লক্ষ মুদ্রারই মালিক হতো। আর সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.)-এর খাজানায় জমা হতো পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ওঠে আসা অজস্র মুদ্রা, সম্পদের অজস্র ভাণ্ডার। তাই তিনি এক বিশাল সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করলেন। তখনও তিনি শাহজাদা। তার পিতা জীবিত আছেন। পিতাকে গিয়ে বললেন, আব্বাজান! আমি একটি মহল নির্মাণ করেছি। আপনি একবার এসে একটু দেখে যান। তার বাবা সুবুক্তগীন। তিনি ছিলেন খুবই সৎ সিপাহী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রাজত্ব দান করেছিলেন। তিনি ছেলের দাওয়াত কবুল করলেন। যথা সময়ে মহলে আগমন করলেন। মহলের চাকচিক্য খচিত নিপুণ নকশা সবই বিরল। কিন্তু তিনি এর প্রশংসায় একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। এতে মাহমুদ গজনবী মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। ভাবলেন, আমার বাবার ভেতরে কোন রুচিবোধ নেই। এত সুন্দর শিল্প ও কারুকার্যময় একটি

প্রাসাদ নির্মাণ করলাম– তিনি একটি শব্দও বললেন না। আমাকে সামান্য বাহবাও দিলেন না। যখন প্রাসাদ পরিদর্শন করে প্রাসাদ থেকে বের হচ্ছিলেন তখন তিনি নিজের কোমরে সজ্জিত খঞ্জরটি বের করে দেয়ালের উপর সজোরে আঘাত করলেন। দেয়ালের নকশাগুলো সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। অতঃপর ছেলের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, বেটা! তুমি এত সাধনা করে এমন একটি মহল তৈরি করলে যা একটি খঞ্জরের আঘাতও বরদাশত করতে পারে না! তোমাকে তো আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে মাটিতে নকশা তৈরি করার জন্যে সৃষ্টি করেননি। তোমাকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন তোমার ভেতরে যে একটা অন্তর রেখেছেন সেই অন্তরটা সাজাবার জন্যে।

স্বর্ণমহলের রাজাকেও মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হয়েছে

চেঙ্গিস খান সারা পৃথিবী জয় করেছিলেন।

তিনি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিজয়ী।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বিজয়ী ছিলেন সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.)।

পৃথিবীর তৃতীয় বিজয়ী ছিলেন তৈমুর লং।

পৃথিবীর চতুর্থ বিজয়ী ছিলেন বাদশাহ সিকান্দার।

সমগ্র পৃথিবী জয় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে অবিরাম লড়াই সংগ্রামে কেটেছে সত্তর বছর।

এবার তার মাথায় চিন্তা এলো জীবনটা তো যুদ্ধ করে করেই শেষ করে দিলাম। যখন দেশ শাসন করার সুযোগ হলো তখন জীবনটা সংকোচিত হতে শুরু করলো। শক্তি ও বীরত্ব কেমন যেন লেপ্টে গেছে। সারা পৃথিবীর দক্ষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকদেরকে ডাকা হলো। সকলকে ডেকে তিনি বললেন, আমার জীবনটা তো যুদ্ধ করে করেই কেটে গেল। এখন তো আমাকে দেশ শাসন করতে হবে। বলো, আমার জীবনটা বাড়াবার কোন উপায় আছে কি না।

তারা বললো, হে মহান অধিপতি! আমরা তো আপনার হায়াতের একটি পলকও বাড়িয়ে দিতে পারি না। তবে আপনার শরীরে এখন যে সুস্থতা আছে তা যদি ভেঙ্গে পড়ে তাহলে তার কারণ বলে দিতে পারবো।

চুয়াত্তর বছর বয়সে তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। রাজ্য শাসনের জন্যে আল্লাহ তাআলা তাকে মাত্র চার বছর সুযোগ দিয়েছিলেন।

লক্ষ লক্ষ মানুষের মস্তক কেটে মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু চার বছরের বেশি রাজত্ব করতে পারেননি। সুতরাং রাজমহলের যে বাসিন্দা সে যেমন চায় না এই রাজমহলে আমার মৃত্যু হোক, চায় না রাজমহলকে বিদায় জানাতে তদ্রূপ যে ঝুপড়িতে বসবাস করে সেও চায় না মৃত্যুর আলিঙ্গন। অথচ আল্লাহ তাআলার ফয়সালা হলো–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। [আলে-ইমরান : ১৮৫]

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। [নিসা : ৭৮]

পালাবে কোথায়? যেখানেই পালাবে দেখবে মৃত্যু তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। হাসি-তামাশায় বয়ে চলা এই জীবনে আমরা ঘুণাক্ষরেও স্মরণ করি না মৃত্যুকে। অথচ নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু সকলকেই বরণ করতে হয়। হারিয়ে যেতে হয় মাটির পরতে। শরীরের হাড়গুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কত যত্নে লালিত এই মুখ এই চোখ মাটির পোকা-মাকড় খেয়ে শেষ করে দেয়। এত শত যত্নে লালিত এই শরীর পচে গলে কী যে দুর্গন্ধ ছড়ায়– যদি কারও কবর ছিদ্র করে দেয়া হতো তাহলে জগতের মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারতো।

বার রাজ্যের রাজা

ওয়াসেক বিল্লাহ। এক বিখ্যাত জালিম বাদশাহ। তার চোখে চোখ রেখে কেউ কথা বলতে সাহস করতো না। তার চোখ থেকে প্রতাপ ঝরে পড়তো। তাকে যখন মৃত্যু এসে ঝাপটা দিয়ে ধরে তখন সঙ্গে সঙ্গে আকাশে দুই হাত তুলে মিনতি জানায়–

يَامَنْ لَّا يَزَالُ مُلْكُهُ، اِرْحَمْ مَنْ زَالَ مُلْكُهُ

> হে অবিনশ্বর রাজত্বের অধিপতি! সেই অসহায়ের প্রতি করুণা কর যার রাজত্ব হারিয়ে গেছে।

কত প্রতাপ-তেজী শাসক। যার চোখে চোখ রেখে সমকালীন কোন শক্তি কথা বলার হিম্মত করেনি। অথচ মৃত্যুর পর যখন তার শরীর ঢেকে দেয়া হলো সাদা কাপড়ে। হঠাৎ করেই চাদরের নিচে নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল। উপস্থিত সকলেই তাজ্জব! কি নড়ছে চাদরের নিচে? যখন চাদর সরানো হলো দেখা গেল, নাদুস-নুদুস একটি ইঁদুর। সে ওয়াসেক বিল্লাহর টগবগে চোখ দুটি খেয়ে ফেলেছে। সকলেই বিস্মিত। এই আব্বাসী রাজমহলে ইঁদুর প্রবেশ করলো কিভাবে? যে রাজমহল আটত্রিশ হাজার পর্দায় আবৃত। যে রাজমহল স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া পর্দা বেষ্টিত। যে রাজমহলে হীরে-মোতি এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হতো যেভাবে আঙুর বাগানে আঙুরের থোকা ঝুলে থাকে। আব্বাসী রাজমহলে তো পিপড়ে প্রবেশ করাও মুশকিল। কিন্তু সেখানে ইঁদুর প্রবেশ করলো কিভাবে? তাও আবার বাদশাহ ওয়াসেক বিল্লাহর শয়নকক্ষে। মূলত এই ইঁদুর পাঠিয়েছেন আল্লাহ। পাঠিয়েছেন জগতবাসীকে এ কথা জানিয়ে দেয়ার জন্যে, হে পৃথিবীবাসী! তোমরা দেখে নাও, যে চোখ থেকে প্রতাপ ঝরে পড়তো, তোমরা দেখ সে চোখকেই সর্বপ্রথম সোপর্দ করা হলো একটি ইঁদুরের হাতে। এ থেকেই বুঝে নাও, কবরে তার সাথে কী আচরণ করা হবে? কবরে সে কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে।

এই পৃথিবী থেকে কেউ বিদায় নিতে চায় না। মরতে চায় না কেউই। তবে মৃত্যু সকলকেই শিকার করে। মৃত্যু ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। এ পৃথিবীর প্রেমে পড়ে কেউ এখান থেকে চলে যেতে চায় না। যেভাবে

প্রথমে কেউ এখানে আসতে চায়নি। এটা আমাদের সকলেরই অবস্থা। একদা আসতে চায়নি। আর এখন যেতে চায় না। চারদিক থেকে কান্না এসে চেপে ধরে। হৃদয়কে কম্পিত করে আকৃষ্ট করে। যেতে দিতে চায় না।

অথচ মৃত্যু আসবেই

সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক ছিলেন এক সুন্দর সুপুরুষ। তিনি প্রতিবার চারজন নারীকে এক সাথে বিয়ে করতেন। তারপর এই চারজনকে এক সাথে তালাক দিয়ে আবার চারজন বিয়ে করতেন। এর বাইরে দাসী তো ছিলই সারি সারি। অথচ প্রমোদলোভী এই বাদশাহ মৃত্যুবরণ করে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে। জীবনের চল্লিশটি বছরও পূর্ণ করতে পারেনি। অথচ এই দুনিয়ার সুখ-ভোগ নিয়ে তার স্বপ্নের অন্ত ছিল না। এর বিপরীতে উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)কে দেখুন, তিনিও তাঁর জীবনের এক চল্লিশ বছর পূর্ণ করতে পারেননি। তবে তিনি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পার্থক্য দেখুন, যখন সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিককে কবরে রাখা হচ্ছিল তখন তার শরীর নড়ে উঠলো। তার পুত্র বললো, আমার বাবা জীবিত। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) বললেন–

عَجَّلَ اللهُ بِالْعُقُوبَةِ

> বেটা! তোমার বাবা জীবিত নয়। বরং আযাব দ্রুত শুরু হয়ে গেছে।

সুতরাং তাকে দ্রুত দাফন কর। দৃশ্যত সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক ছিলেন বনু উমাইয়া শাসকদের মধ্যে সুন্দরতম শাহজাদা। উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) বলেন, আমি নিজে তাকে কবরে নামিয়েছি। যখন তার চেহারা থেকে কাপড় সরালাম দেখলাম, তার চেহারা কেবলার দিক থেকে সরে গেছে। তার রঙ হয়ে গেছে ছাই বর্ণের।

কবরের গরম যখন কাউকে স্পর্শ করে তখন তার হাড়গুলো মোমের মতো গলে যায়। শরীর ছাই হয়ে যায়। সুন্দর মুখ মায়াবী চোখ

সবকিছুই ভস্ম হয়ে যায়। একটি হাদীসে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ্ বলেন, বান্দা! দুনিয়ার প্রেমে পড়ো না। কবরে সর্বপ্রথম পোকা-মাকড় তোমার চোখগুলোকে খেয়ে ফেলবে। সুতরাং চোখগুলো নামিয়ে রাখ। চোখকে নির্লজ্জ করো না। এই চোখ বেগানা নারীকে দেখার জন্য নয়। বোকাদের রঙ-মহল দেখার জন্য এই চোখ নয়। এই কয়েকটি শ্বাস, কয়েকটি ঘণ্টা। পতনুখ গাছের ডালায় কোন বোকাও তো নিশ্চিন্তে চড়ে বসে না। ভাঙ্গা দেয়ালে কোন বোকাও ঘরের চাল পাতে না। ধসমান দেয়ালে পৃথিবীর কোন বোকা হেলান দিয়ে দাঁড়ায় না। মাছির ডানার সমান মূল্য নেই যে পৃথিবীর, যে পৃথিবী শুধুই ধোকার ঘর, মাকড়সার জাল সেই পৃথিবীর প্রতি নির্ভরশীল হওয়া কত যে বোকামী! এই পৃথিবী কার সাথে বিদ্রোহ করেনি? এই পৃথিবী কার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি? এই পৃথিবী আমার বাবার কাছে থাকেনি। সুতরাং আমার হাতেও থাকবে না। অথচ আমরা কত যে বোকা! জীবনের সব শক্তি, সব সঞ্চয় এরই পেছনে বিলীন করছি। অথচ যখন আমাদের লাশ কবরে রাখা হবে তখন কবরের পোকা-মাকড় আমাদের শরীরকে খেয়ে শেষ করে ফেলবে। কবরের তাপ আমাদের হাড়গুলোকে গলিয়ে মোম বানিয়ে দিবে। অতঃপর একদিন যখন এই পৃথিবী পার্শ্ব বদল করবে তখন শরীরের নিচের অংশ উপরে চলে আসবে, উপরের অংশ যাবে নিচে। এই অবস্থার শিকার হবো আমি আপনি সকলে। এখানে নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই।

কবরের আযাব

আমার চোখে দেখা ঘটনা বলি। আমার পাশের গ্রামের ঘটনা। সেখানকার এক জমিদার মারা গেল। তার জন্যে কবর খনন করা হলো। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, বিচ্ছুতে তার কবর ছেয়ে গেছে। সে কবর মাটিতে ভরে দেয়া হলো। আবার নতুন করে কবর খনন করা হলো। দেখা গেল এখানেও কাড়ি কাড়ি বিচ্ছু। মাটি দিয়ে ভরে দেয়া হলো কবর। খনন করা হলো নতুন কবর। এখানেও বিচ্ছু হাজির। এবার

সকলেই বুঝতে পারলো এগুলো মাটিতে সৃষ্ট সাধারণ বিচ্ছু নয়। বরং এগুলো তার পাপের ফসল। .

পাপের ফসল আযাব তো লুকিয়ে আছে আমাদের চোখের অন্তরালে। তবুও মাঝে মধ্যে আল্লাহ তাআলা পর্দা সরিয়ে দেন। পর্দা সরিয়ে দেন আমাদেরকে সতর্ক করার জন্যে। তাছাড়া মানুষের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহশীল তো তিনিই যিনি মানুষকে এই আযাব থেকে রক্ষা করেন না। পৃথিবীতে মানুষকে সামান্য রুটি-রুজির যে ব্যবস্থা করে দেয় সে মানুষের সত্যিকার অর্থে আপন নয়। জাহান্নামের আগুন থেকে যিনি রক্ষা করেন তিনিই সত্যিকার আপন। আমরা মূলত পৃথিবীব্যাপী ঘুরে ঘুরে তাবলীগের নামে মানুষকে এ কথাটাই বুঝাতে চাই।

রুস্তমে হিন্দ-এর কবর

আমি একবার মিয়ানী শরীফের কবরস্থানে গেলাম। সেখানে আমাদের এক সাথীর কবর আছে। আমি মূলত গিয়েছি তার কবর জিয়ারত করতে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর একটি কবর আমার গতি রোধ করে দিল। সে এক ভাঙাচোরা এমন অবহেলিত কবর, আমার মনে হলো যেন এই কবরটির কথা স্মরণ করার মতো কেউ নেই। অথচ তার সাথে আমার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। তবে সম্পর্ক একটি আছে। সে হলো, ঈমানের আত্মীয়তা। এই বন্ধনে পৃথিবীর সকল মুসলমানই পরস্পর আত্মীয়। আমি কবরটির প্রতি অপলক তাকিয়ে রইলাম। আমার পা স্থির। ভাবলাম, হায় খোদা! মানুষ এভাবে হারিয়ে যায়! তারপর আমি ত্রস্তপদে অগ্রসর হলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম কবরটির ফলকে খোদাই করা হরফে লেখা আছে 'রুস্তমে হিন্দ'। আমার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এটা রুস্তমে হিন্দের কবর! ফলকটিতে লেখা আছে জন্ম : ১৮৪৪ ঈ. ও মৃত্যু : ১৯০৮। আমি আমার সাথীর কবর জিয়ারত করার কথা ভুলে গেলাম। আমি রুস্তমে হিন্দের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পড়তে শুরু করলাম। আমার মন বলছিল পৃথিবীর সকল মানুষ বুঝি এই কবরের কথা ভুলে গেছে। কী অসহায়ভাবে পড়ে আছে রুস্তমে হিন্দ!

یہ بے وفائی کب تک کرتے رہوگے؟
شراب کا نشہ بھی ایک دن ختم ہوجاتا ہے

বিশ্বাসঘাতকতা আর কতকাল?
শরাবের নেশা কেটে যাবে একদিন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আমরা আর কতকাল শরীরের যত্ন করবো? আর কতকাল আমরা শরীর ও মনের সেবায় নিমগ্ন থাকবো? আমরা কি আল্লাহ তাআলার প্রতি যত্নবান হবো না? আমরা কি তাঁর সাথে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিবো না? এটা ঠিক, মানুষ বিশ্বস্তও হয়, অবিশ্বস্তও হয়। কেউ যদি আল্লাহর সাথে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয় তাহলে রিপু ও শয়তানের সাথে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে। অতঃপর তার জীবনে আর সুখের কোন সীমানা থাকে না। কিন্তু কেউ যদি রিপু ও শয়তানের সাথে আন্তরিক হতে গিয়ে আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তার বিপদের আর কোন কিনারা থাকে না। আজ পৃথিবীর যেদিকেই চোখ যায়, চোখ ঝলসানো আলো। কিন্তু হৃদয় পড়ে আছে অন্ধকারে। চারদিক থেকে কানে ভেসে আসছে শুধুই কৃত্রিম হাসির রোল। আর হৃদয়ে কেবলই কান্নার ধ্বনি। মুখে মেকাপের প্রলেপ। কৃত্রিম রূপের ঝিলিক। পোশাক চাণক্যময়। অথচ হৃদয়জগত বিরান।

আজকের পৃথিবী, পৃথিবীর মানবতা বড় দুঃখে দিনাতিপাত করছে। আল্লাহর সাথে তার বন্ধন ভেঙ্গে পড়েছে। আল্লাহ কি বলছেন? হে মানুষ! যা ধুলোর সাথে মিটে যায় তাও কি কোন রাজত্ব? একদা যা ডুবে যায় তাও কি কোন উন্নতি? মৃত্যু যে জীবনকে খেয়ে শেষ করে ফেলে সেটা কি কোন জীবন হলো? বার্ধক্য যে যৌবনকে গ্রাস করে ফেলে সেটা কি কোন যৌবন হলো? বেদনার বাতাসে যে আনন্দ মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায় সে আনন্দ কি কোন আনন্দ হলো? যে সম্পদ দারিদ্র্যের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে সে সম্পদ কি কোন সম্পদ হলো? যে সুস্থতা পাছে অসুস্থতার ভয়ে সদা কম্পিত সে কি কোন সুস্থতা হলো? যে ভালোবাসার পেছনে

দাঁড়িয়ে থাকে সারি সারি ঘৃণা সে ভালোবাসা কি কোন ভালোবাসা হলো? অথচ এরই পেছনে আমরা ছুটছি উর্ধ্বশ্বাসে।

গুডো পাহলোয়ানের গল্প

এক পাহলোয়ান ছিলেন গুডো পাহলোয়ান। তিনি একবার রাইভন্ড আসলেন। তখন আমি রাইভন্ডে পড়তাম। তিনি ছিলেন সে সময়কার সবচেয়ে বড় পাহলোয়ান। তিনি সারা পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করে রেখেছিলেন কিন্তু কেউ তাকে মাটিতে শুয়াতে পারেনি। কিন্তু আমি যখন তাকে দেখেছি তখন তার অবস্থা ছিল এই– নিজে নিজে দাঁড়াতেও পারে না, বসতেও পারে না। ধরে ওঠাতে হয় ধরে বসাতে হয়। অথচ তিনি একদা সারা পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। পৃথিবীর কেউ তাকে শুয়াতে পারেনি। অথচ নির্দয় সময়, দিন ও রাতের নিঠুর আবর্তন তাকে একদা এমনভাবে শুইয়ে দিল আর ওঠে দাঁড়াবার সুযোগ হলো না।

জীবনের পদে পদেই নৃত্য করে মৃত্যু। জীবনের পদে পদেই লুকিয়ে থাকে পতন।

আমরা অবিরত হেরে চলছি।

আমাদের পদে পদেই জয় হচ্ছে মৃত্যুর। অথচ আমরা লক্ষ্য করি না।

فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

পরন্তু কেন নয়? প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও তাহলে তোমরা তা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। [ওয়াকিয়া : ৮৩-৮৭]

ডেপুটি কমিশনারের মৃত্যু

এক ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। নাম তার মুস্তফা যায়দী। তার পোস্টমর্টেম করা হলো। আমি তখন লাহুরে পড়াশোনা করতাম। ঘটনাটা সে সময়কার। পত্রিকায় তার মৃত্যুর খবর বেরুলো। এও বেরুলো, মুস্তফা যায়দী যখন কোন পথ দিয়ে হেঁটে যেতো তখন তার ব্যবহৃত সেন্টের সুবাসে চারপাশ আমোদিত হয়ে উঠতো। আর আজ যখন পোস্টমর্টেম করার জন্যে তার কবর খোলা হলো তখন তার দুর্গন্ধে কবরস্থানে দাঁড়ানোই মুশকিল।

এ হলো মানুষের পরিণতি। এই পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে সকলকেই। অথচ আমরা এই নিশ্চিত পরিণতির কথা ভাবি না। ভাবি কেবলই বাচ্চাদের পড়াশোনা, ঘরের খাবার-দাবার, কাপড় অলংকারের কথা। মৃত্যু পর্যন্ত পথটার কথাই কেবল ভাবি। সকল শক্তি মেধা ও সামর্থ এ পথেই বিলিয়ে দেই। অথচ এ পথটা কোন কঠিন পথ ছিল না। এখানে আমার সাথে আমার বাবা আছেন, মা আছেন। আমার সাথে আমার স্ত্রী আছে, আমার সন্তান আছে। আমার বিপদে দাঁড়াবার মতো সকলেই আছে। কিন্তু সেই সময়টা তো খুবই কঠিন। যখন আমাকে আমার সন্তান বাঁচাতে পারবে না। যখন আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, আমার স্ত্রী আমার মা-বাবা। যখন চিকিৎসক আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, এখন তো আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। যখন আমি দ্রুত শ্বাস নিতে থাকবো, যখন আমার প্রাণ আমাকে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হবে, যখন দৃশ্যমান সবকিছুই আমার চোখ থেকে আড়াল হয়ে যেতে থাকবে আর অদৃশ্য সবকিছু আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকবে তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকবে ফিরিশতা। চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে আমার বাড়িঘর, আমার স্ত্রী-সন্তান। এই সময়টা বড়ই করুণ। প্রকৃত অর্থে তখনই আমি কারও সাহায্যের মুহতাজ হবো। এখানে এসে যা আমাকে সাহায্য করবে সেটাই তো প্রকৃত সাহায্য।

চলন্ত জানাযার দিকে তাকিয়ে দেখ। জানাযা ডেকে ডেকে এ কথাই বলে, এই পৃথিবীটা আবাদ হওয়ার নয়। ধ্বংস হওয়ার। জানাযা ডেকে ডেকে এ কথাই বলে, এই পৃথিবীটা হাসার জায়গা নয়, কাঁদার জায়গা।

এখানকার নিবাস ভেঙ্গে যায়।

এখানকার ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এখানকার সম্পদ লুট হয়ে যায়।

এখানকার ধন-ভাণ্ডার হারিয়ে যায়।

এই পৃথিবীকে এখানকার সম্পদকে যে হৃদয় দেয় পরকালের প্রতিযোগিতায় সে হেরে যায়। একবার ভেবে দেখ, যে স্ত্রী-সন্তানের স্বার্থে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করেছিলে আজ তোমার দুর্দিনে কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারছে না।

তোমার কি মনে পড়ে না, কবরের অন্ধকারের কথা?

তোমার কি মনে পড়ে না কবরের গরমের কথা?

তুমি কি জাহান্নামের আগুনের কথা ভুলে গেছো?

দোযখের আযাবের কথা ভুলে গেছো তুমি?

বেহেশতের নিয়ামতের কথা তোমার মনে পড়ে না?

তুমি কি আল্লাহর দীদারের কথা ভুলে গেছো?

কেমন মুসলমান তুমি?

তোমার হৃদয় পাথরের চেয়েও কঠিন। পুরো জীবনটা অবলীলায় বিলিয়ে দিলে আয়-উপার্জনে। এমন অলসতা অবজ্ঞার ভেতর জীবনটা কাটিয়ে দিলে? যৌবনে তাঁকে স্মরণ করলে না, স্মরণ করলে না বার্ধক্যেও। অবশেষে গাফলতের ভেতর দিয়েই এসে দাঁড়ালে মৃত্যুর দুয়ারে। মনে রাখতে হবে, আমরা যতই কবরকে ভুলে যাই না কেন, আমরা যতই আল্লাহকে ভুলে যাই না কেন আল্লাহ কিন্তু কিছুই ভুলেন না।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

তুমি কখনও মনে করো না, জালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফেল। [ইবরাহীম : ৪২]

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ

তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চোখগুলো হবে স্থির। [ইবরাহীম : ৪২]

বিত্তের প্রতিযোগিতা আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি

আজ পৃথিবীতে পয়সা কামাতে কামাতে আমাদের চুল সাদা হয়ে যায়। আমরা সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণে সঞ্চয়ের সব ধন ঢেলে দিই আর ভাবি, আমরা বুঝি অধিষ্ঠিত হয়ে গেছি। মূলত আল্লাহ তাআলা যাদের সম্পদকে ধ্বংস করতে চান, যাদের সম্পদকে আল্লাহ তাআলা উপেক্ষা করতে চান তাদের সম্পদ দিয়েই মূলত এই পৃথিবীতে অট্টালিকা নির্মাণ করেন। হাদীস শরীফে আছে, 'আল্লাহ তাআলা যার সম্পদকে অপছন্দ করেন তার সম্পদ দিয়ে এই মাটিতে মহল নির্মাণ করেন।'

সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাঁরা জীবনে উঁচু মহল নির্মাণ করেননি। হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ঘর ছিল না। হযরত আলী (রা.)-এর কোন ঘর ছিল না। হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর কোন ঘর ছিল না। হযরত আয়েশা (রা.)-এর কোন ঘর ছিল না। অথচ তাঁদের সাধনায় পৃথিবীতে ঈমান বিস্তার লাভ করেছে। তাঁদের সাধনায় আল্লাহর দীন সম্প্রসারিত হয়েছে। তাঁদের চেষ্টায় পৃথিবীব্যাপী আল্লাহর দেয়া জীবনাদর্শ বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁদের একটাই চেতনা ছিল, আমরা জীবন দিব আল্লাহর নামে। আমরা আমাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবো। এটাই আমাদের জীবনের একমাত্র কাজ। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পরকাল। পিতা পুত্রকে ডেকে বলতো, যাও বাবা! আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে দাও। বেহেশতে গিয়ে মিলিত হবো। মা ছেলেকে বলতো, যাও বেটা! আল্লাহর নামে জীবন দাও। আজ আমাদের মাঝে সেই চেতনা কোথায়? আমাদের সমাজের একজন মা, সে যত বয়স্কই হোক, যত তুচ্ছই হোক তার একটাই আবদার– আমার জানাযা যেন আমার পুত্র বহন করে। আমার চোখের সামনে যেন আমার সন্তান মৃত্যুবরণ না করে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জীবন-চেতনা দেখুন, মা-বাবা সকলেই ছিলেন এই চেতনায় সমান অংশীদার।

বুখারী শরীফে আছে, সাহাবী বাশীর (রা.) বলেন– আমি আমার মায়ের সাথে হিজরত করে এসেছি। মদীনায় আসার পর আমার মা মারা গেলেন। আমি সম্পূর্ণ একা। বাবা গেছেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদে। তিনি সেখানেই শাহাদতবরণ

করেছেন। যখন মুসলিম বাহিনী ফিরে আসছিল তখন আমি মনে মনে ভাবছি, এগিয়ে গিয়ে বাবাকে আলিঙ্গন করবো। কারণ, তখনও আমি জানি না, আমার বাবা শহীদ হয়েছেন। আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার সামনে দিয়ে একজন একজন করে হেঁটে যাচ্ছেন। অবশেষে সকলেই যখন চলে গেল তখন আমি পাথরের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আল্লাহর রাসূলও আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাবার কি হয়েছে?

হযরত বাশীর (রা.) বলেন, আমি ছুটে এসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পা জড়িয়ে ধরলাম। খুব কাঁদলাম। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা চলে গেলেন। বাবাও চলে গেলেন। ...

তারপর আল্লাহর রাসূল কী করলেন? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বাশীর (রা.)কে বুকে তুলে নিলেন এবং বললেন–

يَابَشِيرُ اَمَاتَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ عَائِشَةُ اُمَّكَ وَاَنَا
اَبُوْكَ اَوْكَمَا قَالَ

বাশীর! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আয়েশা তোমার মা আর আমি তোমার বাবা?

এ কথা শোনার পর হযরত বাশীর (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই আমি সন্তুষ্ট।

এই তো ছিল আমাদের পূর্বসূরীদের জীবনচেতনা। তাঁরা সদাই ভেবেছেন আখেরাতের কথা। কবরের কথা এবং তাঁরা এই ভাবনাকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার মানসেই ছড়িয়ে পড়েছিলেন দেশ থেকে দেশান্তরে। অথচ আজ আমরা ভুলে গেছি আমাদের প্রকৃত ঠিকানার কথা। আমরা আকণ্ঠ ডুবে আছি এই নশ্বর দুনিয়ার ভাবনায়। আমাদের ঘুম কি ভাঙ্গবে না? ❁

বয়ান : ৯

তাবলিগী মেহনত ও তার বরকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ ؛

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

আল্লাহ তাআলাই সমগ্র জাহানের বাদশাহ। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্র নিরংকুশ রাজত্ব কেবল তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবী কেবল তাঁরই আজ্ঞাবহ।

لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ

পুব ও পশ্চিম আল্লাহরই। [বাকারা : ১১৫]

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

জিজ্ঞেস কর কে সপ্ত আকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি? [মু'মিনূন : ৮৬]

অর্থাৎ যদি জিজ্ঞেস করে, পূর্ব-পশ্চিম সাত আসমান এই বিশাল পৃথিবী আর আরশের অধিপতি কে? তাহলে একজন কাফেরও বলবে–

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ

তারা বলবে, আল্লাহ! [মু'মিনূন : ৮৫]

অর্থাৎ এই আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত মালিকানা ও প্রকৃত বাদশাহী দাবী করার মতো আর কেউ নেই। যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন অধিপতি থাকতো তাহলে কেউ হয়তো আসমান দখলে নিয়ে নিতো। কেউ দখলে নিয়ে নিতো আরেক আসমান। অতঃপর দুই শক্তি মুখোমুখি হতো। শুরু হতো সংঘাত। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাস আমাদেরকে এ কথাই বলে– দুই শক্তি কখনও পরস্পর সংঘাত ব্যতীত থাকতে পারে না। তাই আল্লাহ তাআলা বলে দিচ্ছেন, আমার যদি কোন প্রতিপক্ষ থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই তার সাথে আমার সংঘাত হতো। তোমরা শুনতে পেতে কখনও বা সে হারতো কখনও বা আমি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তোমরা এমন কোন সংবাদ শুনতে পাওনি। আকাশ কিংবা পৃথিবীর রাজত্বে কখনও কারও সাথে আমার সংঘাত হয়নি। এমনকি যারা আমাকে মানতে অস্বীকৃতি জানায় তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তারাও এ কথাই বলবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন–

يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ

তিনি আকাশমণ্ডলী সংরক্ষণ করেন। [ফাতির : ৪১]

وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ

আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায়। তাঁর ডান হাতে। [যুমার : ৬৭]

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاۤءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ

তিনিই মাবূদ নভোমণ্ডলে, তিনিই মাবূদ ভূমণ্ডলে। [যুখরুফ : ৮৪]

উল্লিখিত আয়াতগুলো আল্লাহ তাআলার একচ্ছত্র বাদশাহীর কথাই ঘোষণা করে। তাঁর এই বাদশাহীর সূচনা কখন থেকে? এ সম্পর্কে তিনি নিজেই ইরশাদ করছেন–

لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহরই। [রূম : ৪]

সকল জিনিসেরই একটা সূচনা ও শেষ আছে কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমন এক সত্তা যাঁর আদি নেই, অন্তও নেই। তাঁর শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যও তাই। তাঁর ব্যবস্থাপনারও আদি নেই, অন্ত নেই। তাঁর শাসন ব্যবস্থায় কখনও ইতি ঘটবে না।

মানবিক শাসন ব্যবস্থার ব্যাপকতা ও আল্লাহর শক্তি

তাঁর শাসন ব্যবস্থা এতটা ব্যাপকতর, কেউ যদি পুরো জীবন এর পেছনে বিলিয়ে দেয় তবুও তা উপলব্ধি করে শেষ করতে পারবে না। প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এক লক্ষ কোটি ইট ব্যবহার করেছেন। এই যে আমার আপনার অস্তিত্ব রয়েছে এই প্রতিটি অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ তাআলা যে সেল ব্যবহার করেছেন তাকে আমরা আমাদের ভাষায় ইট বলতে পারি। আমাদের এই দেহঘর তৈরি হয়েছে এক লক্ষ কোটি ইটে। আর সর্বদাই এই দেহঘর ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোন ইট যদি ভেঙ্গে যায় তাহলে তাকে রিপেয়ার করতে হয়। যদি কোথাও কোন ইট খসে পড়ে তাহলে সেখানে নতুন ইট লাগাতে হয়। কোথাও বা বাকল ওঠে যায় তো সেখানে মশলা দিয়ে তা সমান করতে হয়। আবার কোথাও দুর্বলতার সৃষ্টি হলে সেখানে শক্তি

দিয়ে তা পূর্ণ করতে হয়। সুতরাং এই যে এক লক্ষ কোটি Cell's আছে এর প্রতিটিরই চাহিদা রয়েছে এবং প্রতি মুহূর্তে তাকে তার চাহিদা মুতাবেক খাদ্য পৌঁছানো হচ্ছে। যদি এই খাদ্যে কোনরূপ ভুল হয় একটার জায়গায় অন্যটা চলে যায় তাহলে শরীরের সকল ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়বে, ধসে যাবে। আর শরীরের মধ্যে এই যে কোটি কোটি সেল রয়েছে এগুলোও এমন যে মাইক্রোস্কোপ (Microscope) ব্যতীত দেখা যায় না। প্রতিটি মানুষের শারীরিক ব্যবস্থাপনা এতটা সূক্ষ্ম। অতঃপর সেই মানুষের সংখ্যা হলো পাঁচশ' কোটি। এবার ভেবে দেখুন, এই মানুষকে কেন্দ্র করে কত সূক্ষ্ম ও কত বিশাল ব্যবস্থাপনা চলছে। তারপর কেউ জন্মগ্রহণ করছে, কেউ বা মরছে, কেউ যৌবনে উত্তীর্ণ হচ্ছে, কেউ বা জীবনের শেষ সীমানা পার হচ্ছে। কেউ যৌবনের শেষ সীমানা পার করে বার্ধক্যের অন্ধকারে পা রাখছে। কেউ অসুস্থ হচ্ছে। আবার কেউ অসুস্থতার সীমানা ডিঙিয়ে সুস্থতায় পা রাখছে। এ সবকিছু শুধু মানুষের শরীরকে কেন্দ্র করে। যদি একজন মানুষের শরীর কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থাপনার প্রতি কেউ গভীরভাবে দৃষ্টি দেয় তাহলে তার জীবন ভাবনার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট।

অতঃপর যে মারা যায় সে তো চলেই গেলো। মাথা থেকে তার বোঝা নেমে গেলো। কিন্তু আসলে বিষয়টি তা নয়। যে মারা গেছে তার শরীরের একেকটি পরমাণু কোথায় উড়ে বেড়াচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টি রাখা, কোথায় তা সমাধিস্থ হচ্ছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা, শরীরের একেকটি পরমাণুকে কবরের পোকা কখন খেয়েছে, কবে এই পোকাগুলো অন্য পোকাদের খোরাক হয়েছে, অতঃপর সেই পোকাগুলোকে খেল কোন পোকা? আবার এই মাটি কখন পার্শ্ব বদল করলো, কখন মাটি কবরের ভেতরের মাটিকে তুলে উপরে ফেলে দিল, আবার উপরের মাটিকে টেনে নিল ভেতরে– এভাবে একটি কবরের ভেতর সমাধিস্থ হয়েছে শত শত মানুষ।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ক্ষেত্রে তো এমনও ঘটেছে, একটি কবরে দশজনকে দাফন করা হয়েছে। যুদ্ধে যখন তারা চরমভাবে যখম হয়েছেন তখন তাঁদের শরীরে কবর খনন করার মতো শক্তিও ছিল না।

তখন দেখা গেছে একটি কবরে অনেককে দাফন করা হয়েছে। ওহুদের যুদ্ধে একেকটি কবরে দশজন করে সাহাবীকে দাফন করা হয়েছে।

স্বাভাবিক কথা, পরে তাঁদের শরীরের অংশগুলো পরস্পরে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এখন তাঁদের প্রত্যেকের শরীরের অনু-পরমাণুগুলোর খোঁজ-খবর রাখা, অতঃপর মাটির সাথে মিশে যাওয়া শরীরের যে পরমাণুগুলো বাতাসে উড়ে গিয়ে দরিয়ায় পড়েছে, অতঃপর তা গিলে ফেলেছে সমুদ্রের মাছ। আবার সেই মাছকে গিলে খেয়েছে সমুদ্রের বড় বড় মাছ। তারপর সেই মাছ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তা পচে গলে মিশে গেছে সমুদ্রের পানির সাথে এবং তা ভেসে উঠেছে সমুদ্রের পানির উপর। সূর্য তাপ দিয়ে সেই পানিকে শুষে নিয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে মেঘ। অতঃপর সেই পরমাণু মেঘে করে কিছু চলে গেছে ইরানে, সেখানে বর্ষিত হয়েছে বৃষ্টি হয়ে। কিছু চলে গেছে হিমালয়ে। সেখানে বর্ষিত হয়েছে বৃষ্টি হয়ে। কিছু বা বর্ষিত হয়েছে পাকিস্তানের ফয়সালাবাদে। কিছু পেশোয়ারে, কিছু করাচীতে। এভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখবো, এই পৃথিবীতে যে একজন মানুষ মারা যাচ্ছে তার দেহের একেকটি অংশ অনু-পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে তা কোথা থেকে কোথা ছড়িয়ে পড়ছে। অতঃপর তা সংরক্ষিত হচ্ছে আল্লাহর কুদরতে। কারণ, এ সবগুলোকে একত্রিত করে এই মানুষটিকে আবার জীবিত করা হবে।

বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন নিযাম

তাও যদি শুধু মানুষের ব্যাপার হতো তাহলেও না হয় হিসেব করে দেখা যেতো। এখন আমরা যে কলোনীতে বসে কথা বলছি এই কলোনীতে কি পরিমাণে পিঁপড়া আছে, আজ কি পরিমাণে পিঁপড়ে জন্মগ্রহণ করলো, কি পরিমাণে পিঁপড়ে আজ মারা গেল, কি পরিমাণ পিঁপড়ে এখন ডিমের ভেতর আছে এবং সন্ধ্যা নাগাদ জন্মগ্রহণ করবে– এভাবে যদি আমরা শুধু এই একটি কলোনীর পিঁপড়ের হিসেব কষতে যাই তাহলে আমাদের সারা জীবন শেষ হয়ে যাবে। পৃথিবীর সকল বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিয়েও হয়তো আমরা গণনা করে শেষ করতে পারবো না। গণনা করতে

গেলে হয়তো কাল যারা মারা গেছে তাদেরকে গণনা করে বসবো, কাল যারা জন্মগ্রহণ করবে তাদের তো সন্ধানই পাবো না। অথচ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীময় সকল পিঁপড়ের পরিপূর্ণ হিসেব রাখেন। কারণ, প্রতিটি পিঁপড়েকেই তিনি পুনরায় জীবিত করবেন। এমন কোন প্রাণী নেই যাকে কিয়ামতের দিন জীবিত করা হবে না।

আমরা যদি শুধুমাত্র মশার হিসাব করতে চাই তাহলেও করে শেষ করতে পারবো না। এই যে আমরা ঘরে বসে মশা মারার জন্যে স্প্রে করি, একেকবার স্প্রে করার দ্বারা লক্ষ কোটি মশা ও তার ডিম ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত আবার জন্মলাভ করে কোটি কোটি মশা। তারা আমাদের নাকের ডগায় নেচে বেড়ায়। অথচ আমরা তাদের হিসাব জানি না। আল্লাহ তাআলা এর পরিপূর্ণ হিসাব রাখেন এবং প্রতিটি মশাকে কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করবেন।

আমরা কি বলতে পারি, আমাদের বাড়িতে কতটি পাখির বাস? আমাদেরকে যদি বলা হয়, আমাদের গ্রামের পাখিগুলোর হিসেব নিতে তাহলে কি আমরা হিসেব করে দেখাতে পারবো? পারবো না। অথচ আল্লাহ তাআলা কতটি পাখি মারা গেল, কতটি জীবিত আছে, কতটি ডিমের ভেতর আছে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করবে এর সবকিছু জানেন।

তিনি জানেন, আমাদের বাড়ির পাশের পুকুর কিংবা নদীতে কী পরিমাণে মাছ আছে। মাছের ডিমের ভেতর বসবাসকারী মাছগুলোর হিসেবও তাঁর জানার বাইরে নয়। তিনি জিন-এর মতো সূক্ষ্ম জাতির পরিপূর্ণ হিসেব রাখেন। অথচ আমাদের দৃষ্টিতে জিন হলো এক অশরীরী জাতি। কোটি কোটি জিন। অথচ তারা বসবাস করার জন্যে কোনরূপ জায়গা দখল করে না। ফলে আমরা তাদের পরিসংখ্যান জানি না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের পরিপূর্ণ হিসেব রাখেন। সুতরাং বিশ্বময় সম্প্রসারিত তাঁর এই ব্যবস্থাপনা কত যে ব্যাপক ও গভীর তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

আল্লাহ তাআলা কেমন? কেমন তাঁর শক্তি ও বৈশিষ্ট্য? তার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন–

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। [বাকারা : ২৫৫]

لَا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنْسَى

আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। [ত্বহা : ৫২]

অর্থাৎ প্রহরীও কখনও কখনও নির্ঘুম থাকে। তাকেও তন্দ্রা পায় না। কিন্তু সে ভুল করে বরাবরই। বরাবরই বিস্মৃত হয়। এমনকি জাগ্রত মানুষও ভুল করে। দেখা ও শোনা কথা খানিকটা পরে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে না। কিন্তু আমাদের প্রভু এমন যে, তিনি ভুল করেন না এবং তিনি বিস্মৃতও হন না। এই গুণ কেবলই তাঁর। মানুষের মধ্যে যারা সচেতন তাদেরকেও দেখা যায় সতর্কতার সাথে লেখে যাচ্ছে। অথচ ভুল লেখে যাচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায়, যারা বিচার সালিশ করে তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফয়সালা দেয়। অথচ সে ক্ষেত্রেও ভুল করে বসে। ভুল করে বিচারক, ভুল করে চিকিৎসক, ভুল করে শাসক। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ভুল করেন না। কত দিন হলো এই জগত তিনি সৃষ্টি করেছেন। অবিরাম চলছে এর সকল কার্যক্রম। কিন্তু আজ অবধি তিনি যেমন ভুল করেননি, তেমনি তাঁর এই ব্যবস্থাপনায় কোথাও কোন খুঁত ধরাও পড়েনি। ধরা পড়েনি কোন ক্লান্তি কিংবা অবসাদের ছাপ। অথচ আমাদের মায়েদেরকে দেখুন, তিন চারজন সন্তানকে সামলাতে গিয়ে বিকেল পর্যন্ত মাথা ব্যথায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ তো সন্তানদের প্রতি বিরক্ত হয়ে মারধর শুরু করে দেন। ফ্যাক্টরির মালিক একশ' শ্রমিক খাটাতে গিয়ে তার মাথা গুলিয়ে যায়। সন্ধ্যা বেলা দেখা যায় শ্রমিকদের সাথে তার আচরণ মারমুখী হয়ে ওঠে।

আল্লাহর জ্ঞান ও শক্তি

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও শক্তির পরিধি দেখুন। তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন সমগ্র জাহানকে। জলে স্থলে চলছে তাঁরই শাসন। শূন্য জগত

আল্লাহর আরশ এবং সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। গাছপালা, গাছের প্রতিটি পাতা-পল্লব, উড়ন্ত প্রতিটি পাখি, বৃক্ষের প্রতিটি ফল-ফুল তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। মিষ্টি ফল কখনও তিতে কিংবা টক ফলের সাথে মিশে যাচ্ছে না। কোন কোন ফলের মধ্যবিন্দুতে তার বীচি। কোনটার বা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কোনটার ভেতর রসে টইটুম্বুর, আবার কোনটা বা শক্ত। কোনটার রঙ সাদা, কোনটা লাল, কোনটার হলুদ, কোনটার সবুজ। কিন্তু একটার স্বাদ আরেকটার স্বাদের সাথে মিশ্রিত হচ্ছে না। কোনটার ফল গাছের একেবারে শীর্ষে, কোনটার মাঝখানে, কোনটার ডাল-পালায় আবার কোনটার ফল মাটির নিচে। এভাবে সৃষ্টি জগতের যে কোন প্রাঙ্গণের দিকে আমরা তাকাবো দেখবো, সেই অনাদি কাল থেকে এক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় বয়ে চলছে সৃষ্টিধারা। তাতে কোনদিন ব্যত্যয় ঘটেনি।

তিনি কোন কোন সৃষ্টিকে মাল্টি কালারে অলংকৃত করেছেন। তার রঙের একেকটি রেখা একেক বর্ণের। যা দেখে যেমন চোখ জুড়ায়, তেমন বিস্মিতও হতে হয়। শুধু ময়ূরকেই দেখুন, তার ডানায় কত রঙ লুকিয়ে আছে। পৃথিবীর সকল মানুষ মিলে যদি চেষ্টা করে তাহলে এতটা নাজুক, এতটা রূপসী ও এতটা উজ্জ্বল করে একটি ময়ূর তৈরি করতে পারবে না। অথচ কত স্বাভাবিকভাবে একটি ডিমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এত সুন্দর একটি ময়ূর। আর আসছে কালের পর কাল ধরে।

তাঁর এই সৃষ্টি সংখ্যায় যেমন ব্যাপক, ধরনেও তেমনি বিচিত্র। অবিরাম চলছে সৃষ্টির ধারা। তিনি ক্লান্তও হন না, বিস্মৃতও হন না। ঘুমান না তন্দ্রাচ্ছন্নও হন না। তাঁর ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে এমন কোন ভয়ও করেন না। মুহূর্তের জন্যে তাঁকে দুর্বলতা কিংবা অজ্ঞানতা স্পর্শ করতে পারে না। তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না গাফলত এবং অলসতা।

রাতের অন্ধকারেও প্রতিটি সৃষ্টি তাঁর দৃষ্টির সামনে এতটা স্পষ্ট ও প্রতিভাত, দুপুর সূর্যের আলোতেও যেমন স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। আরশের পিঠে কিংবা সমুদ্রের তলদেশে যদি একটি ক্ষুদ্র পিঁপড়েও হেঁটে চলে তিনি তা বরাবর দেখতে পান। তিনি যেভাবে হযরত জিবরাইল (আ.)কে দেখতে পান তেমনি দেখতে পান আমাকে আপনাকে সকলকে। হযরত

মিকাইল (আ.)কে তিনি যেমন স্পষ্ট দেখেন তেমনি স্পষ্ট দেখেন কার্পেটের নিচে চলমান ক্ষুদ্র পিঁপড়েটিকেও। আমরা যদি বলি তাহলে তিনি শুনেন। যদি কোন কথা হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে রাখি তাও তিনি শুনেন।

مَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ

অনু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয়। [ইউনুস : ৬১]

পৃথিবীর সকল সৃষ্টি তাঁর অধীন। তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের বাইরে অনু পরিমাণ কিছু নেই। এই বিশ্ব জগত পরিচালনায় তাঁর কোন শরীক নেই। এই বিশ্ব জগতকে তিনি একাই নিয়ন্ত্রণ করছেন। এখানে তাঁর কোন অংশীদার নেই। এই বিশ্ব জগত নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন না যে, কাউকে ডেকে বলবেন, আমি তো আকাশমণ্ডলী নিয়ন্ত্রণ করছি, পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণের ভারটা তুমি নাও। আমি উত্তর-দক্ষিণ দেখছি, তুমি পূর্ব-পশ্চিম সামলাও। জলজগৎ আমার নিয়ন্ত্রণে আছে শূন্যজগৎ তুমি দেখ। বনের পাতাগুলো আমার নিয়ন্ত্রণে, ফল-ফুলের দেখাশোনা তুমি কর। ফিরিশতারা আমার নিয়ন্ত্রণে আছে, জিনদেরকে তুমি দেখ। না। তাঁর কোন শরীক নেই।

اَلْمَلِكُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَالْفَرْدُ لَا نِدَّ لَهُ وَالْعَلِى
لَاسِمَى لَهُ وَالْغَنِى لَاظَهِيْرَ لَهُ

তিনি বাদশাহ! তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি মহান ও সকলের উর্ধ্বে। তিনি মুখাপেক্ষীহীন, তাঁর কোন সহযোগী নেই।

তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ

তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। [ইখলাস : ৪]

কালিমার দাবী

আমরা 'যে কালিমা শরীফ পাঠ করি সেই কালিমা শরীফ তথা লা-ইলাহা' ইল্লাল্লাহ-এর দাবী হলো- আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সকল নারী ও পুরুষকে এই মর্মে আহ্বান করেছেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা একমাত্র আমি যা চাই তাই কর। আমিই তোমাদের একমাত্র মাবুদ। আমাকে ছাড়া কেউ চলতে পারে না। সকলের অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সবকিছুই আমি জানি। সুতরাং আমাকে ছাড়া তোমাদের কেউ পথ চলতে পারবে না। এই পৃথিবীর সবকিছুই আমার জ্ঞানের অধীন। যা অতীত হয়েছে তাও আমি জানি, ভবিষ্যতে যা ঘটবে তাও আমি জানি। মানুষ, জিন, পশু-পাখি সবকিছুর প্রতিই আমার দৃষ্টি সমান। অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার প্রতি আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি ঠিক এমন স্বচ্ছ যেমন তিনি এখন আমাদেরকে দেখছেন। আদম (আ.)-এর সৃষ্টি তাঁর দৃষ্টির সামনে। তাঁর দৃষ্টির সামনে জিন জাতির সৃষ্টি। আসমান-জমিনের সৃজনলীলা এখনও তাঁর দৃষ্টির সামনে। কিয়ামতের সময় এই বিশ্ব জাহান যে ভেঙ্গে চুরমার হবে সে দৃশ্যও এখনই তাঁর দৃষ্টির সামনে। কিয়ামতের সময় ইসরাফিল শিঙায় যে ফুঁক দিবেন শিঙার সে ধ্বনি এখনই তিনি শুনতে পাচ্ছেন। তখন যে মানুষ বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে, সমুদ্রে আগুন জ্বলে ওঠবে, গাছগুলো একের পর এক মাটিতে ভেঙ্গে পড়বে, ভেঙ্গে পড়বে ঘরবাড়ি, সমগ্র পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত ধুলোর মতো উড়তে থাকবে, ভেঙ্গে পড়বে আকাশ, আলোহীন হয়ে পড়বে চাঁদ-সূর্য- কিয়ামতের এ সকল দৃশ্য এখনই তাঁর দৃষ্টির সামনে। তিনি অতীতকে যেমন দেখেন, যেমন দেখেন বর্তমানকে ঠিক তেমনি দেখনে ভবিষ্যতকেও। কারণ, তাঁর দৃষ্টি পরিপূর্ণ, তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ, তাঁর শক্তি পরিপূর্ণ, তাঁর রাজত্ব পরিপূর্ণ।

তাঁর বাদশাহীর কোন সীমানা নেই।

তাঁর ধনভাণ্ডারের কোন শেষ নেই।

তাঁর শক্তির কোন অন্ত নেই।

তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের উপর কারও শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

তাঁর ভীতির উর্ধ্বে কোন ভীতি নেই।

তাঁর বড়ত্বের উর্ধ্বে কারও বড়ত্ব নেই।

তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার কোন ভাষা নেই।

তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ করার মতো কোন শব্দ নেই।

তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করার মতো কোন ভাষা আমাদের নেই। এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ

> হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না।

অথচ আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় তিনি এতটা পারঙ্গম যে আল্লাহ তাআলা তাঁর নামই রেখেছেন 'আহমদ' অতি প্রশংসাকারী। অথচ এই সর্বাধিক প্রশংসা ক্ষমতার অধিকারী রাসূল– তিনিই ঘোষণা করছেন–

اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

> তুমি নিজে তোমার যেরূপ প্রশংসা করেছো আমরা তোমাকে ঠিক তেমনই জানি।

তাবলীগের সাধনা

তাবলীগী কাজের সূচনা হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ থেকে। পৃথিবীব্যাপী ইসলামের এই প্রথম সবক পৌঁছে দেয়াই তাবলীগী কাজের সূচনা। পৃথিবীর সকল মানুষকে এই মর্মে আহ্বান জানানো– তোমরা তোমাদের প্রভুকে চেনো। তোমরা তোমাদের মালিককে চেনো। তোমরা বুঝতে শেখো আকাশ ও পৃথিবীর সকল সম্পদের যিনি অধিপতি তাঁর হাতেই আমার জীবনের সকল সংকটের সমাধান। আমার জীবন আমার সুস্থতা আমার সম্মান আমার সফলতা এমনকি আমার সন্তান, শান্তি ও নিরাপত্তা সবকিছুর সমাধান তাঁরই হাতে। তিনিই আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারেন। মুক্তি দিতে পারেন এই দুনিয়ার জাহান্নাম থেকেও। এই

পৃথিবীতে আমার শান্তি-সুখের মালিকও তিনিই। জল ও স্থল, বড় ও ছোট সৃষ্টি জগতের সবকিছু তাঁর কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং তাঁকে না মেনে কোন উপায় নেই। আল্লাহ তাআলা মানব জীবনের প্রতিটি পদে পদে তাঁর শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে এ কথাই প্রমাণ করেন- হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের কল্পিত মূর্তিকে প্রত্যাখ্যান কর।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর দাবী শুধু এতটুকুই নয় যে পাথরের মূর্তিকে সিজদা করতে পারবে না। বরং পৃথিবীর যে সকল শক্তি ও বস্তু তোমার আশা ও আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র, এই পৃথিবীর যা কিছু তোমাকে আমার থেকে গাফেল করে দেয়, আমাকে ভুলিয়ে দেয় তাই মূর্তি। তাকেই ভাঙ্গতে হবে। তাকেই উপেক্ষা করতে হবে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) যেভাবে মূর্তি ভেঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন-

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। [আনআম : ৭৯]

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا

অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলোকে। [আম্বিয়া : ৫৮]

সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো চোখে দেখা সকল মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। ভেঙ্গে ফেলতে হবে হৃদয়ের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত সকল মূর্তিকেও। ভেঙ্গে ফেলতে হবে মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত সকল মূর্তিকে। যে সকল মূর্তির প্রতি নিবিষ্ট রয়েছে আমাদের চিন্তা, স্বপ্ন, ধ্যান ও আকাঙ্ক্ষা।

নামাযের ভেতর যেসব বিষয় স্মরণ হয় সাধারণত সেগুলোই হয় কিবলা। নামাযে যেসব বিষয় হৃদয়ে এসে পাক খেতে থাকে সেগুলোই হৃদয়ের কিবলা। তাই আমরা যখন আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু

করি তখন আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের অন্তরে অতঃপর কী ভেসে উঠছে? কী ঘুরপাক খাচ্ছে আমাদের হৃদয়ে। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর আঘাতে হৃদয়ে পাক খাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত এসব কিবলাকে ভেঙ্গে দিতে হবে। যেন এক আল্লাহ ব্যতীত আমাদের অন্তরে আর কোন কিবলা না থাকে। তাবলীগের প্রথম কর্মসূচিই এটা।

কালিমার হাকীকত

এক কবি বলেছেন–

چوں گویم مسلمانم بلرزم
کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ

যখন বলি, আমি মুসলমান কেঁপে উঠি

কারণ, আমি জানি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর বিপদের কথা।

এখানে কবি বলছেন, যখনই আমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করি, বলি আমি মুসলমান তখন আমার পূর্ণ অস্তিত্ব কেঁপে ওঠে। অথচ আমরা তো সারাদিনই নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করি। পাঠ করি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কই, আমাদের শরীরের একটি উকুনও তো কেঁপে ওঠে না। কবি নিজেই তার কারণও উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, আমি কেঁপে উঠি এই কারণে– আমি কালিমার হাকীকত বুঝি। আমি কালিমার বিপদগুলো জানি। তোমরা যেহেতু না বুঝেই উচ্চারণ কর তাই তোমরা কম্পিত হও না।

কালিমার উচ্চারণ সত্যিকার অর্থে কোন সহজ উচ্চারণ নয়। কালিমার উচ্চারণ এতটাই ওজস্বী যা পূর্ণ আসমান-জমিন বহন করতে পারেনি। বরং অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং তাতে শংকিত হয়েছে। [আহযাব : ৭২]

আসমান ও পৃথিবী এই কালিমার ভার বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। অস্বীকার করেছে শয়তানও। আকাশ ও পৃথিবী অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং অস্বীকার করে বিতাড়িত হয়নি, তবে অস্বীকার করে শয়তান বিতাড়িত হয়েছে। কারণ, আকাশ ও পৃথিবী অস্বীকার করার মধ্যে কোন অহংকার ছিল না। অহংকার ছিল শয়তানের অস্বীকারের মাঝে।

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ

সে অমান্য করলো ও অহংকার করলো। [বাকারা : ৩৪]

পক্ষান্তরে আকাশ ও পৃথিবী অস্বীকার করেছে, অহংকার করেনি বরং ভীত হয়েছে। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অপরাগতা প্রকাশ করেছে। বলেছে, হে আল্লাহ! এত বড় বোঝা আমরা বহন করতে পারবো না। পক্ষান্তরে শয়তান বলেছে, আমি আদমের চাইতে বড়। আদম আমার চাইতে ছোট। সুতরাং আমি এই নির্দেশ পালন করতে পারবো না। তাই শয়তান বিতাড়িত হয়েছে তার এই দাম্ভিকতা ও অহংকারের কারণে। আর অহংকার ও দাম্ভিকতা পরিহার করার কারণে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়েছে আকাশ ও পৃথিবী। মানুষকেও আল্লাহ তাআলার প্রিয়পাত্র হতে হলে অহংকার ও দাম্ভিকতা পরিহার করতে হবে। আল্লাহর দরবারে হতে হবে বিনয়ী। তাঁর দরবারে কান্নাকাটি করতে হবে। যদি কারও পাপ হিমালয় পরিমাণও হয় আর সে বিনয়ের সাথে মাটির মতো আল্লাহ তাআলার দরবারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে পারে আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন। তার পাপের ভারে যদি এই পৃথিবী ভেঙ্গে পড়ে, তার পাপের অন্ধকারে যদি চাঁদ ও সূর্যের আলো ঢাকা পড়ে যায়, তার পাপের স্তূপ যদি আকাশকে গিয়ে স্পর্শ করে তবুও সে যদি বিনয়ের সাথে 'আল্লাহ' বলে ডাকতে পারে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। শুধু ক্ষমাই নয় বরং আল্লাহ তাআলা বলে দেন– যাও, অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। এখন থেকে নতুন জীবন শুরু কর।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আমাদের তাবলীগী কাজের প্রথম মেহনত ও সাধনা এটাই– আল্লাহর সাথে নিজেদের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত কর। নিজেদের হৃদয় মন ও বিশ্বাসকে

আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত কর। হৃদয়কে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে আখিরাতমুখী কর। হৃদয়কে পয়সা থেকে সম্পদ থেকে জমি থেকে ব্যবসা থেকে মুক্ত কর। মুক্ত কর অহংকার থেকে। হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে হৃদয়কে সব রকমের অহংকার থেকে মুক্ত করতে হবে। হৃদয় থেকে অহংকারকে বের করে দিতে হবে, বের করে দিতে হবে ঘরবাড়ি, গাড়ি, বাণিজ্য এবং সকল সুখ-সামগ্রী। সম্পদের বড়াই ও বড়ত্বকে অন্তর থেকে বের করতে হবে। এজন্যেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাদাসিধা জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। একজন মানুষ সাইকেলে চড়ে পথ চলে। অন্যজন পথ চলে মোটর সাইকেলে করে। দু'জনের মনের অনুভূতি আসমান জমিন ব্যবধান। একজন যাচ্ছে ট্রেনে করে আরেকজন বিমানে করে। এই দু'জনের হৃদয়ের অনুভূতি কখনও এক হতে পারে না। তাছাড়া আমাদের এই দুনিয়াতে অহংকার করার মতো এমন কী আছে? আমরা যদি নিজেদের দিকে তাকাই তাহলে তো দেখবো, আমরা কত তুচ্ছ! কত সাধারণ।

বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশে হযরত উমর (রা.)-এর ঐতিহাসিক সফর

হযরত উমর (রা.) ছিলেন এক প্রার্থিত সাহাবী। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে তো নিজেরা প্রত্যাশী হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসেছেন। তাঁরা ছিলেন প্রত্যাশী। পক্ষান্তরে হযরত উমর (রা.) ছিলেন প্রত্যাশিত ও প্রার্থিত। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার দরবারে এই মর্মে প্রার্থনা করেছিলেন– হে আল্লাহ! উমরকে হেদায়াত দাও। উমরকে দান কর। তাই হযরত উমর (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ছিল স্বতন্ত্র। ফিলিস্তিনবাসীদের আবেদনে হযরত উমর (রা.) যখন বাইতুল মুকাদ্দাস যান তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের কাছাকাছি পৌঁছলে হযরত আবু উবায়দা (রা.) এসে সাক্ষাত করেন এবং আবদার করেন– আমিরুল মুমিনীন! অনুগ্রহপূর্বক আপনি আপনার গায়ের এই পোশাকগুলো বদলে ফেলুন। দয়া করে ভালো কাপড় পরিধান করুন। যখন বাইরে যাই তখন

আমাদেরকেও অনুরোধ করা হয়। বলা হয়, এই কাপড়ের টুপি নামিয়ে জিন্নাহ ক্যাপ পড়ে নাও। কী আশ্চর্য! যে আমল হুযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে নিয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভে সহায়তা করে সে আমলের প্রতি আগ্রহ আকর্ষণ নেই, বরং মনের ভেতর জেঁকে বসে আছে জিন্নাহ ক্যাপের মাহাত্ম। অনুরূপ হযরত আবু উবায়দা (রা.) বিনীত অনুরোধ জানালেন, আমিরুল মুমিনীন! অনুগ্রহপূর্বক আপনি আপনার গায়ের পোশাক বদলে ফেলুন।

অনুরোধ যেহেতু করেছেন হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাই হযরত উমর (রা.)ও কিছুটা দমে গেলেন। মুখে শুধু এতটুকু বললেন, তুমি ব্যতীত অন্য কেউ যদি এই আবদার করতো তাহলে আমি তার খবর নিয়ে ছাড়তাম। আচ্ছা, তুমি যখন অনুরোধ করেছো তখন ঠিক আছে। হযরত উমর (রা.) নতুন কাপড় পরিধান করলেন। উট রেখে তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। ঘোড়াও ছিল সতেজ সবল। কয়েক কদম যেতেই সে লাফিয়ে উঠলো। তখন হযরত উমর (রা.) 'তোমাদের আমীর ধ্বংস হয়ে গেছে, তোমাদের আমীর ধ্বংস হয়ে গেছে' বলে চিৎকার করে উঠলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.)কে ডেকে বললেন, আমাকে আমার কাপড় দাও, আমাকে আমার উট এনে দাও। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন– আমিরুল মুমিনীন! কী হয়েছে? হযরত উমর (রা.) বললেন–

تَخَلَّنِيَ الْعُجُبُ

আমার ভেতর অহংকার সৃষ্টি হয়েছে।

তারপর তিনি নতুন কাপড় খোলে ফেলেন। তাঁর পুরাতন কাপড় পরিধান করেন। মদীনা থেকে নিয়ে আসা উটের উপর ওঠে বসেন।

এদিকে রোমকরা শর্ত দিয়েছিল, মুসলমানদের আমীর এসে চুক্তিতে সই করতে হবে। কয়েকদিন যাওয়ার পর সকলে মিলে হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)কে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, ইনিই আমাদের আমীর। তখন তারা তাদের কিল্লার ছাদে ওঠে তাদের কিতাব খুলে দেখলো। দেখলো হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)কে। বললো, আমাদের কিতাবে যে

আকৃতি বর্ণিত আছে তার সাথে এঁর আকৃতি মিলছে না। অতঃপর তিনি হযরত উমর (রা.)কে চিঠি লেখেন। সেই চিঠি পেয়ে হযরত উমর (রা.) এখানে আসেন। বাইতুল মুকাদ্দাসে তাঁর আগমনের মূল প্রেক্ষাপট ছিল এটাই। তাদের কিতাবে এও লেখা ছিল, তিনি রাতের বেলা আগমন করবেন, উটের উপর সওয়ার হয়ে আগমন করবেন এবং তাঁর গায়ের জামাটি হবে তালিযুক্ত। অতঃপর তাঁর দেহ-আকৃতিরও বর্ণনা লিপিবদ্ধ ছিল তাতে। হযরত উমর (রা.) যখন আসেন তখন তাঁকে দেখেই তারা বলে ওঠে– হ্যাঁ, ইনিই সেই প্রতিশ্রুত আমীর। অতঃপর তারা হযরত উমর (রা.)-এর গায়ের জামাটি পঁই পঁই করে দেখতে থাকে। অবশেষে বলে, এখানে তো বারটি তালি দেখতে পাচ্ছি। আর দুটি তালি কোথায়? হযরত উমর (রা.) তখন বাহু উঁচু করে দাঁড়ান। তারা তাঁর বাহুর নিচে আরও দুটি তালি দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয়। এ হলো অর্ধজাহানের বাদশাহর পোশাক।

এখন আমরা মুসলমানরা ডুবে আছি জাহেরি সৌন্দর্য চিন্তায়। অথচ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন– বান্দা! তোমার অন্তরকে সুন্দর কর। পরিচ্ছন্নতা মানুষের স্বভাবজাত একটি বিষয়। স্বভাবগতভাবেই মানুষ সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এত সুন্দর করে এই নিখিল জাহানকে সৃষ্টি করেছেন।

কত সুন্দর বিচিত্র পাখি।

কত সুন্দর মধুময় তার কণ্ঠ।

কত সুন্দর বাগ-বাগিচা।

কত সুন্দর ফুল-ফল।

কত সুন্দর বর্ষার আকাশ।

কত সুন্দর মেঘমুক্ত শরতের বিকেল।

মূলত আল্লাহ তাআলা রূপে-গুণে সুশোভিত করে এই নিখিল জাহান সৃষ্টি করেছেন যেন এ সব কিছু দেখে মানুষের চোখ জুড়ায়। তাছাড়া আল্লাহ নিজেও সুন্দর। তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। কিন্তু আমরা চাইলেই তো আর আমাদের আকার-আকৃতিকে সুন্দর করে তুলতে পারবো না। করে

তুলতে পারবো না আল্লাহর মতো অনিন্দ্য রূপময় করে তুলতে। তাই আল্লাহ তাআলা আম্যদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, বান্দা! তোমরা তোমাদের হৃদয়কে সুন্দর কর। তোমাদের হৃদয়ই আমার ঠিকানা।

বান্দার ভগ্ন হৃদয় হলো আল্লাহর ঠিকানা। যে হৃদয় সুন্দর, পাক-পবিত্র সে হৃদয়ে আল্লাহ আগমন করেন। তিনি মাটিতে কিংবা আকাশে আগমন করেন না। তিনি আগমন করেন মানুষের হৃদয়ে। মানুষের আলোকিত হৃদয় আল্লাহ তাআলার আরশসম। তাছাড়া আরশ তো আল্লাহ তাআলার সামান্য তাজাল্লীও বরদাশত করতে অক্ষম। অথচ মানুষের হৃদয় অবিরাম আল্লাহ তাআলার তাজাল্লীর শরাব পান করে যাচ্ছে।

হাদীসে কুদসীতে আছে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْ بُهُمْ

আমি ভগ্ন হৃদয় বান্দার কাছে থাকি।

সুতরাং মানুষের হৃদয় খুব মূল্যবান সম্পদ। যে হৃদয়ে দুনিয়ার কোন আবর্জনা নেই, সম্পদের কোন আচ্ছাদন নেই, দুনিয়ার সব রকমের সব আয়োজন থেকে মুক্ত সে হৃদয় আল্লাহর ঠিকানা।

খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব (রহ.) যখন নিম্নের কবিতাটি পাঠ করেন তখন হযরত থানবী (রহ.) বলেছিলেন, যদি আমার কাছে এক লাখ রুপী থাকতো তাহলে এক লাখ রুপীই আমি এই কবিতার পুরস্কারস্বরূপ দান করতাম। কবিতাটি হলো—

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی

اب تو آجا، اب توخلوت ہو گئی

ساری دنیا ہی سے وحشت ہوگئی

اب تو آجا، اب تو خلوت ہوگئی

সুতরাং সত্যিকার মুমিন বান্দার পরিচয় হলো অন্তরকে দুনিয়ার সবকিছু থেকে পাক-পবিত্র করে আল্লাহর কাছে সঁপে দেয়া।

ঈমানের স্বাদ

জীবনের কত দীর্ঘকাল চলে গেল। এখনও পর্যন্ত আমরা ঈমানের স্বাদ বুঝতে পারলাম না। আস্বাদন করতে পারলাম না। আজও অনুভব করতে পারলাম না ঈমানের মধ্যে কি স্বাদ রয়েছে। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ইরশাদ করেছেন–

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ

সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে।

আমরা তো বুঝি যেসব বস্তু ধরা যায়, ছোঁয়া যায় কেবল সেগুলোই আস্বাদন করা যায়। যেমন আমরা রুটি তরকারী পানি পানীয় ইত্যাদি খাই ও পান করি এবং তার স্বাদ আস্বাদন করি। আমরা আস্বাদন করি, কোনটি ঝাল কোনটি মিষ্টি, কোনটি টক কোনটি ফিকে। এই হাদীসে মূলত এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে– ঈমানেরও এমন একটি স্তর আছে যে স্তরে উন্নীত হওয়ার পর মানুষ পার্থিব মিষ্টি দ্রব্যের মিষ্টতার ন্যায় ঈমানের স্বাদকেও অনুভব করতে পারে। অনুভব করতে পারে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাধুর্য। এটা মূলত মানুষের চেষ্টা ও সাধনার উপর নির্ভরশীল।

আমরা বলি, আমাদের এই তাবলীগের প্রথম চেষ্টাই হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গঠনের। আর আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হলো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনাদর্শ। আর সেটাই হলো কালিমা শরীফের দ্বিতীয় অংশ। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও বন্ধন প্রতিষ্ঠার এই মাধ্যম আরবের জন্য আজমের জন্যেও। ফকীরের জন্যেও গরীবের জন্যেও। নারীর জন্যেও পুরুষের জন্যেও। তাই কালিমার প্রথম অংশে বলা হয়েছে– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে– মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সুতরাং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ও শিক্ষাকে উপেক্ষা করে আল্লাহকে পাওয়া কোনদিনও সম্ভব নয়। ইরশাদ হয়েছে–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করবে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকবে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নিবে। [নিসা : ৬৫]

আয়াতটির বর্ণনাভঙ্গি কি বিস্ময়কর! আল্লাহ তাআলা তাঁর বক্তব্যের সূচনা করেছেন 'তোমার রবের শপথ' বলে। এতে এই বাক্যের বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে তেমনি স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসাও। আল্লাহ তাআলা নিজেকে এখানে আলাদা রেখে ইরশাদ করছেন– তোমার প্রতিপালকের শপথ! অর্থাৎ আমি কেবলই তোমার প্রতিপালক। অথচ তিনি তো সারা জাহানের প্রতিপালক। কুরআনে কারীমের সূচনাতেই তিনি ইরশাদ করেছেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে।

এখানে মূলত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা প্রকাশ করা এবং তাঁর প্রতি তাঁর আদর্শ ও ফয়সালার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের গুরুত্ব বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং আমরা যদি আল্লাহকে আপন বানাতে চাই তাহলে আমাদের জন্য পথ একটাই। সে হলো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শ। তাছাড়া আল্লাহ তাআলাকে আপন না বানিয়ে তো আমাদের

কোন উপায় নেই। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَبِيْدًا سِوَاىَ كَثِيْرُوْنَ وَلَيْسَ لِىْ سِوَاكَ

হে আল্লাহ! তোমার তো আমি ছাড়াও অনেক বান্দা আছে। কিন্তু আমার তো তুমি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই।

তোমার বান্দা অসংখ্য। কিন্তু আমার মাবূদ তো তুমিই। সুতরাং আমি যদি তোমাকে না পাই তাহলে তো কিছুই পেলাম না।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা শপথ করে ইরশাদ করেছেন–

حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

তারা যদি নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করে তাহলে তারা মুমিনই হতে পারবে না।

অর্থাৎ যদি তারা আপনার ফয়সালার প্রতি রাজি থাকে তাহলে আমিও তাদের প্রতি রাজি থাকবো। আর তারা যদি আপনাকে উপেক্ষা করে তাহলে আমাকে পাবে না। কুরাইশী হলেও পাবে না, রাজপুত্র হলেও পাবে না। আরব হলেও পাবে না, আজম হলেও পাবে না, পাঠান হলেও পাবে না। আমাকে পাওয়ার একটাই পথ, তোমার ফয়সালার অনুসরণ। তোমার আদর্শের অনুসরণ। সুতরাং আমরা যদি আল্লাহকে পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে চলতে হবে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় পথে।

ব্যক্তিপূজা ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিপূজারী হয়। ব্যক্তিত্বের দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব তাকে অন্যের চাল-চলনের অনুসরণ করতে পর্যন্ত

অনুপ্রাণিত করে। ফলে দেখা যায়, একেবারে ছোট শিশু পর্যন্ত তার পছন্দের মানুষের অনুসরণে কাপড়-চোপর পরে এমনকি গলায় টাই ঝুলিয়ে ফিরে। এটা আমাদের মাঝে লালিত দাসত্বেরই একটা প্রভাব। শত বছর গোলামীর ফলে অবচেতনভাবেই আমাদের নিষ্পাপ শিশুদের মাঝেও এই টাইপ্রীতি ঢুকে পড়েছে। আজকাল যে স্কুলের বাচ্চারা টাই পরে সে স্কুলকে ভালো স্কুল মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যে বিদ্যালয়ের বাচ্চারা পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে সেই স্কুলকে খুবই সাধারণ স্কুল মনে করা হয়। এটা আমাদের মানসিক বিপর্যয়। কোন ইংরেজ এসে আমাদেরকে এ কথা বলে যায়নি, তোমরা টাই পর, কোট পর। বরং তাদের শত বছরের সাধনা আমাদেরকে তাদের প্রতি তাদের সভ্যতার প্রতি প্রভাবিত করেছে, সমর্পিত করেছে। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমরা আমাদের সেই প্রভাবিত মানসিকতাকে লালন করে আসছি।

এ শুধুমাত্র শহরের চিত্র নয়। শহর ছেড়ে যদি আমরা গ্রামে যাই সেখানেও একই চিত্র নজরে পড়বে। দেখা যাবে সেখানেও বাচ্চারা টাই পরে স্কুলে যাচ্ছে এবং যুবতী মেয়েরা সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে ঘুরাফেরা করছে। এটা বাচ্চাদের অপরাধ নয়। তারা তো নিষ্পাপ। এ অপরাধ মা-বাবার। কিয়ামতের দিন এই জালেম মা-বাবাকে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

মূলত এটা আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিকতা থেকে পেয়েছি। কোন ইংরেজ আমাদেরকে এসে গলায় টাই ঝুলাতে বলে যায়নি। বরং তারা আমাদেরকে শত বছর শাসন করেছে। সেই শাসনের প্রভাবই হলো আজো পর্যন্ত আমরা তাদের কৃষ্টি-কালচার ছাড়তে পারিনি। পক্ষান্তরে আমরা আমাদের নবীর জীবনী কখনও পাঠ করিনি। কখনও তাঁর জীবন ও আদর্শের কথা আমরা শুনিনি। তাই আমরা তাঁর শিক্ষা ও জীবন দ্বারা প্রভাবিতও হইনি। আমরা উম্মাহাতুল মু'মিনীনের জীবনী পাঠ করিনি। মেয়েরা তো মেয়েদের দ্বারাই প্রভাবিত হবে। পুরুষরা প্রভাবিত হবে পুরুষদের দ্বারা। তাই আমাদের সমাজের পুরুষরা যেভাবে বিজাতি পুরুষদের দ্বারা প্রভাবিত তেমনি আমাদের মেয়েরা প্রভাবিত বিজাতি মেয়েদের দ্বারা। তাদের পোশাক যখন সংক্ষিপ্ত তখন আমাদের মেয়েদের পোশাকও সংক্ষিপ্ত। অথচ আল্লাহ তাআলা মুসলিম নারীদের

আদর্শ হিসেবে নির্বাচন করেছেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত বিবিগণকে।

মেয়েদের স্বভাব হলো, তারা সর্বদাই তার চাইতে বড় নারীর দিকে দেখে। অমুক ঘরের অমুক বেগম সাহেবা এই পোশাক পরেছে; সুতরাং আমাকেও পরতে হবে। অমুক ঘরে এটা দেখেছি; সুতরাং আমার ঘরেও এটা হতে হবে। আমি আমার বোনদের উদ্দেশে বলবো, বড়দের প্রতিই যখন তোমাদের এমন আকর্ষণ তখন তোমরা আল্লাহর কালাম খুলে দেখ, আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণ সম্পর্কে ইরশাদ করছেন−

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ

হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। [আহযাব : ৩২]

লক্ষ্য করে দেখুন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণের কী বিশাল মর্যাদা বিবৃত হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, তোমাদের মতো এই পৃথিবীতে আর কোন নারী নেই। অতীতেও ছিল না, এখনও নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। আল্লাহ তাআলা যাঁদের সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন তাঁদের মর্যাদার কি কোন তুলনা হতে পারে? তাছাড়া অন্য আয়াতে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের মর্যাদার কথা এভাবে ঘোষিত হয়েছে−

وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীগণকে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে কখনও বৈধ নয়। [আহযাব : ৫৩]

এ হলো নবীপত্নীগণের সুউচ্চ মাকাম। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তাহলে পৃথিবীর অন্য কোন পুরুষের পক্ষে তাঁদের কাউকে বিয়ে করা বৈধ নয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স আঠার বছর। চুয়ান্ন বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। জীবনে কত দীর্ঘ বৈধব্য

কাটিয়েছেন! কিন্তু কোন স্বামী গ্রহণ করেননি। কারণ, এটা সম্পূর্ণ হারাম।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হক

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হক ও মর্যাদা আমাদের জীবনের চাইতেও বেশি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

اَلنَّبِیُّ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِہِمْ

> নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের জীবন অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। [আহযাব : ৬]

অর্থাৎ আমার নবীর মর্যাদা তোমাদের কাছে তোমাদের জীবনের চাইতেও অধিক। আত্মীয়-স্বজনের মর্যাদাও তো নিজের জীবনের চাইতে বেশি নয়। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন– আমার নবীর মর্যাদা তোমাদের কাছে তোমাদের জীবনের চাইতেও বেশি। এর ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম লিখেছেন– কোন মা-বাবা যদি সন্তানকে নির্দেশ দেয় পানিতে কিংবা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। অতঃপর সন্তান যদি মা-বাবার নির্দেশ মাফিক আগুনে বা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা যায় তাহলে সেটা আত্মহত্যা হয়। কারণ, সন্তানের জীবন হরণ করার অধিকার মা-বাবার নেই। অথচ আল্লাহর রাসূল যদি কোন মুমিন মুসলমানকে বলেন, ঝাঁপ দাও, আর সে ঝাঁপিয়ে পড়লো তখন তার এই মৃত্যুকে বলা হবে শাহাদত। কারণ, সে আল্লাহর নবীর নির্দেশে জীবন দিয়েছে। উপর্যুক্ত আয়াতে নবীর এই মর্যাদার কথাই ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, আমরা আমাদের নবীর পথকে, তাঁর জীবনাদর্শকে এই ছুঁতোয় ছেড়ে দিতে পারি না–

মন চাচ্ছে না।

পরিবেশ প্রতিকূল।

মা-বাবা অনুমতি দিচ্ছেন না।

স্ত্রী রাজী নয়।

এটা মানতে গেলে চাকরি থাকবে না।

না। এমন কোন ছুঁতোর অবকাশ নেই। জীবন চলে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহর নবীর নির্দেশকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। কারণ, নবীর মর্যাদা, নবীর নির্দেশের মর্যাদা একজন মুমিনের কাছে তার জীবনের চাইতেও বেশি। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন–

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা। [আহযাব : ৬]

অর্থাৎ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণ হলেন ঈমানদারদের মা। আল্লাহর নবীর মর্যাদার পাশাপাশি এ হলো নবীপত্নীগণের মর্যাদা। এ কথা বলে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সকল ঈমানদার নারীগণকে এই মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন– হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা তো কারও না কারও দ্বারা প্রভাবিত হবেই। তোমরা তোমাদের চলমান জীবনে কাউকে না কাউকে তো আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেই।

এই যে তোমাদের ঘর হঠাৎ করে বদলে যায়

হঠাৎ করে বদলে যায় তোমাদের ফার্নিচারের ঢঙ

বদলে যায় তোমাদের বিয়ে-শাদীর ফ্যাশন

এ তো কারও না কারও প্রভাবেই হয়। সুতরাং তোমরা যখন কাউকে না কাউকে দ্বারা প্রভাবিত হবেই তখন আল্লাহর রাসূলের বিবিগণের দ্বারাই প্রভাবিত হও।

আল্লাহ তাআলা উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রতি জগতের সকল নারীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই পবিত্র কুরআনে তাঁদের অসীম মর্যাদার কথা তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন এই উদ্দেশ্যে– মর্যাদাবান নারীদেরই যেহেতু তোমরা অনুসরণ কর; সুতরাং তোমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিদের জীবনাদর্শের অনুসরণ কর। তোমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের দিকে তাকিয়ে দেখ। তাঁর প্রিয়তম কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ে

হচ্ছে। অথচ সেখানে বিরাট কোন আয়োজন নেই। হযরত ফাতিমা (রা.)কে ঘরের দাসী হযরত উম্মে আয়মান (রা.)-এর সাথে একাকী পাঠিয়ে দিচ্ছেন হযরত আলী (রা.)-এর ঘরে। কন্যা তুলে দেয়ার বিশেষ কোন আনুষ্ঠানিকতা নেই। কত সহজ জীবন! আর আজ আমরা জীবনটা কত কঠিন করে ফেলেছি।

আমরা যদি কল্যাণ চাই, কুরআনের আলোকে যদি আমরা জীবন গঠন করতে চাই তাহলে আমাদের মা-বোনদেরকে অনুসরণ করতে হবে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণের জীবনাদর্শ। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু বিবাহের লক্ষ্য তো এটাই ছিল যেন সমাজের অন্যান্য নারী সরাসরি নবীপত্নীগণের সান্নিধ্যে এসে আল্লাহর দীন শিখতে পারে, আল্লাহর দীন বুঝতে পারে। অন্যথায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নারীদের প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণের কারণে এতগুলো বিয়ে করেননি। তিনি তো ইরশাদ করেছেন—

مَالِىْ فِى النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ

মেয়েদের প্রতি আমার বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই।

এর বড় প্রমাণ হলো, তিনি পঁচিশ বছর বয়সে প্রথমবারের মতো বিয়ে করেছেন হযরত খাদিজা (রা.)কে যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। অতঃপর যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন তখন একের পর এক বেশক'টি বিয়ে করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এটাই, নবীপত্নীগণের মাধ্যমে সেই সমাজের মেয়েরা আল্লাহর দীন শিখবে, ইসলামী জীবন শিখবে। কারণ, সমাজের এতগুলো নারীর সামনে তো কোন এক দুইজন নারীর পক্ষে ইসলামের এই ব্যাপকতর শিক্ষা তুলে ধরা সম্ভব নয়। আরবের তৎকালীন নারীরাও উম্মাহাতুল মু'মিনীনের সামনে এসে দেখে দেখে ইসলাম শিখেছেন, ইসলামী জীবন শিখেছেন। আরবী ভাষায় প্রবাদ আছে—

لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ

নিশ্চয়ই শোনা সত্য দেখা সত্যের মতো নয়।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একাধিক বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেন তাঁদেরকে দেখে অন্য মেয়েরা দীন শিখতে পারে। অধিকন্তু আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণকে বেশ কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত করেছিলেন যেন কিয়ামত পর্যন্ত নারী জাতি ইচ্ছে করলে তাঁদের অনুসরণ করতে পারে, তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। সুতরাং পুরুষদের জন্যে আদর্শ হলো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তা, আর মেয়েদের জন্যে আদর্শ হলো উম্মাহাতুল মু'মিনীনের জীবনাদর্শ। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্বাচিত, চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ তাই তাঁর প্রতিটি কথা ও কর্ম হয়েছে কুদরতীভাবে সংরক্ষিত। তাঁর জীবনের প্রতিটি কথা, ওঠাবসা, চালচলন সবই এমনভাবে সংরক্ষিত হয়েছে আজও যদি কেউ জানতে চায়, দেখতে চায়– তিনি কিভাবে রাত কাটাতেন, তাঁর দিন কাটতো কিভাবে, তিনি কিভাবে হাঁটতেন, পরিবারের লোকদের সাথে তাঁর আচার-আচরণ কেমন ছিল, বাইরের লোকদের সাথে কেমন ছিল তাঁর ব্যবহার, তিনি কি ধরনের পোশাক পরতেন, কোন ধরনের পোশাক পছন্দ করতেন, তিনি কি খেতে পছন্দ করতেন, কোন পানীয় তাঁর পছন্দ ছিল, তিনি কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন, সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর মেলামেশা কেমন ছিল, বিশেষ লোকদের সাথে তাঁর ওঠাবসা কেমন ছিল তাহলে আজও জানতে পারবে নিঃশঙ্কচিত্তে। যে কেউ ইচ্ছা করলে আজও হাদীসের পাতা উল্টে জানতে পারবে– তিনি নিজেই নিজের উষ্ট্রীকে গাছের চারা খেতে দিতেন, নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন, নিজ হাতে আটার খামিরা তৈরি করতেন, নিজ হাতে নিজের কাপড় ধৌত করতেন, নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে রসিকতা

একবার হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে নিজের কাপড় সেলাই করছিলেন। পাশে বসে হযরত আয়েশা (রা.) চড়কা কাটছিলেন। তাঁদের জীবন ছিল কত সহজ ও মধুময়। কাপড় সেলাই

করতে করতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ললাটে ঘাম জমে ওঠেছিল। চিকচিক করছিল ঘামের বিন্দুগুলো। এমনিতেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখশ্রী ছিল উজ্জ্বল আলোকময়।

اَزْهَرُ اللَّوْنِ وَاسِعُ الْجَبِيْنِ

তাঁর বর্ণ ছিল আলোকোজ্জ্বল। ললাট ছিল প্রশস্ত। মস্তক মুবারক ছিল সুন্দর ও বিশাল। ওষ্ঠযুগল ছিল পাতলা।

তাঁর মুখাবয়ব চওড়াও ছিল না, আবার লম্বাটেও ছিল না। ছিল অনেকটা ডিম্বাকৃতির। তাঁর নাসিকা মুবারক ছিল খানিকটা উঁচু। তাঁর নাসিক মুবারক থেকে আলো ঠিকরে পরতো। তাই প্রথম দৃষ্টিতে বেশ উঁচু মনে হতো। আবার কাছে এসে দেখলে মনে হতো স্বাভাবিক।

اَدْ عَجُ وَاَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ

তাঁর নয়নযুগল ছিল কৃষ্ণকালো এবং আয়ত।

اَهْدَبُ الْاَ شْفَارِ

তাঁর পলক দুটি ছিল দীর্ঘ ও দরাজ।

اَزَجُّ الْحَوَاجِبِ

ভ্রূযুগল ছিল কামানের মতো বাঁকা। যুক্ত ছিল না।

بَيْنَهُمَا

উভয় ভ্রূর মাঝখানে একটি রগ ছিল। কোন বিষয়ে তিনি ক্ষুব্ধ হলে তা স্ফীত হয়ে উঠতো।

سَهْلُ الْخَدَّيْنِ

গণ্ডদ্বয় ছিল সমতল।

كَثُّ اللِّحْيَةِ اَزْهَرُ اللَّوْنِ

ঘন শ্মশ্রু উজ্জ্বল বর্ণ।

তাঁর ত্বকে যেমন কোমলতা ছিল তেমনি ছিল পুষ্পের মতো প্রস্ফুটিত আভা। মনে হতো, তাঁর মুখ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

مُفَلَّجُ الْاَ سْنَانِ بَرَّاقُ الثَّنَايَا

তিনি কখনও মুচকি হাসলে মনে হতো যেন দন্ত মুবারকের আলো দেয়ালে গিয়ে পড়েছে।

তাঁর দাঁতগুলো মোটা ছিল না, ছিল স্বাভাবিক। সুবিন্যস্ত ও আলোকোজ্জ্বল। তিনি যখন হাসতেন তখন মনে হতো যেন আলো খেলা করছে। এই ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখের রূপ। তিনি যখন স্বহস্তে কাপড় সেলাই করছিলেন তখন তাঁর কপালে জমে ওঠা শ্বেত বিন্দুতে খেলা করছিল ছোট ছোট আলোক খণ্ড। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই আলোক বিন্দুর চমক দেখছিলেন হযরত আয়েশা (রা.)। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– কী দেখছো আয়েশা?

হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আপনার কপালে জমে ওঠা স্বেদবিন্দুগুলোতে যে আলো খেলা করছে কবি আবুল কাবির আল হুযালী আজ যদি বেঁচে থাকতো তাহলে সে বুঝতে পারতো তার কবিতার উপযুক্ত সত্তা আপনি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– হুযালী তার কবিতায় কী বলেছিল?

হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, হুযালী বলেছিল–

وَاِذَا رَاَيْتُ اِلٰى اَسْرَةِ وَجْهِهٖ

بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِجِ الْمُتَهَلِّلِ

আমি যখন তার ললাটের দিকে তাকালাম তখন

আমার মনে হচ্ছিল যেন আকাশে বিদ্যুৎ খেলা করছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবিতা শোনার পর বললেন–

مَاسَرَرْتَ مِنِّىْ كَسُرُوْرٍ مِّنْكَ

তোমার এই কবিতা শোনে আমি এতটা খুশি হয়েছি যা ইতোপূর্বে কখনও হইনি।

হযরত মারয়াম (আ.) ও পর্দা

হযরত মারয়াম (আ.)-এর কথা পাক কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর নামে পবিত্র কুরআনে কারীমে একটি সূরাই অবতীর্ণ হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَاذْ كُرْفِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ،

বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত মারয়ামের কথা। [মারয়াম : ১৬]

يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا،

হে মারয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছো। [মারয়াম : ২৭]

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

এ-ই মারয়াম তনয় ঈসা! [মারয়াম : ৩৪]

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ

হে মারয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর। [আলে-ইমরান : ৪৩]

এভাবে কুরআনে কারীমের একাধিক জায়গায় হযরত মারয়াম (আ.)-এর আলোচনা এসেছে। তবে স্বাভাবিকভাবে কুরআনে কারীমে নারীদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। ভালোদেরও নয়, মন্দদেরও নয়। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ কথাই শিখিয়েছেন, মেয়েদের নামও গোপন রাখার বিষয়। বিনা প্রয়োজনে আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর কালামে মেয়েদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি তখন তাদের চেহারা

দেখিয়ে ফেরার অবকাশ কী করে থাকতে পারে? এ কারণে উলামায়ে কেরাম বলেছেন– কুরআনে কারীমের এই বর্ণনাভঙ্গি থেকেই বুঝা যায়, নারী বিষয়টাই হলো আবৃত থাকার। সুতরাং পর্দা মনের বিষয়– এই জাতীয় কথা ও দর্শন শয়তানের প্রতারণা মাত্র।

কেউ যদি এ কথা বলে, নামায একটি অন্তরের বিষয়। তাহলে সেটাও হবে অনুরূপ যুক্তিহীন তর্ক। কেউ চাইলে এর জবাবে এটাও বলতে পারে, পর্দা যখন মনের বিষয়, নামায যখন মনে মনে পড়লেই হয়ে যায় তখন খানাপিনাও মনে মনে করে নাও। প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন পড়লে টয়লেটে না গিয়ে মনে মনে সেরে নাও। আসলে আল্লাহ তাআলার মর্জি ও শরীয়তের মূল মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই আমাদের সমাজের কোথাও কোথাও এ জাতীয় উদ্ভট কথাবার্তা শোনা যায়।

শরীয়ত মেয়েদের সাজসজ্জাকে আবৃত রাখতে আদেশ করেছে। আর রূপ-সজ্জার কেন্দ্রই তো হলো চেহারা। চেহারাই যদি খোলা রাখা হলো তখন আর গোপন করার কী থাকলো? মূলত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতির জন্যে যে পয়গাম নিয়ে এসেছেন আমাদের প্রয়োজন জীবনের সকল অঙ্গনে সে পয়গামকে গ্রহণ করা। তার বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া এবং পৃথিবীব্যাপী এই পয়গামকে ছড়িয়ে দেয়ার মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করা।

আমাদেরকে এও মনে রাখতে হবে, সমাজ ইবাদতের দ্বারা বদলায় না। সমাজ বদলায় চরিত্রের দ্বারা। তাছাড়া যে কোন পরিবারের উপর সর্বাধিক প্রভাব থাকে মেয়েদের। তাই কোন পরিবারের মেয়েরা যদি চরিত্রবান হয়, তাদের মেযাজ ও চরিত্রে যদি দীনের আলো প্রোজ্জ্বলিত থাকে তাহলে তাদের সংস্পর্শে আগামী প্রজন্ম সহজেই সুন্দর ও আদর্শবান হয়ে ওঠে। মেয়েদের মধ্যে যদি সারল্য থাকে, চারিত্রিক উচ্চতা থাকে, ক্ষমা আন্তরিকতা ও উদারতা থাকে, তাদের হৃদয় যদি থাকে বিশাল ও পরিচ্ছন্ন তাহলে এই জাতীয় নারীর ছোঁয়ায় পরিবারও বেহেশতে রূপান্তরিত হয়। পক্ষান্তরে যদি তাদের মধ্যে এই জাতীয় উত্তম গুণাবলী না থাকে তাহলে তারা যতই ইবাদতগুজার হোক তাদের

দ্বারা পরিবার প্রভাবিত হবে না, তাদের স্পর্শে এসে উত্তম আদর্শে গড়ে ওঠবে না আগামী দিনের কাণ্ডারী।

আমরা ইটের ভাটা চিনি। সেখানে সারি সারি ইট সাজিয়ে রাখা হয়। তাই বলে তাকে বিল্ডিং বলা হয় না। বিল্ডিং বানাতে হলে ইটের সাথে ইট জোড়া দিতে হয়। আর সে জোড়া দিতে গেলে প্রয়োজন পড়ে সিমেন্টের। ইবাদত তাকওয়া তাওয়াক্কুল দুনিয়াবিমুখতা যিকির তিলাওয়াত সততা সত্যবাদিতা বিশ্বস্ততা এ সবকিছুর মাঝে সংযোগ ও সমন্বয় সৃষ্টি করার যে মেটারিয়াল বা সিমেন্ট সেটাই হলো আখলাক। সুতরাং যেভাবে সিমেন্টের সংযোগ ব্যতীত ইটের পর ইট সাজিয়ে রাখলে সেটাকে প্রাসাদ বলা যায় না এবং সিমেন্টের সংযোগ ব্যতীত ইটের পর ইট দাঁড় করানো যায় না। দাঁড় করালেও বেশিক্ষণ টিকে থাকে না– উত্তম চরিত্রের বিষয়টি অনুরূপ। যদি কোন সমাজে উত্তম চরিত্রের অভাব থাকে তাহলে সে সমাজ কখনও উদ্ভাসিত হয়ে ফুটে উঠতে পারে না, সে সমাজে কখনও বিশ্বস্ততা সততা সত্যবাদিতাসহ অন্যান্য কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আর যদি উত্তম চরিত্র থাকে তাহলে সে সমাজ সহজেই সুন্দর ও আলোকিত সমাজ হিসেবে সবার চোখে ধরা পড়ে।

উত্তম চরিত্রের পুরস্কার

উত্তম চরিত্র খুবই কঠিন একটি গুণ। নামাযের চাইতে কঠিন। চিল্লার চাইতে কঠিন। হজের চাইতে কঠিন। যাকাত দানের চাইতে কঠিন। যেহেতু উত্তম চরিত্র অত্যন্ত দুর্লভ একটি গুণ সেজন্য আল্লাহ তাআলার কাছে এর মূল্যও অনেক। দুনিয়াতে যেমন কঠিন ও দুঃসাধ্য শ্রমের মূল্য বেশি হয় অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার দরবারেও কঠিন ও দুঃসাধ্য গুণের মূল্য বেশি। তাই অনেকে আবার এই অতিরিক্ত মূল্য ও পুরস্কার পাওয়ার নেশায় এই দুঃসাধ্য কাজটিও মাথায় তুলে নেয়। আল্লাহ তাআলাও উত্তম চরিত্রের বিনিময় ঘোষণা করেছেন চড়া। বলেছেন, তোমার চরিত্রকে উন্নত কর আর জান্নাতুল ফেরদাউসের চাবি নিয়ে নাও।

এই অঙ্গীকার নামাযের বিনিময়ে নয়, তাহাজ্জুদের বিনিময়ে নয়।
এই অঙ্গীকার রোযার বিনিময়ে নয়, যিকিরের বিনিময়ে নয়।
এই অঙ্গীকার তিলাওয়াতের বিনিময়ে নয়, কান্নাকাটির বিনিময়ে নয়।
এই অঙ্গীকার উত্তম চরিত্রের বিনিময়।

কাজটি যেহেতু দুঃসাধ্য তাই আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ও ঘোষণা করেছেন সুউচ্চ। আল্লাহ তাআলার এই অঙ্গীকারে যাদের বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে তারা তো জীবন দিয়ে হলেও তা অর্জনে সচেষ্ট হয়েছে। আর যাদের বিশ্বাস সৃষ্টি হয়নি তারা নানা ছুতোয় তা উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছে।

তাছাড়া সকল বদ-আখলাকী ও দুশ্চরিত্রের শেকড় হলো মুখ। সে এই বলেছে, আমি এই বলেছি– এ থেকে শুরু হয় তর্ক। এই তর্ক এক সময় এতটা দূর পর্যন্ত গড়িয়ে যায় যে, নামায রোযা সবকিছু বরবাদ করে ছাড়ে। সুতরাং অন্যের কথার প্রেক্ষিতে ধৈর্যের সাথে নীরব থাকা নিজের চরিত্রের জোরে অন্যের অন্যায় আক্রমণকে হজম করা সহজ কথা নয়। এজন্যেই চরিত্রের এত কদর। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম চরিত্রবানের মর্যাদা তাহাজ্জুদগুজার অবিরাম সিয়াম সাধনাকারীর চাইতেও অধিক বলেছেন। অথচ জীবনভর রোযা রাখা, রাতের পর রাত তাহাজ্জুদ পড়া কত কঠিন। কিন্তু তার চাইতেও বেশি কঠিন উত্তম চরিত্র অর্জন করা। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এর মর্যাদা এত অধিক করেছেন যে, এটা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। আমি যদি বলি, আমার হাতের এই তসবীহটি আমি এক লক্ষ রুপি দিয়ে খরিদ করেছি তাহলে আপনারা সবাই হয়তো মিথ্যা মিথ্যা বলে চিৎকার করে উঠবেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কোন কথাকে তো মিথ্যা বলবার অবকাশ নেই। কারণ, তাঁর কোন কথাকে অস্বীকার করা মানেই কুফরী। সুতরাং অবিশ্বাস্য হলেও উত্তম চরিত্রের যে পুরস্কার তিনি ঘোষণা করেছেন তা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে এবং মেনে নিয়ে উত্তম চরিত্র সাধনে সচেষ্ট হতে হবে। আমাদেরকে অনুশীলন করতে হবে ক্ষমার ধৈর্যের। যদি আমরা অনুশীলন করতে পারি তাহলে এই পৃথিবীতেও আমাদের মাথা উঁচু হবে, উঁচু হবে পরকালেও।

মানুষ তো আল্লাহকেও ছাড়েনি

আমি ক'দিন আগে পাতোকি গিয়েছিলাম। সেখানে আমার বয়ান ছিল। সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর এক জজ সাহেবের কামরায় গিয়ে বসলাম। সেখানে আরও দু'তিনজন জজ বসে পড়লেন। হঠাৎ করে এক ক্ষুব্ধ জজ সাহেব ভেতরে প্রবেশ করলেন। ভেতরে প্রবেশ করেই বলতে লাগলেন, আমি আমার বাড়ি থেকে পয়সা এনে খরচ করি। তারপরও এ আমার প্রতি অভিযোগ করছে, আমি নাকি ত্রিশ হাজার রুপি ঘুষ নিয়েছি। বেচারা জজ সাহেব রাগের বশে বেসামাল ছিল। আরেকজন জজ তাকে বুঝাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোনভাবেই তার রাগ পড়ছিল না। অবশেষে আমি মাঝখানে ঢুকে পড়লাম। বললাম, একটি কথা বলি শুনুন। আল্লাহর নবী হযরত ইয়াহইয়া (আ.)কে মানুষ গালমন্দ করতো। একদিন তিনি আল্লাহ তাআলাকে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তো তোমার নবী। এরা আমাকে পর্যন্ত রেহাই দিচ্ছে না। দয়া করে তুমি আমাকে এদের মুখ থেকে বাঁচাও। তখন আল্লাহ তাআলা হযরত ইয়াহইয়া (আ.)কে বললেন, তুমি তো আমার নবী মাত্র। আর আমি তো হলাম তোমার প্রভু। অথচ তারা তো আমাকে পর্যন্ত ছাড়েনি। আমার পর্যন্ত তারা একজন পুত্র দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তোমাকে ছাড়বে কিভাবে! আমার কথা শোনে জজ সাহেব হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার রাগ নেমে পড়লো। অবশেষে তিনি আমার বয়ানে অংশগ্রহণ করলেন।

এ হলো মানুষের চরিত্র। তারা যুগে যুগে নবীগণকে পর্যন্ত আক্রমণ করতে ছাড়েনি। কিন্তু এর জবাবে নবীগণ লাঠি হাতে তাদের প্রতিরোধ করেননি। তাদের কথার পিঠে তাদের মতো করেই জবাবও দেননি। বরং নীরব রয়েছেন। কিন্তু আপনি একজন সত্যবাদী মানুষকে যখন মিথ্যাবাদী বলবেন তখন তার হৃদয় ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে যখন অপরাধী বলবেন তখন তার অন্তরটা টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। তাই যখন কোন সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী বলা হয় এবং কোন নিরপরাধীকে অপরাধী বলা হয় তখন সেটা সয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়। আর সয়ে যেতে পারেও খুব কম জনই। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা এর মূল্যও ঘোষণা করেছেন অবিশ্বাস্য। বলে দিয়েছেন, এখানে তুমি চুপ করে থেকো। এর বিনিময়ে তুমি আমার কাছ থেকে

গ্রহণ করো। এখানে তুমি হয়তো বা অপবাদের আঘাতে অশ্রু বিসর্জন দিবে, বেদনায় হয়তো তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হবে। কিন্তু তোমার সময় তো আর থেমে থাকবে না। দিন চলে যাবে, রাত কেটে যাবে। কিন্তু সামনে এমন দিন ও রাত অপেক্ষা করছে যার শুরু আছে শেষ নেই। সেদিন তুমি তোমার এই বেদনাহত হৃদয়ের পুরস্কার আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো।

যেদিন তুমি সত্যিকার অর্থেই ঠেকা হয়ে পড়বে সেদিন আমি পাই পাই করে তোমাকে তোমার সাধনার মূল্য পরিশোধ করবো। বরং আমি তোমাকে বে-হিসাব দিবো। আমি তোমাকে সেদিন তোমার মাপ মুতাবিক দেবো না, দেবো আমার শান মুতাবিক। আল্লাহর শান যেহেতু অসীম তাই তাঁর দানও হবে অসীম।

বেদনায় স্মরণ করো তাঁকে (সা.)

একজন নিরপরাধকে যখন অপরাধী বলা হয়, একজন সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে যখন ঘুষখোর বলা হয় তখন তার হৃদয় কতটা বেদনাহত হয়-সে কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এ থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন তাঁর কালের লোকেরা মিথ্যাবাদী বলেছিল তখন তাঁর হৃদয়ে কতটা আঘাত লেগেছিল। আমি যখন জজ সাহেবের রাগ ও ক্রোধ দেখছিলাম তখন আমার মনে পড়ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা। আমি ভাবছিলাম, একজন সাধারণ মুসলমান মিথ্যাবাদী ও ঘুষখোর হওয়ার অপবাদে এতটা আহত- তাহলে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল তখন তিনি কতটা আহত হয়েছিলেন? তাছাড়া তাঁকে তো সরাসরি আল্লাহ তাআলা সত্যবাদী বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। এই পৃথিবীতে তাঁর চাইতে বড় সত্যবাদী আর কে ছিল? এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

'তুমি যদি কখনও কোন বেদনার মুখোমুখি হও তাহলে আমার বেদনার কথা স্মরণ করো। তোমার সকল বেদনা হালকা হয়ে যাবে। আমার

কষ্টের কথা স্মরণ করো, তোমার সকল কষ্ট উড়ে যাবে।' সুতরাং আমাদের উচিত, আমাদের জীবনের প্রতিটি বেদনায় প্রতিটি ক্ষতের মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করা।

তাবলীগ জামাত হলো প্রতিনিধি মাত্র

তাবলীগ জামাতের সকল চেষ্টা সাধনার মূল লক্ষ্যই হলো আল্লাহ ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না তাই আমাদেরকে তাঁর পয়গাম বয়ে নিয়ে যেতে হবে অন্যদের কাছে। পুরুষরা বয়ে নিয়ে যাবে পুরুষদের কাছে। নারীরা বয়ে নিয়ে যাবে নারীদের কাছে। মনে রাখতে হবে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী– এ কারণেই তাঁর পয়গাম অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়ার এ দায়িত্ব আমরা পেয়েছি। এই দায়িত্ব আমাদেরকে তাবলীগ জামাত দেয়নি। যদি এটা তাবলীগ জামাতের দেয়া দায়িত্ব হতো তাহলে তা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর মুরীদ ব্যতীত আর কেউ পালন করতো না। এটা সত্য তিনি অনেক বড় পীর ছিলেন। সুতরাং তাঁর মুরীদের সংখ্যাও বেশি ছিল। তাঁর মুরীদগণ হয়তো প্রাণখুলে এ কাজ করতেন। কিন্তু পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে যারা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)কে দেখেনি, জানে না তারা এ কাজে অংশগ্রহণ করতো না। তারা তাবলীগের টানে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে কাজ কাম ছেড়ে স্ত্রী-সন্তানদেরকে ছেড়ে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতো না। মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ধাক্কা খেতো না।

তাবলীগের এই কাজ মূলত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেয়া উপহার। তিনি এ পয়গাম রেখে গেছেন। তাবলীগ জামাতের হৃদয়বান কর্মীগণ শুধুমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দ্বারে দ্বারে এই পয়গামকে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করছে। পিয়ন যেভাবে মানুষের ঘরে ঘরে চিঠি পৌঁছে দেয় তাবলীগ জামাতের কর্মীদের উপমাও অনুরূপ। সুতরাং তাদেরকে বিশেষ কোন মানদণ্ডে বিচার করার অবকাশ নেই। কারণ, তারা তো চিঠি পৌঁছে দেয়ার বাহক মাত্র। সুতরাং চিঠির

প্রাপক যেভাবে ডাক পিয়নের দিকে তাকিয়ে দেখে না, তার গায়ের কাপড় দামী না সস্তা, পরিচ্ছন্ন না অপরিচ্ছন্ন; বরং সে তার চিঠি বুঝে নিয়ে তাকে বিদায় করে দেয়। কোন প্রাপক এ কথা বলে ডাক পিয়নকে ফিরিয়ে দেয় না, তুমি কালো। তোমার কাপড় অপরিচ্ছন্ন। সুতরাং আমি তোমার হাত থেকে পার্সেল গ্রহণ করছি না। পিয়নের রঙ সাদা কি কালো সেটা দিয়ে আপনি কি করবেন? তার ড্রেস পরিচ্ছন্ন না অপরিচ্ছন্ন সেটা তো আপনার দেখার বিষয় নয়। আপনার দেখার বিষয় হলো তার দেয়া পার্সেলটি আপনার কি না। যদি আপনার হয়ে থাকে তাহলে দস্তখত করে বুঝে নিন। অনুরূপভাবে আমিও বলবো, আমি আপনাদের সামনে যে কথাগুলো বলছি সে কথাগুলো আপনাদের কথা কি না। যদি আপনাদের কথা হয়ে থাকে তাহলে কথাগুলো গ্রহণ করুন। আমি কালো কি সাদা, ছোট কি বড়, যোগ্য কি অযোগ্য এটা দেখার প্রয়োজন নেই। আমি যে পয়গাম আপনাদের সামনে পেশ করছি সে পয়গামটি যদি আপনাদের পয়গাম হয় তাহলে তা আপনারা গ্রহণ করবেন। আমি তো এই পয়গামের তুচ্ছ বাহক মাত্র।

এটা শয়তানের একটা ফাঁদ। শয়তান আমাদের পথে এভাবেই ফাঁদ পেতে রাখে। যখন কোন নারী বা পুরুষ কাউকে আল্লাহর পথে ডাকে, আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, স্মরণ করিয়ে দেয় আখেরাতের কথা তখন সে তাকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে বরং উল্টো বলে– তুমি নিজেই তো এ কথা মানছো না তাহলে আমাকে বলছো কেন? আমি বলি, যে আল্লাহকে স্মরণ করা আমার প্রয়োজন ছিল, যে পরকালকে তোয়াক্কা না করে আমার কোন উপায় নেই সে আল্লাহ ও পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে তো আমার উপকার করেছে। আমাকে আমার পথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সুতরাং সে আমার কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার হকদার। কারণ, সে আমার প্রতি কল্যাণকামিতার পরিচয় দিয়েছে। তাই আমি বলি, আমরা যখন কারও কাছ থেকে দীনের দাওয়াত পাবো তখন তাকে আমরা মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করবো না। কারণ, সে তো একজন মানুষ। মানুষ ভুল করে, ভালো করে, মন্দও করে। তবে হিসাবের কলম আল্লাহর হাতে। তার ভালো-মন্দ আল্লাহর দরবারে রীতিমত লিপিবদ্ধ হচ্ছে। আমরা দেখবো আমাদের সাথে সে

যে কথাগুলো বলছে সে কথাগুলো যথার্থ কি না। যদি যথার্থ ও যুক্তিগ্রাহ্য হয় তাহলে আমরা তার কথাগুলো গ্রহণ করবো, অন্যথায় নয়। এ ক্ষেত্রে হযরত আলী (রা.)-এর উপদেশটি সোনার হরফে লিখে রাখার মতো। তিনি বলেছেন–

خُذْ مَا صَفَا وَدَعْ مَا كَدَّرَ

> যা ভালো তা গ্রহণ করো। আর যা মন্দ তা উপেক্ষা করো।

তাই আমি বলবো, পৃথিবীব্যাপী এখন যারা দীনি দাওয়াতের পয়গাম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা দীনি দাওয়াতের বাহক মাত্র। মনে রাখতে হবে বাহক কখনও মানদণ্ড হয় না। আমাদের কাজ হলো বাহকের কাছ থেকে আমাদের পত্র বুঝে নেয়া। আমাদের পয়গাম বুঝে নেয়া। অতঃপর সে পয়গাম ও পত্রকে অনুসরণ করা। এটাই আমাদের কর্তব্য।

আমাদের মানদণ্ড

জীবন চলার পথে আমাদের মানদণ্ড হলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণ, তাঁর সম্মানিত পরিবারবর্গ রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। সাহাবায়ে কেরামের সম্মানিত জামাত আমাদের জীবন চলার পথে সত্য-মিথ্যার হক-বাতিলের চিরন্তন মানদণ্ড। তাঁরা নিষ্পাপ নন, তবে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবশ্যই। একবার এক ব্যক্তি এসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)কে বলতে লাগলো, এই উসমান (রা.) তো তিনিই যিনি উহুদের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বললেন, তাঁকে তো আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন তুমি যদি তাঁকে ক্ষমা না করো তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। যিনি হিসেব নিবেন তিনি তো পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন–

وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْكُمْ

আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে (যারা উহুদ যুদ্ধ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন) ক্ষমা করে দিয়েছেন।

সুতরাং এখন কার কি বলার আছে?

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

সাহাবায়ে কেরামের সুমহান মর্যাদা নিঃসন্দেহে প্রশ্নাতীত। তবে তাঁদের মধ্যেও শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন–

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا

তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে, যুদ্ধ করেছে। [হাদীদ : ১০]

সুতরাং মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ইসলামের সেবায় আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করেছেন, ইসলামের ঝাণ্ডা উঁচু করার জন্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন তাঁদের মর্যাদা আর পরবর্তীদের মর্যাদা সমান নয়। তবে এও সত্য, তাঁরা উভয় শ্রেণীই আল্লাহ তাআলার দরবারে মহান মর্যাদার অধিকারী। ইরশাদ হয়েছে–

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

তবে আল্লাহ তাআলা উভয় শ্রেণীকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। [হাদীদ : ১০]

উল্লিখিত আয়াতে 'হুসনা' বা কল্যাণের যে প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে সে প্রতিশ্রুতি ও কল্যাণের মর্ম কি– তা আমরা জানতে পারি অন্য আয়াত থেকে। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى أُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ o لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ o لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ o

তাদের জন্যে আমার নিকট থেকে পূর্ব হতেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে। তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে, তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং সেখায় তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে। মহাভীতি তাদেরকে বিষাদক্লিষ্ট করবে না এবং ফিরিশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে এই বলে– এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। [আম্বিয়া : ১০১–১০৩]

এই আয়াতে হুসনা বা কল্যাণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই যে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে এতটা দূরে রাখা হবে যে, তারা তার ক্ষীণতম আওয়াজও শুনতে পাবে না। তাদের জীবন হবে স্বাদে স্বপ্নে ভরপুর। সেখানে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে সম্মানিত ফিরিশতাগণ। তাছাড়া তাদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন যাদেরকে এই দুনিয়াতে থাকতেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেশতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– এই পৃথিবীতে কেউ যদি বেহেশতি হুর দেখতে চায় তাহলে সে যেন উম্মে রুমানকে দেখে। এই উম্মে রুমান কে? এই উম্মে রুমান হলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর মা এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর জীবনসঙ্গিনী। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাসী হযরত উম্মে আয়মান (রা.) সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেছেন– কেউ যদি কোন বেহেশতি নারীকে বিয়ে করতে চায় তাহলে সে যেন উম্মে আয়মানকে বিয়ে করে। এ হলো সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা। এই পৃথিবীতে বসেই যাঁরা বেহেশতের সুসংবাদ লাভ করেছেন। সুতরাং

জীবন চলার পথে তাঁরাই আমাদের আদর্শ। তাঁরাই আমাদের কাছে সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি। এর বাইরে আমরা যা কিছু বলছি তা থেকে যে কথাগুলো যথার্থ সেগুলো আপনারা গ্রহণ করবেন আর যেগুলো ভুল সেগুলো প্রত্যাখ্যান করবেন। কারণ, তাবলীগ জামাতের কর্মীরা মূলত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেখে যাওয়া পয়গামের বাহক মাত্র, আদর্শ নয়। তবে এতটুকু সত্য, তাদের মাধ্যমে আমরা পবিত্র ইসলামের পয়গামকে আমাদের ঘরে বসে পেয়েছি। এ কারণে পৃথিবীর দেশে দেশে এখন আমরা ইসলামের আলোকময় গতি ও উপস্থিতি লক্ষ্য করছি।

পাকিস্তানবাসীর জন্যে এটা গৌরবের বিষয়, তাবলীগের এই মুবারক কাজে দেশের বাইরে সর্বপ্রথম যিনি ইন্তেকাল করেছেন তিনি পাকিস্তানেরই সন্তান। তাঁর নাম মরহুম আল্লাহবখশ। পাকিস্তানের জন্যে আরও গর্বের বিষয় হলো, এই তাবলীগের সুবাদে বিদেশে গিয়ে প্রথম নারী যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিও এই পাকিস্তানের সন্তান। ভাওলপুরের মাওলানা আশরাফ সাহেবের স্ত্রী যিনি উর্দূনে জামাতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর বিশাল বড় জানাযা হয়েছিল। সেখানকার নিয়ম হলো, যে কেউ মারা গেলে তার পোস্টমর্টেম করা হয়। কিন্তু আল্লাহর পথের এই সম্মানিত যাত্রীর প্রতি সে দেশ এতটুকু সম্মান দেখিয়েছিল যে, তারা তাঁর পোস্টমর্টেম করেনি। উর্দূনের তাবলীগি মারকায মাদীনাতুল হুজ্জায-এর কাছেই অবস্থিত কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সন্দেহ নেই, তাবলীগ জামাতের সম্মানিত ভাই ও বোনেরা যদি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামের খাতিরে এই ত্যাগ স্বীকার না করতেন, এ পথে যদি তাঁরা জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে না দিতেন তাহলে আজ পৃথিবীব্যাপী আমরা দীনের এই সোনালী ফসল দেখতে পেতাম না। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর পয়গামকে পৃথিবীর সর্বত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদেরকে কবুল করুন এবং এ পথের সকল সাধক ভাই ও বোনদেরকে আল্লাহ তাআলা রহম করুন। আমীন। ✿

বয়ান : ১০

সম্পদ ও নেক আমলের হাকীকত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ۔ وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا سُفْيَانَ : وَاللّٰهِ لَتَمُوْتُنَّ ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَيَدْخُلَنَّ مُحْسِنُكُمُ الْجَنَّةَ وَمُسِيْئُكُمُ النَّارَ...اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

এমন একটা কাল ছিল যখন এই বিশ্ব চরাচরে কিছুই ছিল না।

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

তখন আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপর। [হূদ : ৭]

আল্লাহ তাআলার মহান সত্তা আদি অন্ত থেকে পাক। তখন তিনি একা ছিলেন, অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর প্রতিষ্ঠিত। তারপর তিনি এ বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে। আমরা অস্তিত্ব লাভ করেছি।

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا،

কাল প্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। [দাহর : ১]

অর্থাৎ এক সময় আমরা ছিলাম অস্তিত্বহীন। আকাশে কিংবা পৃথিবীতে কোথাও আমাদের অস্তিত্ব ছিল না। সে ছিল এক কাল। তারপর এলো আরেক কাল।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। [আ'রাফ : ৫৪]

الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। [প্রাগুক্ত]

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। [প্রাগুক্ত]

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا

তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে তারা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। [প্রাগুক্ত]

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ بِاَمْرِهٖ

সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। [প্রাগুক্ত]

তারপর এলো কালের তৃতীয় ধাপ। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করলেন ফিরিশতাগণকে।

جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِىٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ-

যিনি বাণী বাহক করেন ফিরিশতাদেরকে যারা দুই দুই তিন তিন অথবা চার চার ডানা বিশিষ্ট। [ফাতির : ১]

তারপর এলো কালপ্রবাহের চতুর্থ ধাপ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো। [বাকারা : ৩০]

তারপর এলো কালপ্রবাহের পঞ্চম ধাপ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্র বিন্দু থেকে। তাকে পরীক্ষা করার জন্যে, এ জন্যে আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। [দাহর : ২]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ভাষায় আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন– আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা করার জন্য। সুতরাং এই পৃথিবীতে আমরা আমাদের ইচ্ছায় আসিনি। বরং এই নারী-পুরুষ সকলকেই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর এই পাঠানোর লক্ষ্য হলো আমাদেরকে পরীক্ষা করা। তাছাড়া এই যে আমরা নারী-পুরুষে বিভক্ত হয়েছি, এই বিভক্ত হওয়াটাও আমাদের ইচ্ছায় নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। [হুজুরাত : ১৩]

তিনি আমাদের কাউকে পুরুষ বানিয়েছেন কাউকে বানিয়েছেন নারী। অতঃপর আমরা বিভিন্ন খান্দানে বিভক্ত হয়েছি। বিভক্ত হয়েছি বিভিন্ন শ্রেণীতে। এখন কেউ পাঠান, কেউ রাজপুত্র, কেউ শায়খ, কেউ মুরীদ, কেউ আফগানী, কেউ ইরানী, কেউ তুরানী। এও আল্লাহরই সৃষ্টি। তিনি ইরশাদ করেছেন—

وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ

পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। [হুজুরাত : ১৩]

সুতরাং এই যে আমরা বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হয়েছি এটাও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়ই হয়েছে। তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন খান্দানে ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন। তাছাড়া আমরা যে বিভিন্ন রঙ ও আকৃতিতে বিভক্ত হয়েছি সেও আল্লাহ তাআলারই ইচ্ছায়। ইরশাদ হয়েছে—

هُوَ الَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ

তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। [আলে-ইমরান : ৬]

জীবন-মরণ আল্লাহরই হাতে

আমাদের সামনে এ এক এমন উদ্ভাসিত সত্য যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আমরা তাঁরই ইচ্ছায় এই পৃথিবীতে এসেছি। তাছাড়া আসার পর আমাদেরকে এই পৃথিবী থেকে আবার চলেও যেতে হবে। এই দুটি ক্ষেত্রে আমরা পরিপূর্ণরূপেই তাঁর অধীন। বরং শতভাগ অসহায়।

আমরা আমাদের মর্জিমত সৃষ্টি হইনি।
আমরা আমাদের ইচ্ছায় নারী-পুরুষে বিভক্ত হইনি।
আমরা আমাদের পছন্দ মতো আকার ও রূপ লাভ করিনি।
অনুরূপভাবে আমরা আমাদের ইচ্ছামত মরণও বরণ করতে পারবো না।

তিনি ইরশাদ করেছেন–

قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ

বলো, তোমাদের জন্যে আছে এক নির্ধারিত দিন যা তোমরা মুহূর্তকাল দেরি করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। [সাবা : ৩০]

সুতরাং এখানে আসার ক্ষেত্রে যেমন আমরা অসহায় যাওয়ার ক্ষেত্রেও তেমনি অসহায়। পৃথিবীর কোন শক্তি কোন মানুষের যাওয়াকে এক মুহূর্ত আগ-পর করতে পারে না। এ এক অবিসংবাদিত বিধান।

وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيْمَةٍ لَا تَنْفَعُ

মৃত্যু যখন তার পাঞ্জা বসিয়ে দিবে তখন দেখবে তোমার সকল কৌশলই অর্থহীন।

ভাববার বিষয় হলো, আগমন ও প্রস্থান উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন অসহায়। মাঝখানের সামান্য সময়ের জন্য আমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এখানে যদি আমাদেরকে হাত-পা বেঁধে দেয়া হতো তাহলে পৃথিবীর কোন নারী ও পুরুষ আল্লাহর অবাধ্য হতে পারতো না। হতে পারতো না কাফের বেঈমান।

হেদায়েতের মালিক আল্লাহ

হেদায়েতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি ইরশাদ করেছেন–

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰهَا

আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম। [সিজদা : ১৩]

আল্লাহ তাআলা যখন এই বিশাল জগতকে অনন্তকাল ধরে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন কঠোর হাতে তখন কি তিনি চাইলে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না? আমাদের শক্তিই বা কতটুকু? আমাদের অস্তিত্ব তো মাত্র পাঁচ ছয় ফুট দীর্ঘ।

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَآءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনি এটা নির্মাণ করেছেন, তিনি এই আকাশের ছাদকে সুউচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। আর তিনি এর রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন তার সূর্যালোক এবং পৃথিবীকে তারপর বিস্তৃত করেছেন। তিনি পৃথিবী থেকে বের করেছেন তার পানি ও তৃণ এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। এ সবকিছু করেছেন তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের ভোগের জন্য। [নাযিআত : ২৭-৩৩]

এই সুবিশাল আকাশ বিস্তীর্ণ জমিন চন্দ্র সূর্য এই সবকিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন ও পরিচালনা করছেন তাঁর পক্ষে পৃথিবীর সকল মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা কি মোটেও কোন কঠিন বিষয় ছিল? তিনি একটি মাত্র নির্দেশ দিলেই তো সকল মানুষ হেদায়েত লাভে ধন্য হতো। তাঁর শক্তি তো এমন–

يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلَا

তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। [ফাতির : ৪১]

اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا

(হে আকাশ ও পৃথিবী!) তোমরা উভয়ে অনুগত হও, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। [হা-মীম সিজদা : ১১]

আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ও পৃথিবী সাড়া দিয়েছে এইভাবে–

اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ

আমরা অনুগত হয়ে আসলাম। [প্রাগুক্ত : ১১]

শুধু আকাশ ও পৃথিবীই নয় বিশ্ব জাহানের সবকিছুই তাঁর অনুগত। পৃথিবীর সকল সৃষ্টি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। সূর্য এই পৃথিবী থেকে বার লক্ষগুণ বড়। সূর্য যদি আমাদের মতো অবাধ্য হতো বলতো, হে আল্লাহ! আজ আমি উদিত হবো না। তুমি মানুষকে বলে দাও তারা যেন তাদের ব্যবস্থা করে। আজ আমাকে ছুটি দাও। চাঁদ যদি বলতো, হে আল্লাহ! রাতের বেলা উদিত হওয়া আমার কাজ। কিন্তু কাল থেকে আমি দিনের বেলা উদিত হতে চাই। সূর্যকে বলে দাও সে যেন রাতের বেলা উদিত হয়। কিন্তু এই বিশ্ব জাহানের কোথাও এমনটি ঘটেনি, ঘটনার অবকাশ নেই। কারণ, সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণের অধীনে।

আল্লাহর কাছে এই বিশ্ব জাহান মশার ডানাসম

আল্লাহর এই জগত কত যে বিশাল! কথিত আছে, এই বিশ্ব জাহানের সাতানব্বই ভাগ অংশে কোন আলো পড়ে না। এই অন্ধকার জগতকে বলা হয় 'ব্ল্যাক হোল' (Black hole)। সেখানকার প্রতিটি ধাতুর ওজন এত বেশি, যদি আমাদের এই সৌরজগতের যেখানে সূর্য রয়েছে, চাঁদ রয়েছে, রয়েছে আরও নানা গ্রহ-উপগ্রহ যার ব্যাপ্তি সাড়ে সাতশ' কোটি মাইল– যদি এই সাড়ে সাতশ' কোটি মাইলকে এক পাল্লায় রাখা হয় আর অন্য পাল্লায় রাখা হয় ব্ল্যাক হোলের এক চামচ ধাতু তাহলে এই এক চামচ ধাতুর ওজন বেশি হবে। অতঃপর ব্ল্যাক হোলের বাইরে অবশিষ্ট তিন শতাংশের প্রতি শতাংশে রয়েছে এক হাজার কোটি

গ্যালাক্সি। অতঃপর প্রতিটি গ্যালাক্সিতে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র। এ পর্যন্ত আবিস্কৃত পৃথিবী থেকে সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থানরত যে নক্ষত্রটি রয়েছে তার আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে সময় লাগে চৌদ্দশত কোটি বছর। আর আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

তারপর এক মিনিট

তারপর এক ঘণ্টা

তারপর একদিন

তারপর এক সপ্তাহ

তারপর এক বছর

অতঃপর একশ' বছর

অতঃপর হাজার বছর

অতঃপর লক্ষ বছর

অতঃপর কোটি বছর

অতঃপর একশ' কোটি বছর

অতঃপর চৌদ্দশ' কোটি বছর।

আলো যদি তার নিজ গতিতে চৌদ্দশ' কোটি বছর সফর করে তখন গিয়ে তার আলো এই পৃথিবীকে প্রথমবারের মতো স্পর্শ করে। সুতরাং এই পৃথিবীবাসী সর্বপ্রথম যে আলোর ফটো গ্রহণ করেছে সে আলোটা হলো চৌদ্দশ' কোটি বছরের পুরাতন আলো। এ হলো আল্লাহর জগত। আর এই বিশাল জগত আল্লাহ তাআলার কাছে মশার একটি ডানার সমান।

এই পৃথিবী পরীক্ষা কেন্দ্র

এই বিশাল জগতকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং সেখানে এক চুল হেরফের হচ্ছে না। সুতরাং তিনি যদি আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন,

সোজা হয়ে যাও তাহলে তাঁর অবাধ্য হওয়ার শক্তি ছিল কার? কিন্তু তিনি আমাদের সাথে তা করেননি। করেননি কারণ–

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? [মূলক : ২]

অর্থাৎ আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কে আমার হুকুম মেনে চলে আর কে নিজের মনের অনুসরণ করে। কে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট হয় আর কে নিজের নফস ও রিপুকে সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট হয়।

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন। তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? [প্রাগুক্ত]

সুতরাং এই জগতে আমরা স্বাধীন নই। আমাদেরকে অর্থহীন সৃষ্টি করা হয়নি এবং লাগামহীন ছেড়ে দেয়া হয়নি।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا

তোমরা কি মনে করেছো আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? [মু'মিনূন : ১১৫]

না, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অর্থহীন সৃষ্টি করেননি, লাগামহীন ছেড়ে দেননি। আমরা পরিপূর্ণভাবে মুক্তও নই।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্যে তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে। [ক্বাফ : ১৮]

بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ

আমার ফিরিশতাগণ তো তাদের কাছে থেকে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে। [যুখরুফ : ৮০]

আমরা এতটা অধীন ফিরিশতাগণ আমাদের প্রতিটি উচ্চারণ লিখে রাখছে, লিখে রাখছে আমাদের প্রতিটি কর্মের বিবরণ।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

> চোখের অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে তাও তিনি অবহিত। [মু'মিনূন : ১৯]

সুতরাং তাঁকে ফাঁকি দেয়ার তো কোন উপায় নেই। তিনি আরও পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন−

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

> আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে কোনকিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। [দুখান : ৩৮]

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا

> আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তাহলে আমি আমার কাছে যা আছে তা নিয়েই তা করতাম। [আম্বিয়া : ১৭]

অর্থাৎ খেলাধুলাই যদি আমার উদ্দেশ্য হতো, তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পেছনে আমার বিশেষ কোন লক্ষ্য না থাকতো তাহলে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টিই করতাম না।

পৃথিবী স্বপ্নজগত

এই পৃথিবীতে আমরা স্বউদ্যোগে আসিনি। এখান থেকে যাওয়াটাও আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। তাছাড়া এই পৃথিবী থেকে আমরা যে মৃত্যুবরণ করবো আমাদের মরণটাও তো মরণ নয়। মরে যাওয়াটাই যদি শেষ কথা হতো তাহলে এই পৃথিবীতে সুন্দর করে থাকতাম কিংবা ঝুপড়িতে সেটাও দেখার বিষয় ছিল না। মরে গেলাম তো শেষ। কিন্তু বিষয়টা তো সম্পূর্ণ এর বিপরীত। মরণ মানেই নতুন জীবন। মরণের ভেতর দিয়ে আমরা নতুন একটি জীবনে প্রবেশ করি।

হযরত আলী (রা.) কত চমৎকার বলেছেন– তিনি জগতের মানুষ সম্পর্কে বলেছেন–

اَلنَّاسُ نِيَامٌ

সকল মানুষ ঘুমিয়ে আছে।

اِذَا مَاتُوْا اِنْتَبَهُوْا

যখন মৃত্যু আসবে তখন সকলেই জেগে ওঠবে।

আসলে এই পৃথিবীটা হলো একটা স্বপ্নজগত। এখানে মানুষ বসে বসে স্বপ্ন দেখছে– সে একটি সুন্দর ঘরে বসে আছে। কেউ বা স্বপ্ন দেখছে, সে একটি ঝুঁপড়িতে বসে আছে। কেউ বা স্বপ্ন দেখছে, সে হাল চালাচ্ছে। কেউ বা স্বপ্ন দেখছে সে গাড়ি চালাচ্ছে। অতঃপর যখন মৃত্যু আসে কবরের মাটি এসে সকলকে একাকার করে দেয়। এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়। এখানে যে সুন্দর ঘরে বসবাস করতো তার কবরে টাইলস লাগানো হয় না। আবার যে ঝুঁপড়িতে বসবাস করতো তার কবরও হয় সাদাসিধে মাটির। দুইয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই।

যখন কাতারে গিয়েছিলাম তখন ফেরার পথে বিমানবন্দরের কাছেই সুরম্য একটি মহল দেখেছি। যে মহলের অধিপতি ছিল কাতারের সবচে' বড় ব্যবসায়ী। শুনতে পেলাম তাকে যেখানে কবর দেয়া হয়েছে তার পাশেই কবরস্থ করা হয়েছে এমন এক দরিদ্রকে যে শহরে ভিক্ষা করে ফিরতো। কবর সত্যিই বড় অদ্ভুত। এখানে এলে উঁচু-নিচু সব ভেদাভেদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

যে কথা বলছিলাম, মরণ যদি মরণ হতো তাহলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু মরণ তো মরণ নয়। মরণ হলো নবজীবনের সূচনা।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য। [ফাতির : ৫]

কিন্তু কী সেই অঙ্গীকার? তাঁর অঙ্গীকার হলো–

مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى

আমি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবো এবং মাটি থেকেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করবো। [ত্বহা : ৫৫]

قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ

বলো, নিশ্চয়ই হবে। আমার প্রতিপালকের শপথ। তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। [তাগাবুন : ৭]

কিয়ামতের সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পাক কুরআনে তিনবার কসম করেছেন। কসম করে বলেছেন, অবশ্যই তিনি মানব জাতিকে পুনরুত্থিত করবেন।

قُلْ اِىْ وَرَبِّىْ اِنَّهٗ لَحَقٌّ

বলো, হ্যাঁ। আমার প্রতিপালকের কসম! কিয়ামত অবশ্যই সত্য। [ইউনুস : ৫৩]

আর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَشْهَدُ اَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। বেহেশত সত্য, দোযখ সত্য, কিয়ামত আসবেই। তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর তুমি কবরবাসীকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করবে।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন–

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ، اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ

বলো, অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। [ওয়াকিয়া : ৪৯-৫০]

আরও ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا

নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে বিচার দিবস। [নাবা : ১৭]

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ

নিশ্চয়ই সকলের জন্যে নির্ধারিত আছে তাদের বিচার দিবস। [দুখান : ৪০]

অর্থাৎ নারী হোক আর পুরুষ, ধনী হোক আর গরীব, আমীর হোক আর ফকীর– সকলকেই আল্লাহর দরবারে উঠে দাঁড়াতে হবে। এটা সত্যিই একটা বড় বিষয়। দুনিয়াতে আসা যেমন একটা বড় বিষয়, মরণ যেমন একটা বড় বিষয়, অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হওয়াটা তার চেয়েও অনেক বড় বিষয়। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ নেই।

সারা পৃথিবীকে জয় করেছিল চেঙ্গিস খান। এই পৃথিবীর সবচে' বড় বিজয়ী ছিল চেঙ্গিস খান। দ্বিতীয় বিজয়ী সুলতান মাহমুদ গজনবী। তারপর তৈমুর লং, তারপর বাদশাহ সেকান্দার। চেঙ্গিস খান যুদ্ধে যুদ্ধে যখন জীবনের সত্তরটি বছর পার করে দেয় তখন তার মনে স্বপ্ন জাগে রাজত্ব করার। তারপর সে তার দেশের সকল চিকিৎসককে ডেকে বলে, আমার জীবনটা বাড়াবার কোন পথ আছে কি না বলো। তখন তারা সকলে মিলে বিনয়ের সাথে জানিয়ে দেয়, আপনার নির্ধারিত বয়স থেকে এক পলক আয়ু বাড়াবার কোন পথও আমাদের জানা নেই। তবে আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন কিভাবে সুস্থ থাকতে পারেন সে বিষয়ে আমরা আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। অতঃপর সে এ পৃথিবীতে

মাত্র চার বছর বেঁচেছিল। যে চেঙ্গিস খান লক্ষ মানুষের মস্তক শরীর থেকে আলাদা করেছে তাকে আল্লাহ তাআলা চার বছরের বেশি শাসকের কুরসীতে বসার অবকাশ দেননি। সুতরাং মৃত্যু সত্যিই এক ভয়ানক বিষয়।

বিশাল সুরম্য প্রাসাদের অধিপতিকে যেমন মরতে হয় তেমনি মরতে হয় নিঃস্ব রিক্ত ঝুঁপড়ির অধিবাসীকেও।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। [আলে-ইমরান : ১৮৫]

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। [নিসা : ৭৮]

সুতরাং মৃত্যু হেসে উড়িয়ে দেয়ার মতো কোন বিষয় নয়। আনন্দে আহ্লাদে নদীর পানির মতো তরতরিয়ে বয়ে চলা এক সুন্দর সচ্ছল জীবনকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে দেয়, সঁপে দেয় মাটির ক্ষুদ্র গর্তে। অতঃপর শত যত্নে লালিত এই চুল, এই চোখ, এই দেহ খোরাকে পরিণত হয় পোকা-মাকড়ের।

আমরা দিবানিশি কী নিয়ে ব্যস্ত থাকি? আমরা ব্যস্ত থাকি আমাদের বাচ্চাদের পড়াশোনা, ঘরের খানাপিনা, বস্ত্র, অলংকার ও অন্যান্য শখ-সামগ্রীতে। আমাদের সকল মেধা ও শক্তি আমরা উদারচিত্তে এ সব কিছুর পেছনেই তো ব্যয় করছি। অথচ যেখানে আমরা আমাদের সকল শক্তি ও সামর্থ ব্যয় করছি সে জগতটা তো মোটেও কঠিন ছিল না। এখানে আমার পাশেই আমার বাবা আছেন। মা আছেন। আমার পাশেই রয়েছে আমার স্ত্রী আমার সন্তান। কিন্তু আমার মেধা ও আমার সামর্থ সেই সময়ের জন্যে আমি খরচ করতে পারি না যখন আমার পাশে কেউ

থাকবে না। যখন আমাকে কেউ একবিন্দু উপকার করতে পারবে না। আমার ব্যবা আমার মা আমার স্ত্রী আমার সন্তান সকলে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকবে, কিন্তু কেউ আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। চিকিৎসক আমার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে বলবে, এখন আমাদের আর কিছু করার নেই। এখন যা কিছু করার আল্লাহই করবেন। শ্বাস দ্রুত ওঠানামা করবে। দৃশ্যমান সবকিছু দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে। চোখের সামনে ভেসে ওঠবে সকল অদৃশ্য। তখন আমি ফিরিশতা দেখতে থাকবো। কিন্তু দেখতে পাবো না আমার ঘর। এই সময়টাই হলো আমার জীবনে সবচে' কঠিন সময়। তখন আমাকে আমার সম্পদ, আমার আপনজন কেউ সাহায্য করতে পারবে না। আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্পদ, সন্তান ও আমলকে তিন ভাইয়ের সাথে তুলনা করে বলেছেন– একমাত্র আমলই তখন আমাকে সাহায্য করবে। আমার সঙ্গ দেবে। এ ক্ষেত্রে আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরয (রা.)-এর দীর্ঘ কবিতা শুনেছি।

খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ'র মৃত্যু ও শিক্ষণীয় ঘটনা

ওয়াসেক বিল্লাহ। এক বিখ্যাত জালিম বাদশাহ। তার চোখে চোখ রেখে কেউ কথা বলতে সাহস করতো না। তার চোখ থেকে প্রতাপ ঝরে পড়তো। তাকে যখন মৃত্যু এসে ঝাপটা দিয়ে ধরে তখন সঙ্গে সঙ্গে আকাশে দুই হাত তুলে মিনতি জানায়–

يَامَنْ لَا يَزَالُ مُلْكُهُ، اِرْحَمْ مَنْ زَالَ مُلْكُهُ

হে অবিনশ্বর রাজত্বের অধিপতি! সেই অসহায়ের প্রতি
করুণা কর যার রাজত্ব হারিয়ে গেছে।

কত প্রতাপ-তেজী শাসক। যার চোখে চোখ রেখে সমকালীন কোন শক্তি কথা বলার হিম্মত করেনি। অথচ মৃত্যুর পর যখন তার শরীর ঢেকে দেয়া হলো সাদা কাপড়ে। হঠাৎ করেই চাদরের নিচে নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল। উপস্থিত সকলেই তাজ্জব! কি নড়ছে চাদরের নিচে? যখন চাদর

সরানো হলো দেখা গেল, নাদুস-নুদুস একটি ইঁদুর। সে ওয়াসেক বিল্লাহর টগবগে চোখ দুটি খেয়ে ফেলেছে। সকলেই বিস্মিত। এই আব্বাসী রাজমহলে ইঁদুর প্রবেশ করলো কিভাবে? যে রাজমহল আটত্রিশ হাজার পর্দায় আবৃত। যে রাজমহল স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া পর্দা বেষ্টিত। যে রাজমহলে হীরে-মোতি এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হতো যেভাবে আঙ্গুর বাগানে আঙ্গুরের থোকা ঝুলে থাকে। আব্বাসী রাজমহলে তো পিঁপড়ে প্রবেশ করাও মুশকিল। কিন্তু সেখানে ইঁদুর প্রবেশ করলো কিভাবে? তাও আবার বাদশাহ ওয়াসেক বিল্লাহর শয়নকক্ষে। মূলত এই ইঁদুর পাঠিয়েছেন আল্লাহ। পাঠিয়েছেন জগতবাসীকে এ কথা জানিয়ে দেয়ার জন্যে, হে পৃথিবীবাসী! তোমরা দেখে নাও, যে চোখ থেকে প্রতাপ ঝরে পড়তো, তোমরা দেখ সে চোখকেই সর্বপ্রথম সোপর্দ করা হলো একটি ইঁদুরের হাতে। এ থেকেই বুঝে নাও, কবরে তার সাথে কী আচরণ করা হবে? কবরে সে কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে।

এই পৃথিবী থেকে কেউ বিদায় নিতে চায় না। মরতে চায় না কেউই। তবে মৃত্যু সকলকেই শিকার করে। মৃত্যু ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। এ পৃথিবীর প্রেমে পড়ে কেউ এখান থেকে চলে যেতে চায় না। যেভাবে প্রথমে কেউ এখানে আসতে চায়নি। এটা আমাদের সকলেরই অবস্থা। একদা আসতে চায়নি। আর এখন যেতে চায় না। চারদিক থেকে কান্না এসে চেপে ধরে। হৃদয়কে কম্পিত করে আকৃষ্ট করে। যেতে দিতে চায় না।

আত্মীয়-স্বজনের স্বরূপ

মানুষের প্রথম ভাই সম্পদ তো স্পষ্ট বলে দিয়েছে– আমি তোমার বড় বন্ধু ছিলাম। কিন্তু এই মরণ মুহূর্তে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো না। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। কারণ, তোমার যখন মৃত্যু হবে তখন তো তোমার কাফন-দাফনের পূর্বেই আমাকে নিয়ে লড়াই বেঁধে যাবে। সুতরাং তুমি যদি আমার দ্বারা উপকৃত হতে চাও তাহলে আমার প্রতি কোনরূপ করুণা না করে সময় থাকতে আমাকে খরচ করে যাও। মৃত্যু আসার পূর্বে কোন

নেক কাজে আমাকে ব্যয় করে আমাকে তোমার কবরে পাঠিয়ে দাও। এ তো হলো সম্পদের স্বরূপ। দ্বিতীয় ভাই আত্মীয়-স্বজন বলবে, আমরা তোমার প্রথম ভাইয়ের মতো অতটা নিচ নই। আমরা তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে তোমার খোঁজ-খবর নিবো। তোমার জন্যে ভালো চিকিৎসক খুঁজে আনবো। তোমার চিকিৎসা ও আরামের সকল আয়োজন আমরা করবো। তবে মৃত্যুযন্ত্রণার সাথে তো আর লড়াই করা যায় না। হ্যাঁ, তোমার মৃত্যুর পর আমরা তোমার জন্যে বুক চাপড়ে বিলাপ করবো। তোমার মৃত্যুতে যারা সমবেদনা জ্ঞাপন করতে আসবে তাদের সামনে আমরা তোমার প্রশংসা করবো। আমরা তোমার কফিন কাঁধে করে তোমাকে কবরস্থানে নিয়ে যাব। অতঃপর তোমাকে তোমার কবরে শুইয়ে দিয়ে তোমার উপর মাটি বিছিয়ে দিব। তারপর আমরা চলে আসবো আমাদের জায়গায়। কারণ, তোমার জীবন তো এখানেই শেষ। আমার জীবন তো এখনও বাকি। আমাকে ফিরে আসতে হবে আমার জীবনে। আমাকে আমার জীবনের দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। অতঃপর তুমি হয়ে যাবে এক বিস্মৃত ইতিহাস। ভুল হরফ যেভাবে মুছে ফেলা হয় আমাদের জীবন থেকে তেমনি মুছে যাবে তোমার নাম। এমন একটা সময়ও আসবে যখন আমরা হয়তো মনেও করতে পারবো না, তুমি একদা আমাদেরই সঙ্গে ছিলে।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভাই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) যখন মারা যান তখন তিনি তাঁর বিয়োগ ব্যথায় একটি কবিতা আবৃত্তি করেন–

كُنَّا كَنَدْمَانَيْ جُزَيْمَةَ حِقْبَةً

مِّنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَى

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكٌ

لِطُولِ اِجْتِمَاعٍ لَمْ اَبِتْ لَيْلَةً مَعًا

প্রাচীন ইতিহাসে এক বাদশাহ ছিল। তার নাম ছিল জাযীমা। জাযীমার দুই জন মন্ত্রী ছিল। ত্রিশ চল্লিশ বছর তারা এক সাথে এমনভাবে

কাটিয়েছে যেন তারা কোন দিন আর বিচ্ছিন্ন হবে না। তাদের একজন যখন মারা যায় দ্বিতীয়জন তখন এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিল। এই কবিতা আবৃত্তি করে হযরত আয়েশা (রা.) এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন, আমি আর আবদুর রহমান ছিলাম জাযীমার দুই মন্ত্রীর মতোই। যেন আমরা কোনদিন আলাদা হবো না। কিন্তু আজ যখন আমি ও আবদুর রহমান আলাদা হলাম তখন মনে হচ্ছে যেন আমরা কোনদিন এক সাথে বসিওনি।

যে বাবা সারা রাত জেগে সন্তানের পাহারাদারী করে, যে বাবা নিজের সকল শখ-স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়ে দিন রাত একাকার করে সন্তানের স্বপ্ন পূরণ করে, সন্তানের মুখে হাসি ফুটায় এই সন্তান তাদের বাবাকে একদা এমনভাবে ভুলে যায় যেন তারা জানেও না তাদের একজন বাবা ছিল।

আমলের হাকীকত

তৃতীয় ভাই আমল। সে বলে, আমি তোমার অন্য দুই ভাইয়ের মতো নই। তোমার সম্পদ তো মৃত্যুর সাথে সাথেই তোমার সঙ্গ ছেড়ে দেয়। তোমার আত্মীয়-স্বজন তোমাকে তোমার কবর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই বিদায় গ্রহণ করে। কিন্তু আমি তাদের মতো নই। বরং আমি তোমার সঙ্গে আছি। তখন থেকেই যখন থেকে তোমার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হবে এবং আমি মৃত্যুযন্ত্রণায় তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। আমি নিয়মিত তোমাকে সঙ্গ দিব।

একবার হযরত ঈসা (আ.) একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কবরটি ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র সাম-এর। হযরত নূহ (আ.)-এর কালে ঐতিহাসিক যে প্লাবন হয়েছিল তাতে সমকালীন পৃথিবীর সকল মানুষ মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর হযরত নূহ (আ.)-এর তিন পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফিস থেকে মানব প্রজন্মের পুনর্যাত্রা শুরু হয়। আমরা হযরত সামের সন্তান। ইউরোপের অধিবাসীরা ইয়াফিসের সন্তান। আর বিশাল আফ্রিকাব্যাপী ছড়িয়ে আছে হযরত হাম-এর সন্তানরা। হযরত ঈসা (আ.) যখন কবরটি দেখিয়ে বললেন, এটা সাম-এর কবর তখন

সফরসঙ্গীগণ আবদার করলো, হে আল্লাহর নবী! তাকে জীবিত করুন। হযরত ঈসা (আ.) নির্দেশ দিলেন। সাম সঙ্গে সঙ্গে জীবিত হয়ে কবর থেকে বের হয়ে আসলো। তার সাথে সামান্য কথাবার্তা হলো। অতঃপর যখন ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন তখন সাম বললো, ফিরে যেতে পারি এই শর্তে যে, আমাকে পুনরায় মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করতে হবে না। কারণ, প্রথমবারের মৃত্যু বেদনা এখনও হাড়ের মধ্যে অবস্থান করছে।

সুতরাং মৃত্যু খুবই নির্মম ও ভয়ানক একটি সত্য। পৃথিবীর সকল নারী-পুরুষকেই এর মুখোমুখি হতে হবে। এ পথে মানুষের একমাত্র সম্বল আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর বন্দেগী। মৃত্যুর পর প্রতিটি মানুষ কবরে শায়িত হবে। কবর থেকেই সে পুনরুত্থিত হবে। সুতরাং আমাদের উচিত, কবর সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কবরের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কবর প্রতিনিয়ত মানুষকে ডেকে ডেকে বলে–

আমি পোকা-মাকড়ের ঘর।

আমি ভয়-ভীতির ঘর।

আমি একাকীত্বের ঘর।

আমি অন্ধকারের ঘর।

সুতরাং আমার জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে এসো।

আমল বলে– আমি তোমার এমন বন্ধু নই যে, তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো। বরং আমি তোমাকে কবরে অভ্যর্থনা জানাবো। মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের সময় আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াবো। আমি তোমাকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবো। মুনকার-নাকীরকে তোমার কাছে ভিড়তে দিবো না।

মুনকার-নাকীরের আগমনও এক ভয়ঙ্কর বিষয়। মাটি ভেদ করে সোজা কবরে এসে হাজির হবে। চোখ থেকে অগ্নিস্ফুলিংগ বেরোতে থাকবে। হাতে এত ভারী একটি গর্জু থাকবে যা পৃথিবীর সকলে মিলেও উঠাতে পারবে না।

কবর ও কুরআন শরীফ

হাদীস শরীফে আছে, যখন হাফেযে কুরআনকে কবরে রাখা হয় তখন যদি সে দুনিয়াতে কুরআনে কারীম মুতাবেক আমল করে থাকে তাহলে কুরআন শরীফ এক সুন্দর যুবকের আকৃতিতে কবরে এসে উপস্থিত হবে। তার ও মুনকার-নাকীরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাবে। মুনকার-নাকীরকে হাফেযে কুরআনের দিকে অগ্রসর হতে বাধা দিবে। হাফেযে কুরআন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে! সে বলবে, ভয় পেয়ো না। আমি তোমার কুরআন। যে কুরআন তুমি তোমার বুকে ধারণ করেছিলে।

এখানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট অর্থহীন।

ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট এখানে অচল।

ব্যবসায়িক পরিচয় এখানে অচল।

এখানে এসে জমিদারীও শেষ।

কিন্তু আল্লাহর কালাম এখানে এসেও হাফেযে কুরআনকে সঙ্গ দিবে, উপকার করবে।

মুনকার-নাকীর তখন জিজ্ঞেস করবে, তোমাকে কে পাঠিয়েছে? আমাদেরকে সুযোগ দাও, আমরা একে জিজ্ঞাসাবাদ করবো।

কুরআন বলবে, তোমাদেরকে যিনি পাঠিয়েছেন আমাকেও তিনিই পাঠিয়েছেন। এ কখনও রাত জেগে আমাকে তিলাওয়াত করতো, কখনও বা দিনে। আজ আমি এর পক্ষ হয়ে তোমার প্রশ্নের জবাব দিবো।

আমাদের অন্তর

আমাদের অন্তর এখন পাথর হয়ে পড়েছে। আল্লাহর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে। আমাদের সম্পর্ক কেবলই আমাদের সাথে। আমাদের ভালোবাসা আমাদের কামনা-বাসনার প্রতি। আমরা পূজা করি কেবলই আমাদের।

আজ আল্লাহ আমাদের মাহবুব নন।

আজ আল্লাহ আমাদের মাবূদ নন।

আমরা এখন আল্লাহকে সিজদা করি না। তাঁর সাথে এখন আর আমাদের কোন বন্ধন নেই। আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে আছে পার্থিব কামনা-বাসনায়। আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ মৃত। আমরা এখন রিপুর গোলাম। আল্লাহ তাআলার কাছে আজ আমাদের কানা-কড়ি মূল্য নেই।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

এই অবস্থা থেকে আমাদের উত্তরণ জরুরি। মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর সাথে আমাদের হৃদয়ের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরি। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক এতটা গভীর হওয়া জরুরি যেন আমাদের অন্তর দেখতেই আল্লাহ তাআলা খুশি হন এবং মারহাবা বলে গ্রহণ করেন। তিনি যেন বলেন, আমার বান্দা এসেছে, আমার গোলাম এসেছে।

এক অনেক বড় তাপসী ছিলেন হযরত শা'বানা (রহ.)। তার বোন একবার স্বপ্নে দেখলেন, খুব সুন্দর করে একটি বেহেশত সাজানো হয়েছে এবং বেহেশতের দরোজায় কাকে যেন অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিপুল প্রস্তুতি চলছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কিসের আয়োজন চলছে? কাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে বেহেশতের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছে সকল হুর? কি বিষয়? তারা বললো, তাপসী শা'বানা ইন্তেকাল করেছে। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে বেহেশত সাজানো হয়েছে। তাঁর আত্মাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে বেহেশতের হুরগণ দাঁড়িয়ে আছে। বোন দেখছে, বেহেশতে বোনের মর্যাদা। মূলত এ হলো আল্লাহ তাআলার বন্দেগীর পুরস্কার।

মূল বিষয় আখিরাত

আমাদের সবাইকে সর্বদাই এ কথা মনে রাখতে হবে, এই দুনিয়া একদিন আমাদেরকে ছেড়ে যেতে হবে। দুনিয়াটা শুধুই ধোকার স্থান। আল্লাহ তাআলার কাছে এর মর্যাদা মশার ডানা সমানও নয়। এ মাকড়সার জাল মাত্র। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে কামনা করবো,

এই দুনিয়ার জীবনও যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিরাপত্তার সাথে পার করে দেন। তবে আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হলো আখিরাত। যে আখিরাতের যাত্রা শুরু হয় কবর থেকে। যেদিন পৃথিবীর সকল নারী ও পুরুষের আমল মাপজোক করা হবে সেদিন হবে বড়ই ভয়াবহ দিন। পৃথিবীর সকল মানুষ একত্রিত হবে। সকলেই নিজেকে নিয়ে এতটা ব্যস্ত থাকবে, কেউ কাউকে চিনবে না।

পার্থিব এই জীবন ঈমানদারদের জন্যে ভাবনার নয়। ঈমানদারের কাছে আসল ভাবনার বিষয় হলো আখিরাত।

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে কম্পিত হবে। [যিলযাল : ১]

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দেবে। [প্রাগুক্ত : ২]

অর্থাৎ পৃথিবীর গর্ভে নিহিত সকল ভাণ্ডার যখন পৃথিবী উদগিরণ করবে সেদিন–

وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا

এবং মানুষ বলবে, এ কী হলো! [প্রাগুক্ত : ৩]

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। [প্রাগুক্ত : ৪]

অর্থাৎ এই মাটির পৃথিবীতে কে কি করেছে তার সবকিছু এই মাটিই বলে দিবে। কে তার বুকে দাঁড়িয়ে কাকে সিজদা করেছে, কার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, কোথায় বসে শরাব পান করেছে এবং কে এই মাটির পৃথিবীতে আল্লাহর নামে রোযা রেখেছে, সিজদা করেছে আল্লাহকে। পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি মাটি সেদিন আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দিবে। মাটি যখন কথা বলবে, মানুষ আশ্চর্য হবে। মাটি কিভাবে কথা বলছে?

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا

কারণ, তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন।
[যিলযাল : ৫]

অর্থাৎ মাটি এই কারণে বলবে, মাটির মালিক মহান সৃষ্টিকর্তা সেদিন মাটিকে নির্দেশ দিবেন, তোমার পিঠের ওপর কে কি করেছে বলো। অতঃপর মাটি শোনাতে থাকবে তার পিঠের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দাস্তান। সে দিনটি হবে খুবই ভয়াবহ।

يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا

সে দিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফিরিশতাগণকে নামিয়ে দেয়া হবে। [ফুরকান : ২৫]

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ

সে দিন আটজন ফিরিশতা তোমার প্রতিপালকের আরশকে তাদের উর্ধ্বে ধারণ করবে। [হাক্কা : ১৭]

ফিরিশতাগণ সে দিন আল্লাহর আরশ ধারণ পূর্বক আল্লাহ তাআলার শানে তাসবীহ্ পাঠ করতে থাকবে। তাদের সে তাসবীহকে মানুষ বজ্রপাতের মতো বুক-কাঁপানিয়া আওয়াজের মতো শুনতে পাবে। আরশ বহনকারী ফিরিশতাগণের তাসবীহ্ হলো–

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ۔ سُبْحَانَ ذِى الْقُدْرَةِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحٰنَ الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ سُبْحَانَ الَّذِىْ يُمِيْتُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ۔ يُمِيْتُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوْتُ

সে দিন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন–

اَلْحَاقَّةُ ۝ مَا الْحَاقَّةُ ۝ وَمَا اَدْرٰكَ مَاالْحَاقَّةُ

সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। কি সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা? আর তুমি কি জান, সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কি? [হাক্কা : ১-৩]

اَلْقَارِعَةُ o مَالْقَارِعَةُ o وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ

মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কী? মহাপ্রলয় সম্পর্কে তুমি কী জান? [কারিয়া : ১-৩]

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

তোমার কাছে কি কিয়ামতের সংবাদ এসেছে? [গাশিয়া : ১]

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

সে দিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হবে। [প্রাগুক্ত : ২-৩]

জাহান্নামের শাস্তি

জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً

তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে। [গাশিয়া : ৪]

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ

তাদেরকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ থেকে পান করানো হবে। [প্রাগুক্ত : ৫]

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ

তাদের জন্যে কন্টকময় গুল্ম ব্যতীত খাদ্য থাকবে না। [প্রাগুক্ত : ৬]

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ

যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে না। [প্রাগুক্ত : ৭]

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى

আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। [লাইল : ১৪]

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন। [বাকারা : ২৪]

ঐ হলো আল্লাহ তাআলার তৈরি জাহান্নাম। যে জাহান্নাম দুর্বিষহ অগ্নিময়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে তার আলোচনা করে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। যেন আমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে সচেষ্ট হই। হাদীস শরীফে আছে, জাহান্নাম আল্লাহ তাআলার দরবারে এই বলে প্রার্থনা করে–

اَللّٰهُمَّ اِشْتَدَّ حَرِّىْ وَبَعُدَ قَعْرِىْ وَجَمْرِىْ، فَاَعْجِلْ اِلَىَّ بِاَهْلِىْ

হে আল্লাহ! আমার অঙ্গারগুলো অতি তপ্ত হয়ে ওঠেছে। আমার গর্তগুলো অতি গভীর হয়ে পড়েছে। আমার ময়দানগুলো তাপে লালাভ হয়ে ওঠেছে। অতি তাড়াতাড়ি পাপীদেরকে আমার ভেতরে পাঠাও। আমি তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলি।

প্রতিদিনই জাহান্নাম আল্লাহ তাআলার দরবারে এভাবে প্রার্থনা করে।

বেহেশতের সৌন্দর্য

বেহেশতের সৌন্দর্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ

অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল, নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত। [গাশিয়া : ৮–৯]

فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

সুমহান জান্নাতে। [গাশিয়া : ১০]

لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً

সেথায় তারা অসার কোন কথা শুনবে না। [প্রাগুক্ত : ১১]

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ

সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা, প্রস্তুত থাকবে পান পাত্র, সারি সারি উপাদান এবং বিছানো গালিচা। [গাশিয়া : ১২–১৬]

সেখানে প্রস্রবণ থাকবে।

সেখানে ঝরনা থাকবে।

সেখানে কালিন বিছানো থাকবে।

সারি সারি বিছানো থাকবে উপাধান।

বালক দল পানপাত্র হাতে দাঁড়ানো থাকবে, ঘিরে থাকবে চারদিক থেকে।

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ

তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির-কিশোর দল। [ওয়াকিয়া : ১৭]

بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ

পানপাত্র কূঁজা ও প্রস্রবণ মিশ্রিত সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে। [প্রাগুক্ত : ১৮]

يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا

সেখানে তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে যানজাবিল মিশ্রিত পানীয় বেহেশতের এমন এক প্রস্রবণের যার নাম সালসাবিল। [দাহর : ১৭-১৮]

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ

অনেক মুখমণ্ডল সেদিন আনন্দোজ্জ্বল হবে। [গাশিয়া : ৮]

مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ

সহাস্য ও প্রফুল্ল হবে। [আবাসা : ৩৯]

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কঙ্কনে অলংকৃত করা হবে। [কাহাফ : ৩১]

বেহেশতে আল্লাহ তাআলা বেহেশতিদের অলংকার তৈরি করে রেখেছেন। তাছাড়া অলংকার তৈরি করার জন্যে ফিরিশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। এ সকল ফিরিশতার কাজ শুধুই অলংকার তৈরি করা। অতঃপর আল্লাহ তাআলা পুরুষ এবং নারীদের মধ্য থেকে যাকে খুশি অলংকার পরিধান করাবেন। দুনিয়ার অলংকারে খাদ থাকে কিন্তু বেহেশতের অলংকারে কোনরূপ খাদ থাকবে না।

বেহেশতির সম্মান

যারা বেহেশতে যাবে, সব বিচারেই তারা হবে এক ব্যতিক্রম জীবনের অধিকারী। সেখানে তাদের পরিধেয় কখনও পুরাতন হবে না–

يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا

এবং সেখানে তারা পরিধান করবে সবুজ বস্ত্র। [কাহাফ : ৩১]

সেখানে তাদের পোশাক কখনও ময়লা হবে না। পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়বে না। তবে মনে যদি কাপড় পরিবর্তন করার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় তখন সে হঠাৎ করেই লক্ষ্য করবে তার শরীরে আগের কাপড়টি নেই এবং সেখানে শোভা পাচ্ছে নতুন কাপড়। কাপড়ও পাবে শত শত সেট। সেখানে লন্ড্রি নেই, কাপড় ধোয়ারও ব্যবস্থা নেই। আর সে কাপড় এতটা হালকা ও কোমল হবে যে, দুই আঙ্গুলে তা তুলে নেয়া যায়। কাপড়ের প্রতি সেটের রঙ হবে আলাদা। আল্লাহ তাআলা বেহেশতবাসীর মাথায় এমন তাজ পরিধান করাবেন যার আলোয় পূব-পশ্চিম আলোকিত হয়ে উঠবে। সূর্য তো বিশ্ব জগতের খুব সামান্যই আলোকিত করে। এর বাইরে ব্ল্যাক হোলের যে বিশাল জগত রয়েছে সেখানে সূর্যের কোন আলো পৌছায় না। অথচ বেহেশতির মাথার তাজের আলোয় ব্ল্যাক হোলসহ আলোকিত হয়ে উঠবে। বেহেশতিদের মুখমণ্ডল হবে আলোকোজ্জ্বল। পোশাক হবে সবুজ। খাঁটি স্বর্ণের অলংকার পরিধান করানো হবে তাদেরকে। তাদের জীবন থেকে মৃত্যু দুঃখ বেদনা সবকিছু ধুয়ে মুছে আলাদা হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সৌন্দর্যে এতটা মুগ্ধ থাকবে যে, একে অপরকে অবিরাম দেখতে থাকবে।

হুরদের তুলনায় মুমিন নারীর মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মুমিন নারীগণকে জান্নাতী হুরদের চাইতেও অধিক সৌন্দর্য দান করবেন। বেহেশতের যে হুরদের সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তারা যদি একবার সমুদ্রে থুথু ফেলতো তাহলে সমুদ্রের সকল লোনা পানি মধুর মতো মিষ্টি হয়ে যেতো। তারা যদি তাদের একটি আঙুল এই পৃথিবীতে তুলে ধরতো তাহলে সূর্যের আলো তার সামনে নিষ্প্রভ মনে হতো। এত সুন্দর রূপবতী হুরদের চাইতে সত্তরগুণ অধিক সৌন্দর্যের অধিকারী হবে বেহেশতি মুমিন নারীগণ। বেহেশতি নারীদের মাথার চুল পায়ের পাতা অবধি প্রলম্বিত হবে। তাদের চুল বহন করে চলবে বেহেশতি হুরগণ। তাদের মাথার সিঁথি থেকে আলো ঠিকরে বেরুতে থাকবে। আল্লাহ

তাআলা তাদের মাথার উপর যে ওড়না বিছিয়ে দিবেন তারা যদি সে ওড়না একবার আসমানে উড়িয়ে দেয় তাহলে তার সুগন্ধিতে সমগ্র জাহান সুবাসিত হয়ে উঠবে। এ কথা শোনার পর সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে কি বেহেশতের হুরগণ মুমিন নারীদের চাইতে উত্তম! ইরশাদ করলেন– না, না। মুমিন নারীদের মর্যাদা বেহেশতের হুরদের চাইতে অনেক বেশি। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, কীভাবে? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

بِصَلاَتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

তাদের নামায রোযা ও ইবাদত-বন্দেগীর কারণে। আর আল্লাহ তাআলা সেদিন তাদের চেহারাকে করবেন নূরে নূরান্বিত।

কুদরতী নূরে উদ্ভাসিত হওয়ার পর তাদের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের আর কোন সীমা থাকবে না। মানুষের কোন ভাষায় তাদের সে সৌন্দর্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মানুষ তো তার মনের ভাবকেও মনের অনুভূতিকেও অনেক সময় প্রকাশ করতে পারে না। তাহলে আল্লাহ তাআলার নূরে উদ্ভাসিত হবে যে মুখ সে মুখের বর্ণনা মানুষ কি করে দেবে? অতঃপর বেহেশতি রেশমি পোশাকে সজ্জিত করা হবে বেহেশতি স্বামী-স্ত্রীকে। তারপর তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত একে অপরকে দেখতে থাকবে, তবুও দর্শনের সাধ ফুরাবে না। ফুরাবে না সেখানকার কোন সাধই।

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন কামনা করে এবং সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ করবে। এটা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ। [হা-মীম সিজদা : ৩১–৩২]

মানুষ বেহেশতে গিয়ে উঠবে আল্লাহর মেহমান হিসেবে। আল্লাহ তাআলা হবেন মেজবান। মেহমানদের সকল সাধ-স্বপ্ন তিনি পূরণ করবেন সেখানে। এই দুনিয়াতে তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, এখানে মাটিতে সিজদায় পড়ে চোখের পানিতে বুক ভাসাও। অতঃপর যখন আমার রহমতের দরজা তোমার জন্য খোলে যাবে তখন সেখানে গিয়ে তুমি আমার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। আল্লাহর দীদার তার স্বাদ ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। আমরা শুধু এতটুকু বুঝি, হযরত ইউসুফ (আ.)কে আল্লাহ তাআলা রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর সে রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ হয়ে মিশরের নারীরা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল। সুতরাং মানুষ যখন আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করবে তখন তার কি স্বাদ ও অনুভূতি হবে সেটা মানুষের ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

যদি ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য দিয়ে সারা পৃথিবীকে ঢেকে ফেলা হয় তাহলে সেই সৌন্দর্যও বেহেশতের সৌন্দর্যের সামনে খুবই তুচ্ছ। কারণ, বেহেশতের সৌন্দর্য হলো আল্লাহ তাআলার অদৃশ্য ভাণ্ডারের এক অপরূপ বিকাশ। আল্লাহ তাআলা যখন নিজের মুখমণ্ডল থেকে পর্দা তুলে দেবেন তখন মানুষ তার দীদার লাভ করবে। বেহেশতের মধ্যে এটাই হবে মানুষের কাছে সবচে' বড় নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা গুনাহগার বান্দাদের এই পাপীদৃষ্টিতে ধরা দেবেন, তাদের সাথে তিনি কথা বলবেন, প্রত্যেককে তার নাম ধরে ডাকবেন, ডাকবেন প্রতিটি নারী ও পুরুষের নাম ধরে। সেদিন সকলের মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে।

হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ঘটনা আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি। আঠার বছর ধরে অসুস্থ পড়ে আছেন। সারা শরীরে পচন ধরে গেছে। পৃথিবীর কোন মানুষ হয়তো এমন কঠিন রোগের শিকার হয়নি কোনদিন। এটা তাঁর জন্যে একটি পরীক্ষা। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুস্থতা দিলেন। সুস্থ হবার পর একদিন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর নবী! আপনার সে অসুস্থতার দিনগুলোর কথা কি আপনার মনে আছে? হযরত আইয়ুব (আ.) বললেন, শোন! আমার সে অসুস্থতার দিনগুলো আমার এই সুস্থতার দিনগুলোর চাইতে অনেক ভালো ছিল। লোকটি বিস্মিত হয়ে বললো, সে আবার কিভাবে, হে আল্লাহর নবী? হযরত আইয়ুব (আ.) বললেন, আমার সে অসুস্থতার দিনগুলোতে

প্রতিদিন আল্লাহ তাআলা আমার খোঁজ নিতেন। জিজ্ঞেস করতেন, আইয়ুব কেমন আছো? তাঁর সে মমতাপ্লুত প্রশ্নে যে সুখ ও তৃপ্তি নিহিত ছিল তার সামনে আমার শরীরের ঘায়ের ব্যথা কোন মূল্যই রাখতো না। যখন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে দেখছেন, আল্লাহ তাআলা যখন আমার নাম নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন তখন কি আর কোন ব্যথা থাকতে পারে?

সুতরাং যে দিন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দীদার দান করবেন, যে দিন আল্লাহ তাআলা আমাদের একেকজনকে নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করবেন–

খালেদ কেমন আছো?

আবু বকর কেমন আছো?

সালমান কেমন আছো?

যায়নাব কি খবর?

ফাতিমা ভালো আছো তো?

বলুন, সে দিন কি আমাদের আনন্দের আর কোন সীমা থাকবে? একবার ভেবে দেখুন, আমাদের সামনে কত সুন্দর ভবিষ্যত পড়ে আছে। আর আমরা এই তুচ্ছ দুনিয়ার পেছনে আমাদের সে সুন্দর ভবিষ্যতকে হেলায় উড়িয়ে দিচ্ছি। আমরা পড়ে আছি সেই কাপড়ের পেছনে যে কাপড় একদা পুরান হয়ে যাবে। ফেটে যাবে নিক্ষিপ্ত হবে ডাস্টবিনে। আমরা সেই সৌন্দর্যের পেছনে পড়ে আছি যা একদা বার্ধক্যে আচ্ছাদিত হয়ে পড়বে। আমাদের এই যৌবনোজ্জ্বল মুখমণ্ডল যেখানে একদা ভাঁজ পড়ে যাবে, কুঞ্চিত হয়ে যাবে আমাদের মুখের ত্বক, আমাদের এই জীবন মৃত্যু গ্রাস করে নিবে, আমাদের সকল সুখ গ্রাস করে নিবে মৃত্যুর বেদনা। দুনিয়ার শান্তি বদলে যাবে অস্থিরতায়। বলুন, এ সবের কি কোন মূল্য আছে? অথচ এ সবের পেছনে পড়েই আমরা আমাদের অপরূপ অমূল্য ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে দিচ্ছি।

আল্লাহর দীদার

সে দিন আমাদের আনন্দের কোন সীমা থাকবে না যে দিন আল্লাহ তাআলা রিদওয়ান ফিরিশতাকে ডেকে বলবেন, আজ আমার সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দাও। আমার বান্দা-বান্দীরা আমার দীদারে এসেছে। পর্দা সরিয়ে দাও। তাদেরকে প্রাণভরে আমাকে দেখতে দাও।

যখন পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন–

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সম্ভাষণ! [ইয়াসীন : ৫৮]

আমাদের প্রভু আমাদেরকে সালাম বলবেন। আল্লাহু আকবার! এর চেয়ে বড় মর্যাদার বিষয় আর কি হতে পারে? আমরা তো আমরা, আল্লাহ তাআলার যেসব নিষ্পাপ ফিরিশতাগণ সর্বদা রুকু সিজদায় পড়ে তাঁর তাসবীহ্ জপে যাচ্ছে তারাও সেদিন আল্লাহকে দেখে বিস্ময়ে বলে উঠবে, হে আল্লাহ! তুমি এতো সুন্দর! আমরা তো কখনও ভাবিনি! অনুমতি দাও, আমরা তোমাকে একটি সিজদা করতে চাই।

আল্লাহ তাআলা বলবেন–

قَدْ وَضَعْتُ عَنْكُمْ مَؤُوْنَةَ السُّجُوْدِ، نَعَلَمْ : اِتَّبَعْتُمْ لِىَ الْأَبْدَانَ وَاَنْسَتُمْ لِىَ الْوُجُوْهَ فَالْاٰنَ اَفْضَيْتُمْ اِلَىَّ رُوْحِىْ وَرَحْمَتِىْ وَكَرَامَتِىْ- هٰذَا مَحَلُّ كَرَامَتِىْ، سَلُوْنِىْ...

না, না! এখন তো তোমরা আমার মেহমান! আমি তোমাদের মেজবান। কোন মেহমানকে তো পৃথিবীর কোন কৃপণও বলে না– যাও, খানা খেয়ে এসো। আর আল্লাহ তাআলার দয়া ও বদান্যতা তো সীমাহীন।

আল্লাহর সন্তুষ্টি

আল্লাহ তাআলা বেহেশতিদের উদ্দেশ্যে বলবেন– আজ তোমরা মেহমান আর আমি মেজবান। দুনিয়াতে তোমরা আমাকে পাওয়ার জন্যে যে সিজদা আদায় করেছো সে সিজদাই যথেষ্ট। আজ আর তোমাদেরকে সিজদা আদায় করতে হবে না। আজ তোমরা আমার কাছে চাও, আমি তোমাদেরকে দান করবো। আমি তোমাদের প্রভু, তোমাদের প্রতি আমি সন্তুষ্ট আছি।

> كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْـًٔا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ
>
> তাদেরকে বলা হবে– পানাহার করো তৃপ্তিসহ। তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়স্বরূপ। [হাক্কা : ২৪]

আল্লাহ তাআলা বলবেন– তোমরা এখন থেকে সব ধরনের বিধি-নিষেধের উর্ধ্বে।

তোমরা চাও, আমি তোমাদেরকে দান করবো।

বেহেশতিগণ বলবে, সব তো পেয়েই গেছি। আর কি চাইবো?

বলবেন, না! তবুও কিছু চাও।

বেহেশতিগণ বলবে, আচ্ছা, তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

আল্লাহ তাআলা বলবেন– আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছি বলেই তো তোমাদেরকে দীদার দিচ্ছি। সন্তুষ্ট আছি বলেই তো তোমাদেরকে বেহেশতে নিবাস দিয়েছি। সন্তুষ্ট আছি বলেই তো তোমাদের সাথে কথা বলছি। সুতরাং অন্য কিছু চাও।

তারপর বেহেশতিগণ আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে শুরু করবে। চাইতে চাইতে তাদের বিবেক-বুদ্ধি সব ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ বলবেন, আরও চাও, আরও চাও। কিছুই তো চাওনি।

এখানে প্রসঙ্গত আরেকটি কথা বলি, মানুষকে আল্লাহ তাআলা যে মেধা ও সম্ভাবনা দান করেছেন এই পৃথিবীতে মানুষ তার চার কি পাঁচ শতাংশই ব্যবহার করতে পারে। অবশিষ্ট মেধা ও সম্ভাবনা ঘুমিয়ে

থাকে। যারা লেখাপড়া করে তাদের মেধা হয়তো সাত আট শতাংশ ব্যবহার হয়। আর খুব বেশি পড়াশোনা করলে হয়তো নয় শতাংশ মেধা মানুষ কাজে লাগাতে পারে। আইনস্টাইন-এর মেধা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ১১.২ শতাংশ সে ব্যবহার করতে পেরেছিল। অবশিষ্ট মেধা আইনস্টাইনও খরচ করতে পারেনি। অথচ তাকে বিজ্ঞানের জনক মনে করা হয়। সেও তার মেধা ও সম্ভাবনার মাত্র ১১.২ শতাংশ ব্যবহার করতে পেরেছিল। অবশিষ্ট শক্তি ছিল তার ঘুমন্ত।

মানুষ যখন বেহেশতে যাবে তখন তার মেধার সবগুলো সেল প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠবে এবং কাজ করতে শুরু করবে। আল্লাহ তাআলা যখন বলবেন, বান্দা চাও! যা চাইবে আমি তাই দিব। মানুষের মেধায় তখন চঞ্চলতার বিদ্যুৎ বয়ে যাবে। মেধার প্রতিটি সেল বিকশিত হয়ে ওঠবে। সে একের পর এক চাইতে থাকবে। চাইতে চাইতে এক পর্যায়ে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ বলবেন, কিছুই তো চাওনি, আরও চাও।

তারপর বান্দা চিন্তায় পড়ে যাবে। কী চাইবো? তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে। জিজ্ঞেস করবে গিয়ে নবীকে পর্যন্ত। তারপর আবার চাইতে শুরু করবে। চাইতে চাইতে আবারও ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তারা চিন্তায় পড়ে যাবে। বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। এখন কী চাইবে? আল্লাহ বলবেন, বান্দা! তোমরা তো তোমাদের সামর্থ মাফিকও চাইতে পারোনি। আমার শান মুতাবেক তোমরা কীভাবে চাইবে! আচ্ছা, যাও। তোমরা যা চেয়েছো তা তো দিলামই। আর যা চাওনি তাও দিয়ে দিলাম। আমি তোমাদের প্রভু। তোমাদের প্রতি আমি সন্তুষ্ট আছি। তোমাদের প্রতি অবারিত আছে, আমার সকল মমতা ও অনুগ্রহ। আমি মৃত্যুকে মৃত্যু দিয়েছি। শেষ করে দিয়েছি বার্ধক্যকে। চিন্তাকে বিনাশ করে দিয়েছি। ধ্বংস করে দিয়েছি সকল বিপদাপদকে।

আখিরাতের জন্যে তৈরি হও

আল্লাহ তাআলা এই পবিত্র জীবনের প্রতি মানব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইরশাদ করেছেন−

وَفِىْ ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

এই বিষয়ে প্রতিযোগীরা যেন পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। [মুতাফফিফীন : ২৬]

এর চাইতে বড় বোকামী আর কী হতে পারে? আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েই মনে করি, পরকালের সব আয়োজন বুঝি পূর্ণ করে ফেলেছি। যেখানে আমরা অনন্তকাল থাকবো সেখানকার জন্যে দিনে মাত্র দু'ঘণ্টা সাধনা! আর আজকাল তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে দুই ঘণ্টাও খরচ হয় না। আমরা তো দশ মিনিটে ইশার নামায পড়ে অবসর হয়ে যাই। আর ইশাই হলো সবচে' দীর্ঘ নামায।

গত পরশু মসজিদে এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখে আমার মনে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম, এই যদি হয় নামাযীর অবস্থা তাহলে বে-নামাযীদের অবস্থা কি হবে। আমি দেখলাম, দেড় মিনিটে চার রাকাত নামায পড়ে ফেলেছে। আমাদের অনেকের অবস্থাই এমন। দেড় মিনিটে চার রাকাত নামায পড়ে মনে করি বেহেশত কিনে ফেলেছি। যেখানে অনন্তকাল থাকবো সেখানকার জন্যে দুই ঘণ্টাও নয়। আর যেখানে থাকবো না সেখানকার জন্যে সারা দিন শরীর মেধা সবকিছু উপুড় করে ঢেলে দিচ্ছি। এ কেমন নির্বুদ্ধিতা!

আমাদের মধ্যে এমন কত মানুষ আছে যারা আজ পর্যন্ত ফজরের সময় ঘুম থেকে জেগে দেখেনি।

সূর্যের তাপেই তাদের ঘুম ভাঙ্গে।

জীবনে কখনও তারা ফজরের সিজদা আদায় করার সৌভাগ্য লাভ করেনি।

আমাদের মাঝে এমন কত মানুষ আছে যে জীবনে একবারও আল্লাহকে সিজদা করতে পারেনি।

আমাদের সমাজে এমন কত ঘর আছে যে ঘরের একজনও আল্লাহর কালাম পড়তে শিখেনি।

এমন কত ঘর পড়ে আছে যে ঘর কখনও আল্লাহর কালামের তিলাওয়াতে আমোদিত হয়নি।

এমন কত ঘর আছে যে ঘরে কখনও কোন মানুষ আল্লাহকে সিজদা করেনি।

শিশুও করেনি, বুড়োও করেনি।

নারীও করেনি, পুরুষও করেনি।

এ বঞ্চনা ও এ পতনের কি কোন শেষ আছে? অথচ সকলকেই আল্লাহর কাছে যেতে হবে। অথচ তার প্রস্তুতি কোথায়?

হযরত মুআযা (রহ.)-এর মৃত্যুমুখে হাসি

এক বিখ্যাত তাপসী নারী হযরত মুআযা আদাবিয়্যা (রহ.)। বর্ণিত আছে, প্রতিটি রাতের সূচনাতেই সে নিজেকে নিজে এই বলে প্রস্তুত করতো, হে মুআযা! এটাই তোমার জীবনের সর্বশেষ রাত। আগামীকালের সূর্য দেখা তোমার ভাগ্যে আর জুটবে না। কিছু যদি করতে চাও তাহলে এই রাতেই করে নাও।

অতঃপর মুসল্লায় বসে পড়তেন। ইবাদত করতে করতে মুসাল্লায় ঘুমিয়ে পড়তেন। আবার জেগে ওঠতেন আবার ডুবে যেতেন ইবাদতে। নিজেকে আবারও শুধাতেন, এই রাতই তোমার শেষ রাত। আগামীকালের সূর্যোদয় হয়তো তুমি দেখবে না। যদি কিছু করতে হয় এখনই করে নাও। এভাবে সারা রাত মগ্ন থাকতেন ইবাদতে। যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এলো তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। পর মুহূর্তে আবার হাসতে লাগলেন। উপস্থিত মেয়েরা জিজ্ঞেস করলো, কাঁদলেনই বা কেন আবার হাসলেনই বা কেন?

তিনি বললেন, কেঁদেছি এইজন্য– আজ থেকে আমি আর কখনও নামায পড়তে পারবো না, রোযা রাখতে পারবো না। নামায রোযার এই বঞ্চনা চিন্তা আমাকে কাঁদতে বাধ্য করেছে। আর হেসেছি এজন্য– (তাঁর স্বামী ছিলেন একজন উঁচুস্তরের তাবেঈ। নাম ছিল সিলআ ইবনুল উশাইম

রহ.। তিনি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে শাহাদতবরণ করেছিলেন।) আমার স্বামী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে বলছে, তোমাকে নিতে এসেছি। এই কারণে হাসছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে আমার স্বামীর সাথে মিলিত করেছেন। তিনি আমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। আর আমার দিকে হাত প্রসারিত করে বলছেন– তোমাকে নিতে এসেছি। এ কথা বলেই তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ফেরাউনের দাসীর দৃঢ়তা

ফেরাউনের এক দাসী ছিল। গোপনে গোপনে সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। টাকা-পয়সা যেমন লুকানো থাকে না, ইসলামও তেমনি লুকিয়ে রাখা যায় না। কৃপণ ব্যক্তির পক্ষে হয়তো টাকা-পয়সা লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু ঈমান কারও পক্ষেই লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। তাই ধীরে ধীরে দাসীর ঈমানের কথা ফেরাউনের কানে গিয়ে পড়ে। ফেরাউন তাকে ডেকে পাঠায়। তার ছিল ছোট দুই কন্যা। একজন ছিল দুগ্ধপায়ী শিশু। ফেরাউন একটি বড় পাত্রে তেল ঢেলে গরম করতে নির্দেশ দেয়। অতঃপর তেল যখন ফুটন্ত হয়ে ওঠে তখন দাসীকে বলে, যদি তুমি আমাকে খোদা না মান তাহলে তোমার সন্তান এখনই তোমার থেকে বিদায় নিবে। যদি তুমি মুসার খোদাকে খোদা মান তাহলে আমি প্রথমে তোমার দুই কন্যাকে এই ফুটন্ত তেলে পুড়িয়ে মারবো, তারপর মারবো তোমাকে। দাসী বললো, আমার তো এই দুইজন মেয়ে মাত্র। যদি আমার তৃতীয় কোন মেয়ে থাকতো তাহলে সেই মেয়েকেও আমি আল্লাহর রাহে বিসর্জন দিতাম। সুতরাং তুমি যা কিছু করতে চাও করো। আমি এর প্রতিদান আল্লাহর কাছে চাইবো।

ফেরাউন বড় মেয়েটিকে তুলে নিয়ে জ্বলন্ত ফুটন্ত তেলের মধ্যে ছেড়ে দিল। মায়ের চোখের সামনে তার নাড়ী ছেঁড়া ধন সন্তান পুড়ে ভুনা হয়ে গেল। এই দৃশ্য কি মানুষের ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব! এই ভাব ব্যক্ত করতে পৃথিবীর সকল ভাষা অক্ষম। এখানে এসে বুঝি পৃথিবীর সকল

ভাষা ও সাহিত্যই বোবা হয়ে যায়! হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ভাষা অক্ষমতা প্রকাশ করে। বেদনা ব্যক্ত করা যায় না।

আল্লাহর রহমত তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। সরে যায় মায়ের চোখের সামনে থেকে পার্থিবতার পর্দা। অদৃশ্য দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। মা পরিষ্কার দেখতে পায় তার কন্যার আত্মা তার শরীর থেকে মুক্ত হয়ে উড়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে বলে যাচ্ছে, মা ধৈর্য ধর। বেহেশতে দেখা হবে।

তারপর ফেরাউন তার বুক থেকে তার দুগ্ধপায়ী শিশুটিকে কেড়ে নেয়। দুধের শিশুর সাথে মায়ের বন্ধন থাকে সবচাইতে গভীর। দুধের সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা থাকে বর্ণনাতীত। মায়ের চোখের সামনেই দুধের শিশুটিকে ফুটন্ত তেলে ছেড়ে দিল ফেরাউন। মা তাকিয়ে আছে। তার চোখের সামনে তার সন্তান ফুটন্ত তেলে ভুনা হচ্ছে।

এই পৃথিবীতে মায়ের মমতার কোন তুলনা হয় না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে মায়ের ভালোবাসার সাথে তুলনা করেছেন। বলেছেন, আমি আমার বান্দাকে তার মায়ের চাইতেও বেশি ভালোবাসি। বাবার ভালোবাসার সাথে তুলনা দেননি। কারণ, মা সন্তানকে বাবার চাইতে অনেক বেশি ভালোবাসে। এই মমতাময়ী মায়ের চোখের সামনেই তার দুই সন্তানকে ফুটন্ত তেলে যখন ভুনা করা হলো তখন আল্লাহ তাআলা মায়ের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্যের পর্দা তুলে দিলেন। মা দেখলো, তার সন্তানের আত্মা শরীর থেকে মুক্ত হয়ে উড়ে যাচ্ছে। বলে যাচ্ছে, মা, ধৈর্য ধর! ধৈর্য ধর! তোমার জন্যে পুরস্কার অপেক্ষা করছে। আমাদের সামনে বেহেশত প্রস্তুত। আমরা শীঘ্রই বেহেশতে গিয়ে মিলিত হবো।

মা-কন্যা তিনজন এক সাথে জীবন বিলিয়ে দিল আল্লাহর নামে। তাদের পোড়া হাড়গুলো পুঁতে রাখা হলো মাটিতে।

তার দুই হাজার বছর পর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছেন মি'রাজে। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে যখন তিনি আকাশের দিকে যাত্রা করেন তখন মাটির নিচ থেকে বেহেশতের খুশবো এসে তাঁকে আমোদিত করে তুলে। সেখান থেকে কাছেই মিশর। বেহেশতের খুশবো এসে নাসিকাগ্র স্পর্শ করতেই বললেন, জিবরাইল!

বেহেশতের খুশবো পাচ্ছি। কোথেকে আসছে এই সুঘ্রাণ! হযরত জিবরাইল (আ.) বলেন, দুই হাজার বছর আগে ফেরাউনের এক ঈমানদার দাসী তাঁর দুই কন্যাসহ যে আল্লাহর নামে জীবন উৎসর্গ করেছিল তাঁদের হাড় থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এই সুবাস।

এই দৃশ্য দেখে ভেতরটা গলে যায় ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার। আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে যায়। একজন মা তার চোখের সামনে এভাবে সন্তান বিসর্জন দিতে পারে, এ কথা কল্পনাও করতে পারেনি আসিয়া। এই দৃশ্য তার ভেতরে এতটা আলোড়ন সৃষ্টি করে, সে ভাবতে বাধ্য হয় একমাত্র সত্য প্রভু ছাড়া আর কারও জন্যে এভাবে জীবন দেয়া যায় না। নিশ্চয়ই হযরত মুসা (আ.)-এর দীনই সত্য দীন।

আসিয়া ছিল ফেরাউনের সবচাইতে প্রিয় জীবনসঙ্গিনী। যখন জানতে পারলো, তার সর্বাধিক প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী মুসলমান হয়ে গেছে তখন তার মহলে শোকের ছায়া নেমে এলো। নানা কৌশল অবলম্বন করলো। যখন কিছুতেই কিছু হলো না অবশেষে তাকে জেলখানায় বন্দী করে রাখলো। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দগ্ধ করলো। কিন্তু ঈমান এমন এক শক্তি আঘাত পেলে যা বেড়েই চলে। এখানে যতই যন্ত্রণা আসে ততই তা শক্তিশালী হয়। যত শক্তভাবে আঘাত করা হয় ততই তার শেকড় গভীরে চলে যায়। যত বাধা আসে, যত প্রতিকূলতা আসে ঈমান তত শক্তিশালী হয়। ততই প্রাণিত হয়। আর জীবনে যত সুখ আসে, যত ভোগ আসে ঈমান ততই সহজ হতে থাকে, হালকা হতে থাকে। ক্ষুধা এসেছে, আসিয়া সয়ে নিয়েছে। তৃষ্ণা এসেছে বরণ করে নিয়েছে। বেত্রাঘাতের ফয়সালা হয়েছে। তাও মাথা পেতে নিয়েছে। কিন্তু ফেরাউনের আবদার মানেনি। সর্বশেষ নির্দেশ এলো, একে শূলিতে চড়াও। এটা ছিল ফেরাউনের শেষ কৌশল।

পৃথিবী ইতিহাসে সর্বপ্রথম শূলি ও ফাঁসি আবিষ্কার করেছে ফেরাউন। দুই হাত সম্প্রসারিত করে দুই হাতের তালু কাঠের উপর বিছিয়ে তাতে পেরেক মেরে দিত। অনুরূপভাবে পেরেক মেরে দিত দুই পায়ে। অতঃপর সে কাঠ ব্যক্তিসহ দাঁড় করিয়ে দিত। তারপর সে সেখানে

কাতরাতে কাতরাতে জীবন দিয়ে দিত। এভাবে শূলিতে দিয়ে মানব হত্যার কৌশল প্রথম আবিষ্কার করে ফেরাউন।

ফেরাউন নির্দেশ দিলো, আসিয়াকে শূলিতে চড়াও। শুরু হলো হযরত আসিয়াকে শূলিতে দেয়ার প্রস্তুতি। শক্ত তৃণ যে হাতকে কখনও স্পর্শ করেনি, সে হাতে লোহার পেরেক মারা হলো। নির্দেশ দেয়া হলো, তার শরীরের চামড়া আলাদা করে দাও। সে সময় ছিল বড় করুণ। ঈমান আঘাত পেলে জ্বলে ওঠে। হযরত আসিয়া এই ভয়ানক বিপদ মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করলো। তার সে দুআয় সেদিন আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। তার সে দুআকে আল্লাহ তাআলা এমনভাবে কবুল করেছিলেন পরবর্তীতে সেটাকে কুরআনে কারীমের অংশ করে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মত কুরআন তিলাওয়াত করবে। তিলাওয়াত করবে হযরত আসিয়ার দুআ। স্মরণ করবে তাঁর হৃদয়বিদারক কাহিনী। আসিয়া দুআ করলো–

رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর। [তাহরীম : ১১]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে আমাদেরকে সেই গল্পই শুনিয়েছেন। বলেছেন–

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَةَ فِرْعَوْنَ

আল্লাহ মুমিনদের জন্যে ফেরাউন পত্নীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। [তাহরীম : ১১]

বলেছেন– শোন! ফেরাউনের স্ত্রীর গল্প শোন।

اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

যখন সে প্রার্থনা করেছিল, হে আমার প্রতিপালক! তোমার সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্যে একটি ঘর

নির্মাণ কর। আর আমাকে উদ্ধার কর ফেরাউন ও তার দুষ্কৃতি থেকে এবং আমাকে উদ্ধার কর জালেম সম্প্রদায় থেকে। [প্রাগুক্ত]

এ ছিল হযরত আসিয়ার দুআ। সে দুআ আজও আমরা কুরআনে পড়ি। কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে সে দুআ।

তাঁর এ দুআ শুনে আল্লাহ তাআলা বেহেশতের রিজওয়ান ফিরিশতাকে বললেন, পর্দা সরিয়ে দাও। বেহেশতে আসিয়ার ঘরটি আসিয়াকে দেখতে দাও। শূলিতে ঝুলতে ঝুলতে আসিয়া প্রত্যক্ষ করছিল বেহেশতে নির্মিত আসিয়ার ঘর। বেহেশতের ঘর প্রত্যক্ষ করতেই আল্লাহ তাআলার নির্দেশে ফিরিশতা তাঁর রূহ কবজ করে নেয়। তাঁর দ্বিতীয় দুআও আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয়ে যায়। মুক্তি পায় সে ফেরাউনের জুলুম থেকে। জুলুম থেকেও মুক্তি, সাথে সাথে বেহেশতে নিজের ঠিকানা দর্শন।

হযরত আসিয়ার মর্যাদা এই ঘটনা দ্বারাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম বিবি হযরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে তখন তাঁকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, খাদিজা! তুমি যখন বেহেশতে যাবে তখন তুমি তোমার সতীনকে আমার সালাম বলো। হযরত খাদিজা (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই তো আপনার প্রথম স্ত্রী। আমার আবার সতীন কোথায়? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়াকেও আল্লাহ তাআলা বেহেশতে আমার সাথে বিয়ে দিবেন। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয়, বেহেশতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আসনও হবে সবার ঊর্ধ্বে। কারণ, হযরত আসিয়া তো আল্লাহ তাআলার কাছে আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে গৃহ প্রার্থনা করেছিল। আযানের পরের দুআয় আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সেই সর্বোচ্চ প্রশংসিত আসনই প্রার্থনা করি। আমরা বলি–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَا
ئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

তাবলীগের নামে এই যে মেহনত ও সাধনা চলছে এ কোন নতুন বিষয় নয়। আমরা মূলত আমাদের ভুলে যাওয়া অতীত দিনের কাহিনীকেই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমরা শুধুমাত্র এতটুকু কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমরা তো আসলে মুসলমান হতেও শিখিনি।

আমরা শিখেছি ডাক্তার হতে।

আমরা ইঞ্জিনিয়ার হতে শিখেছি।

আমরা কাপড় কিনতে শিখেছি।

আমরা অলংকার বানাতে শিখেছি।

আমরা ঘর বানাতে শিখেছি।

কিন্তু মুসলমান হতে শিখিনি।

কোথায় শিখলাম?

কখন শিখলাম?

কিভাবে শিখলাম?

আমরা আমাদের স্কুলে কি মুসলমান হতে শিখেছি?

আমাদের মা-বাবার চিন্তা ছিল আমরা যেন পড়াশোনায় ভালো করি। স্কুল কর্তৃপক্ষের ভাবনা ছিল– আমাদের রেজাল্ট যেন ভালো হয়। বাবার চিন্তা ছিল ব্যবসা নিয়ে। মায়ের চিন্তা ছিল ঘরের পরিচ্ছন্নতা ও জৌলুসপূর্ণ আসবাবপত্র নিয়ে। আমি মুসলমান হতে শিখলাম কি না এ নিয়ে মায়ের কোন চিন্তা নেই। আমি মুসলমান হতে পারলাম কি না এ নিয়ে বাবার কোন বেদনা নেই। এভাবেই তো চলছে আমাদের জীবন। আজ কেউ আমাদের মাথায় হাত রেখে বলে না, মুসলমান হতে শিখো। আজকের প্রজন্মের প্রতি এর চাইতে বড় জুলুম আর কিছু নেই। আজ তাদেরকে কেউ মুসলমান হওয়ার কথা বলে না।

মা-বাবার কর্তব্য

আমাদের মা-বাবা হয়তো খুব বেশি বললে এতটুকু বলে দেন– বাবা, সৎ হও। কেউ কেউ আবার বলে, সন্তানকে তো কুরআন শরীফ পড়িয়ে দিয়েছি। আমি বলি, শুধু কুরআন শরীফ পড়িয়ে দিলেই কি তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়? তাকে ইসলামী জীবন শিখাতে হবে না? ইসলামী জীবন শিখাতে হলে মুসলমান বানাতে হবে। আমরা পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে

মূলত এ কথাই বলি। আমি আমার কথাই বলি, আমার বাবা আমাকে ডাক্তার বানাতে চেয়েছিলেন। এজন্যে প্রতি তিন-চারদিন পর পর আমাকে লেকচার শুনতে হতো। আমাদের এলাকায় এক গরীব পরিবার ছিল। সেই পরিবারের এক ছেলে ডাক্তারী পাস করে পরে বেশ পয়সা উপার্জন করেছিল। চারদিকে এই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। আমার পরিবারের লোকেরা প্রায়ই আমাকে তার গল্প শোনাতো। বলতো, দেখ না কেমন গরীব ছিল! ছেলেটা ডাক্তার হলো, আর কোত্থেকে কোথায় চলে গেল। তুমি যদি ডাক্তার হতে পারো তাহলে তুমিও তার মতো সম্মান পাবে।

আজ পৃথিবীর সকল মা-বাবাই সন্তানদেরকে এই সবকই দিয়ে থাকে। ভুলেও কোন মা কিংবা কোন বাবা ছেলেকে এই বলে উপদেশ দেয় না, তোমাকে মরতে হবে। তোমাকে কবরে যেতে হবে। কবরের জন্য প্রস্তুত হও। সেখানে তোমাকে তাকওয়া আল্লাহর ভয় এবং নেক আমলই কেবল উপকৃত করবে। কোন মা-বাবাই সন্তানকে বলে না, তোমাকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। আমরা চাই, তোমাকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে রেখে যেতে। তুমি আমরা চলে গেলে আমাদের জন্য দান-সদকা করবে। তোমার দ্বারা আমরা কবরে বসেও উপকৃত হবো। তোমার ডাক্তারি তো কবরে আমাদেরকে কোন উপকৃত করবে না। আমাদেরকে উপকৃত করবে, তোমার নামায, তোমার যিকির, তোমার তিলাওয়াত। এভাবেই মূলত ঈমান শেখা হয়। মুসলমানের ঘরেই ঈমানের চাষ হয়। ঈমানী জীবন চর্চা এখান থেকেই শুরু হতে হয়। এটা বাহিরে থেকে আনা কোন বিষয় নয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, আমরা মুসলমান হতে শিখিনি।

আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর বিখ্যাত ঘটনা এবং মায়ের উপদেশ

সেকালে মানুষ দল বেঁধে বিশাল কাফেলা করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছুটে যেতো। এমনি এক কাফেলায় ইলম শেখার জন্য যাত্রী হয়েছেন শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)। তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। পথে তাদের কাফেলায় ডাকাত দল হামলা করলো। কাফেলার সকল সম্পদ তারা লুটে নিল। হযরত জিলানী (রহ.) যেহেতু ছোট ছিলেন তাই ডাকাতরা কল্পনাও করেনি তার কাছেও টাকা-পয়সা

কিছু থাকবে। তাই এমনিতেই এক ডাকাত তাকে জিজ্ঞেস করলো, বাপু তোমার কাছে কিছু আছে কি? হযরত জিলানী (রহ.) বললেন, হ্যাঁ আছে। জিজ্ঞেস করলো, কি আছে? বললেন, চল্লিশটি দিনার আছে। সে কালে চল্লিশ দিনারের অর্থ হলো পুরো এক বছরের খরচ। মোটেও তুচ্ছ পরিমাণ নয়। এ কথা শোনে তো ডাকাত বিস্ময়ে বিমূঢ়। জিজ্ঞেস করলো, কোথায় রেখেছো দিনারগুলো? বললেন, এই যে আমার জামার আস্তিনে সেলাই করে রাখা হয়েছে। ডাকাত বললো, বাপু তুমি যদি আমাকে এই দিনারের কথা না বলতে তাহলে তো আমি কোনভাবেই জানতে পারতাম না তোমার কাছে দিনার আছে। হযরত জিলানী (রহ.) বললেন, আমার মা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন– বাবা, সত্য কথা বলবে। যদি জীবন চলে যায় তবুও মিথ্যে বলবে না। এ হলো মায়ের শিক্ষা। এখন যদি মা-ই না জানে যে সত্য বলা মুক্তির পথ তাহলে সন্তানকে কে শেখাবে?

ডাকাত হযরত জিলানী (রহ.)কে ধরে সরদারের কাছে নিয়ে গেল। বললো, শুনুন সরদার! এ ছেলে কী বলে! হযরত জিলানী (রহ.) সব বলে দিলেন। সরদার বললো, বাপু! তোমার কাছে যে দিনার আছে এটা তো তুমি না বললেও পারতে। তুমি না বললে তো আমরা জানতে পারতাম না, তোমার কাছে দিনার আছে। হযরত জিলানী (রহ.) বললেন, এটা আমার মায়ের উপদেশ। মা বলেছেন, যদি জীবন চলে যায় তবুও মিথ্যে বলবে না। এ কথা শোনে ডাকাত দলের সরদার এমনভাবে কাঁদতে শুরু করে, তার চোখের পানিতে মুখের দাড়ি ভিজে যায় এবং সে বলে ওঠে, হে আল্লাহ! এই নিষ্পাপ বালক তার মায়ের এতটা অনুগত! আর আমি একজন পরিপূর্ণ যুবক অথচ তোমার অবাধ্য। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তারপর ডাকাত দলের সকলেই আল্লাহ তাআলার দরবারে তওবা করে পাপের পথ থেকে ফিরে আসে।

এখানে লক্ষ্যণীয় হলো, তাদের এই তওবা ও সৎপথে ফিরে আসার যিনি উসিলা তিনি হলেন আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর মা। তিনি বসে আছেন জিলান শহরে। তিনি জানেন না, তাঁর সন্তান কোথা থেকে কোথায় চলে গেছেন।

এই তাবলীগের মাধ্যমে মূলত আমরা ইসলামী জীবনেরই অনুশীলন করি। তিন চার বছর আগের কথা। আমরা গাশ্‌ত করতে করতে এক ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। ঘর থেকে একজন ছেলে বেরিয়ে এলো।

জিজ্ঞেস করলাম, বাপু তোমার নাম কি?

: আমার নাম উমর।

: তুমি উমর (রা.)কে চেনো?

: নাম শুনেছি।

এ কথা শুনতেই আমার মনের ভেতর এমন আঘাত লাগলো যে আঘাতের কথা আজও পর্যন্ত আমি ভুলতে পারিনি। আঠার বছরের একজন ছেলে। সে বলছে, হযরত উমর (রা.)-এর নাম তো শুনেছি। এটা তার দোষ নয়। দোষ তার মা-বাবার। তার মা-বাবা তাকে শোনায়নি হযরত উমর (রা.) কে ছিলেন।

আমরা এই তাবলীগের মাধ্যমে মূলত নিজেদেরকে মুসলমান বানাবার কলা-কৌশলই শিখছি। সে জন্য আমাদেরকে আমাদের ঘরবাড়ি ছাড়তে হচ্ছে। তাছাড়া কিছু শিখতে হলে এমনিতেও ঘরবাড়ি ছাড়তে হয়। আমার বয়স যখন এগার বছর তখন আমার বাবা আমাকে লেখাপড়ার জন্যে লাহোর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি আমার ঘরের কথা কল্পনা করে সারাদিন কাঁদতাম। আচ্ছা, আমি যখন কাঁদতাম তখন আমার মা-বাবা কি কাঁদতো না? পরে আমার মা আমাকে বলেছেন, আমাকে লাহোরে পাঠিয়ে তার সারা দিন কাটতো কেঁদে কেঁদে। তারও কষ্ট হতো। এদিকে আমারও কষ্ট হতো। কিন্তু এই কষ্ট কেন? সন্তানকে ডাক্তার বানাবার জন্য। এগার বছর বয়সের ছেলেকে লাহোর পাঠিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার বানাবার জন্যে। কিন্তু আমরা যদি কোন ছেলেকে চিল্লায় যাওয়ার কথা বলি তাহলে মা-বাবা কানে পড়তেই তওবা তওবা করে ওঠে। বলে ওঠে, আরে আমাদের ছেলেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? আমরা বলি, নিয়ে তো যাচ্ছি তোমাদেরই উপকারের জন্যে। সে যদি তাবলীগে গিয়ে মুসলমান হওয়া শিখতে পারে তাহলে তার এই পড়াশোনা তোমাদের কবরেও তোমাদের কাজে লাগবে। কিন্তু বেদনার বিষয় হলো, দুনিয়ার জন্যে তো আমরা সব ব্যথা বরদাশত করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আখিরাতের জন্য কোন ব্যথা বরদাশত করতে প্রস্তুত নই।

নিজের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সন্তানকে গড়ে তুলুন

মাতার ইবনে গুথাইর (রহ.) ছিলেন একজন উঁচু মাপের বুযুর্গ। একবার স্বপ্নে দেখলেন, একটি বিশাল কবরস্থান। কবরগুলো সব বিদীর্ণ হয়ে গেছে। কবরের ভেতর থেকে মৃত লোকগুলো বেরিয়ে এসেছে এবং তারা সকলে মিলে কী যেন কুড়াচ্ছে। আর লক্ষ্য করলেন, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি একটি গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে। বুযুর্গ সেই ব্যক্তির কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, ভাই এখানে এ কী হচ্ছে! সে বললো, আমরা মুসলমান। আমাদের সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকগুলো এখানে কী কুড়াচ্ছে? বললো, আত্মীয়-স্বজনদের পাঠানো নেকী কুড়াচ্ছে। বুযুর্গ বললেন, তুমি কুড়াচ্ছো না কেন? বললো, আমার নেকী তো থোক হিসেবে। আমি অনেক পাই, তাই এখানে কুড়াবার প্রয়োজন নেই। বুযুর্গ বললেন, তুমি অনেক নেকী কিভাবে পাও? বললো, আমার ছেলে হাফেযে কুরআন। সে প্রতিদিন পুরো কুরআন শরীফ একবার খতম করে এবং আমার নামে তা পাঠিয়ে দেয়। তাই আমাকে নেকী কুড়াতে হয় না। বুযুর্গ বললেন, তোমার ছেলে কি করে? বললো, অমুক বাজারে মিষ্টির ব্যবসা করে।

সকাল বেলা যখন ঘুম ভাঙলো তখন বুযুর্গ চলে গেলেন সেই বাজারে। গিয়ে দেখলেন খুব সুন্দর মিষ্টি চেহারার এক যুবক। ভরাট দাড়ি। চেহারা উজ্জ্বল। সদাই বিক্রি করছে আবার তার ঠোঁট দুটোও নড়ছে। তিনি কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, বাবা তুমি কি পড়ছো?

বললো, কুরআন শরীফ পড়ছি।

বললেন, কার জন্যে পড়ছো?

বললো, আমার বাবার জন্য পড়ছি।

: কেন পড়ছো?

: আমার বাবা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, কুরআন পড়তে শিখিয়েছেন। আমার জীবিকার ব্যবস্থা করে গেছেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন। তাই আমি চাই, প্রথমে আমি তাঁকে তাঁর অনুগ্রহের বদলা দেবো। এজন্যে আমি প্রতিদিন তাঁর জন্যে পুরো এক খতম কুরআন শরীফ পড়ি।

এক বছর কেটে গেল। বুযুর্গ পুনরায় স্বপ্নে দেখলেন। সেই কবরস্থান। সেই মৃত মানুষের দল। গাছে হেলান দেয়া সেই লোকটি। কিন্তু এবার আর সে গাছে হেলান দিয়ে বসা নেই। বরং অন্যদের সাথে সেও নেকী কুড়াচ্ছে। এটা দেখেই সঙ্গে সঙ্গেই বুযুর্গ চকিত হলেন। তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকাল বেলা ওঠে বাজারে গেলেন। গিয়ে এক দোকানীকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই এখানে এক যুবক মিষ্টির ব্যবসা করতো সে কোথায়? বললো, সে মারা গেছে। বুযুর্গ বুঝলেন এ কারণেই তার বাবার থোক হিসেবে নেকী পাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

আমরা মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে মূলত এ কথাই বলি। আমরা বলি, আমাদের উচিত আমাদের সন্তানদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন আমরা এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর তারা আমাদের জন্যে কিছু করতে পারে।

আমাদের নবী সর্বশেষ নবী। তাঁর পর এই পৃথিবীতে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের কাছে আল্লাহর দীনের পয়গাম পৌছে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের। যদি আমরা আমাদের মাঝে দীন প্রচারের এই মহান চর্চাকে ছেড়ে দিই, আমরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট না হই তাহলে এক সময় পবিত্র ইসলামের এই ধারাবাহিকতা কেটে পড়বে। তখন আমাদের আগামী প্রজন্ম হয়তো ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে।

গত বছর আমরা জামাতসহ অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম। অস্ট্রেলিয়ার পাশে বিশটি দ্বীপ রয়েছে। এই দ্বীপগুলোর সকল অধিবাসীই এক সময় মুসলমান ছিল। এখন তারা সকলেই খ্রিষ্টান। এর বিপরীত চিত্র দেখুন। আমাদের এই তাবলীগ জামাত যখন ইউরোপে পায়ে হেঁটে চলতে শুরু করলো তখন দেখা গেল শুধু ফ্রান্সেই দেড় হাজার মসজিদ গড়ে উঠলো। ইংল্যান্ডে গড়ে উঠলো প্রায় দুই হাজার মসজিদ। আমেরিকা ও কানাডায় গিয়ে দেখেছি, সেখানে আল্লাহর কালাম মানুষ শিখছে এবং শেখাচ্ছে। প্যারেস্টনের এক মাদরাসায় দেখেছি, দেড় হাজার শিশু কুরআনে কারীম হেফয করছে। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে লন্ডনে দেখেছি, সেখানকার মুসলমান নারীগণ বোরকা পড়ছে। এই দৃশ্য প্যারিসে দেখেছি। সাউথ

আফ্রিকায় দেখেছি, আমেরিকায় দেখেছি, কানাডায় দেখেছি। মূলত এ সবই এই জামাতের নূরানী মেহনতের বরকত।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের শাহাদত ও ইসলাম প্রচার

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম (রহ.) সতের বছর বয়সে ঘর থেকে বেরিয়েছেন এবং ভারতবর্ষের সিন্ধুতে আমাদের জেলা মুলতানে এসে পৌঁছেছেন। আমি জানতে চাই, তিনি কেনো আমাদের এই ভারতবর্ষে ছুটে এসেছিলেন? তাঁর কি ঘরবাড়ি ছিল না? তিনি কি তাঁর মা-বাবার প্রিয় সন্তান ছিলেন না? যুবক ছিলেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ভাতিজা ছিলেন। বিয়ে করেছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কন্যাকে। বিবাহিত জীবন পার করেছিলেন মাত্র চার মাস। তারপর সিন্ধু থেকে জিহাদের ডাক এসেছে তো ছোটে এসেছেন। এখানে কত দিন ছিলেন? মাত্র সোয়া দুই বছর। তারপর ঘরে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। এখানেই শাহাদতবরণ করেছেন। মাত্র চার মাস তাঁর সংসার আবাদ ছিল। তারপর উজাড় হয়ে গেছে। কিন্তু একটি সংসার উজাড় হওয়ার পরিণতিতে হাজার বছর ধরে সিন্ধুতে ইসলাম টিকে আছে। এখানে যত মানুষ মুসলমান হয়েছে, ইসলামী জীবনযাপন করছে তাদের সকল নেকী কবরে বসে পাচ্ছেন মুহাম্মদ ইবনে কাসিম। কত মূল্যবান সওদা করে গেছেন। এক ঘর উজাড় হয়েছে, কিন্তু বিনিময়ে আবাদ হয়েছে কত ঘর! হিজরী ৯০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই মুলতানে যত মুসলমান বসবাস করেছে, আমল করছে তাদের– সকলের নেক আমল মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের খাতায় লেখা হচ্ছে। যদি তিনি কুরবানী না দিতেন, তিনি যদি তাঁর সুখের সংসারকে উৎসর্গ না করতেন তাহলে এখানে বসে আমরা কিভাবে ইসলাম পেতাম? তাঁর কুরবানীতে তাঁর স্ত্রী-সন্তানের কুরবানীতে আমাদের ঘর উজালা হয়েছে ইসলামের আলোয়।

হযরত জাফর (রা.)-এর শাহাদত এবং উর্দূনে ইসলাম প্রচার

হযরত জাফর (রা.) ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয়তম চাচা। তাঁর বয়স ছিল তখন ত্রিশ বছর। স্ত্রীর

বয়স উনিশ বছর। আল্লাহর রাসূল তাঁকে উর্দুনে পাঠান। তিনি সেখানেই শাহাদতবরণ করেন। হযরত জাফর (রা.)-এর ঘরে ছিল তাঁর ছোট ছোট তিন পুত্র। আবদুল্লাহ, আউন ও মুহাম্মাদ। তিনি যখন শাহাদতবরণ করেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে নববীতে সমাসীন। এখানে বসেই তিনি আল্লাহর কুদরতে তাঁদের শহীদ হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন হযরত জাফর শাহাদতবরণ করছেন। হযতর যায়েদ শাহাদতবরণ করছেন। শাহাদতবরণ করছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুম। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল। তিনি সেখান থেকে উঠলেন। সোজা হযরত জাফর (রা.)-এর ঘরে পৌঁছে গেলেন। হযরত জাফর (রা.)-এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস বাচ্চাদের জন্যে রুটি তৈরি করবেন বলে আটা মাখিয়ে রেখেছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে বললেন, আবদুল্লাহ, আউন ও মুহাম্মাদকে আমার কাছে ডাক। যখন তাদেরকে ডেকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হলো তখন তিনি তাদেরকে চুমু খাচ্ছিলেন আর তাঁর চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছিল। হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) বলেন, এই দৃশ্য দেখে আমার মনে খটকা জাগলো– কিছু একটা ঘটেছে হয়তো। কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। অবশেষে আমি বলেই ফেললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাফরের কী হয়েছে? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

إِحْتَسِبِيْ عِنْدَ اللهِ

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রতিদান প্রত্যাশা কর।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে কবুল করেছেন। এ কথা শুনতেই হযরত আসমা (রা.) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। হযরত জাফর (রা.)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, তারপর থেকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই সফর থেকে ফিরে আসতেন হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর পূর্বে আমাকে আদর করতেন। আগে আমাকে

কোলে বসিয়ে আদর করতেন, তারপর হাসান-হুসাইনকে। এখানে দেখার বিষয় হলো, হযরত জাফর (রা.)-এর শাহাদতের মাধ্যমে তাঁর একটি ঘর উজাড় হয়েছে। কিন্তু তার বিনিময়ে উজ্জ্বল হয়েছে পুরো উর্দূন। সেখানে প্রসারিত হয়েছে ইসলাম।

হযরত বাশীর (রা.)-এর মর্যাদা

হযরত বাশীর (রা.) একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁর বাবা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে শাহাদতবরণ করেন। ইতোপূর্বে তাঁর মাও ইন্তেকাল করেছেন। ফলে তিনি একা হয়ে পড়েন। বাবা যুদ্ধে গিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন এ কথা তিনি জানেন না। যখন শুনতে পেলেন মুজাহিদদের কাফেলা মদীনায় ফিরে এসেছে তখন বালক বাশীর (রা.) ছুটে যান মদীনার বাইরে। বাবাকে আলিঙ্গন করবেন বলে। একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে থেকে খুঁজতে থাকেন বাবার মুখ। পুরো বাহিনী একেক করে মদীনায় ফিরে আসে। কিন্তু বাবাকে দেখতে পান না। অবশেষে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছুটে আসেন। এসে সামনে দাঁড়ান। জিজ্ঞেস করেন–

يَارَسُوْلَ اللهِ مَاذَا فَعِلَ اَبِىْ؟ فَاَعْرَضَ عَنِّىْ

> আমার বাবার কী হয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ? বাবাকে দেখছি না কেন?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশ্ন শোনে মুখ ফিরিয়ে নেন।

আবার একই প্রশ্ন : আমার বাবার কী হয়েছে?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও মুখ ফিরিয়ে নেন।

বালক বাশীর (রা.)-এর আবারও সেই একই প্রশ্ন : আমি আমার বাবাকে দেখছি না কেন?

এবার আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থির থাকতে পারলেন না। কেঁদে ফেললেন।

فَاسْتَعْبَرَ وَبَكَى

হযরত বাশীর (রা.) বলেন, তখন আমিও আল্লাহর রাসূলের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মা চলে গেছেন, বাবাও চলে গেলেন! এই পৃথিবীতে আমার কেউ রইলো না।

তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন–

> أَمَا تَرْضَى اَنْ يَّكُوْنَ رَسُوْلُ اللهِ اَبَاكَ وَعَائِشَةُ اُمُّكَ
>
> তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, আজ থেকে আমি তোমার বাবা এবং আয়েশা তোমার মা?

আজ সবচে' বড় বেদনার বিষয় হলো আমরা গল্প পড়ি, উপন্যাস পড়ি, ডাইজেস্ট পড়ি; কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পড়ি না। তাঁরা কিভাবে নিজেদের স্ত্রী-সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর পয়গামকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই কাহিনী আমরা পড়ি না। সেই কাহিনী তো আমাদের পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয় না। ডাইজেস্টে ছাপা হয় না। সে তো ছাপা আছে আল্লাহর কালামে। সাহাবায়ে কেরামের জীবনীতে। আজও যদি আমরা তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদের জীবন আবাদ হবে। আবাদ হবে আমাদের দেশ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই উপলব্ধি দান করুন। আমীন। ☙

বয়ান : ১১

নেক আমলের প্রতিদান ও বদ আমলের পরিণতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى، وَسَلَامٌ عَلٰى خَاتَمِ الْأَنْبِيَآءِ، اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

> আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন–
> অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী– এদের জন্যে আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। [আহযাব : ৩৫]

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের দশটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। যদি এই দশটি গুণ মুসলমান নারী ও পুরুষগণ অর্জন করতে পারে তাহলে তারা সফলকাম। সুতরাং পৃথিবীর যে কোন নারী ও পুরুষ এই গুণ দশটি অর্জন করতে পারবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সেই বিজয় ও সফলতার সনদ লাভে ধন্য হবে।

সফলতার প্রথম শর্ত

আয়াতে উল্লিখিত সফলতার প্রথম শর্ত হলো ইসলাম। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

> ইসলাম গ্রহণকারী তথা আত্মসমর্পণকারী নারী ও পুরুষগণ।

এটা সফলতার জন্যে প্রথম শর্ত। ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের কিছু আমল রয়েছে যা দৃশ্যমান। যেমন- আল্লাহ তাআলার একত্ববাদে বিশ্বাস। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতের প্রতি অকুণ্ঠ একীন, নামায রোযা হজ যাকাতের প্রতি সযত্ন বিশ্বাস।

ইসলামের হাকীকত কি– এ সম্পর্কে এক সাহাবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন–

مَا الْإِسْلَامُ يَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ؟

ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের মূল মর্ম কি?

উত্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন–

اَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ لِلّٰهِ

তোমার অন্তর আল্লাহ তাআলার কাছে সঁপে দিবে এটাই ইসলাম।

অর্থাৎ তোমার অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত কিছু থাকতে পারবে না। পৃথিবীর যে কোন নারী ও পুরুষের হৃদয় যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে পাক-পবিত্র হয়ে উঠবে, হৃদয় ও আত্মা যখন পরিপূর্ণরূপে সমর্পিত হবে কেবলই আল্লাহর দিকে তখনই তাকে বলা যাবে মুসলমান। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন–

وَاَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ

ইসলাম হলো তোমার হাত ও মুখ থেকে যেনো অন্য সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে।

সফলতার দ্বিতীয় শর্ত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী।

ঈমানের ভিত্তি কি? ঈমানের ভিত্তি হলো আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ তাআলার ফিরিশতাগণ, নবী ও রাসূলগণ, আসমানী কিতাবসমূহ,

আখিরাত এবং তকদীরের প্রতি পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা। তবে ঈমানের মূল হাকীকত ও মর্ম কি এ বিষয়ে এক সাহাবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন–

مَا الْاِ يْمَانُ يَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ؟

ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমানের হাকীকত কি?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

اَلصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ

ধৈর্য ও ক্ষমাই হলো ঈমানের মূল মর্ম।

হাদীসে উল্লিখিত 'সামাহাত' শব্দটির মর্ম কেউ কেউ বলেছেন 'দানশীলতা'। সেই হিসেবে ঈমানের মূল মর্ম দাঁড়ায় ধৈর্য ও দানশীলতা। সাহাবী পুনরায় প্রশ্ন করলেন–

اَىُّ الْاِيْمَانِ اَفْضَلُ؟

সবচে' উত্তম ঈমান কি?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

حُسْنُ الْاَخْلَاقِ

উত্তম চরিত্রই হলো সবচে' উত্তম ঈমান।

চরিত্রের পতন

আমাদের এই পাঞ্জাবের মতো পৃথিবীতে এমন অনেক শহর আছে যেখানে নামায কিংবা পর্দার কোন রেওয়াজ নেই। তবে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে আলহামদুলিল্লাহ নামাযের প্রচলন আছে, আছে পর্দারও প্রচলন। তবে আজকাল নামাযের চাইতে বে-নামাযীর সংখ্যাই ক্রমাগত বেড়ে চলছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উত্তম চরিত্র বলতে যে কথা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে তার উপস্থিতি পাঞ্জাবে নেই, সীমান্ত অঞ্চলে নেই, বেলুচিস্তানে নেই, সিন্ধুতে নেই– পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই নেই।

পৃথিবীর লাখ লাখ নারী পুরুষ চষেও একজন উত্তম চরিত্রবান মানুষ আবিষ্কার করা এখন এক দুঃসাধ্য বিষয়। অথচ ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হয় না চারিত্রিক উৎকর্ষ ব্যতিরেকে। একটি হাদীসে আছে, এক সাহাবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে আরয করলো– ইয়া রাসূলাল্লাহ!

أُرِيْدُ اَنْ يَّكْمُلَ اِيْمَانِىْ

আমি আমার ঈমানের পূর্ণতা চাই।

উত্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

حَسِّنْ خُلُقَكَ يَكْمُلْ اِيْمَانُكَ

তুমি তোমার চরিত্রকে সুন্দর কর, তোমার ঈমান এমনিতেই পূর্ণ হয়ে ওঠবে।

আজ মুসলিম উম্মাহর সবচে' বড় সংকট হলো চারিত্রিক সংকট। পুব-পশ্চিম সাদাকালো নারী-পুরুষ কোথাও আজ চরিত্রের ঝলক নজরে পড়ে না। বরং চরিত্রের পতন সর্বত্র স্পষ্ট। নারী-পুরুষ কারও মধ্যেই অন্যকে ক্ষমা করা কিংবা ছাড় দেয়ার প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় না। শুধু যে নিজেরাই চরিত্র থেকে বঞ্চিত তা নয়। বরং সন্তানকেও চরিত্র শোভায় সজ্জিত করে তোলার কথা আমরা ভাবি না। যে কারণে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে অহরহ ঝগড়া-ঝাটি বেধে যায়। যা শেষ পর্যন্ত খুন পর্যন্ত গিয়ে গড়ায়। আমাদের সমাজের একজন আরেকজনকে খুব সহজেই আঘাত করে বসে। সামান্যতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের মনে যেন সামান্য নাড়া দেয় না যে তাদের উপরও একজন আছেন যিনি তাকে পাকড়াও করতে পারেন এবং তাঁর সামনে একদিন তাকে উপস্থিত হতেই হবে। মূলত আমাদের সমাজে এসব ঝগড়া-ঝাটি জুলুম-নির্যাতন ও খুন-খারাবির মূল ভিত্তি হলো চারিত্রিক পতন। আমরা চরিত্র থেকে রিক্ত হয়ে পড়েছি বলেই আমাদের মধ্যে ধৈর্য নেই, ক্ষমা ও অন্যকে মেনে নেয়ার প্রেরণা নেই।

আল্লাহর দরবারে প্রথম বিচার

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার দরবারে সর্বপ্রথম উত্থাপিত হবে হত্যার মোকদ্দমা। হত্যা সম্পর্কেই তিনি সর্বপ্রথম ফয়সালা দিবেন। মোকদ্দমাটি হবে হযরত আদম (আ.)-এর দুই পুত্র হাবীল ও কাবীলের। হাবীলের মস্তক থাকবে কাবীলের হাতে। আর হাবীল কাবীলের বুক চেপে ধরে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করবে। কারণ, কাবীল হাবীলকে হত্যা করেছিল। হাবীল আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করবে- হে আল্লাহ! তুমি একে জিজ্ঞেস কর, এ কেন আমাকে হত্যা করেছিল? এভাবে কাবীল থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সকল হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তিকে সেখানে উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেক নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীর বুক চেপে ধরে তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করবে। আল্লাহ তাআলার আরশের নিচে সমবেত হবে সকল হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি। প্রত্যেক নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে দেখিয়ে বলবে, হে আল্লাহ! তুমি জিজ্ঞেস কর এ আমাকে কেন হত্যা করেছিল?

এজন্য হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের পূর্ণতার জন্যে শর্ত করেছেন আখলাকের পূর্ণতাকে। আর আখলাকের পূর্ণতা ঘটে ধৈর্য ও ক্ষমার দ্বারা। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে ঝগড়া-ঝাটি থেকে শুরু করে খুন-খারাবি পর্যন্ত সকল অঘটন ঘটে এই আখলাকের অনুপস্থিতির কারণে। হাদীস শরীফে এও আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এমন এক নারীর প্রসঙ্গ আলোচিত হলো যে ছিল খুব ইবাদতগুজার। কিন্তু তার আখলাক ভালো ছিল না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, এই নারী দোযখে যাবে। তারপরই এমন এক নারীর প্রসঙ্গ আলোচনায় এলো যে খুব ইবাদত করতো তা নয়, তবে তার আখলাক ভালো ছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, এ নারী বেহেশতে যাবে। সুতরাং চারিত্রিক উৎকর্ষ ব্যতীত ঈমানের পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়।

সফলতার তৃতীয় শর্ত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ

অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী।

অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে বিনয়াবনত ইবাদতগুজার নারী ও পুরুষ। ইতোপূর্বে আমরা মুআযা আদাবিয়্যাহ (রহ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন তাঁর কালের বিখ্যাত তাপসী। তাঁর স্বামী আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে শাহাদতবরণ করেন। স্বামীর শাহাদতের পর তিনি এই পৃথিবীতে বিশ বছর বেঁচে ছিলেন। এই বিশ বছরের প্রতিটি রাতই কেটেছে তাঁর নামাযের মুসল্লায়। মৃত্যুর আগে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি রাতের বেলা বিছানায় ঘুমাননি। অতঃপর যখন তাঁর দুয়ারে মৃত্যু এসে হাজির হয়েছে তখন তিনি হাসতে শুরু করেন। উপস্থিত মহিলারা তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন– আমার সামনে আমার স্বামীকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলছেন, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তোমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছি। এ থেকে আমি এটাই অনুমান করতে পারছি, আল্লাহ আমাদের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছেন এবং আমাদের নিবাস হবে বেহেশত। সুতরাং সফলতার ভিত্তি হলো বিনয়কাতর ইবাদত।

সফলতার চতুর্থ শর্ত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ

সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী।

এক সাহাবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন– হে রাসূল! কোন মুসলমান কি ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে?

ইরশাদ করলেন, হতে পারে।

প্রশ্ন করলেন– কোন মুসলমান কি কৃপণ হতে পারে?

ইরশাদ করলেন– হতে পারে।

আরয করলেন– কোন মুসলমান কি মিথ্যা বলতে পারে?

ইরশাদ করলেন– কখনও না। কোন মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না।

কোন মুসলমান নারী হোক আর পুরুষ সে কখনও মিথ্যা বলতে পারে না। অথচ আজ যদি আমাদের চারদিকে তাকাই তাহলে মনে হবে মিথ্যা যেন বাতাসের চাইতে বেশি ব্যাপক হয়ে পড়েছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-ও বলেছেন– যে ব্যক্তি মিথ্যা বর্জন করবে বেহেশতে আমি তার জন্যে ঘরের ব্যবস্থা করবো। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করার দায়িত্ব নিবে আমি তার জন্যে জান্নাতুল ফেরদাউসে ঘরের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নেবো।

সফলতার পঞ্চম শর্ত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ

ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন, যারা ধৈর্যশীল তারা দাঁড়াও। ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র একটি দল দাঁড়িয়ে যাবে। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা বেহেশতে চলে যাও।

তারপর তাদের সম্মানে আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদের একটি বিশাল দল পাঠাবেন। তারা এসে ধৈর্যশীলদের সমীপে আরয করবে– ভাই, তোমরা কোথায় যাচ্ছো?

তারা বলবে, বেহেশতে যাচ্ছি।

ফিরিশতাগণ বলবে, হিসাব তো দিয়ে যাও।

তারা বলবে, আমাদের তো কোন হিসাব নেই।

ফিরিশতাগণ বলবে, তোমাদের পরিচয় কী?

তারা বলবে, আমরা ধৈর্যশীল।

ফিরিশতাগণ বলবে, বাহ্বা! যাও, যাও! তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করার কে আছে?

ফিরিশতাগণ যেতে যেতে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা, তোমরা কী ধৈর্যধারণ করেছো?

তারা বলবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে আমাদেরকে অভাব দিয়েছিলেন, আমরা ধৈর্যের সাথে তা গ্রহণ করেছি। দুনিয়াতে আমরা আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করার সুযোগ পেয়েছি, তারপরও তাঁর নির্দেশ অমান্য করিনি। ধৈর্যের সাথে নিজেদেরকে রক্ষা করেছি।

ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেহেশত দেখিয়ে দিয়ে বলবে– যাও, এই তো আমলকারীদের ঠিকানা।

সফলতার ষষ্ঠ শর্ত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ

বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী।

বিনয় অর্থ এখানে আল্লাহর ভয়।
যারা নির্জনে আল্লাহকে ভয় করে।
যারা আল্লাহকে ভয় করে লোকালয়ে।
যারা মানুষের মেলায় আল্লাহকে ভয় করে।
আল্লাহকে ভয় করে একান্ত একাকীত্বেও।
আল্লাহর ভয় তাদেরকে হারাম পথে পা বাড়াতে দেয় না।
আল্লাহর ভয় তাদেরকে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করতে দেয় না।

মানুষের হৃদয়ে লালিত এই ভয়কেই খু'শু বলে। যদি কারও অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ভয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে এই ভয়ই তাকে সব রকমের অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। অনন্তর সহজ করে দেয় তার জন্যে সফলতার পথ।

সফলতার সপ্তম শর্ত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ

দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী।

অর্থাৎ যারা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে। হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একদিন হযরত মুআবিয়া (রা.) তাঁর খেদমতে এক লক্ষ দেরহাম উপহার পাঠান। সেদিন হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন রোযাদার। তিনি মুদ্রাগুলো নিয়ে বণ্টন করতে বসে পড়েন। আসর পর্যন্ত এক লাখ দিরহাম মদীনার অসহায় মানুষদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

সন্ধ্যা বেলা যখন ইফতারের সময় ঘনিয়ে আসে তখন ঘরের সেবিকা এসে বলে, আপনি তো জানেন আমাদের ঘরে খাবার কিছু নেই। যদি একটি দিরহামও রেখে দিতেন তাহলে গোশত এনে আপনার ইফতারের ব্যবস্থা করতাম। উত্তরে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, ঘরে যে কিছু নেই সে কথা তো আমার মনে ছিল না। তখন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে, একটি দিরহাম না হয় রেখেই দিতাম! এ হলো আল্লাহর পথে ব্যয় করার নমুনা।

সফলতার অষ্টম নবম ও দশম শর্ত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَالصّٰٓئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ

রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী।

অতঃপর ইরশাদ করেছেন–

وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ

স্বীয় যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী।

তারপর ইরশাদ করেছেন–

وَالذّٰكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ

আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী।

অতঃপর যারা এসব গুণের অধিকারী তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

এদের জন্যে আল্লাহ তাআলা প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

উল্লিখিত আয়াতটি পৃথিবীর সকল নারী ও পুরুষের জন্যে একটি মূলনীতির মতো। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যে কোন কালে যে কোন নারী কিংবা যে কোন পুরুষ এই গুণ দশটি অর্জনে সক্ষম হবে সেই অধিকারী হবে আল্লাহ তাআলার মাগফিরাত ও মহাপ্রতিদানের।

এক ব্যর্থ নারীর গল্প

কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে যেমন সফল মানুষের গল্প শুনিয়েছেন তেমনি গল্প শুনিয়েছেন ব্যর্থ মানুষেরও। আল্লাহ্ তাআলা সূরা তাহরীমে ইরশাদ করেছেন–

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ

আল্লাহ কাফেরদের জন্যে নূহ-এর স্ত্রী ও লূত-এর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। [তাহরীম : ১০]

একজন হযরত নূহ (আ.)-এর স্ত্রী অন্যজন হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী। তাদেরকে তো আল্লাহ তাআলা ব্যর্থ ও অসফলকাম হিসেবে উল্লেখ

করেছেন। কিন্তু তাদের স্বামীদের কিভাবে প্রশংসা করেছেন দেখুন। ইরশাদ হয়েছে–

كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا

তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। [প্রাগুক্ত]

নবীর স্ত্রী হয়েও তারা ঈমান আনেনি। স্বজাতির পথ অনুসরণ করেছে, অনুসরণ করেছে শিরক ও কুফরির পথ।

فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا

ফলে নূহ্ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেননি। [প্রাগুক্ত]

وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

এবং তাদেরকে বলা হলো, তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর। [প্রাগুক্ত]

এ হলো নবীর স্ত্রী হয়েও নবীর পথ অনুসরণ না করার পরিণতি।

সফল নারীর গল্প

এর পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গল্প শুনিয়েছেন হযরত আসিয়া (রা.) ও হযরত মারয়াম (আ.)-এর। ইরশাদ হয়েছে–

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ

আল্লাহ মুমিনদের জন্যে ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। [তাহরীম : ১১]

এখান থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, একদিকে আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক নৈকট্য প্রাপ্ত একান্ত অনুগত বান্দা নবীর স্ত্রী, অন্যদিকে পৃথিবীতে খোদা দাবীকারী পথভ্রষ্ট ফেরাউনের স্ত্রী। নবীর

প্রতি ঈমান এনেছেন তো ফেরাউনের স্ত্রীকে আল্লাহ্ তাআলা সফল নারীর উপমা হিসেবে পেশ করেছেন। তাঁর জন্যে করেছেন বেহেশতের ফয়সালা। পক্ষান্তরে নবীর স্ত্রী নবীর পয়গামকে উপেক্ষা করায় তাকে উপস্থাপন করেছেন ব্যর্থ নারীর উপমা হিসেবে। আর তার জন্যে করেছেন জাহান্নামের ফয়সালা। আমরা এও শুনেছি ফেরাউনের ঘরের দাসী- দাসী হয়ে যখন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, ঈমান এনেছে আল্লাহর নবীর প্রতি তখন তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এমনভাবে বর্ষিত হয়েছে যে, তাঁর এবং তাঁর শহীদ দুই কন্যার হাড় থেকে বেরিয়ে আসা বেহেশতি সুবাস মি'রাজের রাতে আমাদের নবীকে আমোদিত করেছে। এ হলো সফলতার পুরস্কার।

এখানে নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ তাআলার কাছে বিচার হলো ঈমানের ভিত্তিতে নেক আমালের ভিত্তিতে। ঈমানের ভিত্তিতেই মানুষ সফলতা লাভ করে, ব্যর্থ হয় মানুষ ঈমানের ভিত্তিতেই। আর এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সামনে যেমন সফল নারী ও পুরুষদের ঘটনা আলোচনা করেছেন তেমনি আলোচনা করেছেন ব্যর্থ নারী ও পুরুষের ঘটনাও। অতঃপর স্পষ্ট ফয়সালা শুনিয়ে দিয়েছেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْاُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

> মুমিন নারী ও পুরুষের মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে আমি তাকে নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করবো। [নাহল : ৯৭]

এখানে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সৎকর্ম তথা নেক আমলের ভিত্তিতে। এই প্রতিশ্রুতি যেমন পুরুষের জন্যে তেমনি নারীদের জন্যেও।

আসিয়া ও জুলেখার পার্থক্য

হযরত নূহ্ (আ.) এবং হযরত লূত (আ.) ছিলেন আল্লাহর দীনের বিচারে সমাজের শ্রেষ্ঠজন। সে হিসেবে তাঁদের স্ত্রীগণও ছিলেন সমাজের

শ্রেষ্ঠ স্ত্রী। পক্ষান্তরে ফেরাউন ছিল দুনিয়ার বিচারে সমাজের বড় মানুষ। সে বিচারে তার স্ত্রীও ছিল উঁচু মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তাআলা উভয় শ্রেণীর পরিণতি ও সফলতা ব্যর্থতার কাহিনী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমাদের সামনে মিশরের বিখ্যাত শাসক ফেরাউনের স্ত্রীর কাহিনী তুলে ধরেছেন, তুলে ধরেছেন মিশরের আরেক বিখ্যাত নারী জুলেখার কাহিনীও। আসিয়া এবং জুলেখা একই শহরের অধিবাসী ছিল। একজন ছিল রাজার রাণী, অন্যজন ছিল গভর্নরের স্ত্রী। তাদের একজন আত্মিক পরিচ্ছন্নতা লাভে ধন্য ছিল। যে কারণে পৃথিবীবাসীর সামনে আল্লাহ তাআলা তাকে সফলতার শ্রেষ্ঠ উপমা হিসেবে পেশ করেছেন। সেই সাথে আল্লাহ তাআলা পেশ করেছেন মিশরের আরেক আলোচিত নারী জুলেখার কাহিনী। পার্থিব বিচারে অবশ্য জুলেখার মর্যাদা ছিল আসিয়ার চাইতে কম। একজন বাদশাহর স্ত্রী, অন্যজন গভর্নরের স্ত্রী। উভয়ের কালেও বিশাল ব্যবধান।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে জুলেখার গল্পও উল্লেখ করেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে—

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ

সে যে স্ত্রী লোকের ঘরে ছিল সে তার কাছে অসৎকর্ম কামনা করলো এবং দরোজাগুলো বন্ধ করে দিল ও বললো, এসো! [ইউসুফ : ২৩]

কুরআনে কারীম এখানে দুই শ্রেণীর মানুষের চিত্র তুলে ধরেছে। একদিকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাই ও জুলেখা অন্যদিকে হযরত ইউসুফ (আ.)। একদল তাদের আমলকে বরবাদ করে চলেছে, আর অন্যজন নিজের আমলকে নিজেকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট রয়েছেন। এই দুই শ্রেণীর গল্প পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে পাক কুরআনে। এ দুই শ্রেণীর চিত্র পাশাপাশি এই কারণে তুলে ধরা হয়েছে যেন আমাদের সামনে জীবনে সফলতার ভিত্তি ও পথ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য ও ভাইদের অবিচার

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বয়স তখন ষোল বছর। বাবা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর ঘনিষ্ঠ পাত্র। তাঁর প্রতি বাবার আকর্ষণ ও সীমাহীন মমত্ব দেখে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা বসে পরামর্শ করলো–

اُقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِاطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ

> তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো অথবা তাকে কোন স্থানে ফেলে আসো। তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট থাকবে। [ইউসুফ : ৯]

পরামর্শ চলছিল ভাইদের মাঝে। কেউ হত্যা করার পরামর্শ দিচ্ছিলো, কেউ বা বলছিল অন্য কিছু। একজন বললো, হত্যা না করে তাকে কোন নির্জন কূপে ফেলে দাও। হয়তো কোন কাফেলা এসে তাকে তুলে নিবে।

পরামর্শ কখনও কল্যাণের উদ্দেশ্যে হয় আবার কখনও হয় অনিষ্টতার উদ্দেশ্যে। কখনও পরামর্শ হয় মসজিদ নির্মাণের, আবার কখনও পরামর্শ হয় নাট্যমঞ্চ তৈরির। কখনও বা মানুষ পরামর্শ করে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার জন্যে, আবার কখনও বা আহ্বান করে শয়তানের দিকে আহ্বান করার জন্যে। ভালো হোক আর মন্দ হোক, পরামর্শের একটা শক্তি আছে। ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা পরামর্শ করে তাঁকে একটি কূপের মধ্যে ফেলে দিলো।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার শক্তি দেখুন। যখন হযরত ইউসুফ (আ.)কে কূপে ফেলে দেয়া হচ্ছিল তখন তাঁর ভাইয়েরা তাঁর হাতে বারবার তরবারি দ্বারা আঘাত করছিল যেন ইউসুফ (আ.) কূপের গভীরে ছিটকে পড়ে যান। এ মর্মে তখনই আল্লাহ তাআলা ওহী প্রেরণ করেন–

لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

> তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলবে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না। [ইউসুফ : ১৫]

অর্থাৎ ধৈর্য ধর। এমন একটা সময় আসবে যখন তোমার স্থান হবে অনেক উপরে এবং এরা পড়ে থাকবে অনেক নিচে। তখন তুমি এদেরকে এদের অবিচারের কথা স্মরণ করিয়ে দিও।

হযরত ইউসুফ (আ.)কে যখন তাঁর ভাইয়েরা মিলে কূপে ফেলে দিচ্ছিল তখন তো তারা কল্পনাও করেনি যে, নিচে হযরত জিবরাইল (আ.) হযরত ইউসুফ (আ.)কে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন এবং তিনি তাঁকে কোমল হস্তে একটি পাথরের উপর বসিয়ে দিবেন!

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের মধ্যে একজন ছিল খুবই কোমল প্রাণের অধিকারী। তার নামেই পরবর্তীকালে ইহুদীরা প্রসিদ্ধি লাভ করে। সে প্রতিদিন এসে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জন্যে কূপের ভেতর খাবার পাঠাতো। কিন্তু সেও হযরত ইউসুফ (আ.)কে হত্যার ষড়যন্ত্রে শরীক ছিল।

তারপর সে পথে এলো এক কাফেলা। তারা কূপ থেকে পানি উঠাতে গিয়ে তুলে আনলো হযরত ইউসুফ (আ.)কে। সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো–

هٰذَا غُلَامٌ هٰذَا غُلَامٌ

এ যে এক কিশোর! [ইউসুফ : ১৯]

وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً

অতঃপর তারা তাঁকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখলো। [প্রাগুক্ত]

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ

এবং তারা তাঁকে বিক্রি করে দিল স্বল্পমূল্যে– মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে। তারা ছিল তাঁর সম্পর্কে নির্লোভ। [ইউসুফ : ২০]

ঐতিহাসিক সূত্র থেকে এ কথাও জানা যায়, এই ব্যবসায়ীরা যখন হযরত ইউসুফ (আ.)কে তুলে নেয় তখন তাঁর ভাইয়েরা গিয়ে বলেছিল, এ আমাদের পলাতক গোলাম। একে আমাদের হাতে দিয়ে দিন। কিন্তু ইউসুফ (আ.) মুখের উপর এ কথা বলেননি, এরা আমার ভাই। এরা আমার প্রতি অবিচার করছে। বরং ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন।

আমরা এখানে লক্ষ্য করলে দেখবো, একদল মিথ্যা বলে তাদের জীবনকে বরবাদ করছে, আরেকজন ধৈর্যের মাধ্যমে নিজের জীবনকে গড়ে তুলছেন। একদিকে মিথ্যা অন্যদিকে তাকওয়া। একদিকে ষড়যন্ত্র অন্যদিকে ধৈর্য। আল্লাহ তাআলার বিধান হলো তিনি অবাধ্যদেরকে কিছুটা সুযোগ দেন। আর অনুগতদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। পরীক্ষায় যদি অনুগতগণ স্থির থাকতে পারে তখন তারা চলে যায় সুউচ্চ সোপানে। মুহূর্তে অবাধ্যরা পতিত হয় ধ্বংসের অতল গহ্বরে।

আযীযে মিশর-এর ঘরে হযরত ইউসুফ (আ.)

মিশরের বাজারে বিক্রি হলেন হযরত ইউসুফ (আ.)। তাঁকে কিনে আনলেন মিশরের গভর্নর আযীযে মিশর। ভাবলেন, তার যেহেতু সন্তান নেই ইউসুফ (আ.)কে সন্তান হিসেবে লালন-পালন করবেন।

عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا

সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে। অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করবো। [ইউসুফ : ২১]

কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর রূপ ছিল এতটা ধৌত শীলিত, তাঁর রূপ দেখে আযীযে মিশরের স্ত্রী তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ

সে যে স্ত্রী লোকের ঘরে ছিল সে তার কাছে অসৎকর্ম কামনা করলো এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল এবং বললো– এসো! [ইউসুফ : ২৩]

উত্তরে হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন–

مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّیْۤ اَحْسَنَ مَثْوَایَ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

আমি আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রভু। তিনি আমার থাকার সুব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীরা সফলকাম হয় না। [ইউসুফ : ২৩]

তারপর হযরত ইউসুফ (আ.) দরজার প্রতি ছুটে যান। দরজা ছিল তালাবদ্ধ।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ

তারা উভয়ে দৌড়ে দরোজার দিকে গেল। [প্রাগুক্ত : ২৫]

হযরত ইউসুফ (আ.) সামনে আর জুলেখা পেছনে। তারপর জুলেখা কি করলো–

وَقَدَّتْ قَمِیْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ

এবং স্ত্রী লোকটি পেছন দিক থেকে তাঁর জামা ছিড়ে ফেললো। [ইউসুফ : ২৫]

উভয়েই উপনীত হলো দরোজার মুখে।

وَاَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَا الْبَابِ

তারা স্ত্রী লোকটির স্বামীকে দরোজার কাছে পেল। [প্রাগুক্ত]

অর্থাৎ তারা দরোজারা সামনে এসে দেখলো, আযীযে মিশর দরোজার সামনে দাঁড়ানো। কোন নারী যদি অন্যায় পথে পা বাড়ায় তাহলে সে সহজেই পুরুষকে ছাড়িয়ে যায় এবং নারীদের চক্রান্তের জাল খুবই

কঠিন। দরোজার সামনে স্বামীকে দেখতে পেয়ে জুলেখা সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা বদলে ফেললো। বলতে লাগলো–

مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْءً

> যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে তার জন্যে কি দণ্ড হতে পারে? [প্রাগুক্ত]

اِلَّا اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

> কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত। [ইউসুফ : ২৫]

অর্থাৎ জুলেখা নিজেই শাস্তির ফয়সালাও করে দিল। বলে দিল, একে কারাগারে প্রেরণ কর এবং ভালো করে শাস্তি দাও। এ কথা বলেনি, একে হত্যা করে ফেলো। কারণ, যদি তাঁকে হত্যা করা হয় তাহলে জুলেখার মনের কামনা পূরণ করার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, মনে মনে জুলেখা হযরত ইউসুফ (আ.)কে প্রবলভাবে কামনা করছিল। তাই তাকে জেলে পাঠাবার প্রস্তাব দেয়। হযরত ইউসুফ (আ.) পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন– আমি কোন অন্যায় করিনি।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا

> স্ত্রী লোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল। [প্রাগুক্ত : ২৬]

এই সাক্ষী ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, একজন ছোট শিশু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পক্ষে অলৌকিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সাক্ষী লোকটি ছিল বয়স্ক। সে যাই হোক, সাক্ষ্যদাতা পরিষ্কার ভাষায় জুলেখার স্বামীকে বললো–

اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

তার জামা যদি পেছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী লোকটি মিথ্যা বলেছে আর পুরুষ লোকটি সত্যবাদী। [প্রাগুক্ত : ২৭]

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِ كُنَّ اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ

গৃহস্বামী দেখলো যে, তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া তখন বললো, নিশ্চয়ই এটা তোমাদের নারীদের ছলনা। তোমাদের ছলনা তো ভীষণ। [ইউসুফ : ২৮]

অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ.)কে আযীযে মিশর এই বলে সান্ত্বনা দিল–

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا

হে ইউসুফ! তুমি এদিকে কান দিও না। [ইউসুফ : ২৯]

আর জুলেখাকে বললো–

وَاسْتَغْفِرِىْ لِذَنْۢبِكِ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ

এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তুমিই তো অপরাধী। [ইউসুফ : ২৯]

জুলেখা তো আল্লাহ বিশ্বাসী ছিল না। আল্লাহ বিশ্বাসী ছিল না আযীযে মিশরও। সুতরাং এখানে ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ এই নয়, আল্লাহর কাছে গিয়ে অপরাধ স্বীকার কর। বরং এর অর্থ হলো তুমি আমাকে অপমানিত করেছো, লজ্জিত করেছো, কোথাও গিয়ে মুখ ঢেকে থাক।

একদিকে ভাইদের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে নারীর চক্রান্ত। তারপর এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়লো মিশরের নারীদের মধ্যে। নারীরা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলো–

اِمْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَنْ نَّفْسِهٖ

আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাসের কাছে অসৎকর্ম কামনা করছে। [ইউসুফ : ৩০]

শহরের ঘরে ঘরে জুলেখার প্রেমে পড়ার গল্প আলোচিত হতে লাগলো। কথাটা যখন ছড়াতে ছড়াতে জুলেখার কানে এলো−

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ

স্ত্রী লোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনলো তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠালো। [ইউসুফ : ৩১]

অর্থাৎ যারা জুলেখার প্রেমের কাহিনী মানুষের মাঝে চর্চা করে বেড়াচ্ছিল জুলেখা তাদেরকে নিজ মহলে দাওয়াত করে আনলো।

وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً

তাদের জন্যে সে আসন প্রস্তুত করলো।

وَاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا

তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল। [প্রাগুক্ত]

অর্থাৎ প্রত্যেকের সামনে ফল সাজিয়ে রাখলো। অতঃপর প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি দিয়ে তাদের পরিভাষায় ফল কেটে খাওয়ার জন্যে জুলেখা সকলকে আমন্ত্রণ করলো। আর এদিকে হযরত ইউসুফ (আ.)কে বললো−

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ

এবং ইউসুফকে বললো, তাদের সামনে দিয়ে বের হও। [প্রাগুক্ত]

আদেশ মাফিক হযরত ইউসুফ (আ.) মিশরের নারীদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। অতঃপর−

فَلَمَّا رَاَيْنَهٗ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ

যখন তারা তাকে দেখলো তখন তারা তার গরিমায় অভিভূত হলো এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো।

আর বললো, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়। এ তো এক মহিমান্বিত ফিরিশতা। [ইউসুফ : ৩১]

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর রূপ গরিমায় অভিভূত হয়ে তারা ফল না কেটে আঙুল কেটে বসে আছে। কর্তিত আঙুল থেকে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে। অথচ সেদিকে তাদের কোন লক্ষ্যই নেই। তারা ইউসুফ (আ.)-এর রূপ মহিমায় এতটা বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল- তারা বলতেই পারবে না, ফল কেটেছে না হাত। বরং তাদের বিমুগ্ধ প্রাণ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তার রূপের প্রশংসা করছিল- 'এ তো মানুষ নয়! এ তো মহিমান্বিত ফিরিশতা।'

তারা তো আল্লাহ্ কিংবা ফিরিশতায় বিশ্বাসী ছিল না। সুতরাং তাদের বিশ্বাস মুতাবিক যদি আমরা এই আয়াতের তরজমা করি তাহলে এভাবে বলাটাই অধিক সঙ্গত হবে- 'এ তো মানুষ নয়, এ তো দেবতা!' মানুষ এত সুন্দর হতে পারে না। নিশ্চয়ই মানুষের আকৃতিতে কোন অবতার নেমে এসেছে। তাদের এই বিমুগ্ধ অবস্থা দেখে জুলেখা বললো-

قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ

সে বললো, এ-ই সে, যার সম্পর্কে তোমরা আমার নিন্দা করেছো! [ইউসুফ : ৩২]

এত কিছুর পরও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা স্বভাবের সততা মুহূর্তের জন্যে কলংকিত হয়নি। এদিকে তাঁর রূপ-সৌন্দর্যে বিমোহিত নারীরা যখন তাঁকে পাওয়ার জন্যে আকুল তখন তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করছেন-

إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ

আপনি যদি এদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন তাহলে তো আমি এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো। [ইউসুফ : ৩৩]

আরও বললেন-

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ

হে আমার প্রতিপালক! এই নারীরা আমাকে যেদিকে আহ্বান করছে তার চাইতে কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। [ইউসুফ : ৩৩]

অর্থাৎ এই নারীরা আমাকে আহ্বান করছে, তোমার অবাধ্যতার প্রতি। আমি তোমার নাফরমানি চাই না, আমি তোমার নাফরমানি থেকে মুক্তি চাই। সে কারাগারে গিয়ে হলেও।

আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আবেদন মঞ্জুর করলেন। তাঁকে পৌঁছে দিলেন কারাগারে। এখানে আমাদের লক্ষ্য করার বিষয় হলো– একদিকে ধোকা, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র অন্যদিকে ধৈর্য, আল্লাহর আনুগত্য ও আল্লাহর ভয়। বাবার ঘর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন, কিন্তু তাকওয়া ছাড়েননি। ভাইদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছেন, তবুও ধৈর্য হারাননি। অনেকেই বলে, এই তাকওয়া দিয়ে কি লাভ? যেমন- আজকাল আমরা বলে থাকি, মুসলমান হয়ে কী লাভ? চারদিকে মুসলমানরা লাঞ্ছিত হচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি সত্যিকার অর্থে মুসলমান হতে পারতাম তাহলে আজ আমাদেরকে অপমানের এই সিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে হতো না।

হযরত ইউসুফ (আ.)কে দেখুন। তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছেন। পরিণতিতে তাঁর জীবনে আঘাতের পর আঘাত এসেছে।

কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন।

মিশরের বাজারে স্বল্প মূল্যে বিক্রি হয়েছেন।

লাঞ্ছনা বেড়েছে।

তাঁর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে।

এও ছিল অপমানের উপর অপমান।

অবশেষে তাঁর স্থান হলো কারাগারে। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.)! তিনি প্রতিষ্ঠিত তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, ঈমান ও আমলের উপর। আজকাল অনেকেই বলে, তোমার এই কালিমা দিয়ে কী হবে? নামায দিয়ে কী

হবে? ইলম দিয়ে কী হবে? তাবলীগ দিয়ে কী হবে? আমি বলি, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী পড়, সব প্রশ্ন হাওয়ায় উড়ে যাবে।

হযরত ইউসুফ (আ.) যখন কারাগারে

হযরত ইউসুফ (আ.) যখন কারাগারে তখন তাঁর খেদমতে দুইজন কয়েদী এসে তাদের স্বপ্নের কথা বললো। ইউসুফ (আ.) তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে একজনকে বললেন, তুমি শীঘ্রই জেল থেকে মুক্তি পাবে। অন্যজনকে বললেন, তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে।

أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ

তোমাদের দু'জনের একজন তার প্রভুকে মদ পান করাবে আর অপরজন শূলিবিদ্ধ হবে। [ইউসুফ : ৪১]

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাখ্যা মাফিক যখন যাকে মুক্তি পাবে বলেছিলেন সে জেলখানা থেকে বের হচ্ছিল তখন ইউসুফ (আ.) তাকে বললেন–

اُذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ

তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো। [ইউসুফ : ৪২]

অর্থাৎ তুমি যখন মুক্ত হয়ে তোমার মালিকের কাছে যাবে তখন তাকে এ কথা বলো, আমি নিরপরাধ।

হযরত ইউসুফ (আ.) যখন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীর কাছে এই প্রস্তাব পাঠাচ্ছিলেন তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাইল (আ.) এসে হাজির। এসে জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ তাআলা আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনাকে আপনার ভাইদের হাত থেকে কে রক্ষা করেছেন? ইউসুফ (আ.) বললেন, আল্লাহ।

: আপনাকে কূপ থেকে কে উদ্ধার করেছে?

: আল্লাহ।

: আপনাকে নারীদের ষড়যন্ত্র থেকে কে বাঁচিয়েছে?

: আল্লাহ।

: তাহলে কি জেলে এসে তিনি আপনাকে ভুলে গেলেন? আপনি কেন বাদশাহর কাছে পয়গাম পাঠালেন। সুতরাং এখন আপনাকে এর জন্যে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ

> সুতরাং ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইলেন। [ইউসুফ : ৪২]

সামান্য বাদশাহর কাছে নিজের নিরপরাধী হওয়ার কথা বলার কারণে হযরত ইউসুফ (আ.)কে জেলখানায় আরও ছয় সাত বছর কাটাতে হয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আল্লাহর দীনের উপর চলতে গেলে অনেক সময় মনে হয় যেন কেবল ঠকছি, আর ঠকছি। আর আল্লাহর নাফরমানির পথে চলতে গেলে মনে হয় যেন প্রতিটি দিনই ঈদ। মাটিতে হাত দিলে যেন মাটি সোনা হয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, পাথর হাতে তুলে নিলে পাথরও সোনা হয়ে যাবে। তাই মানুষ অনেক সময় ঠিক ধরতে পারে না, আসলে সে কি ভুল পথে চলছে? বরং তার কাছে মনে হয় আমি ঠিক পথেই চলছি। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে মানে, আল্লাহর পথে চলে তারা অনেক সময় দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। ভাবে, ঠিক পথে চলছি তো! আমার চলার পথ সঠিক তো!

আল্লাহ তাআলার কাছে সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। তাঁর কাছে একটা সুনির্দিষ্ট মাপ ও মাপকাঠি আছে। সে নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে আল্লাহ তাআলার শক্তি ও সত্তার মর্যাদা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সত্যবাদীর সম্মান আর মিথ্যাবাদীর লাঞ্ছনা। তখন আল্লাহকে যারা মেনেছে তাদের মর্যাদা যেমন সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তেমনি আল্লাহকে যারা উপেক্ষা করেছে তাদের অপমানের বিষয়টিও হয়ে ওঠে পরিষ্কার।

তারপর হলো কি, বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখলো। আর সে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ (আ.)কে বের করে আনার ব্যবস্থা করলেন। হযরত ইউসুফ (আ.)কে জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসার পয়গাম পাঠানো হলো। ইউসুফ (আ.) অস্বীকার করে বসলেন। বললেন, আগে গিয়ে মিশরের সেই নারীদের কাছে ইউসুফের ঘটনাটি জিজ্ঞেস কর।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য দেখে আশ্চর্য হতে হয়। দীর্ঘকাল জেলখানায় থাকার পরও যখন তাকে বেরিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তখন তিনি পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, আগে গিয়ে মিশরের সেই নারীদেরকে জিজ্ঞেস কর, ইউসুফ কি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? বাদশাহ সেই নারীদেরকে ডাকলেন। ডেকে বললেন–

مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ

রাজা নারীদেরকে বললো, যখন তোমরা ইউসুফের কাছে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে তখন তোমাদের কী হয়েছিল? [ইউসুফ : ৫১]

অর্থাৎ বাদশাহ ডেকে নারীদেরকে বললেন, বলো তো দেখি– ইউসুফ (আ.)-এর আসল ঘটনাটি কি?

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ

তারা বললো, আল্লাহর মাহাত্ম্য! আমরা তাঁর মধ্যে কোন দোষ দেখিনি। [প্রাগুক্ত]

অর্থাৎ ইউসুফের মধ্যে আমরা কোন ত্রুটি অসততা ও কলংক দেখিনি। এ কথা শোনে জুলেখাও বলে উঠলো–

اَلْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ

এতক্ষণে সত্য প্রকাশ হলো। [প্রাগুক্ত]

কুরআনে কারীমে এখানে যে 'হাসহাসা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের ভাষায় এর তরজমা করার মতো কোন যথার্থ শব্দ নেই। আমরা এর তরজমা করেছি 'প্রকাশ হলো'। এটা যথার্থ শব্দ নয়। এর খুব কাছাকাছি হবে যদি আমরা এর তরজমা করি 'সূর্য প্রকাশিত হলো'। অর্থাৎ জুলেখা মিথ্যার আবরণে যে সত্যকে চাপা দিয়ে রেখেছিল এতক্ষণে সূর্যের মতো সে সত্য প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। জুলেখাও স্বীকার করে নিল ইউসুফ সত্যবাদী। মিথ্যাবাদী আমিই।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي

> রাজা বললো, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আসো। আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করবো। [ইউসুফ : ৫৪]

বাদশাহ এই ঘটনায় খুবই আলোড়িত হলো। ইউসুফ (আ.)কে ডেকে এনে তাঁর পরামর্শক নিযুক্ত করলো এবং শাহী কুরসীতে সমাসীন করলো।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো, এখানে দুটো কাহিনী পাশাপাশি এগিয়ে চলছে। একদিকে মিশরের নারীদের অবাধ্যতার গল্প, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের অবিচারের গল্প। আর এদের মাঝখানে রয়েছেন এক যুবক। যে যুবক চক্রান্তের শিকার, জুলুমের শিকার। কিন্তু তিনি উভয় হাতে উঁচু করে রেখেছেন আল্লাহর আইন। কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বিধানকে লজ্ঘন করেননি। সত্যকে রক্ষা করতে গিয়ে ধৈর্যচ্যুত হননি। অথচ তিনি ক্রমাগত এগিয়ে চলছেন পরীক্ষার পর পরীক্ষার দিকে। অনাগত প্রতিটি সন্ধ্যাই বিগত সন্ধ্যার চাইতে বিপদঘন।

মওসুম বদলায়। দিন আসে দিন যায়। রাত আসে রাত যায়। কিন্তু তাঁর ভাগ্যের রাত যেন পোহায় না। বরং প্রতিনিয়ত অন্ধকার বেড়েই চলেছে। মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে বিপদের পর বিপদ। কিন্তু তিনি ধৈর্যচ্যুত হননি। আল্লাহর নির্দেশকে মুহূর্তের জন্যে লজ্ঘন করেননি। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সকল বিপদ থেকে বের করে এনে শাহী কুরসীতে সমাসীন করেছেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে জুলেখার প্রকৃত রূপ তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন তার লাঞ্ছিত ইতিহাসকে। অবশ্য ঐতিহাসিক সূত্রগুলো থেকে জানা যায়, পরবর্তী সময়ে জুলেখা ঈমান গ্রহণ করেছিল এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে তার বিয়েও হয়েছিল।

ইউসুফ (আ.)-এর দরবারে তাঁর ভাইগণ

এক মিথ্যার তো সমাধান হলো। এবার দ্বিতীয় মিথ্যার স্বরূপ উন্মোচনের পালা। আল্লাহ তাআলা তারও ব্যবস্থা করলেন।

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَ خَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ

ইউসুফের ভাইয়েরা আসলো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। সে তাদেরকে চিনলো কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলো না। [ইউসুফ : ৫৮]

অর্থাৎ যখন আকাল দেখা দিল, দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়ে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা খাদ্যসামগ্রী নেয়ার জন্যে ইউসুফ (আ.)-এর কাছে যখন উপস্থিত হলো তখন তাদেরকে দেখেই তিনি চিনে ফেললেন। কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারলো না। কারণ, তিনি নেকাবে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন। অতি সৌন্দর্যের কারণে তিনি এমনিতেও সতর্কতাস্বরূপ মুখ ঢেকে রাখতেন। হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে তাদের প্রার্থনা মাফিক খাদ্যসামগ্রী দিলেন। সাথে কিছু নগদ অর্থ-কড়িও দিলেন।

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

যেন তারা পুনরায় আসে। [ইউসুফ : ৬২]

সেই সাথে তিনি তাদেরকে এও বলে দিলেন, তোমরা আবার যখন আসবে তখন তোমাদের ভাইটিকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। সাথে এই বলে সতর্ক করে দিলেন–

فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِىْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِىْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ

> কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আসো তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার নৈকট্য পাবে না। [ইউসুফ : ৬০]

তারা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। বাড়িতে গিয়ে তাদের বাবা হযরত ইয়াকুব (আ.)কে বললো, এবার তো আমাদের খাদ্যসামগ্রীর পথও বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ, মিশরের গভর্নর বলে দিয়েছে, তোমাদের ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। যদি না আনো তাহলে তোমাদেরকে আর খাবার দেয়া হবে না। হযরত ইয়াকুব (আ.) বললেন—

> هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ
>
> আমি কি তোমাদেরকে তার ক্ষেত্রেও সেরূপ বিশ্বাস করবো যেরূপ বিশ্বাস করেছিলাম ইতোপূর্বে তার ভাইয়ের ক্ষেত্রে? [ইউসুফ : ৬৪]
>
> فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ
>
> আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। [প্রাগুক্ত]

অর্থাৎ ঠিক আছে, যদি তাকে তোমাদের সাথে যেতেই হয় তাহলে আমি তাকে আল্লাহর হাতেই সোপর্দ করবো, তোমাদের হাতে নয়। দ্বিতীয়বার সফর হলো। এবার তাদের সাথে রয়েছে ভাই বিনইয়ামিন। হযরত ইউসুফ (আ.) তাকে দেখে কাছে ডাকলেন এবং ডেকে বললেন—

> اِنِّىْٓ اَنَا اَخُوْكَ
>
> নিশ্চয়ই আমি তোমার সহোদর। [ইউসুফ : ৬৯]

অর্থাৎ চুপে চুপে তিনি তাকে জানিয়ে দিলেন, আমি তোমার সহোদর। আমি তোমাকে আমার কাছে রেখে দেয়ার একটা পদ্ধতি গ্রহণ করবো। তুমি নীরব থেকো।

হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর পরিমাপ পাত্রটি ভাই বিনইয়ামিনের খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেটের মধ্যে রেখে দেন। অতঃপর যখন খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ভাইদের কাফেলা চলতে শুরু করে তখন পেছন থেকে এক আহ্বানকারী এই বলে ডাক দেয়–

إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ

তোমরা নিশ্চয়ই চোর। [ইউসুফ : ৭০]

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ

তারা তাদের দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা চোর নই। [ইউসুফ : ৭১]

সরকারী প্রহরীরা বলে, আমরা কি তাহলে খুঁজে দেখবো?

ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা বললো, খুঁজে দেখ।

: যদি পাই তাহলে কি শাস্তি হবে?

তারা বললো, যার মালপত্রের সাথে তোমাদের পাত্র পাওয়া যাবে সে চোর বিবেচিত হবে এবং তোমরা তাকে গোলাম বানিয়ে রেখে দিবে।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ

তারপর সে (ইউসুফ আ.) তার সহোদরের মালপত্র তল্লাশীর পূর্বে তাদের মালপত্র তল্লাশী করতে লাগলো। [ইউসুফ : ৭৬]

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ

পরে তার সহোদরের মালপত্র থেকে পাত্রটি বের করলো। [প্রাগুক্ত]

যখন বিনইয়ামিনের মালপত্রের সাথে পাত্রটি পাওয়া গেল তখন বললো, এই তো আমাদের চোর। তখন সঙ্গে সঙ্গে ভাই ইয়াহুদা বললো, আরে আল্লাহর বান্দা এর আগে তো ইউসুফকে হারিয়েছি। আর এবার হারালাম বিনইয়ামিনকে। বাবাকে গিয়ে কি উত্তর দিব!

لَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَأْذَنَ لِىْ اَبِىْ اَوْيَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ

আমি কিছুতেই এই দেশ ছেড়ে যাবো না, যতক্ষণ না আমার বাবা আমাকে অনুমতি দেন। অথবা আল্লাহ আমার জন্যে কোন ব্যবস্থা করেন। [ইউসুফ : ৮০]

অতঃপর সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে এসে সবিনয়ে বলতে থাকে–

خُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

এর স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে একজন মহানুভব ব্যক্তি হিসেবেই দেখছি। [ইউসুফ : ৭৮]

ইউসুফ (আ.) বলে দিলেন, এটা হতে পারে না।

ভাইয়েরা সবাই পেরেশান! কি করবে তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না।

দেখুন, এরা কত কঠোর মনের অধিকারী। এরা হযরত ইয়াকুব (আ.)কে গিয়ে বললো–

اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ

আপনার পুত্র তো চুরি করেছে। [ইউসুফ : ৮১]

এ কথা বলেনি, আমাদের ভাই চুরি করেছে। বলেছে, আপনার পুত্র চুরি করেছে। কারণ, বিনইয়ামিন এবং ইউসুফ (আ.) ছিলেন এক মায়ের সন্তান। অবশিষ্টরা ছিল অন্য মায়ের সন্তান।

হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর চিঠি

যখন তারা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে পৌঁছলো এবং বিনইয়ামিনের এই কাহিনী শোনালো তখন হযরত ইয়াকুব (আ.) হযরত ইউসুফ (আ.)কে একটা চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিতে তিনি বললেন–

আমরা নবী পরিবার। আমরা চোর নই। আমাদের পরিবার শুরু থেকেই নানা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে। আমার দাদা আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। আমার বাবাকে শানিত ছুরির নিচে শায়িত করা হয়েছে। আমার পুত্রকে আমার বুক থেকে ছিন্ন করা হয়েছে। যার বিয়োগ ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে আমি চল্লিশ বছর পার করেছি। এখন আমার দৃষ্টিশক্তিও হারিয়ে গেছে। আমার সেই হারানো পুত্রকে স্মরণ করার মতো আমার কাছে একটি ভরসাই ছিল। আজ সেই ভরসাটিও তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে। তুমি যদি আমার এই সন্তানটি আমার কাছে ফিরিয়ে দাও, আমি অনুরোধ করছি– তাহলে এটা আমার প্রতি অনুগ্রহ হবে।

হযরত ইয়াকুব (আ.) ঠিক এই জাতীয় কয়েকটি বেদনা-বিধুর বাক্য লিখে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে পাঠান। চিঠিটি পড়ে হযরত ইউসুফ (আ.) কাঁদতে শুরু করেন। কারণ, পিতা-পুত্র উভয়েই নবী ছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে হযরত ইউসুফ (আ.)কে এ কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়নি যে, আমি জীবিত আছি, ভালো আছি। এবার যখন দুই দিকেই কান্না শুরু হয়েছে তখন আল্লাহ তাআলা পিতা-পুত্রের মিলনের ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা তখন সত্যকে সত্য হিসেবে আর মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে উদ্ভাসিত করেছেন। এই সত্য তুলে ধরেছেন– আল্লাহর নাফরমানির পরিণতি হলো অপমান আর তাঁর আনুগত্যের পরিণাম হলো সম্মান। যদিও এই সম্মান প্রকৃতপক্ষে তো আখিরাতেই প্রকাশ পাবে। তবুও মাঝে মধ্যে দুনিয়াতেও প্রকাশ করেন। যেন পৃথিবীর মানুষ শিখতে পারে।

আবার ফিরে এলো হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা এবং আবেদন করলো–

يَاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ

> হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা তুচ্ছ পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের রসদ পূর্ণমাত্রায় দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন। [ইউসুফ : ৮৮]

এখানে লক্ষ্যণীয় হলো, একদা যারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, যারা হযরত ইউসুফ (আ.)কে অপমানিত করতে চেয়েছিল আজ তারাই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে এসে আবদারের সুরে বলছে, আপনি আমাদেরকে আল্লাহর নামে কিছু দান-খয়রাত করুন।

ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য ও তার প্রতিদান

সবই আল্লাহ তাআলার কুদরতের লীলা। তিনিই ঘটনাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। এ সবই তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের ফসল। ইতোপূর্বে হযরত ইউসুফ (আ.) জেল থেকে বের হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন আল্লাহ চাননি। তাই তিনি জেল থেকে বের হতে পারেননি। আবার যখন আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন তখন তিনি জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং মিশরের গভর্নরের পদে আসীন হয়েছেন। ইতোপূর্বে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তাঁর কাছে এসেছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুমতি হয়নি তাই তিনি পরিচয় দেননি। কিন্তু এখন যখন তারা অসহায় ও বিনীত হয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে এসেছে এবং নিজেদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছে তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরিচয় দানের অনুমতি এসেছে। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ.) নিজের মুখ থেকে নেকাব সরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন–

هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جٰهِلُوْنَ

> তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে? যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ। [ইউসুফ : ৮৯]

এই বাক্যটির দ্বারা আমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুউচ্চ চরিত্রেরও সন্ধান পাই। হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর এই কথার দ্বারা তাঁর নববী চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। আমরা তো অতি তুচ্ছ বিষয়েও কাউকে খোটা দিতে ও আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করি না। কিন্তু এখানে হযরত ইউসুফ (আ.)কে দেখুন, তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সাথে যা কিছু করেছেন জেনে বুঝেই করেছে। দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা এবং ষড়যন্ত্রের ফসলই ছিল তাঁর প্রতি অবাঞ্ছিত সব জুলুম ও নিপীড়ন। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) যখন তাদেরকে তাদের সেই অবিচারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তোমরা না বুঝে ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের প্রতি যে আচরণ করেছিলে সে কথা কি তোমরা জান? তিনি যেন এ কথাই বুঝাতে চাচ্ছেন, তোমরা যে আমাকে কূপে ফেলে দিয়েছিলে, তরবারীর দ্বারা আমার হাতে আঘাত করেছিলে– এর কোনটিই তোমরা সচেতনভাবে করনি। বরং ভুলে করেছো।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের কথা তাদের ভালো করেই মনে ছিল এবং তারা সেদিন এই আশঙ্কাও করেছিল– একদিন ইউসুফ অনেক উপরে চলে যাবে আর আমরা পড়ে থাকবো নীচে। আজ যখন হযরত ইউসুফ (আ.) পুরাতন ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন তখন তারা সবাই গভীর দৃষ্টিতে তাঁকে দেখলো এবং সমস্বরে বলে উঠলো–

ءَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ

তুমিই তো ইউসুফ। [ইউসুফ : ৯০]

قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي

ইউসুফ (আ.) বললেন, আমিই ইউসুফ এবং এ আমার সহোদর।

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا

আল্লাহ তো আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

সে অনুগ্রহও কত বড় অনুগ্রহ তাকিয়ে দেখ। তাছাড়া সে অনুগ্রহের পথ কি?

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

> নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে এবং ধৈর্য অবলম্বন করবে আল্লাহ্ সেরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। [ইউসুফ : ৯০]

কুরআনে কারীমে এই ঘটনা মূলত আমাদের মানসিকতা নির্মাণে অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এখানে আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো, যদি কেউ আল্লাহ তাআলাকে মানে এবং ধৈর্য ও আল্লাহ্ভীতির পথে চলে তাহলে তার পথে যত বাধা-বিপত্তিই আসুক সে একদিন সফল হবেই। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্য হয় আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে অবকাশ দেন তবে তাদেরকে ছেড়ে দেন না। আল্লাহ্ তাআলার অনুগত বান্দারা পরীক্ষার মুখোমুখি হন। তবে অপমানিত হন না। আর অবাধ্যরা সুযোগ পায়, তবে ছাড় পায় না।

আমাদের তাবলীগ জামাতের মিশন হলো, পৃথিবীর সকল মানুষকে ঘুরে ঘুরে এই মানসিকতার দাওয়াত দেয়া। একজন মুসলমান হিসেবে মায়ের কর্তব্য হলো সর্বপ্রথম তার সন্তানের মনে এই মানসিকতার বীজ বপন করা। নবী-রাসূলগণের গল্প শুনিয়ে সত্য ও সততার প্রতি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হলো, আমরা আমাদেরকে সন্তানদেরকে খুবই ছোট বেলায় স্কুলে পাঠিয়ে দিই। আমাদের এ কালের স্কুলগুলোর অবস্থা হলো, ছাগল জবাই করার নির্দিষ্ট কসাইখানার মতো। শহরের সকল ছাগল যেমন কসাইরা খরিদ করে এনে এক জায়গায় একত্রিত করে। তারপর তাদেরকে জবাই করে। অতঃপর তারা পাশাপাশি পড়ে তড়পাতে থাকে। কারও বা শরীরের চামড়া আলাদা করা হচ্ছে, কারো নাড়ি-ভুড়ি টেনে বের করা হচ্ছে, কাউকে বা শুইয়ে দিয়ে জবাই করা হচ্ছে। অতঃপর সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে মহল্লার দোকানগুলোতে বিক্রির জন্যে এনে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। আমাদের আজকালকার শিশুদের স্কুলগুলো আর কসাইদের জবাইখানার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এ ক্ষেত্রে এসব স্কুলে যারা শিক্ষকতা করেন তাদেরকেও বিশেষ কোন দোষ দেয়া যাবে না।

কন্টকাকীর্ণ নার্সারী

আমাদের সবচে' বড় ব্যর্থতা হলো, আমরা আজও পর্যন্ত দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারিনি। ফলে আমাদের সমাজে সন্তানদেরকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার যে মানসিকতা সেটা কোথাও নেই। বরং এখন শিক্ষাকে উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এখন আমাদের চিন্তার মানদণ্ড হলো এটা– আল্লাহকে পাই না পাই সেটা বিবেচ্য নয়, বিবেচ্য হলো পয়সা উপার্জন করতে পারলাম কি পারলাম না। তাছাড়া আমাদের সমাজের মায়েরাও বিশেষ কোন মানসিকতায় গড়ে ওঠেনি। ফলে সন্তানদেরকে যে মানসিকভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে এ কথা তারা কল্পনাও করে না। একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠিয়ে দেয়। স্কুল শিক্ষক তাদেরকে প্রথম দিন থেকেই এ বি সি ডি'র ফাঁদে ফেলে দেয়। অতঃপর এই শিশু এক সময় এমএ এবং পিএইচডি করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সে তার সৃষ্টিকর্তাকে জানার সুযোগ পায় না। তার সৃষ্টিকর্তার পরিচয় তার স্কুলেও তাকে দেয়া হয়নি, দেয়া হয়নি কলেজেও। কোন ইউনিভার্সিটিতেও তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়নি তার সৃষ্টিকর্তার কথা। সৃষ্টিকর্তার বিষয় তাদের পাঠ্য-সূচিতে নেই। সুতরাং দেবে কোত্থেকে?

এরই পরিণতিতে পঞ্চাশ বছর পর এমন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়েছে, দেখা গেছে, আজ তাদের সামনে কোন মনজিল নেই, জীবনের সুনির্দিষ্ট কোন টার্গেট নেই। তাদের চোখের সামনে সর্বদা ভেসে বেড়ায় তরল মুদ্রা ও চাকরির বড় বড় পোস্ট। তারা পার্থিব জীবনের তুচ্ছ স্বাদ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। তাদের চিন্তার চূড়ান্ত হলো এই পার্থিব জীবন। তাদের স্বপ্ন একটাই–

বড় পদ চাই।

বড় ব্যবসা চাই।

সমাজে অর্থ-বিচারে প্রতিষ্ঠিতদের সাথে সম্পর্ক চাই।

হাতে দামী দামী পাথরের আংটি চাই।

মোবাইল সেট চাই।

ইউরোপ-আমেরিকায় ঘুরে বেড়াতে চাই।

আমাদের সন্তানদেরকে বিদেশে পড়ালেখা করাতে চাই।

ব্যস, এটাই হলো এই আধুনিক শিক্ষা ও জীবন-চিন্তার নির্যাস। বিগত পঞ্চাশ ষাট বছরের সাধনায় এখন আমাদের দেশে ঠিক এমন একটা আবহই সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাঁটা বিছানো এই নার্সারী এমনভাবে ছেয়ে গেছে যা বাহ্যত সুন্দর দেখালেও ভেতরে ভেতরে আমাদের অস্তিত্বকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। দৃশ্যত আমাদের সমাজ অত্যন্ত চাণক্যপূর্ণ মনে হলেও ভেতরে ভেতরে তা চালুনির মতো ঝাঝরা হয়ে গেছে। অস্তিত্বের সর্বশেষ রক্তফোঁটাটিও এখন আমাদের শরীরে নেই।

আমাদের ভাবনার বিষয় হলো, যখন এদের সামনে আল্লাহ নেই, যখন এদের চিন্তায় আখিরাত নেই তখন এদেরকে কে নিয়ন্ত্রণ করবে? অন্যায় পথে পা বাড়াতে গেলে কে বাধা দিবে এদেরকে? আজ আমাদের মায়েরা সম্পূর্ণরূপ অবসর হয়ে পড়েছে। সন্তানরা স্কুল থেকে ফিরে এসে প্রাইভেট মাস্টারের কাছে পড়তে বসে পড়ে। সন্তানদেরকে নিয়ে মায়েদের কোন মাথাব্যথা নেই। কেউ কেউ হয়তো বা তাদের সন্তানকে মসজিদে পাঠিয়ে দেয়– যাও, পড়ে আসো। সেখানকার কারী সাহেব বেচারা যা জানে শুদ্ধ অশুদ্ধ তাই তাকে পড়িয়ে দিল। কুরআনে কারীম সেই বেচারা যেভাবে শিখেছে সেভাবেই তাকে শিখিয়ে দিল। মসজিদে সামান্য সময় অপরিকল্পিতভাবে কাটিয়ে বাচ্চা আবার এসে উপস্থিত হলো টিউশন মাস্টারের সামনে। চললো সন্ধ্যা পর্যন্ত। অতঃপর টেলিভিশন।

একই ঘরে বসবাস করেও অনেক সময় দেখা যায়, মা এবং সন্তানের সাথে দেখা নেই।

বাবা ও ছেলে-মেয়েদের সাথে দেখা নেই।

মা মেয়ের সাথে মিল নেই। হয়তো বা খাবারের টেবিলে কখনও কখনও দেখা হয়ে যায়। এটা কি কোন দেখা হলো?

সকালে ঘুম থেকে ওঠে বাবা চলে গেলো তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কিংবা অফিসে। মা চলে গেলো মায়ের কাজে। বাচ্চা বেরিয়ে পড়লো

তার স্কুলের উদ্দেশে। বাচ্চা যখন স্কুল থেকে ফিরে আসে তখন আবার তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় মসজিদে না হয় টিউশন মাস্টারের কাছে। অথবা তাকে বসিয়ে দেয়া হয় স্কুলের হোম ওয়ার্কে। মা মায়ের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সন্তান ব্যস্ত সন্তানের কাজে। বাচ্চা চলছে বাচ্চার গতিতে। মা চলছে মায়ের গতিতে। বাবা চলছে বাবার মতো, সন্তান চলছে সন্তানের মতো। এভাবেই এগিয়ে চলে আমাদের এই আধুনিক জীবন। অতঃপর পনের বিশ বছর অতিক্রান্ত হতে সন্তান যখন মায়ের সামনে চোখ উল্টে কথা বলে তখন মায়ের কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যায়। মা বলে, আশ্চর্য! তুমি আমার সামনে চোখ তুলে কথা বলছো?

আমি বলি, সন্তান চোখ তুলবে না তো কি তুলবে? তুমি তো তাকে এমনভাবে গড়ে তুলনি যে, সে তোমার প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না। তুমি তো কখনও তাকে মানুষ হয়ে গেড় ওঠার প্রতি অনুপ্রাণিত করনি।

বাবার অভিযোগ সন্তান বাবার সাথে বেআদবী করে। কিন্তু বাবার সাথে কেমন আচরণ করতে হবে সে কথা কি বাবা হয়ে তুমি কখনও বলেছো? তাকে কি কখনও মানুষ হতে উৎসাহিত করেছো?

যারা তাবলীগ করে তাদের প্রতি মানুষের অভিযোগের শেষ নেই। অভিযোগ করে এরা স্ত্রী-সন্তানদেরকে রেখে বাইরে চলে যায়। আমি বলি, এখন তো সমাজের সকলেই তাদের সন্তানকে ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের সমাজের কোন বাবাই এখন আর তার সন্তানকে নিয়ে বসার সময় পায় না। সন্তানকে তার জীবনের লক্ষ্য এবং জীবনযাপনের আদব-আখলাক সম্পর্কে কথা বলার অবকাশ বাবার নেই। তাছাড়া অনেকে তো এমন, নিজে পড়ে আছে গ্রামে, সন্তান লেখাপড়া করছে শহরে। সন্তান কিভাবে গড়ে উঠছে এ সম্পর্কে বাবা-মায়ের কোন ধারণাই নেই। তাছাড়া এই বাস্তবতাকেই অস্বীকার করবো কিভাবে? টাকার টানে বাবা পড়ে আছে–

দুবাই।

কেউ বা আবুধাবী।

কেউ বা আরব-আমীরাতে।

কেউ বা কাতারে।

কেউ বা কুয়েতে।

সন্তানদের গড়ে ওঠা এবং বেড়ে ওঠার মূল সময়টাতে বাবার সাথে তাদের কোন দেখা-সাক্ষাত নেই। সুতরাং এক শ্রেণী পাশে থেকেও সন্তানের বেড়ে ওঠার প্রতি নজর দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। আরেক শ্রেণী অর্থের জন্য পড়ে আছে বিদেশে। আর সন্তানরা বেড়ে উঠছে দেশে নিজেদের মতো করে। এ নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। মাথাব্যথা শুরু হয় তখন যখন কাউকে তাবলীগে যেতে দেখে।

আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে বসিয়েছেন ঘরে। ঘর নারীর আপন ঠিকানা। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পর্দার বিধান দিয়েছেন। যেন তারা ঘরের ভেতরই থাকে। ঘরের বাইরে যেন পারতপক্ষে না যায়। একান্ত যদি যেতেই হয় তাহলে যেন পর্দার কঠোর নিয়ন্ত্রণ মেনে যায়।

পর্দার গুরুত্ব

কুরআনে কারীমে বিভিন্ন ঘটনায় নারীদের কথা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো, পুরো কুরআন শরীফে একমাত্র হযরত মারয়াম (আ.) ব্যতীত আর কারও নাম পর্যন্ত নেয়া হয়নি। কুরআনে কারীমের এক জায়গায় 'সাবা'র আলোচনা এসেছে। আমি মনে মনে ভেবেছিলাম, হয়তো এটা কোন মেয়ের নাম হবে। পরে এ প্রসঙ্গে আমি একটি হাদীস পেয়েছি। এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাবা কি?

উত্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন– সাবা হলো ইয়ামানের এক সরদার। তার দশজন ছেলে ছিল। এই হাদীস পড়ার পর আমার মনে যে সংশয় ছিল তাও কেটে গেল। আমি এখন দৃঢ়তার সাথে বলতে পারছি, পুরো কুরআন শরীফে একমাত্র হযরত মারয়াম (আ.) ব্যতীত আর কোন নারীর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। নারী যে কতটা গোপনীয় বিষয় এ থেকেই তা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। কুরআনে কারীমের যেখানেই নারীর প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে 'আযীযের স্ত্রী', 'ইমরানের স্ত্রী', 'নূহ (আ.)-এর স্ত্রী', 'লূত (আ.)-এর স্ত্রী' ইত্যাকার পরিচয়ে নারীকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আর হযরত মারয়াম (আ.)-এর নামও এক বিশেষ প্রয়োজনে উল্লেখ করা

হয়েছে। কারণ, খ্রিষ্টানরা দাবী করে বসেছিল– ঈসা (আ.) আল্লাহ তাআলার পুত্র।

وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ

খ্রিষ্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। [তাওবা : ৩০]

খ্রিষ্টানদের এই দ্বন্দ্ব ও ভিত্তিহীন দাবীর জবাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ

এ মারয়াম তনয় ঈসা। আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। [মারয়াম : ৩৪]

এখানে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরার জন্যেই আল্লাহ তাআলা হযরত মারয়াম (আ.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, বিনা প্রয়োজনে মেয়েদের নাম নেয়াটা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয় নয়। সুতরাং মেয়েরা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াবে– এ কথা তো কল্পনাও করা যায় না।

হ্যাঁ, কোন নারী চাইলে তার প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে তাকে পর্দার আইন মেনে বাইরে যেতে হবে। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, হযরত মুসা (আ.) যখন মিশর ছেড়ে হযরত শুআইব (আ.)-এর অঞ্চলে যান তখন সেখানে হযরত মুসা (আ.) কূপের কাছে হযরত শুআইব (আ.)-এর দুই কন্যাকে দেখতে পান। তারা তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাতে পারছিল না। মুসা (আ.) তাদেরকে সহযোগিতা করেন। বিষয়টি মেয়ে দুটো তাদের বাবার কাছে বলে। অতঃপর বাবার অনুমতিতে তাদের একজন হযরত মুসা (আ.)কে ডেকে নিতে আসে। সে আসাটা ছিল প্রয়োজনের ভিত্তিতে। তার সে আগমন ছিল আল্লাহ তাআলার দীন মুতাবিক। যে কারণে আল্লাহ তাআলার তার সে আগমনের ধরনকে এতটা পছন্দ করেছেন যে, তা কুরআনে কারীমে উল্লেখ করেছেন।

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ

তখন মেয়েদ্বয়ের একজন লজ্জাজনিত চরণে তাঁর কাছে আসলো। [কাসাস : ২৫]

সুতরাং এখানে একটি মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে। নারীকে একান্ত কোন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে তার লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। বরং পর্দার মাধ্যমে লজ্জাকে লালন করে বাইরে যেতে হবে। একজন মুসলমান নারীর ঘরের বাইরে যাওয়ার এটাই যথাযথ পদ্ধতি। কোন মুসলমান নারী পর্দা লঙ্ঘন করে ঘরের বাইরে যেতে পারে না।

নারী ও পুরুষের দায়িত্ব

নারীকে আল্লাহ তাআলা ঘরের অভিভাবিকা করেছেন। ঘর সামলানো তার দায়িত্ব। অবশ্য এখানেও এখন আমরা সীমালঙ্ঘনের শিকার। আমরা তো আমাদের নারীকে অনেকটা দাসী মনে করে বসেছি। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে ঘরের সব কাজকাম তার কর্তব্য মনে করে বসেছি। অথচ ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে কাপড়-চোপড় ধৌত করা এমনকি বাচ্চাকে দুধ পান করানোও নারীর দায়িত্ব নয়। রান্নাবান্না তো অনেক পরের কথা। সুতরাং বাচ্চাকে দুধ পান করাতে হলে অন্য কোন দুধ মায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোন নারী তার সন্তানকে দুধ পান করাতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে বাধ্য করার অবকাশ শরীয়তে নেই। আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন–

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা কর। [বাকারা : ২৩৩]

ইসলাম-পূর্ব যুগে নারী ছিল চরম অবহেলিত। বন্য জানোয়ারের মতো আচরণ করা হতো তাদের সাথে। ইসলাম এসে নারীর মর্যাদাকে এতটা উঁচু করে তুলে ধরেছে যে তার জন্যে সুনির্দিষ্ট অধিকার চিহ্নিত করে দিয়েছে। যেভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে পুরুষের অধিকারও। এটা ঠিক, পুরুষ নারীর চাইতে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ

পুরুষ নারীর কর্তা। [নিসা : ৩৪]

সুতরাং নারীর চাইতে পুরুষের মর্যাদা অবশ্যই বেশি। যুগে যুগে পুরুষদের মধ্য থেকে নবী-রাসূলগণ আগমন করেছেন। আজ অবধি কোন নারী নবুওয়ত লাভে ধন্য হয়নি। তবে এও সত্য, সম্মানিত নবী-রাসূলগণ নারীদের কোলেই লালিত-পালিত হয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক নবীই কোন না কোন নারীর সন্তান। এটাই নারীর প্রকৃত সম্মান।

তবে যেহেতু নারী ছিল চরম অবহেলা ও প্রান্তিক বঞ্চনার শিকার, তাই ইসলাম নারীকে তার অধিকার চিহ্নিত করে দিয়েছে।

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন রয়েছে তাদের উপর পুরুষের অধিকার। [বাকারা : ২২৮]

পুরুষ যেহেতু মর্যাদায় নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ তাই স্বাভাবিক দাবী ছিল কথাটা এভাবে বলা হবে– পুরুষদের নারীদের উপর অধিকার রয়েছে যেমন নারীদের অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর। কিন্তু কুরআনে কারীমের উল্লিখিত ভাষ্য থেকে অনুমান হয়, এখানে নারীর অধিকারটাকেই প্রধান ভিত্তিরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। অতঃপর অনুরূপ অধিকার পুরুষের জন্যে প্রমাণ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা। আমি আমাদের অঞ্চলের কথাই বলি। আমাদের অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমানই হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে। আর হিন্দু ধর্মে যেহেতু মেয়েদের কোন অধিকার নেই তাই আমাদের সমাজেও স্বাভাবিকভাবে পিতার সম্পদে মেয়েদের কোন ওয়ারিশী অধিকার দেয়া হয় না। এটা তাদের প্রতি চরম অবিচারের শামিল। যারা মেয়েদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে এজন্য অবশ্য তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহর ফয়সালা থেকে কেউ রক্ষা পাবে না। এমনকি কেউ যদি মেয়েদের অধিকার গ্রাস করে নিজে তাবলীগে চলে যায়, কিংবা অন্য

কোন ধর্মকর্মে পরিচিতও হয়ে ওঠে তাতেও কিছু যায় আসে না। নারীদের অধিকার আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট বিধান। এই বিধান লঙ্ঘন করার অধিকার কোন মানুষের নেই। কুরআনে কারীম সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে প্রথমে মেয়েদের অধিকারের কথা বলেছে। তারপর বলেছে ছেলেদের অধিকারের কথা। ইরশাদ হয়েছে–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ

আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন। [নিসা : ১১]

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। [প্রাগুক্ত]

এখানেও প্রথমে মেয়েদের অংশকে স্থির করা হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে– এই স্থিরিকৃত অংশের দ্বিগুণ পাবে পুত্র সন্তান। এতে মেয়েদের অধিকারের স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতাই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তাআলা চাইলে এভাবেও বলতে পারতেন, কন্যা সন্তান পুত্র সন্তানের অর্ধেক পাবে। তা না বলে বলেছেন, পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের দ্বিগুণ পাবে। যেন কন্যা সন্তানের অধিকার সম্পর্কে কারও কোন সংশয় না থাকে। এর আরেকটি কারণ এও, নারীরা যেন উপলব্ধি করতে পারে তাদের অধিকার যেমন প্রতিষ্ঠিত তাদের কর্তব্যও তেমনি অনস্বীকার্য। ছেলে সন্তানকে মানুষরূপে গড়ে তোলার মূল দায়িত্ব মাকেই পালন করতে হয়। স্বামীকে তো জীবিকার সন্ধানে সকাল-সন্ধ্যা ঘুরে বেড়াতে হয়। স্বামীরা সন্তানদেরকে দেখশুনার সুযোগ কমই পায়।

সন্তানের জীবন গঠনে মায়ের ভূমিকা

হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন হযরত ইসমাইল (আ.)কে কুরবানী করতে নিয়ে যান তখন তাঁর বয়স সবেমাত্র ছয় বছর। তাছাড়া এটা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে তাঁর দ্বিতীয় সাক্ষাত। একবার তো এখানে এনে মা ও পুত্রকে রেখে গেছেন। তারপর এক বছর পর এসে আরেকবার দেখে গেছেন। সেই এক বছর বয়সে তো হযরত ইসমাইল

(আ.) বাবাকে চিনার কথা নয়। এক বছর বয়সে কে বাবা কে শত্রু এটা কে বুঝে? তৃতীয়বার যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) আগমন করেন তখন হযরত ইসমাইল (আ.) বয়সের পঞ্চম কি ষষ্ঠ বছরের শিশু। খেলাধুলা করেন। যেখানে খুশি সেখানে ঘুরে বেড়ান। তাছাড়া এটা তো ছোটাছুটিরই বয়স। পৃথিবী আজ পর্যন্ত এমন দৃশ্য অবলোকন করেনি, এমন দৃশ্য আজ পর্যন্ত আকাশও দেখেনি, দেখেনি এ বিশাল জগত, এমনকি অন্তরীক্ষও।

ঘটনার স্থান জামরাতুল উকবা।

ছুরি হাতে স্বয়ং বাবা দাঁড়ানো।

সামনে তাঁর নিষ্পাপ শিশু সন্তান।

শিশু যদি পরেরও হয় তার জন্যেও তো মনে মায়া লাগে। আর হযরত ইবরাহীম (আ.) তো ইসমাইল (আ.)কে পেয়েছেন চুরাশি বছর বয়সে। তাঁর বিয়ে যদি বিশ বছর বয়সে হয়ে থাকে তাহলে মানতে হবে চৌষট্টি বছর তিনি এ সন্তানের জন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করেছেন। আর বিয়ে যদি পঁচিশ বছর বয়সে হয়ে থাকে তাহলে এই সন্তান প্রার্থনা করেছেন অবিরাম প্রায় ষাট বছর। সেই কাঙ্ক্ষিত শত কান্নার বিনিময়ে প্রাপ্ত ধন সন্তান যখন এখন হাঁটতে শিখেছে, ছুটতে শিখেছে, বাবাকে বাবা ডাকতে শিখেছে তখন বাবা হয়ে সেই প্রিয় সন্তানকে বলতে হচ্ছে, আমি তোমাকে জবাই করতে চাই। বলো, তোমার কি মত?

এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য এটা ছিল না, পুত্র যদি রাজি থাকে তাহলে তাকে জবাই করবেন অন্যথায় নয়। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল, তুমি যদি মেনে নাও তাহলে ভালো। কাজটা সহজ হবে। আর যদি না মান তাহলে জোর করে হলেও আমি তোমাকে জবাই করবো।

কিন্তু মা হযরত ইসমাইল (আ.)কে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন, বাবা যখন তাঁর সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছেন, তাঁর মতামত জানতে চেয়েছেন তখন তিনি সরল-সহজ ভাষায় বলে দিয়েছেন–

يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ
الصّٰبِرِيْنَ

হে আমার বাবা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। [সাফ্ফাত : ১০২]

নারীর প্রকৃত অলংকার

এ হলো মায়ের তরবিয়ত। আজ আমাদের মায়েরা এই তরবিয়তের কথাই ভুলে গেছেন। সন্তানকে সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার কথা তারা আজ বেমালুম ভুলে গেছে। এখন তাদের কেবল কাপড়ের পর কাপড় চাই। চাই অলংকারের পর অলংকার। মায়েরা যখন পরস্পরে গল্পে বসে তখন তারা গর্বের সাথে এ কথাই বলে– আমি আমার মেয়ের জন্যে এই এই অলংকার তৈরি করেছি। তার জন্যে এই কিনেছি, ঐ কিনেছি। তাকে বিয়ে দিতে হবে তো। যা যা দরকার সবই কিনে রেখেছি।

আমি বলি, সব কিছুই তো করলে। কিন্তু তার অন্তরটি কি তৈরি করেছো?

তার হাতে অলংকার।

তার মাথায় অলংকার।

তার কানে অলংকার।

তার নাকে অলংকার।

তার কণ্ঠে অলংকার।

তার পদযুগলে অলংকার।

তার কাপড়ের অভাব নেই।

তার ফার্নিচারের অভাব নেই।

তার জন্য ফ্রিজ কিনে দিয়েছো।

ওয়াশিংমেশিন কিনে দিয়েছো।

কিন্তু তার অন্তরে তাকওয়ার ব্যবস্থা করেছো তো?

তার অন্তরকে আল্লাহভীতির অলংকারে সাজিয়েছো তো?

যদি তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসার অলংকার না থাকে, তার অন্তর যদি আল্লাহভীতি থেকে শূন্য থাকে তাহলে তো তার ঘর আবাদ হওয়া খুবই কঠিন হবে।

অনেকেই বলে, আমার ছেলে ব্যবসা ধরেছে। এখন তাকে বিয়ে করাতে হয়।

আমার ছেলে ডাক্তার হয়েছে। তাকে বিয়ে দিতে হয়।

কিন্তু আমি বলি, বিয়ে দেবে কিন্তু ছেলেকে মানুষ বানিয়েছো তো?

মা-বাবা কত আশা নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে, কত যত্ন করে তাদের কন্যাদেরকে লালন-পালন করে। আর ভবিষ্যতে হিংস্র স্বামীরা তাদের শাসনের দণ্ড দিয়ে এই কোমলমতি মেয়েদের জীবনকে দলিত-মথিত করে চুরমার করে দেয়। তাদের দেখে মনে হয়, যেন তারা ঘরের চাকরানী। আমাদের মেয়েরাও জানে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহর কি বিধান রয়েছে। জানে না স্বামীরাও। অথচ ঘরে ঘরে জ্বলছে আগুন। সুতরাং এটা মা-বাবার কর্তব্য। সন্তানকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কর্তব্য মা-বাবার। সন্তান যদি উঁচু আখলাক, উত্তম আদর্শ, আল্লাহর ভয় ও সহনশীলতার গুণাবলী নিয়ে গড়ে ওঠে তাহলে আর পরস্পরে কোন ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয় না। তারা জীবনের সকল সংকটকে তাদের চরিত্র, সহনশীলতা ও আল্লাহভীতির শক্তিতে সহজেই মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে এসব গুণে গুণান্বিত করার কথা ভাবি না।

হযরত ইসমাইল (আ.)-এর প্রতি দেখুন। মা হাজেরা তাঁকে মানুষরূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন তাঁকে জবাই করার জন্যে প্রস্তাব করেছেন তখন তিনিই উল্টো বাবাকে এই বলে পরামর্শ দিয়েছেন– আমার হাত-পা বেঁধে নিন যেন আমার নড়াচড়ার কারণে আপনার কষ্ট না হয়। তাছাড়া আপনি আপনার চোখও বেঁধে নিন এবং আমাকে কাৎ করে এমনভাবে শুইয়ে দিন যেন জবাই করার সময় আমার চেহারা আপনার নজরে না পড়ে। পাছে পিতৃত্বের মমতা যদি জেগে ওঠে তাহলে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হবে।

মাত্র ছয় বছরের শিশু। হাত-পা বেঁধে যখন তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দেয়া হলো হযরত ইবরাহীম (আ.) ছুরি বের করলেন। হৃদয়ের টুকরা সন্তানকে জবাই করবেন বলে তখন হয়তো আকাশের ফিরিশতাদের শ্বাসও রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কেঁপে ওঠেছিল সমগ্র জাহান। এ কী ঘটতে যাচ্ছে!

শানিত ছুরি! ছয় বছরের নিষ্পাপ শিশুর কোমল কণ্ঠ। তাছাড়া গলা তো এমনিতেও নরম হয়। ষাট বছরের মানুষের গলাও নরমই হয়। সেই কোমলকণ্ঠেই চলছে শানিত ছুরি। স্তব্ধ সমগ্র পৃথিবী। আল্লাহ তাআলা এই দৃশ্যই দেখতে চেয়েছিলেন। দেখতে চেয়েছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা কতখানি।

শানিত ছুরি যখন কোমল কণ্ঠ স্পর্শ করতে গেল তখনই আল্লাহর তাকদীর এসে দাঁড়িয়ে গেল মাঝখানে। তাকদীরের স্পষ্ট ফয়সালা, ইসমাইলের গলা কাটতে পারবে না। কেউ কেউ বলেছেন, ছুরি ও গলার মাঝখানে এক লোহা কিংবা তামার টুকরা রেখে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি বলি, কিছুই ছিল না। মাঝখানে ছিল আল্লাহর ফয়সালা। ছুরি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর হাতে থাকুক কিংবা থাকুক ফেরাউনের হাতে, যদি আল্লাহর ফয়সালা হয়, আল্লাহ তাআলা যদি রক্ষা করতে চান তাহলে ছুরি গলা কাটতে পারে না। ফেরাউনও মুসাকে মারতে পারে না। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছুরি চালিয়েছেন, কিন্তু হযরত ইসমাইল (আ.)-এর গলা কাটতে পারেননি। কারণ, আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ছিল ভিন্ন। একবার দুইবার তিনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গলা কাটছে না। দেখুন, এই হলো ঈমানের পরীক্ষা।

বাবা হযরত ইবরাহীম (আ.) চাইলে এই বলে ফরিয়াদ জানাতে পারতেন- হে আল্লাহ! আমার চেষ্টা তো করেছি, পরীক্ষা তো হয়েছে।

হযরত ইসমাইল (আ.) এ কথা বলতে পারতেন- বাবা! তোমার ছুরি যখন কাজ করছে না তখন আমাকে ছেড়ে দাও।

না, বাবাও এ কথা বলেননি, বলেননি পুত্রও। পুত্র বাবাকে উৎসাহিত করছেন আর বাবাও চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যখন কিছুতেই কাজ হচ্ছে না তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) নতুন করে ছুরিতে শান দিলেন। তারপর পুনরায় চেষ্টা করলেন। আর তখনই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন-

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করেছো। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। [সাফফাত : ১০৫]

অতঃপর মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা জিবরাইল (আ.)কে দিয়ে বেহেশত থেকে একটি দুম্বা পাঠিয়ে দিলেন। ইসমাইল (আ.)কে ছুরির নিচ থেকে সরিয়ে সেখানে দুম্বা শুইয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুম্বা জবাই হয়ে গেল।

জবাই হবার পর হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন চোখের বাঁধন খুললেন তখন লক্ষ্য করলেন, পুত্র ইসমাইল সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন আর সামনে জবাইকৃত অবস্থায় পড়ে আছে একটি দুম্বা। এ কারণেই আমাদের নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদায়ই একটি পুরুষ দুম্বা জবাই করতেন। একটি নিজের পক্ষ থেকে জবাই করতেন আর একটি জবাই করতেন তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে। মূলত হযরত ইসমাইল (আ.)-এর এই অভাবনীয় ঈমান, এই অভাবনীয় চরিত্র ছিল মা হাজেরার তরবিয়তের ফসল। এজন্য আমরা বলি, শুধু পুরুষরা নয়, মেয়েদেরকেও আল্লাহর রাস্তায় বেরোতে হবে। তাদেরকেও শিখতে হবে, কীভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে গড়ে তুলবে।

পুত্রের শাহাদাতে মায়ের দৃঢ়তা

সাহাবী হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ (রা.)কে ভণ্ড নবী মুসাইলামাতুল কাযযাব ধরে নিয়ে যায় এবং তাঁকে বলে– তুমি যদি শুধু একবার এ কথা বল আমি আল্লাহর রাসূল তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দিব। হযরত হাবীব (রা.) বললেন, এ কথা আমি কোনদিন বলতে পারবো না।

ক্ষিপ্ত মুসাইলামা তাঁর একটি হাত কেটে দিল। বললো, এখনও সুযোগ আছে, বলো আমি আল্লাহর নবী।

: বলবো না।

কেটে দিল দ্বিতীয় হাত। বললো, বলো এখনও সুযোগ আছে।

: বলবো না।

অতঃপর প্রথম পা, দ্বিতীয় পা কেটে দিল।

তারপর চোখ দুটো বের করে ফেললো।

তারপর কান দুটো কেটে দিলো।

অতঃপর জবাইকৃত ছাগলের শরীর থেকে যেভাবে চামড়া আলাদা করা হয় ঠিক সেভাবে তার হাড় থেকে গোশতগুলো আলাদা করে ফেলতে লাগলো। হযরত হাবীব (রা.) কুঁকরে কুঁকরে উঠছিলেন এবং এভাবেই জীবন দিয়ে দেন। তবুও মুখে স্বীকার করেননি মুসাইলামা আল্লাহর নবী।

যখন তাঁর এই বর্ণনাতীত কষ্ট ও শাহাদাতের খবর তাঁর মা হযরত উম্মে উমারা (রা.)-এর কাছে পৌছায় তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন–

لِهٰذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ

> এই দিনটির জন্যেই আমি তাকে দুধ পান করিয়ে ছিলাম।

একেই তো বলে মা। মা তো এভাবেই তার সন্তানকে তিলে তিলে গড়ে তুলে।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বাহিনী পবিত্র মক্কা শরীফে তাঁকে ঘেরাও করে ফেলে। অবশেষে তাঁর চারজন সঙ্গী ব্যতীত অবশিষ্ট সকলেই তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। তাঁর মা ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা.)। তিনি মায়ের কাছে যান। বলেন, মা! শত্রুপক্ষ সন্ধির প্রস্তাব দিচ্ছে। বলছে, সন্ধি কর। তাহলে জীবনে বেঁচে যাবে। উত্তরে হযরত আসমা (রা.) যে শব্দ ব্যবহার করেছিলেন সে শব্দ এত কঠিন যা আমি উচ্চারণ করার সাহস পাচ্ছি না। হযরত আসমা (রা.) তো মা ছিলেন। তাই এমন কঠিন কথা বলার অধিকার তাঁর ছিল। আমি যদি খুব সহজ শব্দে বলি তাহলে এভাবে বলতে হবে– তিনি বলেছিলেন, তুমি যদি দুনিয়ার জন্যে লড়াই করে থাক তাহলে তোমার এ লড়াই আমার জন্যে চরম আক্ষেপের বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যদি পরকালের জন্যে লড়াই করে থাকো তাহলে তোমার বেঁচে থাকা আর জীবন দিয়ে দেয়া উভয়টাই আমার জন্যে সমান। প্রাণ রক্ষার জন্যে অন্যায়ের সামনে মাথা নত করার সুযোগ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেন, মা! আমিও এ কথাই ভেবেছিলাম। তুমি আমাকে এ পরামর্শই দিবে।

إِنَّ فِي الْمَوْتِ رَاحَةٌ

মৃত্যুর মধ্যেও সুখ আছে।

এ কথা বলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ওঠে দাঁড়ান এবং বলেন, মা! জীবনের শেষবারের মতো আলিঙ্গন কর।

হযরত আসমা (রা.) যখন পুত্রকে জীবনের শেষবারের মতো জড়িয়ে ধরেন তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর শরীরে লৌহবর্ম অনুভব করেন। জামার নিচে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) লৌহবর্ম পরিধান করে রেখেছিলেন।

: এ কী পরেছো আবদুল্লাহ?

: লৌহবর্ম মা।

: কেন?

: আমি যদি শাহাদতবরণ করি, আমার ভয় হয় শত্রুপক্ষ আমার লাশ টুকরা টুকরা করে ফেলবে।

এ কথা শোনে হযরত আসমা (রা.) যে জবাব দিয়েছিলেন আজও তা আরবী সাহিত্যের বিরাট বড় সম্পদ হয়ে বেঁচে আছে। তিনি বলেছিলেন–

اَلشَّاةُ الْمَذْبُوْحَةُ الْعَجُوْلُ الْمُحَصَّلَةُ

বেটা! বকরি যখন জবাই হয়ে যায় তখন তার চামড়া তুলে নেয়ার দ্বারাতে তার কোন কষ্ট হয় না।

যাঁরা আল্লাহর পথে জীবন দেয়– বেটা! তারা তো লোহার সাহায্যও গ্রহণ করে না। তুমি আমার সামনে লৌহবর্ম খুলে ফেল।

আমাদের এ কালে মায়েরা যেমন তাদের সন্তানদেরকে বিয়ের বর সাজিয়ে দেয় সেকালে মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে শহীদের সাজে সাজিয়ে দিতো। আল্লাহর নামে জীবন দানের জন্যে আল্লাহ পথে পাঠিয়ে দিত।

এক দিকে চারজন আল্লাহর পথের সৈনিক। বিপরীত দিকে তিন হাজার হাজ্জাজের সৈন্য। সকাল থেকে নিয়ে আসর পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকে। কিন্তু কেউ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর কাছেও ঘেঁষতে পারেনি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) দুই হাতে তরবারী চালনায় ছিলেন দক্ষ। তাই তাঁর কাছে আসা মানে নিজেই নিজের মরণকে ডেকে আনা। আসরের পর শত্রুপক্ষ আবু কুবাইস পর্বতে ওঠে সেখান থেকে তোপের মাধ্যমে পাথর নিক্ষেপ করে। সে আবু কুবাইস পর্বতে এখন সৌদী বাদশাহদের মহল। পাথর এসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর মাথায় লাগে। ভারী পাথর। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মাথার রক্তে পাঞ্জা রঞ্জিত করে এই কবিতা আবৃত্তি করেন–

وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَا كُلُوْمِنَا

لٰكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ دِمَاءٌ،

কোমরের রক্তে গোড়ালি রঞ্জিত করার লোক আমি নই।

আমি তো আমার বুকের রক্তে পাঞ্জা সজ্জিত করি মেহেদির রঙে।

পরপর দুটি পাথর এসে মাথায় আঘাত করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ঘুরে পড়ে যান মাটিতে। তখন তাঁর বয়স সত্তর বছর। সত্তর বছর বয়সে মাত্র চারজন আল্লাহর সৈনিক লড়ে যাচ্ছেন তিন হাজার হাজ্জাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে। তিনি যখন মাটিতে পড়ে যান তখন সর্বশেষ তাঁর মুখ থেকে এই শব্দগুলো বেরিয়ে আসে–

اَسْمَاءُ اِنْ قُتِلْتُ لَا تَبْكِيْنِيْ

لَمْ يَبْقَ اِلَّا حَسَبِيْ وَدِيْنِيْ

আসমা! আমি যদি শহীদ হই কান্না করো না।

আমার দীন ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়নি।

শাহাদতের পর তাঁর লাশ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 'হাজুন' নামক স্থানে শূলিতে ঝুলিয়ে দেয়। সেখানে তাঁর লাশ এক সপ্তাহ পর্যন্ত ঝুলন্ত থাকে।

তৃতীয় দিন সে পথে যাচ্ছিলেন হযরত আসমা (রা.)। তিনি শূলিতে ঝুলন্ত পুত্রের লাশের দিকে তাকিয়ে বলেন–

'তোমার কি এখনও নামবার সময় হয়নি?'

আমাদের আজকালের মেয়েরা তো এটাও বুঝে না, সন্তানকে কিভাবে গড়ে তুলতে হয়। সন্তানকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার অর্থই বা কি। আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি নামাযী হয়ে যায় তাহলে আমরা মনে করি, তারা বুঝি গড়ে ওঠেছে। অথচ মানব জীবনে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন হলো আখলাক। তাই মা-বাবার কর্তব্য সন্তানের চরিত্র গঠনের প্রতি সর্বাধিক মনোযোগ নিবিষ্ট করা। মায়েরা তো আজকাল বুঝেই না, আর বাবাদের এসব বিষয়ে নজর দেয়ার সময়ই হয় না।

সন্তান প্রতিপালনের কয়েকটি মূলনীতি

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আল্লাহ তাআলা এমন কিছু গুণের কথা কুরআনে কারীমে উল্লেখ করেছেন যে গুণগুলো ব্যতীত কোন মানুষ পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে না। আমাদের কর্তব্য আমাদের সন্তানদেরকে এসব গুণের আলোকে গড়ে তোলা। যেমন- ইরশাদ হয়েছে–

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ

স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে তাঁর পুত্রকে বললো, হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। [লুকমান : ১৩]

সুতরাং আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো, আমাদের সন্তানদেরকে এই মানসিকতার উপর গড়ে তোলা– এই পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার কোন শরীক নেই। আমরা হয়তো প্রকাশ্য কোন শরীক আল্লাহ তাআলার সাথে

না। কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে আমরা নানা রকমের শিরকের শিকার হয়ে পড়ি। যেমন- আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্থেবিত্তে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। আমরা পার্থিব উপায়-উপকরণের উপর তাওয়াক্কুল করে থাকি। এগুলো স্পষ্ট শিরক না হলেও প্রচ্ছন্ন শিরক। সুতরাং সন্তানের মনের ভেতর শুরুতেই এ কথা বদ্ধমূলরূপে গড়ে তুলতে হবে- আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মালিক ও প্রভু নেই। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি কেবলই নিবদ্ধ থাকবে আল্লাহর প্রতি।

সেই সাথে আল্লাহ তাআলা মা-বাবার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের কথাও আলোচনা করেছেন। মা-বাবার আনুগত্য এবং তাদের প্রতি উত্তম আচরণের মহিমাও তুলে ধরেছেন। যেন সন্তান মা-বাবার গোলাম হয়ে জীবনযাপন করে। যেন তারা মা-বাবার বাড়াবাড়িকে বরদাশত করতে পারে এবং তাদের কোন আচরণের মুখে 'উফ্' শব্দটিও যাতে না করে। সেই সাথে আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে এই শিক্ষাও দিয়েছেন-

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। [লুকমান : ১৬]

হিসাব-কিতাব এবং পরকাল চিন্তা বান্দার হৃদয়পিঠে অংকিত করাই হলো এ বাণীর লক্ষ্য। অতঃপর তৃতীয় উপদেশ হিসেবে ইরশাদ হয়েছে-

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ

হে বৎস! যথাযথভাবে নামায আদায় কর। [লুকমান : ১৭]

চতুর্থ উপদেশ হিসেবে ইরশাদ হয়েছে-

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

সৎকর্মের নির্দেশ দাও আর অসৎকর্মে বাধা দাও। [প্রাগুক্ত]

তারপর বলেছেন–

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ

এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। [প্রাগুক্ত]

আর–

اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

নিশ্চয়ই এটাই হলো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। [প্রাগুক্ত]

এর উদ্দেশ্য হলো, এই কাজগুলো যেহেতু কষ্টসাধ্য তাই তাকে উৎসাহিত করা, এই মর্মে সাহস যুগানো যে কাজগুলো কঠিন হলেও সামান্য পরিশ্রমেই তুমি বড় মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। যেভাবে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে উৎসাহিত করে থাকি। ক'দিন একটু মনোযোগ দিয়ে কষ্টসহ লেখাপড়া কর। তাহলে বড় ডাক্তার হতে পারবে। বড় ধনী হতে পারবে। অথচ আমাদের উৎসাহ দান কত যে ভুল কত যে তুচ্ছ! আমাদের তো উচিত ছিল ক্ষণস্থায়ী এ দু'দিনের বড়ত্ব মহত্ত্ব ও মর্যাদার কথা তাদের বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত না করে সত্যিকার সফলতা মর্যাদা ও বড়ত্বের কথা তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা।

এক সার্থক তরবিয়ত

আমাদের এক বন্ধু নাম শামসুর রহমান। থাকেন জার্মানীতে। তার স্ত্রী একজন নওমুসলিম। তার হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারপর তাকেই বিয়ে করেছেন। তিনি তার বাচ্চাদেরকে এত সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন, তার বাচ্চার বয়স মাত্র চার বছর। অথচ তাদের ঘরে যদি কোন মেয়ে মানুষ আসে তাহলে সে 'মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষ' বলে দৌড়ে কামরার ভেতর চলে যায়। এতটুকু বয়সেই সে শিখে গেছে পর্দা করতে হবে। তাদের ঘরে বাচ্চারা যদি দুষ্টুমি করে তখন তাদের মা বাচ্চাদেরকে এই বলে শাসায়– দেখ, যদি বেশি দুষ্টুমি কর তাহলে কিন্তু

আমি তোমাদেরকে স্কুলে ভর্তি করে দেব এবং ডাক্তার বানাবো। তখন বাচ্চারা এই বলে কান্না করতে থাকে, না না! আমরা ডাক্তার হবো না। আমরা আলিম হবো। মা তার বাচ্চাদেরকে এই বলে ভয় দেখায়, যদি আমার কথা না শোন তাহলে আমি তোমাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবো। তখন বাচ্চারা এই বলে মায়ের কাছে আকুতি জানায়, আর দুষ্টুমি করবো না, তবু আমাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ো না। একেই বলে মুসলিম নারী। মুসলিম নারী তো তাদের আত্মার ধন সন্তানদেরকে এভাবেই গড়ে তুলে। কুরআনে কারীমে এই পথকেই বলা হয়েছে–

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

এটাই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। [লুকমান : ১৭]

আমাদের আরেক বন্ধুর কথা বলি। নাম মাওলানা বেলাল। আমরা রাইভেন্ডে একই সাথে লেখাপড়া করেছি। তার বাবা বাংলাদেশে থাকতেন। মূলত তারা ইন্ডিয়ার উত্তর প্রদেশের লোক। ১৯৫৫ কি '৬০ সালের কথা। তখন বাংলাদেশে তাদের টেক্সটাইল মিল ছিল। সে আমাকে বলেছে, একবার আমার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা হারিয়ে গেল। সে ১৯৬৪ সালের কথা। আমি ভেতরে ভেতরে খুব ভয় পাচ্ছিলাম। কারণ, টাকাটা হারিয়েছে আমার দোষেই। ভাবছিলাম, কখন আব্বা জিজ্ঞেস করে বসেন। এজন্য নির্ঘাত আমাকে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! আব্বা আমাকে একবারও টাকার কথা জিজ্ঞেস করেননি।

আমাদের মসজিদে প্রতিদিন ইশার পর তালিম হতো। একদিন আমি মসজিদে তালিমে না বসে ঘরে চলে এসেছি। আব্বা তখন ঘরে ফিরেই আমাকে খুব কঠিনভাবে শাসালেন। বললেন, কী হয়েছে তোমার? তালিমে বসোনি কেন? আমার বন্ধু বলেছিলেন, সেদিন আমি বুঝতে পেরেছি আমার আব্বার কাছে বিশ হাজার টাকার চাইতে একটি তালিমের মজলিস অনেক বেশি দামী। আমি বিশ হাজার টাকা খুইয়েছি। এর জন্য তিনি আমাকে একটি শব্দ বলেননি। কিন্তু একদিন তালিমে বসিনি বলে তিনি আমাকে শক্তভাষায় শাসন করেছেন। এই হলো সত্যিকার বাবা রূপ। সত্যিকার বাবার তো তিনিই যিনি তার সন্তানের ভবিষ্যত দেখেন এবং সন্তানের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সর্বদা সতর্ক থাকেন।

আখলাকের গুরুত্ব

কুরআনে কারীমে তারপর যে বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে তা হলো আখলাক। আমাদের ভাষায় যাকে আমরা 'একরামুল মুসলিমীন' বলি। আখলাক বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ, হযরত লুকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে ঈমান সম্পর্কে বলেছেন একটি বাক্যে, আখিরাত সম্পর্কে বলেছেন দুটি বাক্যে, নামায সম্পর্কে একটি বাক্যে আর আখলাক সম্পর্কে ব্যবহার করেছেন তিনটি বাক্য। ইরশাদ হয়েছে−

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ

আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। [প্রাগুক্ত]

لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। [লুকমান : ১৮]

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ

তুমি সংযতভাবে পদক্ষেপ করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো। নিশ্চয়ই সুরের মধ্যে গাধার সুরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। [লুকমান : ১৯]

এখানে লক্ষ্যণীয় হলো, আখলাক সম্পর্কে পর পর ছয়টি বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রে যেভাবে প্রথমে সহজ প্রশ্ন করা হয়, সবশেষে রাখা হয় কঠিন প্রশ্ন। উদ্দেশ্য যেন সহজ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে দিতে প্রশ্নোত্তর বিষয়টা পরীক্ষার্থীর কাছে সহনীয় ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বাস্তব পক্ষেও ঈমান, আখিরাত এবং নামায রোযার চাইতে অনেক বেশি কঠিন হলো উত্তম চরিত্র। কঠিন বলেই এটাকে সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া তাঁর কিতবুত্ তাওয়াক্কুল নামক গ্রন্থে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এক সাহাবী বলেছেন– আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে বিভিন্ন গুণ বন্টন করেছেন। তন্মধ্যে দুটি গুণ আসমান থেকে আল্লাহ্ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন খুব স্বল্প পরিমাণে। একটি হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আর অপরটি হলো উত্তম চরিত্র।

আমরা জানি, বাজারে যে জিনিস কম পাওয়া যায় সে জিনিসের মূল্য থাকে বেশি। আমাদের ইসলামী শরীয়তেও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও উত্তম চরিত্রের মূল্য এই কারণে অন্য সব কিছুর চাইতে বেশি। আমরা মূলত চাই আমাদের সাথীরা জামাতবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে ঘুরে ঘুরে এই্ কাঙ্ক্ষিত চরিত্র অর্জন করুক।

মানব জীবনের এক পরম সম্পদ হলো উত্তম চরিত্র। সমাজ জীবন এমন কি আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারও অর্থ-বিত্ত কিংবা শক্তিতে চলে না। চলে উত্তম চরিত্রে। যদি ঘরে শত অভাবও থাকে আর ঘরে সকলের মধ্যে থাকে চরিত্রের ধন তাহলে সে ঘরে আর কিছু না থাকলেও সুখ থাকে, সম্প্রীতি থাকে। তাই মা-বাবার প্রধান কর্তব্য হলো সন্তানকে চরিত্রের ধনে ধনী করে তোলা।

আমাদের কাছের একটি গল্প বলি। আমাদের এক আত্মীয়। আত্মীয় খুব কাছের না হলেও আমার বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি ছিলেন ইন্সপেক্টর। দেখতে যেমন সুন্দর তেমনই শরীরের গঠন আকৃতি। উচ্চতা সাড়ে ছয় ফুট। গায়ের রঙ ঈষৎ লালবর্ণ। তার মা আমাদের খান্দানের এমন একটি মেয়ের সাথে তাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছিল যাকে সকলেই শ্রীহীন হিসেবে জানতেন। আমাদের সে আত্মীয় আমার বাবার সাথে পরামর্শ করলো। বললো, দেখ আমি এখন কী করবো? যদি মায়ের কথা মানি তাহলে আমার জীবনে কখনও এই বিপদ থেকে আমি মুক্ত হতে পারবো না। আর যদি মায়ের কথা না রাখি তাহলে তিনি আজীবন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। আমার বাবা পরামর্শ দিলেন মায়ের কথাই মেনে নাও। আমাদের সে আত্মীয় বললো, ঠিক আছে তুমি যখন বলছো মায়ের কথাই মেনে নিচ্ছি। তাদের বিয়ে হয়ে গেল। তার স্ত্রীর নাম ছিল নূর বিবি। কিন্তু তাদের জীবন ছিল এমন, নূর বিবি যদি ঘরের ভেতরে

থাকে তাহলে তার স্বামী বাইরে। নূর বিবি বাইরে থাকলে স্বামী ঘরে। কোনভাবেই তাদের মধ্যে খাপ খাচ্ছিল না। সে বেচারা ছিল দেখতে শুনতে যেমন সুন্দর সুপুরুষ তেমনই উচ্চ শিক্ষিত বড় অফিসার। আর তার স্ত্রী? সম্পূর্ণ বিপরীত। দেখতে শুনতে কুশ্রী তার উপর অশিক্ষিত। কিন্তু নূর বিবি চরিত্র বিচারে ছিল সত্যিই নূর। তাই সে তার উচ্চ শিক্ষিত সুন্দর সুপুরুষ স্বামীর জন্যে নিজেকে স্ত্রী হিসেবে উপস্থাপন না করে একজন পরিপূর্ণ দাসীরূপে সঁপে দিল। স্বামী পুলিশ অফিসার। ঘরে ফিরে গভীর রাতে। স্ত্রী তার ঘরে ফেরা পর্যন্ত তার অপেক্ষায় থাকে। যখন ফিরে আসে তখন তাকে তাজা রুটি বানিয়ে খেতে দেয়। শোয়ার পর তার শরীর টিপে দেয়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগেই তার জুতা পলিশ করে কাপড়-চোপড় প্রস্তুত করে রাখে। এভাবে অবিরাম তিন বছরের সাধনার দ্বারা তার শরীরের কুশ্রী রূপকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করে ফেলে অবশেষে তার স্বামীই তার গোলাম বনে যায়।

নূর বিবির কথা আমাদের মনে নেই। কারণ, আমরা তখনও ছোট। এতটুকু মনে পড়ে, নূর বিবি যখন মারা যায় তখন তার তিন সন্তানকে জড়িয়ে ধরে তার স্বামী এমনভাবে কাঁদতো যেন মা-হারা এক ছোট শিশু। নূর বিবির ইন্তেকালের পর আমাদের সে অফিসার আত্মীয় তার বংশেরই আরেক রূপসী নারীকে বিয়ে করলেন। আমরা দেখেছি, এই রূপসী নারীকে বিয়ে করার পর আজীবন সে কপাল চাপড়ে ফিরেছে এবং নূর বিবি নূর বিবি বলে মাতম করতে করতে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে।

এজন্য আমি বলি, সৌন্দর্য দিয়ে জীবন গড়ে না। পরিবারে সুখ আসে না রূপের পাখায় ভর করে। পরিবারের সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় চরিত্রের দ্বারা। তাই নিজেদের ছেলে-মেয়েদেরকে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান করে তোলা মা-বাবার প্রধান কর্তব্য। অথচ আমরা তো অর্থ সঞ্চয়ের চক্করে পড়ে থাকি। আমরা মনে করি, সন্তানের জন্যে যদি টাকা-পয়সা সঞ্চয় করে রেখে যেতে পারি তাহলেই আমাদের সন্তানরা সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে। আমাদের এই ধারণা ভুল।

আমি এখানে সংক্ষেপে যে ছয়টি কথা আরয করেছি এর প্রতিটি কথাই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কিন্তু এখানে সেই ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। তবে আমি আমাদের মা-বোনদের পরামর্শ দেবো, তারা যেন প্রতিদিন কুরআনে কারীমের এই রুকুটিই তিলাওয়াত করেন। কারণ, এই রুকুটিতে আমাদেরকে এই মর্মে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে কি শিখাবো এবং তাদের জীবনের লক্ষ্য কি হবে? যদি এই লক্ষ্যগুলো আমরা আমাদের সন্তানদের হৃদয়ে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারি তাহলে আমাদের সন্তানরা দৃশ্যত যেমনই দেখাক তারা বাদশাহ হয়ে গড়ে ওঠবে। এই দুনিয়াতে কে কি লাভ করবে সে তো তার ভাগ্যের ব্যাপার। কোন মা-বাবাই সন্তানের ভাগ্য নির্মাণ করতে পারে না।

ভাগ্যের গল্প

এক জেলে ছিল। তার নাম ছিল আবু শুজা। সে মাছ ধরছিল। তার সঙ্গে ছিল তার তিন পুত্র। তাদের পাশ দিয়ে ইরানের ইউলিয়াম নামে এক জ্যোতিষী যাচ্ছিল। আবু শুজা তাকে দেখে বললো, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, ব্যাখ্যা বলে দাও। জ্যোতিষী বললো, কী স্বপ্ন বলো?

আবু শুজা বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম প্রস্রাব করছি। আমার প্রস্রাব থেকে একটি আগুন বেরিয়ে উপরে চলে গেল এবং সেখানে গিয়ে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের রূপ ধারণ করলো। সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে আরও তিনটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসলো। আবার সেগুলোর উপরও ছিল ছোট ছোট অনেক শিখা। জ্যোতিষী স্বপ্ন শোনার পর আবু শুজাকে বললো, একদা তোমার এই তিন ছেলে বাদশাহ হবে।

এ কথা শোনার পর আবু শুজা খেপে যায়। সে পায়ের জুতা খুলে জ্যোতিষীকে ধাওয়া করে এবং ছেলেদেরকেও বলে, ধর এই বদমাশকে, গরীব বলে আমাদের সাথে ঠাট্টা করছে। সত্যি সত্যি চার বাপ-বেটা মিলে জ্যোতিষীকে খুব ধোলাই করে। কিন্তু জ্যোতিষী তার সিদ্ধান্তে অটল। সে বললো, আমাকে যতই মার তোমরা একদিন বাদশাহ হবে। অনেক উত্তম-মধ্যমের পরও যখন জ্যোতিষীর একই বোল তখন আবু

শুজা বললো, ঠিক আছে। একে পেটাই তো কম করিনি, এবার কিছু মাফ দিয়ে দাও।

এই ঘটনার বিশ বছর পর এই তিন পুত্র সত্যি সত্যিই ইসলামী সাম্রাজ্যের বাদশাহ হয়েছিল। রুকনুদ্দৌলাহ, মুইজুদ্দৌলাহ, ইজ্জুদ্দৌলাহ। তাদের পর তাদের খান্দানে একশ' বিশ বছর পর্যন্ত রাজত্ব ছিল। তাদের মধ্যে রুকনুদ্দৌলাহ ছিল অত্যন্ত সফল ও স্বার্থক শাসক। সুতরাং মা-বাবা কখনও সন্তানের ভাগ্য নির্মাণ করতে পারে না। ভাগ্য তকদীরে যা আছে তাই হবে। মা-বাবা পারে সন্তানের চরিত্র নির্মাণ করতে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, আমাদের সন্তানদেরকে উত্তম আখলাকে গড়ে তোলা। বিশেষভাবে লুকমান হাকীম তার সন্তানকে যে ছয়টি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন– ঈমান, আখিরাত, নামায, সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধাদান, ধৈর্য ও উত্তম চরিত্র– এ বিষয়গুলোর উপর যত্নবান করে আমাদের সন্তানদেরকে গড়ে তোলা আমাদের প্রধান কর্তব্য। বিশেষ করে মেয়েদের যেহেতু জামাতের সাথে নামায পড়ার বিশেষ কোন পাবন্দী নেই তাই তাদের উচিত, তাদের সন্তানরা মসজিদে গিয়ে যথাযথভাবে নামায আদায় করছে কি না সে দিকে লক্ষ্য রাখা এবং তারা পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে নামায পড়তে শিখছে কি না, তাদের চরিত্র কাঙ্ক্ষিতরূপে গেড় উঠছে কি না– এ সব বিষয়ের প্রতি সযত্ন লক্ষ্য রাখা মায়েরই কাজ। আল্লাহ তাআলা আমাদের মা-বোনদেরকে এসব বিষয়ে যত্নবান হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন। ✿

বয়ান : ১২

দীন প্রচারে নারীর অবদান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مُلْكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন— হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাবান তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। [হুজুরাত : ১৩]

নারীর কর্তব্য

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেবো। [নাহল : ৯৭]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّخَيْرُ مَتَاعِهَا اِمْرَاَةٌ صَالِحَةٌ

দুনিয়া হলো একটি সম্পদ। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো সৎ নারী।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে, স্বীয় গুপ্তাঙ্গের হেফাজত করবে, স্বীয় স্বামীর আনুগত্য করবে সে বেহেশতের যে দরোজা দিয়ে খুশি প্রবেশ করবে।

কুরআনের প্রশ্ন

এই যে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি প্রচণ্ড এই গরমের ভেতর আমাদের এই বিশাল সংখ্যক ইজতেমা যেন শুধুমাত্র একত্রিত হওয়াঃ অতঃপর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার উদ্দেশ্যেই না হয় এ জন্য আমরা এখানে

কিছু জরুরি কথা বলবো। উদ্দেশ্য, আমরা যেন একটি লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি। কুরআনে কারীম বড় সুন্দরভাবে আমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। এই প্রশ্ন পৃথিবীর প্রতিটি নারী ও পুরুষের জন্যেই। প্রথম প্রশ্ন হলো–

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ

তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে? [তূর : ৩৫]

অর্থাৎ তোমরা কি কোনরূপ স্রষ্টা ব্যতীত নিজে নিজেই সৃষ্টি লাভ করেছো? এই স্কুল, এই কলেজ, এই বিশাল বিশাল অট্টালিকা– এগুলোর কি কোন সৃষ্টিকর্তা নেই?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো–

أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? [প্রাগুক্ত]

তৃতীয় প্রশ্ন–

أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

না কি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? [তূর : ৩৬]

এরপর বক্ষমান সূরাটিতে আরও অনেক প্রশ্নই উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু আমার আলোচনা উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বিধায় আমি আর অতিরিক্ত প্রশ্ন এখানে উল্লেখ করছি না।

এখানে আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করছেন, জঙ্গলের গাছ-গাছালির মতো কিংবা পথের পারে পতিত পাথরের মতো তোমরা কি নিজে নিজেই সৃষ্টি লাভ করেছো যে, তোমরা তোমাদের মর্জিমত জীবনযাপন করবে? তোমরা তোমাদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে না? যদি সত্যিই তোমরাই তোমাদের স্রষ্টা হয়ে থাকো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যদি তোমরাই সৃষ্টি করে থাকো তাহলে তো সন্দেহ নেই, তোমরা স্বাধীন। যেভাবে খুশি জীবনযাপন করতে পারো। এই পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে তোমরা যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারো। তখন আর শরাব হারাম হওয়ার কোন

বিষয়ও নেই, আর দুধ হালাল হওয়ারও কোন কথা নেই। তখন বিয়ে ও ব্যভিচারের মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য নেই পর্দা ও বেপর্দার মাঝেও। তখন নামাযী ও বেনামাযীর মাঝে কোন তফাত নেই, তফাত নেই সত্য-মিথ্যার মাঝেও। সতী-অসতীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য নেই লজ্জাবতী ও নির্লজ্জ নারীর মধ্যেও। তখন তোমাদেরকে জুলুম ও ইনসাফের কথা বলারও কারও কোন অধিকার নেই। আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত আয়াতে যেন এ কথাই বলতে চাচ্ছেন, যদি তোমাদের সৃষ্টি স্রষ্টা ব্যতীত হয়ে থাকে কিংবা তোমরা নিজেরাই যদি নিজেদের স্রষ্টা হয়ে থাকো, আর তোমরাই যদি সৃষ্টি করে থাকো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে তাহলে আমি সরে যাচ্ছি। তোমাদের যা খুশি তোমরা তাই কর।

ঘুম থেকে এক নারী জেগেই দেখে তার পাশে শুয়ে আছে নাদুস-নুদুস চাঁদের মতো একটি শিশু। ঘুম থেকে জেগে দেখে তার পাশে পড়ে আছে স্বর্ণমুদ্রার বিশাল স্তুপ। ঘুম থেকে ওঠেই দেখে তার পাশে প্রস্তুত হয়ে আছে বিচিত্র খাবারের দস্তরখানা। বলুন, এমন কি কোথাও হয়? হয় না। কেন হয় না?

এই যে আমি, আমিই তো আমাকে সৃষ্টি করিনি। যদি আমিই আমার সৃষ্টিকর্তা হতাম তাহলে আমাকে আমি আরও অনেক সুন্দর করে সৃষ্টি করতাম এবং কোন রাজার ঘরে আমার জন্ম হতো।

তাহলে প্রশ্ন হয়, আমাকে কে বানিয়েছে? আর এই বিশ্ব জাহানকে যদি আমি না বানিয়ে থাকি তাহলে কে বানিয়েছে? তাছাড়া আমি তো একটি ছিন্ন তৃণও সৃষ্টি করতে পারি না। গাছ বানাবো কি করে? আমি তো একটি পরমাণুও বানাতে অক্ষম। এই বিশাল পৃথিবী বানাবো কি করে? আমি একটি পাথরও সৃষ্টি করতে পারি না। এই হিমালয় পর্বত বানাবো কি করে? এক ফোঁটা পানিও তো আমি সৃষ্টি করতে পারি না। এই বিশাল সমুদ্র বানাবো কি করে? আমি তো গাছের একটি পাতাও বানাতে পারি না। তাহলে এই বিচিত্র ফুল-ফল কিভাবে বানাবো? আমি তো পাখির একটি পালকও বানাতে পারি না। এই সুন্দর ময়ূর বানাবো কি করে?

মানুষ বলে, আমি নিজে নিজে সৃষ্টি হইনি। তাছাড়া আমি আমার সৃষ্টিকর্তাও নই। এই আকাশ ও পৃথিবীও আমি সৃষ্টি করিনি। তাহলে কে সৃষ্টি করেছে? এটাই প্রশ্ন। অনুসন্ধান করে দেখ, তোমাকে, এই পৃথিবীকে, এই আকাশমণ্ডলীকে কে সৃষ্টি করেছে?

যে নারী এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারেনি সে ধ্বংস হয়ে গেছে। ধ্বংস হয়েছে সে পুরুষও যে পুরুষ এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পায়নি। প্রতি ক্লাসে গোল্ড মেডেল অর্জন করেছে এবং প্রথম শ্রেণীতে মাস্টার্স করে পিএইচডি করেছে। কিন্তু সে যদি এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজে না পেয়ে থাকে আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে পারি, তার জীবন ব্যর্থ, তার জীবন অর্থহীন। সে ব্যর্থ এই পৃথিবীতে এবং পরকালে।

প্রথম প্রশ্ন : তোমাকে কে বানিয়েছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন : কেন বানিয়েছে?

এই দুঃখ-বেদনার জগতে কেন এসেছো? যেখানে প্রতি মুহূর্তে কষ্ট ও যাতনার গল্প জন্মগ্রহণ করে, যেখানে সেকেন্ডে সেকেন্ডে শত সহস্র কষ্টের কাহিনী প্রসব করে, যে কাহিনী কাঁদায় মানবতাকে, যে কাহিনী কেঁদে কেঁদে হারিয়ে যায় মাটির নীচে। যেখানে পদে পদে কষ্ট, যেখানে পদে পদে আশঙ্কা। কুরআনে কারীম প্রশ্ন তুলেছে সেই পৃথিবীতে তুমি কি কোনরূপ স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছো? তোমাকে এই পৃথিবীতে কে পাঠিয়েছে, কেন পাঠিয়েছে?

এই প্রশ্ন তুলেছে স্বয়ং কুরআন। তাই আমরা এর জবাবও অনুসন্ধান করবো কুরআনেই। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا

কাল প্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। [দাহর : ১]

তারপর কি করে তার সৃষ্টি হলো? সে কাহিনী শোনাচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। ইরশাদ হচ্ছে–

أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

যারা কুফুরী করে তারা কি ভেবে দেখে না, আকাশ ও পৃথিবী মিলিত ছিল ওৎপ্রোতভাবে। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিয়েছি। [আম্বিয়া : ৩০]

আল্লাহর পরিচয়

এই আকাশ ও পৃথিবী কিছুই ছিল না। কে ছিল? একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছিলেন। তিনি অনাদিকাল থেকে আছেন, অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবেন। শুরুতেও তিনি, শেষেও তিনি। প্রকাশ্যেও তিনি, গোপনেও তিনি। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি চির প্রতিষ্ঠিত। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল বাদশাহর বাদশাহ। সব রকমের ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র তিনি। তাঁর সূচনা নেই, শেষও নেই। তিনি আদি-অন্ত কোন কিছুর মুহতাজও নন। এই বিশ্ব জাহানে একমাত্র আল্লাহই এমন সত্তা যিনি অনাদি অনন্ত। তিনি স্থান ও কালের উর্ধ্বে এবং রূপ ও বদনের উর্ধ্বে। তাঁর স্ত্রী-সন্তান নেই। তিনি স্ত্রী-সন্তান, কিতাব, নবী-রাসূল, জান্নাত-জাহান্নাম, জিবরাইল মিকাইল কারও প্রতিই ঠেকা নন। তিনি বিশেষ কোন আসনে সমাসীনও নন। তবে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাঁকে ঘুম-তন্দ্রা পায় না। তিনি সকল দিক ও স্থান থেকে পবিত্র। কোন গাফলত কিংবা অলসতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি কোন কিছুর ভয়েই ভীত নন। রাত দিন আরশ ফরশ আগুন পানি সবকিছু তাঁর জন্যে সমান। তিনি সকল মানুষের বাদশাহ। তিনি জিনদের বাদশাহ। তিনি সমুদ্রের বাদশাহ। পাহাড়-পর্বতের বাদশাহ। বাতাসের বাদশাহ। সোনা-রূপার বাদশাহ। আকার আকৃতির বাদশাহ। রূপ-সৌন্দর্যের বাদশাহ। সকল অট্টালিকার বাদশাহ। জল-স্থল ও অন্তরীক্ষের বাদশাহ। শূন্যে উড়ন্ত পাখি জগতের বাদশাহ। পৃথিবীতে আপতিত বৃষ্টির ফোঁটাসমূহের বাদশাহ। ফুটন্ত কুসুমের বাদশাহ। সাহসী ঈগলের বাদশাহ। সাপ ও সাপের মধ্যে সৃষ্ট বিষের সৃষ্টিকর্তা। ঝিনুকের গর্ভে প্রসবিত মোতির অধিপতি। মাছের থুথুকে আম্বরে রূপান্তরকারী বাদশাহ। তিনিই মৌমাছির মুখে পানি ঢেলে দিয়ে তাকে মধু বানান। রেশমী পোকাকে পানি পান করিয়ে তা থেকে রেশম উৎপাদন করেন। তুচ্ছ পানির ফোঁটা থেকে তিনিই হরিণের ভেতরে মেশক তৈরি করেন। তিনিই তৈরি করেন সুন্দর সুস্বাদু আম।

তিনিই তো আল্লাহ, যাঁর নির্দেশে একই পানিকে কখনও আম বানান, কখনও ডালিম। কত শক্তিশালী তিনি! তাঁর নির্দেশে গাছের ছোট ছোট ডালা ছেয়ে যায় ডালিমে ডালিমে। বাইরে থেকে দেখতে শক্ত এবং মুখে দিলে তিতে। অথচ যখন কাটা হয় তখন তার ভেতরে কত সুন্দর রসপূর্ণ দানা। সারি সারি সজ্জিত। মনে হয় যেন মূল্যবান মণি-মুক্তা। একটি সাদা ডালিম ফাটিয়ে দেখলে মনে হবে যেন কেউ হীরা-জহরত সারি সারি সাজিয়ে রেখেছে। এসব তো আল্লাহ তাআলারই দান। তিনিই এ ডালিমের দানা সৃষ্টি করছেন। কোনটাকে করছেন লাল, কোনটাকে সাদা। অতঃপর তা পূর্ণ করে দিচ্ছেন সুস্বাদু রসে। যেন বান্দা এই বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখে বলতে পারে, তার সৃষ্টিকর্তা কেমন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

এটা আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি ব্যতীত অন্যরা কী সৃষ্টি করেছে, আমাকে দেখাও। [লুকমান : ১১]

অর্থাৎ তোমার চারপাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই যে অফুরন্ত সৃষ্টি মেলা– এ সব তো আমারই সৃষ্টি। বলো, তোমাদের প্রভু ব্যতীত আর এমন কেউ আছে কি যে এমন কিছু সৃষ্টি করে দেখাতে পারে? আমি একই পানি থেকে ডালিম বানিয়েছি। এই পানি থেকেই পেয়ারা বানিয়েছি, এই পানি থেকেই ঝিনুকের গর্ভে মোতি সৃষ্টি করেছি। হরিণের গর্ভে সৃষ্টি করেছি কস্তুরী। এই পানি থেকেই আমি মধু সৃষ্টি করেছি। আর হে মানুষ! তুমিও তো একদা পানির ফোঁটাই ছিলে।

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى

সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? [কিয়ামা : ৩৭]

মানুষ পানির পূর্বে কি ছিল?

مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ

মৃত্তিকা উপাদান থেকে। [মু'মিনূন : ১২]

অর্থাৎ মানুষ পানির পূর্বে ছিল মৃত্তিকা। মাটি থেকে উৎপাদিত হয়েছে খাবার। সে খাবার থেকে সৃষ্টি হয়েছে শরীরের নানা উপাদান। সে

উপাদান থেকে সৃষ্টি হয়েছে পানি। আর সেই পানি থেকে এই সুন্দর অবয়বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি হে মানুষ।

إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ

আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। [হুজুরাত : ১৩]

يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا

তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা যাকে খুশি দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। [শূরা : ৪৯-৫০]

সুতরাং কে সৃষ্টি করেছে আমাদেকে- এর জবাব আমরা এখানে পেয়ে গেছি। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলে দিয়েছেন, তিনিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন-

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী। আর ভূমি আমিই তাকে বিছিয়ে দিয়েছি। আমি কত সুন্দর প্রসারণকারী। [যারিয়াত : ৪৭-৪৮]

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا

পাহাড়কে তিনিই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। [নাযিয়াত : ৩২]

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا

তিনিই তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তৃণ। [নাযিয়াত : ৩১]

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّاo وَعِنَبًا وَقَضْبًاo وَزَيْتُونًا وَنَخْلًاo وَحَدَائِقَ غُلْبًاo

> আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি, অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি এবং তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য। দ্রাক্ষা, শাক-সবজি, যাইতুন, খেজুর বহু বৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান। [আবাছা : ২৫-৩০]

এই পৃথিবী তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই পানি প্রবাহিত করেছেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন তিনিই। তিনিই মাটিকে বিদারিত করেছেন, তিনিই ফল-মূল উৎপন্ন করেছেন, এ বিশাল পৃথিবীকে তিনিই বিছিয়ে দিয়েছেন। চাঁদ ও সূর্যের প্রদীপ জ্বেলেছেন তিনিই। অতঃপর তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِo الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَo فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ o

> হে মানুষ! তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাকে কে বিভ্রান্ত করলো? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন। যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। [ইনফিতার : ৬-৮]

কুরআনে কারীমের সম্বোধন দেখুন! এখানে সম্বোধন করেছে 'ইনসান'। 'হে মানুষ' বলে। পুরো কুরআনে কারীমে দুইবার আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতিকে 'হে মানুষ' বলে সম্বোধন করেছেন। এই সম্বোধন খুবই চমৎকার। এখানে আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র মুসলমানগণকে লক্ষ্য করে কথা বলেননি। বরং পৃথিবীর সকল মানুষকে লক্ষ্য করে কথা বলেছেন। সে চাই মুসলমান হোক কিংবা কাফের। কমিউনিস্ট হোক কিংবা সোস্যালিস্ট। সৎ হোক কিংবা অসৎ।

কুরআনে কারীমের এই আয়াত যখন আমি পড়ি তখন আমার কল্পনায় এক মমতাময়ী মায়ের চিত্র ভেসে ওঠে। আমার কাছে মনে হয়, যেন এক মমতাময়ী মা তার সন্তানের পিঠে হাত রেখে তাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন। বলছেন, আমার প্রিয় সন্তান! তুমি কি আমার সম্পর্কেও ভ্রান্ত ধারণায় ডুবে আছো? পৃথিবীর কোন মা তার সন্তানের অকল্যাণ কামনা করতে পারে না। মাকে যদি টুকরো টুকরো করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হয় তাহলে তাদের কর্তিত শরীর থেকে সন্তানের জন্যে কল্যাণ কামনাই উচ্চারিত হতে থাকবে। আর সে সন্তানই যদি তার মা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয় তখন মায়ের মনে কী ব্যথা অনুভূত হয় সে কথা একজন মা-ই বলতে পারবেন। কুরআনে কারীমের এই আয়াত যখন আমি তিলাওয়াত করি তখন আমার কাছে মনে হয় যেন আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বান্দার কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন এবং বলছেন- হে আমার বান্দা! শেষ পর্যন্ত তুমি আমার সম্পর্কেও বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে?

اَلَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ

যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন। যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।

মানুষের বেড়ে ওঠার কাহিনী

এক সময় তুমি কিছুই ছিলে না। ছিলে নাপাক পানি। সেখান থেকে তোমার হাড় সৃষ্টি করেছি, গোশত সৃষ্টি করেছি, তারপর চামড়ার আবরণ দিয়েছি। অতঃপর তোমাকে এক দৃষ্টি নন্দন আকৃতিতে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছি। সে কথা তুমি ভুলে গেছো? তুমি এও ভুলে গেছো-

لَا لَكَ سِنٌّ تَقْطَعُ وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِىْ

তোমার খাবার কেটে খাওয়ার মতো দাঁত ছিল না। ধরার মতো হাত ছিল না এবং হেঁটে যাওয়ার মতো পায়ে শক্তি ছিল না।

তুমি চলতে পারতে না। নিজের প্রয়োজনের কথা কাউকে বলতেও পারতে না।

جَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِيْ صَدْرِ اَبَوَيْكَ

তখন আমি তোমার মা-বাবাকে তোমার প্রতি দয়াপরবশ করে দিয়েছি।

তখন তোমার প্রয়োজন চিন্তায় তোমার বাবা অস্থির ছিল। অস্থির ছিল তোমার মা।

لَا يَشْبِعَانِ حَتّٰى تَاْكُلَ وَلَا يَنَامَانِ حَتّٰى تَرْقُدَ

তুমি খেয়ে তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা খেতো না। তুমি না ঘুমানো পর্যন্ত তারা ঘুমাতো না।

তোমার কান্নার আওয়াজ কানে পড়লে তাদের হাত থেকে খাবার পড়ে যেতো। তাদের হৃদয় চিরে তোমার জন্যে 'আহা' বেরিয়ে আসতো। তোমার সামান্য ব্যথাতুর উচ্চারণ তাদেরকে মুহূর্তে অস্থির করে তুলতো। এ ব্যবস্থা কে করেছে? যদি তোমার মা-বাবার হৃদয়ে তোমার প্রতি আমি এই দরদভরা আকুতি সৃষ্টি না করতাম তাহলে তারা রাত জেগে তোমাকে পাহারা দিতো না। তোমার প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করতো না। নিজে তোমার প্রস্রাবের ওপর শুয়ে থেকে তোমাকে শুকনো জায়গায় শুতে দিতো না। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে তোমাকে খেতে দিতো না। প্রচণ্ড খরার দিনে দুপুরের তপ্ত রোদে গিয়ে মজদুরী খেটে তোমার মুখের খাবার সংগ্রহ করতো না। রাতের মধুর ঘুম পদদলিত করে গিয়ে তোমার জন্যে খাবার গরম করতো না। তোমাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্যে এই ব্যবস্থা তো আমি করেছি। তোমার প্রতি তোমার মা-বাবার অসীম ভালোবাসা তো আমারই সৃষ্টি। যদি তাদের হৃদয় থেকে আমি এই ভালোবাসা ছিনিয়ে নিতাম তাহলে তোমার মা-বাবা তোমার প্রতি সেই বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুর মতোই হয়ে পড়তো, যে সাপ নিজেই নিজের সন্তানকে খেয়ে ফেলে। কিন্তু আমি তোমাকে লালন-পালনের এই আয়োজন করেছি। তুমি কি জান সর্বপ্রথম আমি কোথায় তোমার জন্যে

খাবারের ব্যবস্থা করেছি? তোমার জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করেছি তোমার সবচাইতে কাছে। তোমার সবচাইতে কাছের আশ্রয়টিই ছিল তোমার খাবারের উৎস। আমি তোমার মায়ের স্তনকে তোমার জন্যে ঝর্না বানিয়ে দিয়েছি। গরমের সময় তোমার মায়ের দুধকে আমি ঠাণ্ডা করে দিই, আবার শীতের সময় দিই গরম করে। আমাকে এক চিকিৎসাবিজ্ঞানী বলেছেন, কেউ যদি তার যৌবনকে অন্যায়ভাবে নষ্ট না করে তাহলে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সে তার মাতৃদুগ্ধের শক্তি অনুভব করবে। পৃথিবীর সকল দুধের মধ্যেও সে পরিমাণ শক্তি নেই যে পরিমাণ শক্তি আল্লাহ তাআলা মায়ের দুধের মধ্যে রেখেছেন।

এত কিছু করার পরও যদি কোন নারী আল্লাহকে সিজদা করতে অস্বীকার করে, কোন যুবক যদি আল্লাহর সামনে মাথানত করতে অস্বীকার করে- যখন কারও দৃষ্টি আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন করে, কোন নারী যখন পর্দাকে উপেক্ষা করে তখন এই আয়াতটি তার কাঁধে হাত দিয়ে যেন শক্তভাবে ঝাঁকুনি দেয় এবং বলে- হে আমার বান্দা! আমি কি তোমাকে সৃষ্টি করিনি? কেন তুমি আমার বিদ্রোহী হয়ে পড়লে? আমি তোমার বেড়ে ওঠার সকল আয়োজন করলাম। আর তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে? আমি তোমাকে এত সুন্দরভাবে গড়ে তুললাম। জীবনযাপনের সব আয়োজন করলাম। অতঃপর নির্দেশ করলাম, পর্দায় থেকো। আমাকে সিজদা কর। আর তুমি আমার নির্দেশ ভুলে গেলে?

তোমাকে সৃষ্টি করেছি আনুগত্যের উদ্দেশ্যে

আমি যে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি রোযা রাখ, যাকাত দাও। আমি তোমাদেরকে আদেশ করেছি, মায়ের পা ধুয়ে পানি পান কর। আমি তোমাদেরকে বলেছি, বাবার সামনে চোখ তুলে কথা বলো না। আমি তোমরা নারীদেরকে বলেছি, স্বামীদের হক আদায় কর। তোমরা পুরুষদেরকে বলেছি, স্ত্রীদের অধিকারের প্রতি যত্নবান হও। আমি তোমাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুদ পরিহার করে চলতে বলেছি। অন্যের প্রতি অবিচার করতে নিষেধ করেছি। তোমাদের শক্তিকে অন্যায় পথে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছি। কিন্তু তোমরা কি করেছো? তোমরা কদমে কদমে আমার নির্দেশ লঙ্ঘন করেছো।

আমি তোমাদের সামনে পাক কুরআনে নানা রকমের ঘটনা তুলে ধরেছি। তোমরা অতীত দিনের কাহিনী মনে করে তা ফেলে রেখেছো। নিজেরাও পড়নি, অন্যদেরকেও পড়াওনি।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা মসজিদে ছিপারা পড়ে ঘরে এসে দেখতাম তখনও ঘরের মেয়েরা বসে বসে কুরআন পড়ছে। এই চিত্র ছিল প্রতিটি মুসলিম পরিবারের। কিন্তু আজ মুসলমানদের প্রতিটি ঘরেই রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত টেলিভিশন চলে, ডিশ চলে। আর যেখানে ডিশ ও কেবল আছে সেখানে নির্লজ্জতা তো আছেই, আছে ব্যভিচারও। সেখানকার নতুন প্রজন্মরাও হয় নির্লজ্জ, আদর্শবিবর্জিত। আজ দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের মুখেই কান্না শোনা যায়। দেশ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। দেশের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য ভেঙ্গে পড়েছে। আমি বলি, এটা তো কান্নার বিষয় ছিল না। কান্নার বিষয় তো ছিল এটা যে, আজ আমাদের সন্তানরা পথহারা হয়ে পড়েছে। আমি মনে করি, যে জাতির যুবক সন্তানরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, ব্যভিচার ও নাচ-গানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, যে জাতির তরুণীরা বেপর্দা হয়ে পড়ে প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র তো সেই জাতি। এ জাতি ভাগ্যাহত। তাদের তরী কখনও তীরে ভিড়বার নয়।

যদি কোন সম্প্রদায়ের নাচ-গান সভ্যতার রূপ ধারণ করে, চোখের সামনে যদি সন্তানরা শিষ্টাচার বিরোধী হয়ে পড়ে, বাজার যদি হয়ে পড়ে সুদনির্ভর, ব্যবসা-বাণিজ্য যদি ধোঁকা ও চাতুর্যে ছেয়ে যায়, কোন সমাজের শাসকরা যদি অবিচারী হয়ে পড়ে, টাকা-পয়সার বিনিময়ে যদি ন্যায়বিচার বিক্রি হতে শুরু করে, কোন সমাজের অসহায়-নির্যাতিতরা যদি সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে পড়ে তখন সে সম্প্রদায় দুনিয়াতে টিকে থাকাটাই তো অনেক বড় সৌভাগ্যের কথা। এই পৃথিবীটা যদি প্রতিদানের জগত হতো তাহলে আমাদের সমাজে যে পরিমাণে পাপ ও অবিচার চলছে, বহু পূর্বেই আমাদের এই দেশ মাটির ভেতর ধসে যেতো।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

কোন একজন নারী যখন নূপুর পরে খোলা বাজারে নৃত্য করে তখন তার এই নাচের ঝনঝনাতিতে হিমালয় পর্বত ভেঙ্গে পড়ার কথা ছিল। কথা ছিল সমুদ্রে আগুন লেগে যাওয়ার। আমাদের সবুজ-শ্যামল ফসলের মাঠ

মরুভূমিতে রূপান্তরিত হওয়ার কথা ছিল। কথা ছিল আমাদের শহরে উজাড় হয়ে যাওয়ার। কিন্তু আমাদের প্রভুও এই পৃথিবীটাকে প্রতিদানের জগত হিসেবে সৃষ্টি করেননি। বরং সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে। আমাদের প্রতিদান জগত আমাদের সামনে। যেদিন আমাদের দৃষ্টি ফেটে পড়বে, যেদিন আমাদের কলজে আমাদের মুখে চলে আসবে, যেদিন মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে ভুলে যাবে, যেদিন সন্তানরা ভুলে যাবে তাদের মা-বাবাকে সেদিন হবে আমাদের প্রতিদানের দিন। সেদিন সামনে অপেক্ষা করছে।

অবশ্য মৃত্যুর ভেতর দিয়েই আমরা এখানে একটা ফয়সালা দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই, মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে তার মৃত্যুও সেভাবেই হয়। যার জীবন যে পথে যে রঙে পরিচালিত হয় তার মৃত্যু সেভাবেই আসে, সে পথেই আসে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

এজন্য আমি বলি, উপরোক্ত আয়াতটি যখন আমি তিলাওয়াত করি, তখন আমার কাছে মনে হয়– আল্লাহ তাআলা যেন পৃথিবীর প্রতিটি নারী ও পুরুষকে কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন। ঝাঁকুনি দিচ্ছেন প্রতিটি মা, বাবা, বোন, খালা, ফুফু, মামা, চাচা সকলকেই। প্রত্যেকের কাঁধেই যেন হাত রেখে মহান রাব্বুল আলামীন ঝাঁকুনি দিয়ে বলছেন– হে আমার বান্দা! তোমার জীবন গঠনের দায়িত্ব তো আমার। আমি তোমাকে তোমার মায়ের চাইতে সত্তরগুণ বেশি ভালোবাসি। বলো, তুমি অভাবে থাকবে সে কি করে আমি বরদাশত করবো? আরবী ভাষায় সত্তর শব্দটি অধিক সংখ্যা বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এর মর্ম হলো– আমি তোমাকে অসীম ভালোবাসি। সুতরাং তুমি নামাযের জন্য চলে আসো। মুসল্লা বিছিয়ে আমার সিজদায় পড়ে যাও। হে আমার বান্দী! আমি তোমাকে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করছি না। প্রয়োজন পড়লে অবশ্যই যাবে। তবে পর্দা করে যাবে। তোমার শরীর কাউকে দেখাবে না। যখন রোযা আসে তখন আমি তোমাকে বলি, রোযা রাখ। তুমি যদি কন্যা হয়ে থাকো তাহলে আমি তোমাকে বলি, মা-বাবার সেবা কর। তুমি যদি বোন হয়ে থাকো তাহলে আমি তোমাকে বলি, ভাইদের সেবা কর। আর তুমি যখন স্ত্রী তখন বলি, তুমি তোমার স্বামীর সেবা কর। তুমি যদি পুত্র হয়ে থাকো তাহলে আমি বলি, মা-বাবার সেবা

কর। যদি ভাই হয়ে থাকো তাহলে বলি, বোনের সেবা কর। যদি স্বামী হয়ে থাকো তাহলে বলি, স্ত্রীর অধিকারের প্রতি যত্নবান হও। যদি বাবা হয়ে থাকো তাহলে বলি, নিজের সন্তানদেরকে ধর্মীয় আদলে গড়ে তোল। যদি ব্যবসায়ী হও তাহলে বলি, মিথ্যা বলো না। মাপে কম দিও না। তুমি যখন জমিদার তখন বলি, জমিদারীর উৎপাদন নিয়ে কখনও অহংকার করো না। বরং অসহায় দুঃখীদের সেবা কর। তুমি যদি শাসক হও তাহলে বলি, মানুষের প্রতি ইনসাফ কর। তুমি যদি বিচারক হও তাহলে বলি, ন্যায়বিচার কর। আর জালেমের পক্ষ নিও না। আমি এ কথাগুলো অবিরাম বলে যাচ্ছি তোমাদেরকে। বলছি তোমাদেরই ভালোর জন্যে। হে মানুষ! আমার চাইতে কল্যাণকামী তুমি এই পৃথিবী আর কোথায় পাবে?

وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا o

আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। [নিসা : ১৪৭]

বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা

হযরত ইউনুস (আ.)কে মাছে খেয়ে ফেললো। কিছুদিন মাছের পেটে থাকার পর মাছ তাঁকে উগলে ফেললো। তিনি যখন মাছের পেট থেকে বেরিয়ে এলেন তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, তোমার সম্প্রদায় তওবা করেছে। তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও। হযরত ইউনুস (আ.) যাচ্ছেন স্বজাতির কাছে। পথে লক্ষ্য করলেন, এক কুমার মাটির পাত্র তৈরি করছে। হাতে মাটির পাত্র বানিয়ে তা আগুনে পুড়িয়ে সাজিয়ে রাখছে। আল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুস (আ.)কে বললেন– আচ্ছা, এই কুমারকে বলো একটি পাত্র ভেঙ্গে ফেলতে। হযরত ইউনুস (আ.) কুমারকে বললেন, ভাই এই একটি পাত্র ভেঙ্গে ফেলো তো?

কুমার বললো, কেন, কি হয়েছে? আমি নিজ হাতে এই পাত্র বানালাম। আবার ভাঙ্গবো কেনো?

হযরত ইউনুস (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! এ তো পাত্র ভাঙ্গতে রাজি নয়।

আল্লাহ তাআলা বললেন- দেখ, এই কুমার এই সামান্য পাত্র ভাঙ্গতে প্রস্তুত নয়। আর যে বান্দাদেরকে আমি নিজে সৃষ্টি করেছি তুমি তো আমার হাতেই তাদেরকে মারতে বসেছিলে। তুমি গিয়ে দেখ, তারা তাওবা করেছে। তারা আমার কাছে ফিরে এসেছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

এই হলো আমাদের আল্লাহর মমতা। তিনি পৃথিবীর সকল মুসলমানকেই তাদের কাঁধে হাত রেখে বলছেন, তোমরা তোমাদের দয়ালু প্রভুর সাথে এখানেই একটি মিটমাট করে নাও। এমন দয়ালু প্রভু, এমন মমতাময় মালিক আর কোথাও খুঁজে পাবে না।

এই আমার অপরূপ প্রভু। তাঁর মতো কোন প্রভু দেখাও তো দেখি। তাঁর মতো কোন মালিক ও অভিভাবক কোথাও আছে কি? তাঁর মতো দয়ালু সৃষ্টিকর্তা আর কোথায় পাবে? তাঁর উপমা তো তিনিই। যিনি আমাদের অস্তিত্ব দান করেছেন, যিনি আমাদেরকে এই চোখ দিয়েছেন, এই মাথা দিয়েছেন তাঁকে সিজদা করবে না তো কাকে সিজদা করবে? মেয়েরা টিকলিকে তাদের অলংকার মনে করে রেখেছে। আমি বলি টিকলি নয় সিজদার চিহ্নকে তোমরা অলংকার বানাও। আমি বলি, সুরমায় চোখ সাজিয়ো না। চোখ সাজাও আনত দৃষ্টির লজ্জা দিয়ে। তোমরা তো অলংকারে শরীর সাজিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়ানোকে নিজেদের বড়ত্ব মনে করে রেখেছো। অথচ হীরা পাহাড়ে লুকিয়ে থাকে। সমুদ্রের ভেতর ঝিনুকের গর্ভে লুকিয়ে থাকে মোতি। মূল্যবান বস্তু কখনও খোলাবাজারে পাওয়া যায় না। আমি বলবো, পৃথিবীতে এমন কোন ফল আছে যা খোসার পর্দায় আবৃত নয়। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি ফলকেই পর্দাবৃত করে রেখেছেন। যেখানে যে পদার্থটা যত বেশি মূল্যবান সেখানে সে পদার্থটাকে তত বেশি যত্নের সাথে প্যাকিং করে রাখা হয়।

এই পৃথিবীতে সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ হলো নারী। এই নারীই মা। মা থেকে বংশ সম্প্রসারিত হয়। মায়ের কোল যদি উর্বরা হয় তাহলে এই মায়ের কোলে লালিত সন্তানরাই এই পৃথিবীকে সবুজ-শ্যামলিমায় গড়ে তোলে। পক্ষান্তরে মায়ের কোল যদি হয় অনুর্বর তখন পৃথিবী হয়ে পড়ে বিরান। মায়ের কোল যদি কোমল মমতাশূন্য হয়ে পড়ে তখন সে

কোল থেকে উৎপাদিত সন্তানরাই হয় মদ্যপ, জুয়াড়ী, ব্যভিচারী, ঘাতক। তারা পৃথিবীতে মানুষের জীবনের বাণিজ্য করে বেড়ায়। বাণিজ্য করে বেড়ায় মানুষের সম্ভ্রমের। তারা লুট করে নেয় মানুষের ইনসাফ। তারা নির্মমভাবে হত্যা করে মানবতা। পক্ষান্তরে মায়ের কোল যদি হয় মাতৃত্বের দায়িত্বে সচেতন, মায়ের কোল যদি হয় লালনের সযত্ন ভূমি তখন এই মায়ের কোলেই সৃষ্টি হয় খালেদ সাইফুল্লাহ, তারেক ইবনে যিয়াদ, আবদুল কাদের জিলানী, জুনায়েদ বাগদাদী, রাবেয়া বসরী, সিররি সিকতী। এই মায়ের কোল থেকেই সৃষ্টি হয় বখতিয়ার কাকী, সৃষ্টি হয় জগতখ্যাত আরও কত সোনার সন্তান। এই মায়ের কোলে উৎপাদিত হীরে মানিকরাই আলোকিত করে তুলে পৃথিবী। আজ বেদনার বিষয় এটাই, পৃথিবীর মায়েদের কোল যেন বন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাবারা যেন নিঃসন্তান হয়ে পড়েছে।

কেউ হয়তো বলবেন, পৃথিবীর মা ও বাবারা নিঃসন্তান কোথায়? সন্তানে তো তাদের ঘর বোঝাই। আমি বলবো, সন্তান আছে। তবে এমন সন্তান নেই যে সন্তানকে দেখে আল্লাহ খুশি হবেন। খুশি হবেন আল্লাহর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজ সে সন্তান নেই যে সন্তান নিয়ে ইসলাম গর্ব করতে পারে।

কোন মুমিন পুরুষ কিংবা নারী যখন মাটিতে মাথা রেখে আল্লাহকে সিজদা করে, অতঃপর তার চোখ থেকে বেরিয়ে আসা অশ্রু যখন মাটি স্পর্শ করে তখন সে অশ্রুর পরশে এই পৃথিবীর হৃদয় এতটা শীতল হয় চল্লিশ দিনের বৃষ্টিতেও ততটা শীতল হয় না। এটা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। মুমিনের চোখের পানি সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত এমনভাবে শীতল করে তোলে, চল্লিশ দিনের বৃষ্টিও সেভাবে এই মাটির পৃথিবীকে শীতল করতে পারে না। চল্লিশ দিনের বৃষ্টি তো দশ ফিট মাটির নিচেও পৌঁছায় না। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে নির্গত এক ফোঁটা চোখের পানি মুহূর্তে পৌঁছে যায় সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত। আজ এই পৃথিবী নাচে-গানে এতটা উত্তপ্ত, পৃথিবীর পিঠ এখন চৌচির হয়ে আছে। পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে জ্বলছে আগুন। ব্যভিচারের আঘাতে আঘাতে পৃথিবী এখন ফেটে পড়বার উপক্রম। মা-বাবার অবিচারে পাহাড়-পর্বতগুলো

বিচূর্ণ ধুলোর মতো উড়ে যেতে প্রস্তুত। পৃথিবী আজ যেন তৃষ্ণায় চরমভাবে কাতর। আকাশে আজ কোন আলো নেই।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

একমাত্র তোমরাই পারো তোমাদের চোখের পানি দিয়ে পৃথিবীর এই তৃষ্ণাকে মিটাতে। তোমাদের চোখের পানিই পারে খোদার অবাধ্যতায় প্রজ্জ্বলিত এই আগুনকে নিভাতে। তোমাদেরই কর্তব্য, নতুন করে এই পৃথিবীকে আবাদ করা। তোমাদেরকে নাচার জন্যে এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়নি। তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁর কুদরতী পায়ে সিজদা করার জন্যে।

সমাজের যেদিকেই তাকাই কেবলই আল্লাহর নাফরমানী। নাচ আর মেহেদী অনুষ্ঠান ছাড়া মুসলমানদের বিয়ে হয় না। এ তো ছিল হিন্দুদের সভ্যতা। আজ আমাদের মুসলমান মা-বাবারা গর্বের সাথে নিজের মেয়ের বিয়েতে এই হিন্দু উৎসবের আয়োজন করছে। বলুন, আমাদের বিত্তবানদের বিয়ে কি এখন নাচ-গান ছাড়া হয়? ব্যান্ড পার্টি ছাড়া যেন আমাদের বিয়ে-শাদী পূর্ণাঙ্গতাই পায় না।

আমি আমার কথা বলছি না, আমি বলছি আল্লাহর কথা। বলছি আল্লাহর রাসূলের কথা। কারণ, এ পৃথিবীতে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলই তো আমাদের একমাত্র ভরসা। আত্মীয়তা ও বন্ধনের উপযুক্ত সত্তা তো একমাত্র আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই। মৃত্যুও মায়ের বন্ধনকে ছিন্ন করে দেয়। নিজ হাতে কাফন পরিয়ে সন্তানকে কবরে রেখে আসে। নিজের বাবাকে নিজ হাতে ধরে কবরে শুইয়ে দেয়। কবরে শুইয়ে দেয় নিজের মাকে। কেউ অপরের জায়গায় মৃত্যুবরণ করতে পারে না। আমরা আমাদের বাবার পরিবর্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারি না। আলিঙ্গন করতে পারি না মায়ের মৃত্যুকেও। কিন্তু আল্লাহ তো তিনিই যিনি মরণেও বন্ধু। যিনি রাতের অন্ধকারেও বন্ধু, বন্ধু দিনের আলোতেও। বন্ধু তিনি অন্ধকার কবরেও। কবরে শায়িত হবার পর ডান দিক থেকে নামায আসবে, বাম দিক থেকে আসবে কুরআন। মাথার দিক থেকে রোযা আসবে, পায়ের দিক থেকে আসবে মসজিদে হেঁটে যাওয়ার পা। কবরে

বন্ধু হয়ে দেখা দিবে ধৈর্য, আল্লাহর ভয়। মুনকার-নাকীর যখন জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে উপস্থিত হবে তখন এরাই তো হবে সঙ্গী।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) তো একজন নারীই ছিলেন। ইতিহাসে কি নারীর কোন অভাব ছিল? তাছাড়া ইতিহাসে যে কোন নারী কিংবা পুরুষকে স্থান পেতে হলে প্রথমেই তাকে হতে হয় উচ্চ খান্দানের অধিকারী। হতে হয় নারীকে রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারী। হতে হয় বিশাল ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির অধিকারী। এই চারটির কোন একটিতেও যদি ঘাটতি থাকে তাহলে আর ইতিহাসের পাতায় মর্যাদার আসন পাওয়া যায় না। আসন পাওয়া যায় না শ্রেষ্ঠত্বের। বরং ইতিহাস তাকে দেখে উপেক্ষার দৃষ্টিতে। যার আলোচিত বংশ নেই, যার রূপ নেই, সৌন্দর্য নেই, অর্থ নেই বিত্ত নেই- ইতিহাসে তার কী মর্যাদা আছে? কোন নারী যদি বন্ধ্যা হয় তাহলে তো কোন পুরুষ তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয় না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো, হযরত রাবেয়া (রহ.) এই চারটির কোনটিরই অধিকারী ছিলেন না। মর্যাদা লাভের এই চারটির সবটিতেই তিনি ছিলেন শূন্যের কোঠায়। বংশগতভাবে ছিলেন হাবশী। কৃষ্ণ গোত্রের। শরীরের গঠন আকৃতিও ছিল নেহায়েত অসুন্দর। তাছাড়া ছিলেন গোলামের সন্তান গোলাম। আর গোলামের কি কোন অর্থ থাকে? তার উপর বন্ধ্যা।

যৌবনেই স্বামী মারা গেছে। কিন্তু তাঁর প্রতিদিনকার রুটিন ছিল এই- প্রতিদিন রাতে গোসল করতেন। কাপড় বদলাতেন। তারপর স্বামীর কাছে এসে বলতেন, আমার দায়িত্বে কোন সেবা আছে যা আমি আঞ্জাম দিতে পারি? স্বামী নেতিবাচক জবাব দিলে তার অনুমতি নিয়ে মুসল্লায় দাঁড়িয়ে যেতেন এবং মুসল্লায় দাঁড়িয়ে যেতেন রাবেয়া বসরী হয়ে। তাঁর স্বামীর ইন্তেকালের পর জগতের অন্যতম বিখ্যাত আলেম মুজাহিদ ও মুহাদ্দিস রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারী হযরত হাসান বসরী (রহ.) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। উত্তরে হযরত রাবেয়া (রহ.) বলে পাঠান- আমার চারটি প্রশ্নের জবাব দিন। আমি বিয়েতে প্রস্তুত আছি।

এক. বলুন, আমি কি বেহেশতি না দোযখী?

হাসান বসরী (রহ.) বললেন, বলতে পারবো না।

দুই. আমি কি আমার আমলনামা ডান হাতে পাবো না বাম হাতে?

হাসান বসরী (রহ.) বললেন, তাও তো জানি না।

তিন. আমি কি পুলসিরাত পার হতে পারবো না পুলসিরাত থেকে পড়ে যাবো?

হাসান বসরী (রহ.) বললেন, জানা নেই।

চার. আমার মৃত্যু কি ঈমানের সাথে হবে?

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বললেন, জানা নেই।

উত্তর শোনার পর হযরত রাবেয়া (রহ.) বলে দিলেন- যাও। তাহলে তো আমার হাতেও সময় নেই। আমাকে পরকালের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে দাও।

হযরত রাবেয়া (রহ.) মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছিলেন, আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার মুসল্লায় আমাকে কাফন দিয়ে প্রতিবেশীদেরকে ডেকে রাতের অন্ধকারেই আমার জানাযা পড়ে আমাকে দাফন করে দিও। সকালে লোকদেরকে বলে দিও, এই পৃথিবীর উপর একটি বোঝা ছিল পড়ে গেছে।

যে দাসীকে তিনি মৃত্যুর আগে এ কথা বলে গিয়েছিলেন মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখা হয় এই দাসীর সাথে। তখন তিনি দাসীকে বলেন, মুনকার-নাকীর এসেছিল। এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো- তোমার রব কে? আমি বললাম, সুবহান আল্লাহ! চল্লিশ বছর পর্যন্ত যাঁকে মাটির উপর ভুলিনি মাত্র চার ফুট নিচে এসে তাঁকে ভুলে গেলাম? এ কথা শোনে তো মুনকার-নাকীর নির্বাক।

আমি বলি, প্রিয় বোনেরা! মরতেই যখন হবে এমন মরণ মরো।

আচ্ছা, হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) কি এই পৃথিবীর উপর বোঝা ছিলেন? বোঝা তো আমরা। আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পাপে জর্জরিত। আমাদের মাথা সিজদাবনত নয়। আমাদের চোখে লজ্জাবোধ

নেই। আমাদের কান গানে গানে বধির। আমাদের মায়েরা আল্লাহর অবাধ্য। আমাদের স্বামীরা স্ত্রীদের অধিকারের প্রতি যত্নবান নয়। স্ত্রীরাও অনুগত নয় স্বামীদের। এই পৃথিবীতে যদি কেউ বোঝা হয়ে থাকে সে তো আমরাই।

প্রিয় বোনেরা!

যে সভ্যতার পিঠে চড়ে এখন আমরা হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছি এ সভ্যতা তো আমাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমাদের দেশে। আমাদের প্রভু তো এই পৃথিবীকে একটি ধোঁকার ঘর হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবী আমাদের প্রভুর দৃষ্টিতে একটি মশার ডানা মাত্র। যারা এই পৃথিবীর পেছনে হন্যে হয়ে ফিরছে তারা তো স্বপ্নবিলাসী পাগল। যারা এই মশার ডানাসম পৃথিবীতে বিশাল বিশাল বাড়ি বানাতে ব্যস্ত তারা নির্বোধ। দুনিয়ার বাড়ির নেশায় যারা পরকালের বেহেশতের বাড়ির কথা ভুলে গেছে, ভুলে গেছে দুনিয়ার মোহে পড়ে, দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তাকে তাদের চাইতে বোকা এই পৃথিবীতে আর কে আছে?

এ পৃথিবী তো একটি মুসাফিরখানা। কত রাজা গেছে, রাণী গেছে, আমীর গেছে, ফকীর গেছে, মন্ত্রী গেছে, ফৌজী গেছে, এসপি গেছে, প্রেসিডেন্ট গেছে, প্রধানমন্ত্রী গেছে, সেক্রেটারী গেছে, ছোট বড় সকলেই তো গেছে। এ পৃথিবীতে যারা রাজত্ব করেছে তারাও গেছে। যারা মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরেছে তারাও গেছে। তাদের উপস্থিতিতে আবাদ হয়েছে কবরস্থান। বিরান হয়েছে ঘরবাড়ি। এই পৃথিবীতে প্রতিটি ঘর তা যত আবাদ ও উৎসবমুখরই হোক একদিন তা বিরান হবেই। একদিন তাকে নীরবতা গ্রাস করবেই। একদিন সকলকেই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে। সেদিন তিনি প্রতিটি মানুষকে মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করবেন– হে আমার বান্দা! হে আমার বান্দী! বলো, দুনিয়াতে কী করে এসেছো?

মনযিল ভুলে যেয়ো না

এই জীবনে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝতে শেখো। তাঁর আদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবন গড়তে সচেষ্ট হও। তাঁকে

মূল্যায়ন করতে শেখো। তাঁর মতো এতটা দয়ালু ও ভালোবাসার মানুষ আর কেউ নেই। আমাকে বল, পৃথিবীতে এমন কোন মা আছে– তেইশ বছর অবিরাম যার চোখ শুকাইনি। তেইশ বছর অবিরাম যে নিজের সন্তানের কল্যাণ কামনায় কেঁদেছে বিচলতার মধ্য দিয়ে জীবন পার করেছে? কিন্তু আমাদের নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখ, তিনি তাঁর উম্মতের জন্যে অবিরাম তেইশ বছর এতটা অস্থিরতা ও বিচলতার মধ্য দিয়ে সময় পার করেছেন– তাঁর সে অস্থিরতা দেখে যিনি তাঁকে নবী করে পাঠিয়েছেন তিনি পর্যন্ত তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। বলেছেন, হে নবী! আপনি এতটা কাঁদছেন কেন?

সন্তান অতিরিক্ত পড়াশোনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লে যেমন মা-বাবা তাকে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। মা বারবার তাকে এই বলে তাড়া দেয়, বাবা একটু আরাম করে নাও। বাবা তোমার এত পড়ার দরকার নেই। আমার আপনার নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থাও অনুরূপ। আমাদের প্রতি তাঁর অস্থিরতা দেখে স্বয়ং প্রভু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। বলেছেন, আপনি কি আপনার উম্মতের কথা ভেবে অবশেষে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন?

এখনও তায়েফের পাহাড়কে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস কর, সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বরের প্রতি এখানে কিভাবে পাথর বর্ষিত হয়েছিল? দীর্ঘ তিন মাইল পথ তাঁকে পাথরের মুখোমুখি পথ চলতে হয়েছে। শরীরের রক্তে জুতা পায়ের সাথে লেগে গিয়েছে। তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছেন। খাদেম হযরত যায়েদ (রা.) তাঁকে তুলে নিয়ে এক দুশমনের বাগানে আশ্রয় নিয়েছেন। জীবনশত্রু উতবা ইবনে রাবিআ পর্যন্ত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে আঁতকে উঠেছে, অশ্রুসজল হয়েছে। বলেছে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর সাথে এ কী আচরণ করা হয়েছে? স্বয়ং এই শত্রু উতবা নিজ হাতে বাগান থেকে গিয়ে আঙুর ছিঁড়ে এনেছে। চোখলজ্জায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে নিজে তো আঙুর পরিবেশন করতে পারেনি, তাই তার গোলামকে পাঠিয়েছে এবং এ কথা বলে পাঠিয়েছে, শত্রুতা শত্রুতার জায়গায়; এখন তোমার অবস্থা ভয়াবহ। কুরাইশদের রক্তের কসম! আমার এই আঙুরগুলো ফেরত পাঠিয়ো না,

খেয়ে নাও। অথচ এই সেই উতবা, যে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার সুযোগের অপেক্ষায় ঘুরে ফিরতো। যে নবীর দুরবস্থা দেখে রক্তাক্ত নির্যাতিত রূপ দেখে তার জীবনশত্রুরা পর্যন্ত তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়েছে। আজ আমরা তাঁর উম্মত হয়ে তাঁর আদর্শকে হত্যা করে চলছি।

আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত। অথচ ব্যান্ড পার্টি ছাড়া আমাদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে-শাদী হয় না। সন্তানদের মন খুশি করার জন্যে এত কিছু করছো। যে রাসূল তেইশ বছর তোমাদের জন্যে কেঁদেছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন একবার কি সে রাসূলকে খুশি করার কথা ভেবেছো?

আমি তো এ কথা বলি– যাঁর বরকতে আজ আমরা পৃথিবীতে টিকে আছি, যাঁর দুআর উসিলায় আজ আমরা মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, যাঁর চোখের পানির বরকতে আজও আমরা বেঁচে আছি– মানব আকৃতিতে যদি তিনি চোখের পানি ফেলে ফেলে আমাদের সমস্যার সমাধান না করে যেতেন তাহলে আজ হয়তো পৃথিবীতে কোন মানুষ চোখে পড়তো না। আজ হয়তো আমরা সর্বত্র জানোয়ারদেরকে ঘুরে ফিরতে দেখতাম।

আজ আমরা আমাদের মেয়েদেরকে খুশি করার জন্যে তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে গান-বাজনার আয়োজন করি। আমরা ভুলে যাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় নন্দিনী হযরত ফাতিমাতুয্ যাহরা (রা.)-এর কথা। অথচ একবার ভেবে দেখ, হযরত ফাতিমাতুয্ যাহরা (রা.)-এর মর্যাদার কথা। নবী-নন্দিনী হযরত ফাতিমা যখন পুলসিরাত পার হওয়ার জন্যে পুলসিরাতে পা রাখবেন তখন হাশরের ময়দানে ঘোষণা দেয়া হবে– সকলে নিজ নিজ দৃষ্টি নমিত করে রাখ। ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ আসছেন। আজ আমরা সেই ফাতিমাতুয্ যাহরা (রা.)কে ভুলে গেছি। আমরা নিজেদের মর্যাদা খুঁজে ফিরছি পাশ্চাত্যের নির্লজ্জ নারীদের মাঝে। আমি মনে করি, আমার মা-বোনদের জন্যে এটাই সবচে' বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়। তারা তাদের শেকড় ভুলে গেছে। ভুলে গেছে তাদের মর্যাদার প্রতীক।

মোহর ও তার দর্শন

আল্লাহ তাআলা মুসলমান নারীকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছেন, স্বামীকে দায়িত্ব দিয়েছেন নারীর ভরণ-পোষণের। স্ত্রীকে মোহর দেয়া স্বামীর কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মোহর নারীর এক চিরপ্রতিষ্ঠিত অধিকার। মোহর ব্যতীত বিয়ে শুদ্ধ হয় না। এ মোহর কোন নারীর মূল্য নয়। বরং আমরণ যে স্বামীকে নারীর ব্যয়ভার বহন করে চলতে হবে তারই নিদর্শন হলো এই মোহর। মোহরের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে এ কথাই জানিয়ে দিয়েছেন– নারী আমরণ ঘরের ভেতর নিরাপদে জীবনযাপন করবে। তার জীবন ও জীবিকার কথা ভাববে কেবলই তার স্বামী। শুধু এখানেই শেষ নয়, আল্লাহ তাআলা নারীকে উত্তরাধিকার দিয়েছেন তার বাবার সম্পদে, স্বামীর সম্পদে। আজকাল তো আমাদের মুসলমান সমাজেও এক্ষেত্রে পুরুষরা চরম অবহেলা করে থাকে। অথচ এটা নারীর প্রতিষ্ঠিত অধিকার। অনেকে তো কৌশল করে মেয়েদের উত্তরাধিকার সম্পদ নিজের নামে লিখে নেয়। অনেকে আবার কৌশলে মেয়েদেরকে বঞ্চিত করে, সকল সহায়-সম্পদ ছেলেদের হাতে তুলে দেয়। আমি বলি, যারা নারীদের প্রতি এই অবিচার করে কবরে যায়, নামায রোযা হজ যাকাত তাসবীহ যিকির তাবলীগ কোন কিছুই তাদেরকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অথচ কবরই হলো সত্যিকার মুমিনের জন্য সবচে' বড় চিন্তার বিষয়।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচে' বড় কন্যা হলেন হযরত যাইনাব (রা.)। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে কবরে নামান তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। স্বীয় কন্যাকে কবরে শুইয়ে দিয়ে যখন বেরিয়ে আসেন তখন তাঁর চেহারা ছিল হাস্যোজ্জ্বল। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরয করেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন কবরে নামছিলেন তখন আপনাকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছিল। আবার যখন বেরিয়ে আসছিলেন তখন মনে হচ্ছিল

বেশ হাস্যোজ্জ্বল। উত্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আমি আমার মেয়ের ব্যাপারে কবরের আযাবকে ভয় করছিলাম। তাই আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করেছি– হে আল্লাহ! তুমি আমার মেয়েকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা কর। আল্লাহ তাআলা আমার দুআ কবুল করেছেন। আমার মেয়েকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। অন্যথায় যদি কাউকে কবর একবারও চেপে ধরে তাহলে তার এ চেপে ধরার আওয়াজ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যায়। একমাত্র মানুষ ব্যতীত পৃথিবীর সকল সৃষ্টি সে আওয়াজ শুনতে পায়। সুতরাং কবর কেবলই একটি মাটির গর্ত নয়। বরং এখান থেকেই শুরু হয় নব জীবনের যাত্রা।

এক ডাক পিয়নের চিৎকার

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আমার কথা শোন! আমি আমার নিজের কথা বলছি না, আমি তো হলাম হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন ডাক পিয়ন। আমি তোমাদের কাছে তাঁর পক্ষ থেকে একটা পয়গাম নিয়ে এসেছি। এই পৃথিবীতে যারা জমিদার তাদের একটা রেওয়াজ আছে। তারা তাদের একান্ত আপনজনদের কাছে চিঠি পাঠায় না। বরং সেখানে তাদের কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত করতে হলে তাদের কোন কর্মচারীকে পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর সেই আমন্ত্রিত জমিদার অতিথিরা নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী সেই চাকর দাওয়াতপত্র বিতরণকারীকে উপহার-উপঢৌকন দিয়ে খুশি করে। তদ্রূপ আমিও তোমাদের কাছে আল্লাহ ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাকর হয়ে তাঁদেরই পক্ষ থেকে দাওয়াতপত্র নিয়ে এসেছি। আমার পয়গাম এটাই, প্রিয় বোনেরা! আজ থেকে তোমরা তোমাদেরকে হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রা.)-এর কন্যা মনে করবে। এটাই তোমাদের জন্যে মর্যাদার সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার। পর্দাহীন খোলামেলা ঘুরে বেড়ানো কোন মুসলিম নারীর শান নয়। মুসলিম নারীর অলংকার হলো পর্দা। যেখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর পাক কালামে বিনা প্রয়োজনে কোন নারীর নাম পর্যন্ত

উল্লেখ করেননি সেখানে কোন আত্মমর্যাদাশীল মুসলিম নারী কিভাবে তার সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াবে? .

তোমরা কোন বিচারে পশ্চিমা নারীদের পেছনে ছুটছো? যে পশ্চিমা জগতে মায়ের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। যে সভ্যতা নারীর মায়ের অস্তিত্বকে নাশ করে দিয়েছে। যে সভ্যতায় নারীকে কন্যা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। গ্রহণ করতে পারেনি সম্মানিত জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে। যে সভ্যতায় নারী সমাসীন হতে পারেনি বোনের আসনে। যে পশ্চিমা সভ্যতার পেছনে তোমরা পাগল হয়ে ছুটছো সে পশ্চিমে একবার গিয়ে দেখ, সেখানে কোন নারীর নানী পরিচয় নেই। খালা পরিচয় নেই। ফুফু পরিচয় নেই। পরিচয় নেই দাদীর। সেখানে নারী অর্থই প্রেমিকা। নারী অর্থই যৌবনের খোরাক। সাধ পূর্ণ হলো অতঃপর পথে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এই তো পশ্চিমা সভ্যতার নারী।

এর বিপরীতে পবিত্র ইসলামের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। এখানে নারীর মর্যাদা এত বেশি– এখানে নারী মা। নারী বোন। নারী স্ত্রী। নারী দাদী। নারী নানী। নারী ফুফু। নারী খালা।

আমাদের প্রিয়তম রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখ, তাঁর প্রথম সন্তান হযরত যাইনাব (রা.)। দ্বিতীয় সন্তান হযরত রুকাইয়া (রা.)। অতঃপর পুত্র সন্তান। আর এ কন্যা সন্তান পেয়ে তাঁর হৃদয়ে আনন্দের সীমা নেই। তিনি আনন্দে তাদের জন্যে অনুষ্ঠান করেছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তানের পিতা হলো; অতঃপর তাদেরকে লালন-পালন করে বিয়ে দিল সে এবং আমি বেহেশতে পাশাপাশি থাকবো।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে এ কথা শোনে এক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কারও দুটি কন্যা সন্তান হয়? ইরশাদ করলেন, তার প্রতিদানও অনুরূপ। অন্য আরেক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কারও একটিমাত্র কন্যা সন্তান হয়? বললেন, সেও বেহেশতে আমার পাশাপাশি থাকবে। এ কথা শোনে আরেক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাকে আল্লাহ তাআলা কোন কন্যা সন্তান দেননি সে কী করবে? ইরশাদ করলেন– যাকে আল্লাহ তাআলা দুটি কন্যা সন্তান কিংবা

দুটি বোন দিয়েছেন অথচ আর্থিকভাবে সে খুবই দুর্বল এই ব্যক্তি তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জন কিংবা মরণ অবধি যদি আর্থিক সাহায্য করতে থাকে তাহলে তার জন্যও বেহেশত অবধারিত হয়ে যাবে। এ হলো ইসলামে নারীর মর্যাদা। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের প্রতি আমাদেরকে যত্নবান হতে এভাবে উৎসাহিত করেছেন– উৎসাহিত করেছেন বিয়ের পরও বোনদের জন্যে টাকা-পয়সা খরচ করতে। দাম্পত্য জীবনে পুরুষদেরকে আদেশ করেছেন–

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে। [নিসা : ১৯]

আর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهٖ

তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের চোখে ভালো তারাই প্রকৃত ভালো মানুষ।

হাদীস শরীফে আছে, এক মেয়ে এসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করলো– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা-বাবা আমাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছে। বলুন, আমার উপর আমার স্বামীর কি অধিকার রয়েছে? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– 'যদি তোমার স্বামীর সারা শরীর জখমে ছেয়ে যায় আর সে জখম যদি পুঁজে ভরে ওঠে, অতঃপর তুমি যদি জিহ্বায় চেটে চেটে সেই পুঁজ পরিষ্কার করো তবুও তার হক আদায় হবে না।' এভাবে নারী-পুরুষ উভয়ের কর্তব্যের কথা উল্লেখ করে একটা সম্মানিত সীমানা তৈরি করে দিয়েছে ইসলাম। একদিকে এ কথা বলা হয়েছে– 'পুরুষ নারীর কর্তা'। [নিসা : ৩৪] সেই সাথে এও বলা হয়েছে– 'স্ত্রীদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো। নিসা : ১৯]

উদ্দেশ্য, যেন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একটি সম্মানজনক পরিবেশ গড়ে ওঠে। আমাদের নবী আমাদেরকে এভাবেই গড়ে তুলেছেন। আমাদের নবী তো নিজ হাতে নিজ ঘর ঝাড়ু দিতেন। নিজে আটা মাখিয়ে স্ত্রীদেরকে রুটি বানাতে সাহায্য করতেন। কখনও কখনও নিজ হাতে কাপড় পরিষ্কার

করতেন। ঘরের বাইরে যত দুঃখ-বেদনারই তিনি শিকার হতেন যখন ঘরে আসতেন তখন তাঁর মুখে মুচকি হাসি লেগেই থাকতো। এ হলো মুসলমান পরিবারের আদল।

মুসলিম উম্মাহর সূচনা এক সম্মানিত মা থেকে

আমরা যদি আমাদের পেছনের দিকে তাকাই– যদিও পেছনের দিকে তাকানো খুবই কঠিন, কঠিন অতীতকে কল্পনা করা– তাহলে দেখবো এই উম্মাহর সূচনা হয়েছে একজন উপমাময়ী মা থেকে। মিশরের সম্মানিত এক শাহজাদী বিশ বাইশ বছর বয়সে তার আদরের পুত্রকে কোলে নিয়ে বসে আছে। স্বামীকে ছেড়ে দেয়া অনেক বড় বিসর্জন। একজন সম্ভ্রান্ত নারীর জন্যে স্বামীর বিচ্ছেদের চাইতে কষ্টের আর কিছু নেই। আর সেই স্বামী যদি হয় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো স্বামী তখন কি আর কষ্টের কোন সীমা থাকে? অতঃপর সেই বিচ্ছেদও ঘরে নয়, মরুভূমিতে। জনমানবহীন এক পাথুরে মরুভূমিতে।

মা হাজেরা এর কোলেই জন্ম লাভ করেছে এই উম্মাহ। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত মা হাজেরার কোল থেকেই বেরিয়ে এসেছে। আর এই মা ইসমাইল (আ.)কে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন মাত্র ছয় বছর বয়সে যখন বাবা ইসমাইল (আ.) তাঁকে কুরবানী করার প্রস্তাব করেন তখন তিনি অবলীলায় সেই প্রস্তাবের সামনে মাথানত করে দিয়েছিলেন। এ তো মূলত মা হাজেরার তরবিয়তেরই ফসল। তিনি হযরত ইসমাইল (আ.)কে যথার্থ সন্তানরূপে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বলেই বাবার দৃশ্যত সেই নির্মম প্রস্তাবের মুখে সঙ্গে সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন–

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ

> হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। [সাফফাত : ১০২]

আমি যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করি তখন আমি এই আয়াতের মর্মের ভেতর হারিয়ে যাই। মনে হয়, হৃদয়বান পিতা তার সন্তানের হাতে খেলনা তুলে দিয়েছেন, আর যে খেলনার বিনিময় সম্পর্কে পিতা-

পুত্রের মাঝে রসঘন গল্প চলছে। পিতা সন্তানের কাছে যেন নিজের দেয়া খেলনাটি ফেরত চাচ্ছেন। আর পুত্র প্রশান্তচিত্তে খেলনাটি পিতার হাতে তুলে দিচ্ছে।

ফিকাহশাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম হযরত ইবনে কুদামা হাম্বালী (রহ.) এ সম্পর্কে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাটি যখন পড়ি তখন হৃদয় কেঁপে ওঠে। বর্ণনাটিতে আছে- পিতার প্রস্তাব শুনে হযরত ইসমাইল (আ.) বলেছিলেন- আব্বু এ আমাকে কি প্রশ্ন করছেন? আপনি যদি আমাকে জবাই করে ফেলেন তাহলে তো আমি আল্লাহকে পেয়ে যাবো। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনার চাইতে ভালো এবং বেহেশত ভালো এই দুনিয়ার চাইতে। আমি বলি, এই তো মায়ের কৃতিত্ব। কৃতিত্ব মা হাজেরা (আ.)-এর। অতঃপর হযরত ইসমাইল (আ.) কিভাবে নিজেকে ছুরির নিচে শুইয়ে দিয়েছিলেন, কতভাবে সাহস যুগিয়ে ছিলেন পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)কে সে কাহিনী আমরা জানি। আমরা জানি তার পুরস্কারের কাহিনীও।

ইতোপূর্বে আমরা আরেক গর্বিতা মা হযরত আসমা (রা.)-এর কথাও পড়েছি। আমরা পড়েছি তাঁর স্বর্ণসন্তান জানবায মুজাহিদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)কে যখন হাজ্জাজ বাহিনী ঘেরাও করে ফেলেছিল তখন তিনি পরামর্শের জন্য গিয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছে। বলেছিলেন, মা! শত্রুপক্ষ সন্ধির প্রস্তাব করেছে। উত্তরে হযরত আসমা (রা.) বলেছিলেন- বাবা! তুমি যদি দুনিয়ার জন্যে লড়াই করে থাক তাহলে তুমিও ধ্বংস হয়েছো, ধ্বংস হয়েছে তোমার সঙ্গীরাও। আর যদি তুমি আখিরাতের জন্যে লড়াই করে থাক তাহলে জালেমের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করার কোন অবকাশ নেই। আমার কাছে তোমার জীবন বিসর্জনও প্রিয়, প্রিয় তোমার বেঁচে থাকাও। তুমি যদি আল্লাহর জন্যে জীবন দিয়ে দাও তাহলে এইজন্য মোটেও আমি চিন্তিত নই। উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেছিলেন- মা! আমি তো কখনোই দুনিয়ার জন্যে লড়াই করিনি। অতঃপর বীরপুত্র মাত্র চারজন সঙ্গী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিন হাজার সশস্ত্র সৈন্যের বিরুদ্ধে। আর আল্লাহর পথে লড়তে লড়তে জীবন দিয়ে দেন।

যাদের ত্যাগ ও কুরবানীতে আজও আমাদের ইতিহাস উজ্জ্বল সে তো মূলত গর্বিতা জননীদের ত্যাগেরই ফসল। কোন জাতির মায়েরা যখন তাদের সন্তান ও স্বামীদেরকে আল্লাহর পথে তুলে দেন তখন সে জাতির ভাগ্যকে আর কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না। আজ এই উম্মাহর জীবনে সবচে' বড় প্রয়োজন হলো সেই আদর্শময়ী মা। যে মা তাদের সন্তানকে গড়ে তুলবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শে। যে মা তাদের স্বামী-সন্তানের বিয়োগ-যাতনাকে হাসিমুখে বরণ করে নিবে এই উম্মাহর মুক্তি ও কল্যাণ কামনায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের ঘরে ঘরে এমনই আদর্শময়ী মা দান করুন। আমীন।

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ مُحَمَّدٍ خَلْقِهٖ وَّاٰلِهٖ
وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥

স মা প্ত